ভাসিলি সুখম্লিন্স্কি

শিক্ষা আমার ব্রত

ভাসিলি সুখম্লিনস্কি • শিক্ষা আমার ব্রত

শিশুদের মনোজগৎ,
বিশেষত
তাদের চিন্তাজগতের চর্চা —
শিক্ষকের অন্যতম
গুরুত্বপূর্ণ
সমস্যা।

ভাসিলি সুখম্লিনস্কি

...বিদ্যালয়ে
শিক্ষাদীক্ষার কর্মসূচি
সমগ্র শিক্ষামূলক কাজে
সাফল্যের প্রধান
শর্ত।

ভাসিলি সুখমলিনস্কি

ভাসিলি সুখমলিনস্কি • শিক্ষা আমার ব্রত

ভাসিলি সুখমলিনস্কি

শিক্ষা আমার ব্রত

ভাসিলি সুখম্‌লিন্‌স্কি

শিক্ষা আমার ব্রত

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো
১৯৮২

অনুবাদ: অরুণ সোম

অঙ্গসজ্জা: স্ভেৎলানা পুশ্‌কোভা

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ

Сердце отдаю детям

На языке бенгали

VASILY SUKHOMLINSKY

To Children I Give My Heart

In Bengali

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮২

С $\frac{603000—965}{014(01)—82}$ 559—82 4303000000

সূচি

প্রকাশকের নিবেদন ৫
ভূমিকা ১১

আনন্দ নিকেতন

বিদ্যালয়ের পরিচালক . . . ১৫
প্রথম বছর — শিশুমনের সন্ধানে ৩০
আমার শিক্ষার্থীদের মা-বাবারা ৩২
মুক্তাঙ্গন-বিদ্যালয় . ৫১
আমাদের ‘স্বপ্নপুরী’ . ৭৪
স্বাস্থ্যের উৎস — প্রকৃতি ৮৩
শিশুমাত্রেই শিল্পী ৯০
জীবন্ত ও সুন্দর জিনিসের প্রতি যত্ন ৯৪
শ্রমজগতে আমাদের পর্যটন ১০৪
নিসর্গ-সঙ্গীত ১০৭
শীতের আনন্দ আর ঝামেলা ১২৫
ভারুই পাখির প্রথম উৎসব ১২৯
আমাদের লেখাপড়া চর্চা . ১৩১
মানুষের মাঝে তোমার বাস ১৪৬
আছি দশে — মিলেমিশে . ১৫৭
স্বাস্থ্যের বাগানে আমাদের বাস . . ১৬১
প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রাক্কালে চিন্তাভাবনা ১৬৩

শৈশব পর্ব

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচয়	১৭০
স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্য .	১৭৭
শিক্ষা — মনোজীবনের অংশবিশেষ	১৯২
'প্রকৃতি পাঠের' তিনশ' পৃষ্ঠা . . .	২২১
বস্তুজগৎ থেকে সমাজে। কোথা থেকে কিসের আগমন ?	২৪৮
সজীব প্রশ্নমালা — হাজার প্রশ্ন	২৫২
আমাদের বিশ্ব 'পর্যটন'	২৬৯
শিশুর চাই মানসিক শ্রমের আনন্দ, বিদ্যায় সাফল্যের আনন্দ	২৮১
'রূপকথার ঘর'	৩০৭
রূপকথার ধারানুসরণ — আমাদের 'আশ্চর্য দ্বীপ'	৩২৩
গীতের আলোকে জাগতিক সৌন্দর্য	৩২৮
শিশুর মনোজীবনে গ্রন্থ	৩৩৬
মাতৃভাষা	৩৫০
আমাদের নিভৃত 'সৌন্দর্যলোক'	৩৭৩
জীবনাদর্শের উৎসমুখে . .	৩৭৬
কমিউনিস্ট পার্টির ভাবানুসরণে	৩৮৯
অহরহ মানুষের চিন্তা ছাড়া জীবন নিরর্থক	৩৯২
মহৎ অনুভূতিদীপ্ত শ্রম	৪১০
তোমরা, খুদে পাইওনিয়ররাই জন্মভূমির ভবিষ্যৎ অধিপতি	৪৪১
খুদে লেনিনীয় সংগঠনে শিশুদের যোগদান .	৪৬২
লেনিনের মতো সংগ্রামী ও বিজয়ী হতে হবে	৪৬৪
'অসমসাহসীদের দল'	৪৭১
গ্রীষ্মবিদায়	৪৮০

প্রকাশকের নিবেদন

'শিক্ষা আমার ব্রত' গ্রন্থের রচয়িতা — বিখ্যাত সোভিয়েত শিক্ষাব্রতী ভাসিলি আলেক্সান্দ্রভিচ সুখম্‌লিন্‌স্কি (১৯১৮-১৯৭০) তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার কাজে ব্যয় করেন। শেষ ঊনত্রিশ বছর তিনি ছিলেন বড় বড় শহর থেকে অনেক দূরে, ইউক্রেনের পাভ্‌লিশ পল্লীতে এক গ্রামীণ বিদ্যালয়ের পরিচালক।

বিদ্যালয়ের কাজে অবদানের জন্য তিনি সম্মানে ভূষিত হন: সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর ও ইউক্রেন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সম্মানীয় শিক্ষকের খেতাব অর্জন করেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের শিক্ষাবিজ্ঞান আকাদমির সহ সদস্য নির্বাচিত হন।

বিশ্বের বহু প্রগতিশীল শিক্ষাব্রতী অনেক কাল হল শিক্ষাপদ্ধতিকে এমন ভাবে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করে আসছেন যাতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা সেখানে এক অখণ্ড প্রক্রিয়ায় সম্মিলিত হতে পারে। . ভাসিলি আলেক্সান্দ্রভিচ সুখম্‌লিন্‌স্কির শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যকলাপ এই স্বপ্নেরই বাস্তব রূপায়ণ।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর মধ্যে মানুষটিকে দেখতে পাওয়া — এ-ই হল তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা, আর যাঁরা শিশুদের মানুষ করে তুলতে চান, শিক্ষা দিতে চান তাঁদেরও একান্ত দাবি।

ভাসিলি সুখম্‌লিন্‌স্কি ব্যবহারে ও তত্ত্বে প্রমাণ করলেন যে যে-কোন সুস্থ শিশুকেই আধুনিক মাধ্যমিক শিক্ষাদান করা যায়, পরন্তু কার কতটা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী শিশুদের কোন রকম বাছবিচার না করে সাধারণ সর্বজনীন বিদ্যালয়েই তা সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি কোন নতুন আবিষ্কার করেন নি, তবে যে বিচক্ষণ ব্যবস্থার ফলে শিক্ষকের

পক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি অনুযায়ী শিশুকে জ্ঞান বিতরণ করা সম্ভব, তিনি তা খুঁজে বার করেন। সুখমলিনস্কির কাছে প্রধান ব্যাপার হল শিশুর মধ্যে পড়াশুনায় আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, তার আত্মশিক্ষা ও আত্মোন্নতির প্রয়াস বিকশিত করে তোলা।

সুখমলিনস্কি গভীর নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে নিজের ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য করেছেন, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও মা-বাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন, অতীতের বড় বড় শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টিভঙ্গি আর লৌকিক জ্ঞানের সঙ্গে নিজের ভাবনাচিন্তা মিলিয়ে দেখেছেন।

শিশুদের শিক্ষাদান করতে গেলে তাদের ভালোবাসতে হয়। একমাত্র তখনই শিক্ষক শ্রমের আনন্দ, বন্ধুপ্রীতি ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা শিশুর মধ্যে সঞ্চার করতে পারেন। শিক্ষককে প্রতিটি শিশুর মনের সন্ধান জানতে হবে, একমাত্র তখনই নিজেদের পরিবার, স্কুল, শ্রম ও জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা তিনি শিশুদের শেখাতে পারেন। এই প্রণালীটিই — শিশুদের মনের সন্ধান লাভ — সুখমলিনস্কির শিক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।

প্রকৃতি মানুষকে যা'যা সদ্‌গুণ দান করেছে, ছাত্রদের মধ্যে তার উদ্বোধন ঘটানো, মানুষের নৈতিক গুণাবলীকে জানা, তাকে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে নিষ্ঠাবান, সৎ ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলা — এ-ই ছিল সোভিয়েত শিক্ষক সুখমলিনস্কির উদ্দেশ্য।

সুখমলিনস্কির শিক্ষাতত্ত্ব — উদারতা ও সত্যজ্ঞানের শিক্ষাতত্ত্ব, অনুভূতি ও মানস চর্চার শিক্ষাতত্ত্ব, তা হল 'মানুষ' ও 'সুনাগরিক' হওয়ার শিক্ষাতত্ত্ব।

জীবনের শেষ বিশ বছর ধরে সুখমলিনস্কি সবসময় তাঁর পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা নোট করে রাখতেন, আর তারই ফলে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় সক্ষম হন। সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেছে: 'শিক্ষা আমার ব্রত', 'নাগরিকের জন্ম', 'পাভ্‌লিশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়', 'কর্মিদলের বিচক্ষণ ক্ষমতা' ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রতিটি রচনাই অসামান্য শিক্ষাব্রতীর সুসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সমন্বয়। লেখক নিজে তাঁর রচনাগুলির 'মাকারেঙ্কোর মানসসন্তান' আখ্যা দিয়েছেন। সোভিয়েত

শিক্ষাবিদ আন্তন মাকারেঙ্কোর (১৮৮৮-১৯৩৯) জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাসংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে সমাদৃত ছিল।

মাকারেঙ্কোর শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তি ছিল মানুষের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বিশের দশকে, যখন বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে পিতৃমাতৃহীন ও ছন্নছাড়া অবস্থায় ছিল সেই সময় — সোভিয়েত দেশের দুরূহ পর্বে তিনি শিশুদের শ্রমকলোনি পরিচালনা করেন। একাকীত্বের মধ্যে পরিত্যক্ত শিশুমনের বেদনার উপশম ঘটাতে গেলে যা ছিল অত্যাবশ্যক তা হল শিশুকে দরদ ও যত্ন দিয়ে ঘিরে রাখা, তার জন্য নতুন পরিবার খুঁজে বার করা। মাকারেঙ্কোর শিক্ষার্থীদের কাছে এ ধরনের পরিবার হল তাদের কর্মিদল। এই ছেলেমেয়েদের আবার মানুষ করে তুলতে গেলে, তাদের ভেতরে অতীতের যে সমস্ত অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে আছে সেগুলিকে দূর করতে হলে সেই সময় দরকার ছিল মাকারেঙ্কোর উদ্ভাবিত অসামান্য শিক্ষাপ্রণালী। কিন্তু, সুখমলিনস্কির কথায়, মাকারেঙ্কোর পদ্ধতির প্রধান বিষয় হল 'অবিরাম মানবতাবাদের অফুরান অনুরণন,' 'মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসের মুগ্ধকর সৌন্দর্য'।

মাকারেঙ্কো তত্ত্বে ও প্রয়োগে যা প্রতিপন্ন করেছেন — অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে মনের আদানপ্রদান, শুভাকাঙ্ক্ষার পরিমণ্ডল — সুখমলিনস্কির পরিচালিত পাভলিশ বিদ্যালয়েও সেই একই রকম বাস্তব হয়ে দেখা দেয়। উভয় শিক্ষাব্রতীই অপরিহার্য ভাবে নাগরিক কর্তব্যবোধের দৃষ্টিতে বিশ্বদর্শনের সঙ্গে, মাতৃভূমি ও জনগণকে সেবার মধ্যে মানুষের যে সৌন্দর্য, তা উপলব্ধির সঙ্গে শিক্ষাকে সংশ্লিষ্ট করে দেখেছেন। তাঁদের মতে, তরুণ সম্প্রদায়কে বাঁচার শিক্ষাদানের অর্থ কেবল শুভ-অশুভ বুঝতে শেখানোই নয়, বড় কথা হল সামাজিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন হতে শেখানো।

সুখমলিনস্কির কাছ থেকে শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছি তা এই দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে শিক্ষাপ্রণালী নির্বাচন কালে শিক্ষাব্রতী পরিচালিত হন মাকারেঙ্কোর নির্দেশ দ্বারা, আর উক্ত নির্দেশের মূলকথা হল এই যে, শিক্ষার প্রতিটি উপায় বাকিগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রযুক্ত হলে যেমন শুভ ফলদায়ক হতে পারে তেমনি অশুভও হতে পারে;

শিক্ষার ব্যাপারে সুসমঞ্জসরূপে সংগঠিত উপায়গুলির গোটা পদ্ধতিটি গুরুত্বপূর্ণ।

যৌথ শিক্ষার যে তত্ত্ব সর্বোপরি মাকারেঙ্কোর নামের সঙ্গে যুক্ত, সুখম্‌লিন্‌স্কির শিক্ষাবিষয়ক রচনাবলীতে ও প্রয়োগে তার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। আমাদের কালে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে শিক্ষাদান অসম্ভব, কেননা যৌথ শিক্ষাব্যবস্থাই শিশুকে মেলামেশার আনন্দ দেয়, তার ক্ষমতার প্রকাশ সম্ভব করে তোলে।

শিক্ষাবিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশের, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ রূপের অপরিহার্য দাবি হল সমস্ত প্রগতিশীল শিক্ষাবিদের আবিষ্কার ও সাফল্যের প্রতি, তাদের সৃজনী উত্তরাধিকারের প্রতি যতদূর সম্ভব মনোযোগ দেওয়া। সুখম্‌লিন্‌স্কির কার্যকলাপের অসাধারণ ফলাফল একথাই সমর্থন করে: তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল ভিত্তি একটিই এবং তা উঠতি পুরুষকে উচ্চ নীতিবোধ ও রুচিবোধের শিক্ষা দেয়।

* * *

ভাসিলি আলেক্সান্দ্রভিচ সুখম্‌লিন্‌স্কি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হতে পারেন নি। ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনা ছিল যুদ্ধেরই প্রতিধ্বনি।

ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ (১৯৪১-১৯৪৫) সূচনার প্রথম পর্বেই সুখম্‌লিন্‌স্কি ফ্রন্টে যোগ দেন। তখন তাঁর বয়স তেইশ। পলতাভার শিক্ষক-শিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পাঠ সবে শেষ করে তিনি প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষকতা করছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভেরা পাভ্‌লিশ-এ জার্মান অধিকৃত অঞ্চলে থেকে যান। তিনি গেরিলাদের সাহায্য করতেন। কর্তব্য পালন করার সময় তিনি গেস্টাপোদের হাতে ধরা পড়েন। ফাশিস্ত কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাঁর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ফাশিস্তরা এই নির্ভীক নারীর উপর দীর্ঘকাল নির্যাতন চালায়, তাঁর কাছে দাবি করে তিনি যেন গেরিলাবাহিনীর নেতাদের ধরিয়ে দেন। তিনি মুখ বুজে থাকেন। মার চোখের সামনে তাঁর শিশুসন্তানকে ওরা হত্যা করল। শিশুর বয়স হয়েছিল মাত্র কয়েক দিন। ভেরাকে ওরা ফাঁসি দিল। ...সেই সময়

সুখম্লিন্স্কি মস্কোর উপকণ্ঠে দখলকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। গুরুতর আঘাতের ফলে সামরিক বাহিনীতে তাঁর পক্ষে আর থাকা সম্ভব হল না। কিন্তু তাঁর বুকে চিরকালের জন্য রয়ে গেল গোলার মারাত্মক টুকরো আর হৃদয়ে রয়ে গেল নিহত পরিবারের জন্য ব্যক্তিগত শোকের ক্ষত।

জার্মান ফাশিস্তদের পরাভবের পর, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত — ১৯৭০ সনের ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত — ভাসিলি সুখম্লিন্স্কি শিশুদের জন্য জীবন নিয়োগ করেন।

বছরের পর বছর কাটতে লাগল, দেশ যুদ্ধের ক্ষত থেকে আরোগ্য লাভ করছিল, আবির্ভাব ঘটছিল নতুন প্রজন্মের মানুষদের, যারা যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক থেকে। পাভ্‌লিশ-এর বালক-বালিকারা জানতও না যে তাদের যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, মাঠে ও বনে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন, সেই মানুষটির বুকের ভেতরে বিশ বছর হল আজও টাটকা হয়ে জ্বলছে বিগত যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন।

চিকিৎসায় কোনও কাজ হল না। শিক্ষাবর্ষের একেবারে গোড়ায়, শেষ বারের মতো নবপ্রজন্মের শিশুদের সামনে নিজের বিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করার পর, কর্মরত অবস্থায় তিনি মারা যান।

বছরের পর বছর কেবল সোভিয়েত ইউনিয়নেই নয়, সমগ্র বিশ্বেও সুখম্লিন্স্কির শিক্ষাসংক্রান্ত উত্তরাধিকার, তাঁর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা শিক্ষক ও অভিভাবকদের ক্রমাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করছে।

ভূমিকা

মাননীয় পাঠকবর্গ, সহকর্মিবৃন্দ — বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রধানেরা,

এই রচনা বিদ্যালয়ে বহু বছরব্যাপী কাজের ফল — গভীর ভাবনাচিন্তা, যত্ন-প্রয়াস আর উদ্বেগের ফল।

তেত্রিশ বছর এক ঠায় গ্রামের স্কুলে কাজ করা আমার পক্ষে ছিল পরম সুখের বিষয়, সে সুখের কোন তুলনা নেই। আমি নিজের জীবন শিশুদের জন্য উৎসর্গ করেছি। দীর্ঘ ভাবনাচিন্তার পর আমি আমার রচনার নাম দিই 'শিক্ষা আমার ব্রত' — আমার মনে হয়, একথা বলার অধিকার আমি রাখি। আমার ইচ্ছা, শিক্ষাব্রতীদের — যাঁরা এখন বিদ্যালয়ে কাজ করছেন, যাঁরা আমাদের পরে বিদ্যালয়ে কাজ করতে আসবেন — তাঁদের সকলকেই আমি জীবনের একটি পর্বের কথা বলি। সে পর্ব একটি দশকের সমান। আমরা, শিক্ষাবিদরা যাকে প্রায়ই 'অবোধ শিশু' বলে থাকি, সে যেদিন বিদ্যালয়ে প্রথম উপস্থিত হয় সেদিন থেকে শুরু করে সেই অনুষ্ঠানের মুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের কাহিনী, যখন কিশোর-কিশোরীরা প্রধান শিক্ষকের হাত থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র লাভ

করে, স্বাধীন কর্মজীবনের পথে নামে। এই পর্ব ব্যক্তিতে পরিণতিলাভের পর্ব, আর শিক্ষকের কাছে তাঁর জীবনের একটি বিরাট অংশ। আমার জীবনের প্রধানতম বিষয় কী ছিল? উত্তরে আমি নির্দ্বিধায় বলব: **শিশুদের প্রতি ভালোবাসা।**

মাননীয় পাঠক, আমার রচনার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে আপনি হয়ত একমত হবেন না, হয়ত এখানে কোন ব্যাপার আপনার কাছে অদ্ভুত, আশ্চর্যের বলে ঠেকতে পারে — তাই আগে থাকতে আমার অনুরোধ: গ্রন্থটিকে শিশুশিক্ষার, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের, কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার সর্বায়ত সহায়ক গ্রন্থরূপে বিবেচনা করবেন না। শিক্ষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলতে গেলে এই রচনার বিষয় হল ক্লাস-বহির্ভূত শিক্ষাদান (অবশ্য, শিক্ষাদান কথাটিকে যদি সংকীর্ণ অর্থে ধরা যায়)। পাঠের বিষয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয় চর্চার প্রক্রিয়াকে সমস্ত রকম খুঁটিনাটি যুক্তিপরম্পরার সামনে হাজির করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। সূক্ষ্ম মানবিক সম্পর্কের ভাষায় বলতে গেলে আমার রচনার বিষয়— শিক্ষাব্রতীর অন্তঃকরণ। ছোট মানুষটিকে কী ভাবে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা উপলব্ধির জগতে পরিচালিত করা যায়, কী ভাবে তাকে বিদ্যাশিক্ষায় সাহায্য করতে হয়, তার মানসিক শ্রমকে সহজ-সাধ্য করে তোলা যায়, কী ভাবে তার মনের ভেতরে মহৎ অনুভূতি ও আবেগের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা ঘটানো যেতে পারে, কী ভাবে মানবিক সদগুণে, মানুষের মূল শুভবুদ্ধির উপর বিশ্বাস ও জন্মভূমি সোভিয়েত দেশের প্রতি অবাধ ভালোবাসার মন্ত্রে তাকে দীক্ষিত করা যায়, কী ভাবে শিশুর সূক্ষ্ম বোধে ও সংবেদনশীল হৃদয়ে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে সমুন্নত

আনুগত্যের প্রথম বীজ বপন করা যায় — তারই বিবরণ আমি দেওয়ার চেষ্টা করি।

যে গ্রন্থটি এখন হাতে নিয়েছেন তাতে আছে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। এক কথায়, এর বিষয়বস্তু হল শিশুজগৎ। আর শৈশব, শিশুজগৎ হল এক বিশেষ জগৎ। শিশুরা জীবন অতিবাহিত করে শুভাশুভ ও মান-অপমান সম্পর্কে, মানবিক সদ্‌গুণ সম্পর্কে নিজস্ব ধ্যানধারণা নিয়ে; তাদের সৌন্দর্যের মানদণ্ড নিজস্ব, সময়ের হিসাব পর্যন্ত নিজস্ব: শৈশবের পর্বে দিন মনে হয় বছর, আর বছর যেন অনন্তকাল। 'শৈশব' নামে রূপকথার পুরীতে প্রবেশাধিকার লাভের পর আমি চিরকাল ভাবতাম, আমাকেও কিছু মাত্রায় শিশু হতেই হয়। একমাত্র তাহলেই শিশুরা মনে করতে পারবে না যে আপনি দৈবক্রমে তাদের রূপথার জগতের তোরণ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছেন, ভাবতে পারবে না যে আপনি ঐ জগতের রক্ষাকারী এক প্রহরীর মতো, যার কাছে অভ্যন্তরে কী ঘটছে না ঘটছে সবই সমান।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু এবং অভিজ্ঞতার প্রকৃতি প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা — সর্বোপরি একজন শিক্ষকের সৃজনশীল শ্রম। এই কারণে আমি সচেতন ভাবেই সমগ্র শিক্ষকসম্প্রদায়ের, অভিভাবকদের প্রয়াস প্রদর্শন থেকে নিবৃত্ত হয়েছি। গ্রন্থে এ সমস্ত বিষয়ের বিবরণ দিতে গেলে তা বিপুল আকার ধারণ করত।

যে সব পরিবার থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে সে সম্পর্কে, মা-বাবাদের সম্পর্কে শৈশবসংক্রান্ত রচনায় না বলে পারা যায় না। পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের (১৯৪১-১৯৪৫) পর কোন কোন

পরিবারে বিষণ্ণ, এমন কি সময় সময় হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক পরিবেশের পরিপূর্ণ যথাযথ চরিত্রবৈশিষ্ট্য যদি আমি তুলে না ধরি, তাহলে শিক্ষাকর্মের গোটা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য দুর্বোধ্য থেকে যায়। শিক্ষার অসাধারণ ক্ষমতায় — ক্রুপ্‌স্কায়া, মাকারেঙ্কো এবং অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ যাতে আস্থা পোষণ করতেন — তাতে আমারও দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

আনন্দ নিকেতন

বিদ্যালয়ের পরিচালক

দশ বছর শিক্ষকতার পর আমি পাভ্‌লিশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক নিযুক্ত হলাম। শিক্ষকতার প্রথম দশ বছর পর্বে শিক্ষাসংক্রান্ত যে ধ্যানধারণা গড়ে উঠতে থাকে এখানে তার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। এখানে সজীব সৃজনী কর্মের মধ্যে নিজের ধ্যানধারণাকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা আমার হয়।

নিজের ধ্যানধারণাকে যত কাজে লাগানোর চেষ্টা করি ততই বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল যে শিক্ষাদীক্ষার কর্ম পরিচালনার অর্থ হল কর্মে ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের সঙ্গে সমগ্র বিদ্যালয়ব্যাপী ভাবাদর্শমূলক ও সাংগঠনিক সমস্যাবলী সমাধানের সঠিক সমন্বয়। শিক্ষকমহলের সংগঠকরূপে বিদ্যালয়-প্রধানের ভূমিকা তখনই অপরিসীম বৃদ্ধি পায় যখন শিক্ষকেরা তাঁর কাজের মধ্যে উচ্চ শিক্ষাদর্শের, শিশুদের প্রত্যক্ষ শিক্ষাদাতার পরিচয় পান।

শিক্ষাদীক্ষা হল সর্বোপরি শিক্ষক ও শিশুর মধ্যে নিরন্তর আত্মিক সংযোগ। মহান রুশ শিক্ষাব্রতী ক. দ. উশিন্‌স্কি* (১৮২৪-১৮৭০) বিদ্যালয়ের প্রধানকে মুখ্য শিক্ষক আখ্যা

---

* ক. দ. উশিন্‌স্কির 'নির্বাচিত রচনাবলী' ও 'শিক্ষাদীক্ষার বিষয়স্বরূপ মানুষ —শিক্ষাদানের নৃবিদ্যাগত অভিজ্ঞতা' নামে গ্রন্থ দুটি 'প্রগতি' প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায়।

দেন। কিন্তু প্রশ্ন হল কোন কোন শর্তে বিদ্যালয়ের মুখ্য শিক্ষাদাতার ভূমিকা সম্পাদিত হয়?

শিক্ষকদের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান, শিক্ষকদেরও শিক্ষাদাতা হওয়া, শিক্ষার বিজ্ঞান ও কলাকৌশল শেখানো — খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে বিদ্যালয় পরিচালনার বহুমুখী প্রক্রিয়ার একটি মাত্র দিক। মুখ্য শিক্ষাদাতা যদি কেবল শিক্ষাদানের পদ্ধতিই শেখান, শিশুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব না রাখেন তাহলে তিনি আর শিক্ষাদাতারূপে পরিগণিত হতে পারেন না।

প্রধান শিক্ষকের কার্যভার গ্রহণের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ঘটনায়ই আমার দৃঢ় প্রত্যয় হল যে শিশুর সঙ্গে আমার আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও প্রয়াসের যদি কোন সংযোগ না থাকে তাহলে শিশুহৃদয়ের দ্বার আমার কাছে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে থাকবে। শিশুদের উপর শিক্ষাদাতারূপে সরাসরি, প্রত্যক্ষ প্রভাব না ফেলতে পারলে আমি হারিয়ে ফেলব শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষক হিশেবে আমার সবচেয়ে বড় গুণ — শিশুদের মনোজগৎ অনুভবের ক্ষমতা। ক্লাস-পরিচালক শিক্ষকদের দেখে আমার ঈর্ষা হত: তাঁরা সবসময় শিশুদের সঙ্গে আছেন। শিক্ষক প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনা করছেন, তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বনে যাচ্ছেন, নদীর ধারে যাচ্ছেন, খেতে কাজ করতে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েরা কবে প্রমোদ-ভ্রমণে যাবে সেই দিনগুলির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। তারা রান্না করবে, মাছ ধরবে, খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাবে, তাকিয়ে তাকিয়ে তারাদলের ঝিকিমিকি দেখবে। আর প্রধান শিক্ষক থাকবেন এসব থেকে দূরে। তাঁর কাজ হল কেবল সংগঠন করা,পরামর্শ দেওয়া, ত্রুটি খুঁজে বার করা, ত্রুটি সংশোধন করা, প্রয়োজনীয়

কাজে উৎসাহ দেওয়া আর অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে বাধা দেওয়া। এটা এড়ানোর অবশ্যই কোন উপায় নেই, কিন্তু আমি নিজের কাজে তৃপ্তি পেলাম না।

আমি এমন বহু ভালো ভালো প্রধান শিক্ষকের কথা জানি যাঁরা শিক্ষাকর্মে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ'রা যথার্থ শিক্ষাকুশলী। তাঁদের শিক্ষা শিক্ষকদের আদর্শ। তাঁরা পাইওনিয়র ও কমসমোল সংগঠনের কাজে ও জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষক, ক্লাস-পরিচালক ও পাইওনিয়র-নেতা — সকলেরই কিছু না কিছু শেখার আছে। কিন্তু আমার মনে হল, এবং এই বিশ্বাস আজ আরও দৃঢ় হয়েছে যে শিক্ষামূলক কর্মদক্ষতার সর্বোচ্চ ধাপ হল প্রাথমিক কোন এক ছাত্রদলের জীবনে প্রধান শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও সুদীর্ঘকালীন অংশগ্রহণ। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ছোটদের সঙ্গে কাটাই, তাদের আনন্দ ও বেদনার অংশীদার হই, শিশুর সান্নিধ্য অনুভব করি। এই শিশুসান্নিধ্যই হল শিক্ষকের সৃজনী কর্মের অন্যতম পরম তৃপ্তি। আমি সময় সময় শিশুদের এদলের-ওদলের জীবনযাত্রার যোগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম: তাদের সঙ্গে সঙ্গে কাজে কিংবা নিজেদের অঞ্চলের এখানে-ওখানে পদযাত্রায় বের হতাম, প্রমোদ-ভ্রমণে যেতাম।

কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে কেমন যেন একটা কৃত্রিমতা ছিল। সেটা যেমন আমি অনুভব করতাম, তেমনি শিশুরাও করত। ওরা জানত যে আমি মাত্র কিছু সময়ের জন্য ওদের সঙ্গে জুটেছি। সত্যিকারের মনের আদানপ্রদান সেখানেই হতে পারে যেখানে শিক্ষক দীর্ঘকালের জন্য সাধারণ কাজকর্মের ক্ষেত্রে শিশুর বন্ধু, সমমতাবলম্বী ও সাথী হন। আমি অনুভব করলাম যে কেবল সৃজনী শ্রমের আনন্দের জন্য নয়, নিজের

সহকর্মীদের শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাকৌশলের জ্ঞান দিতে গেলেও এ ধরনের মেলামেশা আমার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। শিশুদের সঙ্গে প্রাণবান, প্রত্যক্ষ, দৈনন্দিন মেলামেশা ভাবনাচিন্তার, শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্ভাবনার উৎস, আনন্দ-বেদনার, মোহভঙ্গের উৎস; আর এসব ছাড়া আমাদের কাজের সৃজনশীলতা অর্থহীন। আমি এই সিদ্ধান্তে এলাম যে মুখ্য শিক্ষাদাতাকে হতে হবে শিশুদের ছোটখাটো কোন দলের শিক্ষক, ছোটদের বন্ধু ও সাথী। পাভ্‌লিশ বিদ্যালয়ে কাজ নেওয়ার আগেই শিক্ষার ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তারই ভিত্তিতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়।

শিক্ষকতার প্রথম পর্বেই আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে যথার্থ বিদ্যালয় কেবল শিশুদের জ্ঞান ও কর্মকুশলতা অর্জনের স্থান নয়। বিদ্যাশিক্ষা শিশুর মানসজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বটে, কিন্তু একমাত্র ক্ষেত্র নয়। আমরা সকলে যাকে শিক্ষাদীক্ষার প্রক্রিয়া আখ্যা দিতে অভ্যস্ত, তাকে আমি যত কাছাকাছি থেকে লক্ষ্য করি, ততই বেশি করে আমার মনে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে যথার্থ পাঠশালা হল শিশুদলের বহুমুখী মানসজীবন, আর সেই দলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই অসংখ্য আগ্রহে ও অনুরাগে সম্মিলিত। যে শিক্ষক কেবল পাঠের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিত হন তিনি শিশুমনের সন্ধান রাখেন না। আর যিনি শিশুকে জানেন না তিনি শিক্ষাদাতা হতে পারেন না। শিক্ষকের টেবিল সময় সময় হয়ে দাঁড়ায় পাথরের দেয়াল যার আড়াল থেকে শিক্ষক তাঁর ‘প্রতিপক্ষের’ উপর — শিক্ষার্থীদের উপর ‘আক্রমণ’ চালান। কিন্তু প্রায়ই এই টেবিল পরিণত হয় এক অবরুদ্ধ দুর্গে। ‘প্রতিপক্ষ’ ধীরে ধীরে সেই দুর্গ অধিকার করে আর সেখানে

আত্মগোপনকারী ‘সেনাপতির’ অবস্থা হয় হাত-পা-বাঁধা।

দেখে দুঃখ হয় যে বিষয়ের উপর অধিকার থাকা সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষকের শিক্ষাদান অনেক সময় নির্মম যুদ্ধে পরিণত হয়, একমাত্র এই কারণে যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন মানসিক সংযোগ নেই, শিশুর মনের দ্বার সেখানে সম্পূর্ণ রুদ্ধ। কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে তিক্ত, অপ্রীতিকর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তার প্রধান কারণ হল পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহপ্রবণতা; কখনও কখনও শিক্ষক শিশুমনের গহনে প্রবেশ করতে পারেন না, শিশুর আনন্দ-বেদনা অনুভব করতে পারেন না, মনে মনে শিশুর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার ক্ষমতা তাঁর থাকে না।

পোল্যাণ্ডের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইয়ানুশ কর্চাক (১৮৭৮-১৯৪২) তাঁর একটি পত্রে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে শিশুর জগৎকে কৃপার দৃষ্টিতে না দেখে সে জগতে উন্নীত হওয়া অত্যাবশ্যক। চিন্তাটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমাদের, শিক্ষাজীবীদের উচিত এর গভীর মর্ম উপলব্ধি করা। শিশুকে আদর্শায়িত না করে, কোন অলৌকিক ধর্ম তার ওপর আরোপ না করেও খাঁটি শিক্ষাব্রতী লক্ষ্য না করে পারেন না যে শিশুর জগৎ-উপলব্ধি, পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার উপর তার আবেগ ও নীতিবোধের প্রতিক্রিয়া নিজস্ব স্বচ্ছতা, সূক্ষ্মতা ও অকপটতার গুণে বিশিষ্টধর্মী। শিশুর মনোজগতে উন্নীত হওয়ার যে আহ্বান ইয়ানুশ কর্চাক দিয়েছেন তাকে শিশুর জগৎ-উপলব্ধির প্রতি — তার বুদ্ধি ও হৃদয়ের উপলব্ধির প্রতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা রূপে ধরতে হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হৃদয়ের এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে যেগুলি ছাড়া মানুষ সত্যিকারের শিক্ষাদাতা হতে পারে না।

সে সব বৃত্তির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করে — শিশুর মনোজগতে প্রবেশের কৌশল। একমাত্র তিনিই খাঁটি শিক্ষক হতে পারেন যিনি কখনও বিস্মৃত হন না যে নিজেও শিশু ছিলেন। বহু শিক্ষকের (শিশুরা, বিশেষত উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা তাঁদের 'কাটখোট্টা' আখ্যা দিয়ে থাকে) দুর্ভাগ্য এই যে তাঁরা ভুলে যান শিক্ষার্থী হল সর্বোপরি জীবন্ত মানুষ — সে পদক্ষেপ করতে চলেছে উপলব্ধি, সৃজন আর পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের জগতে।

শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব নেই, বিচ্ছিন্ন ভাবে কোন বস্তু মানুষের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে না। শিক্ষা হল শিক্ষার্থীদের বিশ্ববীক্ষা-প্রক্রিয়ার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক রূপ। শিশুরা কী ভাবে জগৎকে উপলব্ধি করে, কী ধরনের মতামত তাদের গড়ে উঠছে — তারই উপর নির্ভর করছে তাদের মানসজীবনের সমগ্র গঠনপ্রকৃতি। কিন্তু বিশ্ববীক্ষার অর্থ কেবল জ্ঞানচর্চাই নয়। বহু শিক্ষকের দুর্ভাগ্য এই যে তাঁরা শিশুর মনোজগৎকে কেবল পরীক্ষার নম্বরের মাপকাঠিতে বিচার করেন, শিক্ষার্থীরা পাঠাভ্যাস করে কি করে না তার বিচার না করে তাদের ভাগ করেন দুটি শ্রেণীতে।

শিক্ষকই যেখানে এমন বেকায়দায় পড়েন, যেখানে তিনিই বহুমুখী মানসজীবনকে একদেশদর্শীয় দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, সেখানে প্রধান শিক্ষক সম্পর্কে আর কী বলার আছে? প্রধান শিক্ষক ত তাঁর নিজের কাজ বলতে মনে করেন কেবল শিক্ষকদের কার্যকলাপ যাচাই করা, যথাসময়ে 'সাধারণ নির্দেশ' দেওয়া, অনুমতি দেওয়া অথবা না-দেওয়া। তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয়। এই রকম ভূমিকা আমার কাছে অসহ্য ঠেকে।

আমি কষ্ট পেতাম। সময় পেলে আমি ছাত্রদের কাছে আসতাম, কিন্তু দেখা যেত ওরা ওদের শিক্ষকের সঙ্গে কী নিয়ে যেন মশগুল। ওদের কাছে গেলাম, কিন্তু ওরা আমাকে লক্ষ্যই করল না: শিশুরা তাদের শিক্ষকের সঙ্গে এক সমৃদ্ধ মানসজীবন কাটায়, ওদের আছে নিজস্ব গোপন রহস্য। এমন প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন আছে কি? না, নেই। ১৯১৭ সনের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত রাশিয়ার স্কুলগুলিতে পরিচালনার যে পদ্ধতি ও রূপ গড়ে উঠেছিল সেখানে প্রধান শিক্ষক আসলে ছিলেন শিক্ষকদের পরিদর্শক, প্রশাসক ও আমলা, যার কাজ ছিল শিক্ষক ঠিকমতো কর্মসূচি অনুসরণ করছেন কিনা, তিনি কোন বাড়তি কিংবা ভুল কথা বলে ফেললেন কিনা — সেদিকে নজর রাখা। এই রূপ ও পদ্ধতি আজকের দিনে অচল।

আধুনিক বিদ্যালয় পরিচালনার মূলকথা হল এই যাতে শিক্ষাদানের সুকঠিন কাজে শিক্ষকের চোখের সামনে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি গড়ে ওঠে, পূর্ণতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মূর্ত হয়ে ওঠে অগ্রণী শিক্ষামূলক ভাবধারায়। আর যিনি এই পদ্ধতির স্রষ্টা, যাঁর শ্রম অন্যান্য শিক্ষকের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায় তিনিই প্রধান শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত। এ ধরনের প্রধান শিক্ষক ছাড়া — উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষক ছাড়া — আজকের দিনে স্কুলের কথা ভাবা যায় না। শিক্ষাদান — সর্বোপরি মানববিদ্যা। শিশু সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া — শিশুর বুদ্ধিগত বিকাশ, ভাবনাচিন্তা, আগ্রহ, অনুরাগ, ক্ষমতা, ঝোঁক ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া শিক্ষাদান সম্ভব নয়। শিশুর বিদ্যালয়ে আগমনের প্রথম দিন থেকে শুরু করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র লাভের সময় পর্যন্ত শিক্ষক তার সঙ্গে ধাপে ধাপে ওঠেন, তার বুদ্ধিগত

ও নৈতিক বিকাশের, সৌন্দর্যবোধ ও আবেগ-অনুভূতি বিকাশের সরাসরি যত্ন নেন, তার মানসিক আগ্রহের সমান ভাগীদার হন, নিজের মানসিক ঐশ্বর্য তাকে প্রদান করেন।

স্কুলের প্রধান ব্যক্তি হলেন শিশুদের প্রারম্ভিক গ্রুপের ক্লাস-টিচার। তিনি একাধারে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদাতা, বন্ধু এবং তাদের বহুমুখী মানসজীবনের পরিচালক। ব্যাপক অর্থে শিক্ষাদীক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি, বিদ্যাশিক্ষা হল সেই ফুলের একটি পাপড়ি মাত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ বলে কিছু নেই যেমন নেই ফুলের সৌন্দর্যসৃষ্টিকারী পাঁপড়ির মধ্যে মুখ্য পাপড়ি। শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে পাঠানুশীলন ও পাঠের বাইরে শিশুদের বহুমুখী আগ্রহের বিকাশ, গ্রুপে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক -- সবই মুখ্য।

ছয় বছর প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর আমি ক্লাস-টিচার হলাম। এখানে একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই: শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের সরাসরি আত্মিক যোগাযোগের এটাই যে একমাত্র উপায় তা নয়। তবে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আমার কাছে এই উপায়টি ছিল সবচেয়ে উপযোগী। ছোটদের ক্লাসের পরিচালক-শিক্ষক হিশেবে কাজকে আমি স্বাভাবিক পরিবেশে সুদীর্ঘকালীন পরীক্ষা-নিরীক্ষারূপে বিবেচনা করে থাকি।

কয়েক বছর ধরে কী ভাবে কী কী কাজ করেছি তার বিবরণ দেওয়ার আগে উল্লেখ করতে চাই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্বের, যা বহুল পরিমাণে ব্যবহারিক কর্মের মর্মবস্তু ও উদ্দেশ্যনিষ্ঠা নির্ধারণ করে। শৈশব পর্ব, প্রাক্‌বিদ্যালয় ও নিম্নশ্রেণীতে পড়াশুনার বয়স মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। মহান

রুশ লেখক ও শিক্ষাবিদ লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) যখন মন্তব্য করেন যে শিশু তার জন্ম থেকে শুরু করে পাঁচ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তার জ্ঞান, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রের জন্য পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে যা যা আহরণ করে তা পাঁচ বছর বয়স থেকে নিজের জীবনের শেষ দিনের তুলনায় অনেক বেশি, তখন তিনি খুবই খাঁটি কথা বলেন। এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন সোভিয়েত শিক্ষাব্রতী আন্তন মাকারেঙ্কো। তাঁর মতে, মানুষ যেমন হওয়ার তেমনি হবে পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে।

অসাধারণ নৈতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ মানুষ ইয়ানুশ কর্চাক তাঁর 'যখন আমি ছোট হব' গ্রন্থে লিখেছেন যে স্কুলের ছেলে যখন বোর্ডের দিকে তাকায় তখন বেশি জ্ঞান পায়, না যখন কোন দুর্নিবার শক্তি (সূর্যের শক্তি, সূর্যমুখী ফুলের মাথায় দোলন) তাকে জানলার বাইরে উঁকি মারতে প্রবৃত্ত করে তখন পায় — একথা কারও জানা নেই। সেই মুহূর্তে কোনটা তার পক্ষে বেশি কাজের, অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ — ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডে আবদ্ধ যুক্তির জগৎ না জানলার বাইরের চলমান জগৎ? মানুষের মনের ওপর জোর খাটিয়ে লাভ নেই: প্রতিটি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের নিয়ম, তার বৈশিষ্ট্য, প্রয়াস আর চাহিদা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখা দরকার।

ইয়ানুশ কর্চাক ছিলেন ওয়ারশর ইহুদী পাড়ায় অনাথভবনের শিক্ষক। হিটলারের লোকজন হতভাগ্য শিশুদের ত্রেব্লিন্‌কার চুল্লিতে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। ইয়ানুশ কর্চাককে যখন বলা হল যে শিশুদের বাদ দিয়ে জীবন কিংবা শিশুদের সঙ্গে মৃত্যু — যে-কোনটা তিনি বেছে নিতে পারেন তখন তিনি নির্দ্বিধায়, বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে মৃত্যুকেই বেছে নিলেন।

গেস্টাপোরা তাঁকে বলল: 'আমরা আপনাকে ভালো ডাক্তার বলে জানি, আপনাকে যে ত্রেব্লিন্‌কার চুল্লিতে যেতেই হবে, এমন নয়।' উত্তরে ইয়ানুশ কর্চাক বললেন: 'আমি বিবেক নিয়ে বেসাতি করি না।' শিশুদের সঙ্গে বীর চললেন মৃত্যু বরণ করতে, তিনি ওদের সান্ত্বনা দেন, চেষ্টা করেন যাতে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার ভয় শিশুদের মনে প্রবেশ না করতে পারে। ইয়ানুশ কর্চাকের জীবন, বিস্ময়কর নৈতিক শক্তি ও শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ তাঁর কীর্তি আমার প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। আমি বুঝতে পারলাম শিশুদের খাঁটি শিক্ষাদাতা হতে গেলে নিজের হৃদয় তাদের জন্য উৎসর্গ করতে হয়।

ক. উশিন্‌স্কি লেখেন যে আমরা যার সঙ্গে সবসময় বাস করছি তাকে গভীর ভাবে ভালোবাসা সত্ত্বেও সে ভালোবাসা অনুভব না-ও করতে পারি যতক্ষণ না কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা আমাদের অনুরাগের গভীরতা পুরোপুরি আমাদের সামনে তুলে ধরছে।' সারা জীবন কাটিয়েও মানুষ জানতে পারে না সে তার স্বদেশকে কতটা ভালোবাসে, যদি না, দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, সে নিজে দীর্ঘকাল স্বদেশের অদর্শনে নিজের অভিজ্ঞতায় এই ভালোবাসার সমগ্র শক্তি আবিষ্কার করে। এই কথাগুলি আমার তখনই মনে পড়ে যখন দীর্ঘকাল আমি শিশুদের দেখতে না পাই, যখন তাদের আনন্দ-বেদনা অনুভব করার সুযোগ আমার না থাকে। বছরের পর বছর এই বিশ্বাসই আমার মনে বেশি করে দৃঢ় হয়েছে যে শিক্ষকতার অন্যতম সুস্পষ্ট বিশেষত্ব হল শিশুদের প্রতি অনুরাগ।

শিক্ষাব্রতীর অনুভূতিসংক্রান্ত শিক্ষাদীক্ষার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎস হল এমন এক অখণ্ড, সৌহার্দপূর্ণ দলের মধ্যে শিশুদের সঙ্গে বহুমুখী আবেগের সম্পর্কস্থাপন, যেখানে

শিক্ষক কেবল গুরুই নন, বন্ধু, সাথীও বটেন। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কেবল পাঠের সময়ই সংযোগ রক্ষা করেন এবং শিশুরা যদি কেবল ক্লাসরুমের ভেতরেই তাঁর প্রভাব অনুভব করে তাহলে আবেগের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না।

এমন ধারণাও ঠিক নয় যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা — মানুষের মনের ওপর জুলুম, ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ড — শিশুদের স্বাধীনতাহরণ, আর জানলার বাইরের জগৎ হল যথার্থ মুক্তির জগৎ।

শিশুর জীবনে প্রাইমারী ক্লাসের শিক্ষকের ভূমিকা যে কী বিরাট, পাভ্‌লিশের বিদ্যালয়ে কাজ করতে আসার আগেই বহুবার আমার সে বিশ্বাস জন্মায়। শিশুর কাছে তাঁকে হতে হবে জননীর মতোই প্রিয় ও আপন মানুষ। শিক্ষকের প্রতি স্কুলের ছোট ছেলের বিশ্বাস, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, শিশু তার শিক্ষাদাতার মধ্যে মানবতার যে আদর্শ দেখতে পায় — এ সবই হল শিক্ষার সেই সমস্ত প্রাথমিক নিয়ম, সঙ্গে সঙ্গে জটিলতম, প্রাজ্ঞতম নিয়মও বটে, যেগুলি হৃদয়ঙ্গম করার পর শিক্ষক যথার্থ মনোজগতের গুরুস্থানীয় হতে পারেন। শিক্ষকের পরম মূল্যবান সদ্‌গুণাবলীর একটি হল মানবতাবোধ, শিশুর প্রতি ভালোবাসা, যে ভালোবাসার মধ্যে থাকবে পিতামাতার সুপরিমিত কঠোরতা ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে আন্তরিক স্নেহের সমন্বয়।

শৈশব হল মানবজীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব না বলে খাঁটি, উজ্জ্বল, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অনবদ্য জীবন আখ্যা দেওয়া যায়। শৈশব কী ভাবে অতিবাহিত হয়েছে, শিশুকালে কে শিশুকে পরিচালনা

করেছে, পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে কী তার চেতনায় প্রবেশ করেছে — এরই উপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্ভর করছে আজকের শিশুর ভবিষ্যৎ। প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথম পর্বেই মানুষের চরিত্র, ভাবনাচিন্তা ও প্রকাশের ক্ষমতা গড়ে উঠতে থাকে। বইপত্র, পাঠ্যপুস্তক আর পাঠানুশীলন থেকে শিশুর চেতনায় ও অন্তঃকরণে যা কিছু প্রবেশ করে, তা হয়ত করে একমাত্র এই কারণেই যে গ্রন্থের পাশাপাশি আছে পারিপার্শ্বিক জগৎ, যেখানে শিশু তার জন্মের সময় থেকে শুরু করে যখন নিজে বই খুলতে ও পড়তে পারে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কষ্ট করে পা ফেলে চলে।

শৈশবে শুরু হয় উপলব্ধির — বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির — দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। মাতৃভূমির প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, মাতৃভূমির সুখ, মহিমা ও পরাক্রমের জন্য নিজের প্রাণ সমর্পণের প্রবৃত্তি, দেশের শত্রুদের প্রতি আপসহীন মনোভাব, তথা কমিউনিস্ট নীতিবোধের ভিত্তিস্বরূপ যে-সমস্ত নৈতিক মূল্য নিহিত আছে এ হল তারই উপলব্ধি।

৩৩ বছর ধরে আমি ছোট, মাঝারি ও বড় বয়সের ছেলেমেয়েদের এবং বয়স্কদের শব্দভাণ্ডার অনুসন্ধান করি। তাতে একটি বিস্ময়কর চিত্র আমার সামনে উদ্‌ঘাটিত হল। সাধারণ যৌথখামারী পরিবারের (মা-বাবা হলেন মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পন্ন মানুষ, বাড়িতে গ্রন্থের সংখ্যা — ৩০০-৪০০) সাত বছর বয়সী শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার মুহূর্তে মাতৃভাষায় তিন-সাড়ে তিন হাজার শব্দ ও সেগুলির অভ্যন্তরীণ সুষমা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে; তার মধ্যে দেড় হাজারের ওপর শব্দের সে সক্রিয় প্রয়োগ ঘটাতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পন্ন শ্রমিক, যৌথখামারী ৪০-৫০

বছর বয়সে মাতৃভাষায় পাঁচ-সাড়ে পাঁচ হাজার শব্দ ও সেগুলির অভ্যন্তরীণ সুষমা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে; তার মধ্যে দুই থেকে আড়াই হাজারের বেশি শব্দের সক্রিয় প্রয়োগ সে ঘটাতে পারে না। শৈশব পর্ব মানুষের জীবনে যে কত তাৎপর্যবহ এই ঘটনাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথম পর্বেই যে মানুষের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হয় এই দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থ মোটেই এমন নয় যে অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে পুনঃশিক্ষণ অসম্ভব। পুনঃশিক্ষণের শক্তি যে কত বড়, সোভিয়েত শিক্ষাবিদ মাকারেঙ্কোর অভিজ্ঞতা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। তবে তিনি ঠিক অল্প বয়সের ওপরই বেশি তাৎপর্য আরোপ করেন। শিক্ষার সঠিক পন্থার অর্থ অতি অল্প বয়সের ভুলত্রুটি সংশোধন করা নয়, তার অর্থ নিহিত আছে ঐ ভুলত্রুটি নিবারণের মধ্যে, পুনঃশিক্ষণের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বিলোপের মধ্যে।

প্রধান শিক্ষক হিশেবে কাজ করার সময় আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে কখন কখন শিশুদের স্বাভাবিক জীবনকে বিকৃত করা হয়, যখন শিক্ষকের শিক্ষাদানের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় শিশুদের মস্তিষ্কে যতদূর সম্ভব বেশি জ্ঞান ঠেসে দেওয়া।

আমরা এমন এক কালে বাস করছি যখন জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত না করে শ্রমনিয়োগ, মানবিক সম্পর্কের প্রাথমিক চর্চা, নাগরিক কর্তব্য পালন — কোনটাই সম্ভব নয়। শিক্ষা একমাত্র তৃপ্তিদায়ক ও উপভোগ্য, হালকা ও প্রীতিকর খেলা হতে পারে না। ভবিষ্যৎ নাগরিকের জীবনের পথও কুসুমাস্তীর্ণ হবে না। আমাদের কাজ হবে এমন মানুষ গড়ে তোলা যারা হবে উচ্চ

শিক্ষিত, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, যারা আমাদের পিতৃপিতামহ ও পূর্বপুরুষদের তুলনায় কম বাধাবিপত্তি অতিক্রমে প্রস্তুত নয়। ৭০-৯০ দশকের তরুণের জ্ঞানের মাত্রা পূর্ববর্তী দশকগুলির যুব সম্প্রদায়ের জ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি হবে। জ্ঞানের যত বিস্তৃত ক্ষেত্র আয়ত্তে আনার প্রয়োজন দেখা দেবে, ততই বেশি করে দ্রুত বিকাশ ও উন্নতির পর্বে, ব্যক্তিত্ব অর্জনের পর্বে — শৈশবে মানবদেহের যে প্রকৃতি তার কথা গণ্য করতে হবে। মানুষ প্রকৃতির সন্তান ছিল এবং চিরকাল থাকবেও। তাই যা কিছু প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মীয়তা রচনা করে সে সবই মানসসংস্কৃতির সম্পদের সঙ্গে তার সাযুজ্যসাধনের জন্য কাজে লাগানো আবশ্যক। শিশুর পারিপার্শ্বিক জগৎ — অশেষ ঐশ্বর্যপূর্ণ ঘটনার অফুরান সৌন্দর্যের প্রকৃতিজগৎ। এখানে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে আছে শিশুর বুদ্ধিচর্চার অনন্ত উৎস। কিন্তু মানুষের সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে, শ্রমের সঙ্গে প্রকৃতির যে-সমস্ত উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকে তাদের ভূমিকাও বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা উপলব্ধির প্রক্রিয়া — ভাবনার এমনই এক আবেগপ্রবন প্রেরণা, যার কোন পরিবর্ত নেই। প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের ও বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুদের কাছে এই প্রেরণার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সত্যে পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনা সাধারণীকৃত হয় তা যখন উজ্জ্বল ভাররূপে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন হয় শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি। প্রথম বৈজ্ঞানিক সত্য শিশু যাতে পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যে জানতে পারে, যাতে প্রাকৃতিক ঘটনার সৌন্দর্য ও অফুরন্ত জটিলতা ভাবনার উৎস হয়, যাতে শিশুকে ধীরে ধীরে সামাজিক সম্পর্কের

জগতে, শ্রমের জগতে নিয়ে আসা যায় — এটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ।

পাভ্‌লিশের বিদ্যালয়ে কাজ নেওয়ার একেবারে শুরুতেই কনিষ্ঠ শিক্ষার্থীরা, বিশেষত প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষারত ছেলেমেয়েরা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। আমি লক্ষ্য করি কী দারুণ উত্তেজনা নিয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষাগ্রহণের প্রথম দিনগুলিতে বিদ্যায়তনে প্রবেশ করে, কত আস্থা নিয়ে না তারা শিক্ষকের চোখের দিকে তাকায়! কিন্তু প্রায়ই এমন কেন হয় যে কয়েক মাসের মধ্যে, এমন কি কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের চোখের সেই দীপ্তি আর থাকে না, কেন কোন কোন শিশুর কাছে বিদ্যাশিক্ষা পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়? অথচ সব শিক্ষকই ত আন্তরিকভাবে শিশুসুলভ সরলতা বজায় রাখতে চান, বজায় রাখতে চান জগৎকে উপলব্ধি ও আবিষ্কারের আনন্দ, চান যেন শিক্ষা শিশুদের জন্য প্রেরণাদায়ক আকর্ষণীয় শ্রম হয়ে দেখা দেয়।

সম্ভব হয় না সর্বোপরি এই কারণে যে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার আগে কোন শিশুর মনোজগৎ কেমন ছিল সে সম্পর্কে শিক্ষকের তেমন ধারণা নেই, অথচ স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, ঘড়িঘণ্টায় বাঁধা জীবন শিশুদের সকলকে যেন একই স্তরে এনে ফেলে, তাদের একই মাপকাঠিতে বিচার করে, আর তার ফলে তাদের ব্যক্তিজগতের ঐশ্বর্যের উদ্বোধন ঘটে না। প্রথম শ্রেণীতে যাঁরা শিক্ষা দেন আমি অবশ্য তাঁদের পরামর্শ দিতাম, নির্দেশ দিতাম কী ভাবে আগ্রহ বিকাশ করতে হয়, শিশুদের মানসজীবনের বৈচিত্র্যসাধন করতে হয়, কিন্তু পরামর্শই সব নয়। শিক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণার মর্মবস্তু নিহিত আছে শিক্ষক ও শিশুদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে,

আর তা তখনই স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যখন শিক্ষকদের চোখের সামনে নির্মাণরত বিদ্যালয়ভবনের মতো উঠতে থাকে। এই কারণেই আমি ক্লাসের একটি বিভাগ নিয়ে দশ বছরের জন্য শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হলাম।

ক্লাসের জীবন গোটা স্কুলের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র বিদ্যালয়ের কথা মনে রেখে আমি শিক্ষকতার রূপ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করি। তবে তা আমি করি একমাত্র এই উদ্দেশ্যে যাতে ক্লাসের সকলকে আরও উজ্জ্বল ভাবে চোখে পড়ে, কেননা ক্লাসে শিক্ষকতার মর্মবস্তুই সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষাপরিচালনার অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্তস্বরূপ।

প্রথম বছর — শিশুমনের সন্ধানে

১৯৫১ সনের শরৎকালে, ক্লাস শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে প্রথম শ্রেণীতে শিশুদের গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ছয় বছরের ছেলেমেয়েদের নাম — অর্থাৎ যাদের পড়াশুনা শুরু হবে আরও এক বছর বাদে — তাদের নামও স্কুলের খাতায় উঠল। এই ছেলেমেয়েদের নিয়েই আমাকে দশ বছর শিক্ষকতা করতে হবে।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অভিভাবকদের সকলকে ডেকে যখন আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা শুরুর এক বছর আগে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর প্রস্তাব তাঁদের দিলাম তখন মতপার্থক্য দেখা দিল: কেউ কেউ বললেন, সারা বছরের জন্য কোন কিণ্ডারগার্টেন না থাকায় (তখনকার দিনে গ্রামে কিণ্ডারগার্টেন কেবল গ্রীষ্মকালে খোলা থাকত) বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারলে পরিবারের উপকারই হবে; অন্যদের আশঙ্কা

হল এই যে যথাসময়ের আগে বিদ্যাশিক্ষা শিশুস্বাস্থ্যের প্রতিকূল হবে। আমি বুঝিয়ে বললাম যে ক্লাসের পড়াশুনা শুরু হওয়ার আগে এক বছর ধরে স্কুলে যাতায়াতের অর্থ এই নয় যে তাদের ক্লাসরুমে বসে থাকতে হবে।

প্রতিটি শিশুকে ভালো করে জানার উদ্দেশ্যে তার গ্রহণক্ষমতা, ভাবনাচিন্তা ও বুদ্ধি খাটানোর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গভীর ভাবে অনুসন্ধান করে দেখার উদ্দেশ্যে ক্লাসের শিক্ষার আগের এই বছরটি আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল। জ্ঞান দান করার আগে ভাবতে, উপলব্ধি করতে, পর্যবেক্ষণ করতে শেখানো দরকার। প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্যের ব্যক্তিগত বিশেষত্বও ভালোমতো জানা চাই — এছাড়া স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

মানসিক শিক্ষা আর জ্ঞানার্জন মোটেই এক কথা নয়। অবশ্য জ্ঞানচর্চা ছাড়া মানসিক শিক্ষা অসম্ভব, যেমন সূর্যরশ্মি ছাড়া সবুজ পত্র অসম্ভব, তাহলেও সবুজ পত্রকে যেমন সূর্যরশ্মির সঙ্গে এক করে দেখা যায় না তেমনি মানসিক শিক্ষাকেও এক করে দেখা যায় না জ্ঞানার্জনের সঙ্গে।

শিক্ষাব্রতীর কাজ হল মননশীল পদার্থ নিয়ে। শৈশবের পর্বে তার পারিপার্শ্বিক জগৎ জানা ও উপলব্ধির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে শিশুস্বাস্থ্যের উপর। এই নির্ভরতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, তাকে ধরা কঠিন। শিশুদের অভ্যন্তরীণ মনোজগৎ অনুসন্ধান, বিশেষত তার চিন্তাভাবনার প্রকৃতি অনুসন্ধান — শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

আমার শিক্ষার্থীদের মা-বাবারা

শিশুদের ভালোমতো জানতে গেলে তাদের পরিবারকে — মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদু-দিদিমাকেও ভালোমতো জানা চাই। আমাদের স্কুলের পাড়ায় ছিল ছয় বছর বয়সী ৩১টি শিশু — ১৬ জন ছেলে, ১৫ জন মেয়ে। সব বাবা-মা'ই 'আনন্দ নিকেতনে' ছেলেমেয়েদের পাঠাতে রাজি হলেন। আমাদের প্রাক্‌বিদ্যালয় বিভাগটি কিছুকাল বাদে মা-বাবাদের কাছে ঐ নামে পরিচিত হয়ে উঠল। ৩১ জনের মধ্যে ১১ জন ছেলেমেয়ে পিতৃহীন, দুজন মাতৃপিতৃহীন। ভিতিয়া ও সাশা — এই দুটি ছেলেরই ভাগ্য ছিল শোকাবহ। ভিতিয়ার বাবা ছিলেন পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের গেরিলা যোদ্ধা। ফাশিস্তরা তাঁর স্ত্রীর চোখের সামনে নৃশংস উৎপীড়ন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে। ভিতিয়ার মা এ শোক সহ্য করতে পারলেন না, তিনি বুদ্ধিবিবেচনা হারিয়ে ফেললেন। এই শোকাবহ ঘটনার ছয় মাস বাদে ছেলের জন্ম হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মা প্রাণত্যাগ করেন। শিশুকে কষ্ট করে বাঁচানো সম্ভব হয়। সাশার বাবা ফ্রণ্টে নিহত হন, মা নিহত হন ফাশিস্ত দখলদারদের হাত থেকে গ্রাম মুক্ত করার সময়।

'আনন্দ নিকেতন' খোলার কয়েক সপ্তাহ আগে আমি প্রতিটি পরিবারের পরিচয় নিলাম। আমি উদ্বেগ বোধ করলাম এই দেখে যে কোন কোন পরিবারে বাপ-মা ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বাবা ও মা'র মধ্যে সৌহার্দের পরিবেশ নেই, নেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, যা ছাড়া শিশুর সুখী জীবন অসম্ভব।

যেমন কোলিয়া। ছেলেটার গায়ের রং তামাটে, নাক বড়ি-বসানো, চোখ দুটো কালো। ওর চাউনিতে সদা সতর্ক ভাব।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসি, ও তাতে আরও ভুরু কোঁচকায়। এই মুহূর্তগুলিতে না ভেবে পারা যায় না পরিবারের অস্বাভাবিক পরিবেশের কথা। কোলিয়ার বাবা যুদ্ধের আগে জেলে ছিল, পরিবার তখন বাস করত দন্‌বাসে। ফাশিস্ত অধিকারের সময় সে জেল থেকে খালাস পায়, পরিবার তখন আমাদের গ্রামে উঠে আসে। মা ও বাবা লোকের দুর্দশার সুযোগে মুনাফা লোটার তাল করে, তারা সন্দেহজনক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়: চোরাকারবার করে, ফাশিস্ত কর্মচারীদের — পুলিশের লোকজনের লুটের মাল এখানে-ওখানে লুকিয়ে রাখে। যুদ্ধ-পরবর্তী দুঃসময় মা যৌথখামারের পোল্‌ট্রি থেকে মুরগী চুরি করত, কোলিয়ার দাদার মতো কোলিয়াকেও কক শিকার করতে শেখায়। বাচ্চারা পাখি শিকার করত, মা সেগুলিকে ভেজে মুরগীর মাংস বলে বাজারে বিক্রি করত। ...ছেলেটার দিকে আমি তাকাই, আমার ইচ্ছে হয় ও হাসুক, কিন্তু তার চোখে দেখতে পাই কুণ্ঠা আর ভয় ভয় ভাব। কী করে কোলিয়ার মনের ভেতরে জাগিয়ে তোলা যায় শুভ, মানবিক বোধ, মানুষের প্রতি অবজ্ঞা আর হিংসার এই যে বিকৃত পরিবেশে সে বড় হয়ে উঠেছে, তাকে কী ভাবে রোখা যায়? মা'র কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাসীন চোখ যখন আমার দৃষ্টিতে পড়ে, তখন আমি ভালো বোধ করি না।

না, আমাদের আশেপাশে আজও যে মন্দবুদ্ধি ও শঠতা বিরাজ করছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকা ঠিক নয়। এই মন্দবুদ্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে, তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে, পুরনো দুনিয়ার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মালিন্য থেকে শিশুমনকে মুক্ত করতে হলে সত্যের চোখে চোখে তাকানোর সাহস থাকা চাই।

আরেকটি ছেলে তোলিয়া। রোগা। চুলগুলো তার সাদা, চোখজোড়া বসন্তের আকাশের মতো নীল। তোলিয়া মা'র পাশে তাঁর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি কেমন যেন মাটির দিকে, কেবল কদাচিৎ চোখ তুলছে। ছেলেটির বাবা কার্পাথিয়াতে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। তার স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েকটি অর্ডারও মা'র কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবার জন্য তোলিয়া গর্ব বোধ করে, কিন্তু গাঁয়ে মায়ের বড় বদনাম: ভ্রষ্ট জীবন কাটায়, বাচ্চাটাকে একেবারেই দেখাশোনা করে না। ...এত বড় দুঃখের আঘাতে ছয় বছরের বালকের হৃদয় যাতে বিকৃত না হয়ে যায় তার জন্য কী করা যেতে পারে? কী এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে যাতে মা তার সংবিৎ ফিরে পায়, তার মনে জেগে ওঠে পুত্রের চিন্তা?

যুদ্ধ আমাদের জীবনকে গভীর ভাবে ক্ষতবিক্ষত করে গেছে, তার ঘা এখনও শুকোয় নি। আমার সামনে যে সব ছেলেমেয়ে, তাদের জন্ম ১৯৪৫ সনে, কারও কারও জন্ম ১৯৪৪ সনে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মাতৃগর্ভে থাকতেই থাকতেই পিতৃহীন। যেমন ইউরা। ওর বাবা যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগের দিন চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে প্রাণ হারান। মা ছেলে বলতে অজ্ঞান, শিশুর প্রায় কোন আবদারই পূরণ করতে বাকি রাখেন না। পরিবারে দাদু আছেন। ইউরার জীবন যাতে নিশ্চিন্ত হয় তার জন্য তিনিও সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত। এই পরিবারটি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানতে পারলাম তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে ছয় বছরের বাচ্চা একটা ছোটখাটো অত্যাচারী হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্ধ মাতৃস্নেহও ঔদাসীন্যের মতোই বিপজ্জনক।

পেত্রিককে নিয়ে এলেন তার মা ও দাদু। ছেলেটির মা'র

কঠিন জীবন সম্পর্কে অনেক কথা আমি শুনেছি। তাঁর প্রথম স্বামী যুদ্ধেরও আগে পরিবার ত্যাগ করে চলে যান। মহিলা দ্বিতীয়বার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন, কিন্তু এ বিয়েও সুখের হল না: দেখা গেল সাইবেরিয়ার কোথায় যেন পেত্রিকের বাবার পরিবার আছে; যুদ্ধের পর তিনি চলে যান। মহিলার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল, তাই তিনি ছেলেকে এই বলে বুঝ দেন যে তার বাবা ফ্রণ্টে মারা গেছেন। ছেলে অন্য বাচ্চাদের কাছে তার বাপের কল্পিত কীর্তিকলাপের কাহিনী বলে। সমবয়সীরা ওকে বিশ্বাস করে না, বলে যে ওর বাবা — প্রতারক। পেত্রিক কাঁদতে কাঁদতে, জলভরা চোখে মা'র কাছে যায়। দেখাই যাচ্ছে, মন্দ লোকজন শিশুর মনে লোকজনের প্রতি অবিশ্বাস আর নৃশংসতার বীজ বপন করছে। শিশু যাতে শুভকর্মে আস্থাবান হয়ে ওঠে তার জন্য কী করা দরকার?

কোস্তিয়ার বয়স সাত হয়ে গেল, অথচ ও এখনও প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় নি। ছেলেটিকে স্কুলে নিয়ে এলেন ওর বাবা, সৎমা আর দাদু। যুদ্ধের মারাত্মক হল্‌কা এই শিশুকেও ঝলসে দিয়ে গেছে। ফাশিস্ত দখলদারদের হাত থেকে গ্রাম মুক্ত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ বাদে কোস্তিয়ার মা (তিনি তখন আসন্নপ্রসবা) কোথায় যেন ধাতুর গোটা কয়েক জিনিস পেয়ে তাঁর প্রথম সন্তানকে — সাত বছরের ছেলেকে খেলতে দেন। ঐ সব জিনিসের মধ্যে মাইনের ফিউজও ছিল। বিস্ফোরণ ঘটল, শিশু প্রাণ হারাল। মা ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। লোকজন সময়মতো তাঁকে ফাঁস থেকে নামিয়ে আনে। মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়ে মহিলা কোস্তিয়াকে জন্ম দিলেন। বালক আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেল: পড়শী মহিলা এই সময় স্তন্য দিয়ে ওকে বাঁচায়। বাবা ফ্রণ্ট থেকে ফিরে

এলেন। পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ স্নেহ, তিনি তাকে আদর-যত্ন করেন। সৎমা — চমৎকার মানুষ। তিনি এবং ছেলেটির দাদুও তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু কোস্তিয়ার বয়স পাঁচ পূর্ণ হতে না হতে নতুন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল: বালক সবজি বাগানে চকচকে ধাতুর একটা জিনিস পেয়ে লোহা দিয়ে তার ওপর ঘা মারতে থাকে — তারপরই বিস্ফোরণ ঘটল: রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কোস্তিয়া সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে রইল: তার বাঁ হাত আর বাঁ চোখ খোয়া গেল; মুখময় চিরকালের জন্য বসে রইল বারুদের নীল নীল কণা।

কোস্তিয়া যাতে সুখী মানুষ হয়ে উঠতে পারে তার জন্য হৃদয়ের কতটা দরদ ও স্নেহই না আমাদের উচিত ওকে দেওয়া! ওর বাবা, ভালোমানুষ সৎমা আর দাদুর ভালোবাসা যাতে যুক্তিযুক্ত ও সুসঙ্গত হয় সে কথা ওঁদের বুঝিয়ে বলি কী ভাবে? কী ভাবে ও পড়াশুনা করবে? ওর আত্মীয়স্বজনরা বলে ওর নাকি প্রায়ই মাথা ব্যথা করে। কী ভাবে ওর শিক্ষাকে সহজসাধ্য করা যায়, স্বাস্থ্য ভালো করা যায়, ওর নিস্তেজ মনকে প্রফুল্ল করে তোলা যায়? বাবা বলেন, ও নাকি প্রায়ই একা একা কাঁদে, সমবয়সীদের খেলাধুলা ওকে আকর্ষণ করে না।

মায়ের পাশে স্লাভাকে দেখছি। চোখজোড়া ছাইরঙা, মুখ তার বিষণ্ণ। ওর মা'র জীবনটা কঠিন, নিঃসঙ্গ নারীর জীবন। তাঁর বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। অল্পবয়সে দেখতে তিনি সুশ্রী ছিলেন না। তরুণীর সুখের স্বপ্ন ছিল, কিন্তু কেউই তাঁর স্বামী হতে চায় না। যৌবন চলে যায়, অথচ ব্যক্তিগত সুখের দেখা নেই। এই সময় যুদ্ধ ফেরত একজনের সঙ্গে তাঁর আলাপ, তাঁরই মতো নিঃসঙ্গ, সর্বাঙ্গ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। লোকটি

তাঁকে ভালোবাসে, ওঁদের বিয়ে হল। এ সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না: অচিরেই স্বামীর মৃত্যু হল। স্বামীর প্রতি তাঁর সমস্ত ভালোবাসা এসে পড়ল ছেলেটার ওপর, কিন্তু শিক্ষাদানে ত্রুটি ছিল। স্লাভা লোকজন পছন্দ করে না, সারাদিন বাড়িতে বসে থাকে, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করলেই সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে জ্বলে ওঠে বিদ্বেষের আগুন। এই মুহূর্তে আমি যখন বালকের চোখের দিকে তাকাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে চোখজোড়া কুঁচকে উঠল, চোখে দেখা দিল সতর্ক ভাব।

আমার ভাবী শিক্ষার্থীদের আমি যত কাছ থেকে দেখি ততই বেশি করে আমার মনে এই নিশ্চিত ধারণা হয় যে আমার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল পরিবারে যারা শৈশব থেকে বঞ্চিত, তাদের শৈশব ফিরিয়ে আনা।

স্কুলে কাজ করতে গিয়ে তিন বছরে আমি এ রকম ডজন কয়েক ছেলেমেয়ের সাক্ষাৎ পাই। জীবনের অভিজ্ঞতায় নিশ্চিত ভাবে জেনেছি যে কল্যাণ ও ন্যায়ের প্রতি ছোট শিশুর বিশ্বাস যদি ফিরিয়ে আনা না যায়, তাহলে সে কখনই নিজেকে মানুষরূপে গণ্য করতে পারে না, তার আত্মমর্যাদাবোধ জন্মাতে পারে না। উঠতি বয়সে এ রকম শিক্ষার্থী হয়ে দাঁড়ায় নির্দয়, তার কাছে জীবনে পবিত্র ও উদাত্ত বলে কিছুই থাকে না, শিক্ষকের বাণী তার মনের গভীরে দাগ কাটে না।

এ ধরনের মানুষের মন শোধরানো —শিক্ষাদাতার দুরূহতম কর্তব্যগুলির একটি। বস্তুত, এই সূক্ষ্মতম, অত্যন্ত শ্রমসাধ্য কাজের মধ্য দিয়েই পরীক্ষিত হয়ে থাকে মানবচরিত্রজ্ঞান। মানবচরিত্রজ্ঞানী হওয়ার অর্থ কেবল এই নয় যে শিশু কী করে ভালো ও মন্দ উপলব্ধি করছে তা দেখা, অনুভব করা,

তার অর্থ কোমল শিশুহৃদয়কে মন্দের হাত থেকে রক্ষা করাও বটে।

শিশুদের কালো, নীল, আসমানী রঙের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি ভাবি ওদের হৃদয়কে উষ্ণ করে তোলার মতো শুভবুদ্ধি ও আন্তরিকতা আমার আছে কি? আমার মনে পড়ল ক্রুপ্‌স্কায়ার উক্তি: 'শিশুর কাছে ভাব ও ব্যক্তিত্ব অবিচ্ছেদ্য। যে লোক তাদের অপরিচিত, যাকে তারা অবজ্ঞা করে, তার মুখের কথার থেকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে তারা গ্রহণ করে প্রিয় শিক্ষকের মুখের কথাকে।' আমি শিক্ষা দেব কথায় আর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের সাহায্যে। আমার মুখের কথা, আমার আচার-আচরণ এমন হতে হবে যাতে শিশুরা তার মধ্যে কল্যাণের, সত্যের, সুন্দরের সন্ধান পায়। আমার প্রতিটি উক্তির মধ্যে থাকতে হবে আন্তরিকতা, সহৃদয়তা, হৃদয়াবেগ।

গালিয়াকে নিয়ে এলেন তার বাবা। তাকে আর তার ছোট বোনকে বড় রকমের দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হয়েছে: ওদের মা মারা গেছেন। মা'র মৃত্যুর এক বছর বাদে পরিবারে অপরিচিতা নারীর আগমন ঘটল। মহিলাটি উদার, সৎ, সংবেদনশীল। তিনি বুঝতে পারলেন শিশুহৃদয়ে কী ঘটছে, নিজের অনুভূতি প্রকাশের ব্যাপারে তিনি সতর্কতার আশ্রয় নিলেন, তাঁর আশা ছিল মেয়ে দুটিকে তিনি বশে আনতে পারবেন। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস কেটে যায়, গালিয়া আর তার ছোট বোন ভালিয়া কিন্তু সৎমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করতে চায় না। ওরা যেন তাঁকে লক্ষ্যই করে না। মহিলা চোখের জল ফেলেন, তাঁর কী করা উচিত এই বিষয়ে স্বামীর ও আত্মীয়স্বজনের পরামর্শ চান। তিনি মনে মনে এও ঠিক করেছিলেন যে পরিবার পরিত্যাগ করবেন, কিন্তু

এরপর তাঁর পুত্রের জন্ম হল। ভাবলেন যে শিশুর আবির্ভাবে মেয়েদের মন নরম হবে, কিন্তু সে আশা সত্য প্রতিপন্ন হল না। মেয়ে দুটি (বিশেষত গালিয়া) ছোট ভাইটিকে আমলই দিতে চায় না। এই দর্পিত হৃদয়কে কী ভাবে নাড়া দেওয়া যায়? বাবা আর সৎমাকে কী বলা যায়, তাঁদের কী পরামর্শ দেওয়া যায়? বাবা ত ইতিমধ্যেই স্কুলে এসে তাঁর মনোবেদনা প্রকাশ করে গেছেন। আমি বললাম যে গালিয়াকে আগে ভালোমতো জেনে নিই, একমাত্র তখনই কোন পরামর্শ দিতে পারব।

লারিসা বসে আছে তার মায়ের পাশে। গোলগাল মেয়েটি, চোখজোড়া ছাইরঙা, মুখে তার হাসি। হাতে চন্দ্রমল্লিকা ফুল। আমি জানি যে মা'র বুকে ভারি পাথরের মতো চেপে বসে আছে বেদনা। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন। বাবাকে মেয়েটির মনে নেই। এদিকে মা মেয়েকে বলেন যে বাবা আসবেন। অবশেষে মহিলা বিয়ে করলেন একজন ভালো লোককে — তিনি গাড়ি ও ট্র্যাক্টর ডিপোর শ্রমিক। মহিলা তাঁর মেয়েকে এই বলে বুঝ দিলেন যে ইনিই ওর বাবা। লারিসা বাপকে ভালোবাসে, কিন্তু মা মনে মনে কষ্ট পান — হঠাৎ যদি অসাবধানে কোন লোকের মুখ ফসকে এমন কথা বেরিয়ে পড়ে যাতে তাঁর প্রতারণা ফাঁস হয়ে যায়? মেয়েটি সুখী, তবে মন্দ কথায় রূঢ় স্পর্শ যাতে তার মনে না লাগে সেদিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। মা-বাবা লোক ভালো। তাঁদের সঙ্গে মিলে আমরা এ কাজ করতে পারব কি? আপন বাপ নয়। ...কিন্তু সব ছেলেমেয়েরই জন্মদাতা বাপ যদি লারিসার এই বাপেরে মতো হত! এই মানুষটি সম্পর্কে আমি যত বেশি জানতে পারলাম ততই আমার দৃঢ়তর প্রত্যয় হতে লাগল যে সত্যিকারের পিতৃত্বের দাবি করতে পারেন তিনিই

যিনি সন্তানকে মানুষ করে তুলেছেন। আমি প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম, অবাক হয়ে যেতাম একটা কৌতূহলজনক ব্যাপার দেখে: মেয়েটির চোখে সেই একই উদারতা, কোমলতা, সংবেদনশীলতা যেমন দেখা যায় তার সৎ-বাপের চোখে। যেমন সৎ-বাপের চোখ থেকে তেমনি শিশুর চোখ থেকেও বিচ্ছুরিত হচ্ছে সৌন্দর্যদর্শনের পুলক, বিস্ময়। এমন কি চালচলন, হাবভাব, বিস্ময়, সতর্কতা ও কঠোরতা প্রকাশের ভঙ্গি — এ সবই লারিসা পেয়েছে তাঁর কাছ থেকে।

ফেদিয়া। ...তারও বাবা নেই, কিন্তু ছেলেটিকে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার শুনতে হয়েছে হুল-ফোটানো অপমানজনক কথা — লোকে আকারে-ইঙ্গিতে তাকে বোঝাতে ছাড়ে নি যে তার মায়ের স্বভাবচরিত্র মোটেই সুবিধের নয়। শিশুমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে: তা কী করে হয়? — মা যে বললেন বাবা ফ্রন্টে মারা গেছেন। আমি যুদ্ধের আগে থেকে ফেদিয়ার মাকে জানি। যুদ্ধের সময় তার জীবনে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন শিশুর মনকে যাতে পীড়িত না করে তার জন্য মানবমনের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিল জগতের সঙ্গে তাকে কী ভাবে পরিচিত করা যায়?

আমরা, শিক্ষাব্রতীরা অনেক সময় ভুলে যাই যে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে জগৎ সম্পর্কে উপলব্ধির শুরু হয় মানুষ সম্পর্কে উপলব্ধি থেকে। বাবা মায়ের সঙ্গে কোন সুরে কথা বলে, তার দৃষ্টি চালচলন কী ধরনের অনুভূতি ব্যক্ত করে তারই মধ্য দিয়ে শিশুর সামনে উন্মুক্ত হয় ভালো-মন্দের উপলব্ধি। আমি একটি মেয়েকে জানি যে বাগানের এক নির্জন কোণে গিয়ে কাঁদতে থাকে যখন দেখে বাবা কাজ থেকে বাসায় ফেরেন মুখ গোমড়া করে, কারও

সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন না, এদিকে মা যে-কোন কথা নিয়ে তাঁকে খুশী করার চেষ্টা করছেন। বাপের ওপর রাগে আর মায়ের প্রতি সহানুভূতিতে শিশুর বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল।

কিন্তু মানবসম্পর্কের যে-সমস্ত উপলব্ধি শিশুর ঘটে, এ হল তার প্রথম ভাসা-ভাসা রূপরেখামাত্র। কিন্তু মা-বাবার ঝগড়াঝাঁটির মাঝখানে অসতর্ক ভাবে দুজনের কারও মুখ ফসকে যখন এমন কথা বেরিয়ে পড়ে যা থেকে শিশু জানতে পারে যে তারা একে অন্যকে ভালোবাসে না, অথচ সন্তানের বন্ধন থাকায় তারা একসঙ্গে বসবাস করছে — তখন শিশুহৃদয়ে কত বড় আঘাতই না লাগতে পারে!

যমজ দুই বোন নিনা ও সাশা। স্কুলে ওদের নিয়ে এলেন বাবা। বহু সন্তানের এই পরিবার নিনা ও সাশা ছাড়া আরও চারটি সন্তান — দুর্ভাগ্যপীড়িত। আজ কয়েক বছর হল গুরুতর পীড়ায় মা শয্যাশায়ী। বড় বোনেরা ঘরসংসার চালায় — বাবা অসুবিধার মধ্যে আছেন। নিনা ও সাশা জানে শ্রম কাকে বলে। ওদের পরিবারে আনন্দ বড়ই কম। মেয়ে দুটো যখন একটা ছেলের কাছে রবারের বল দেখল তখন ওদের চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল, কিন্তু সে দীপ্তি সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল। আমি ওদের চোখে এমন গভীর বিষাদ লক্ষ্য করলাম যে আমার গলা বুজে গেল। কী ভাবে এই শিশুদের দেওয়া যেতে পারে শৈশবের উজ্জ্বল, নিশ্চিন্ত আনন্দ? আমার পক্ষে কি তা করা সম্ভব হবে? বাবা ত আমাকে বলেই গেলেন যে মেয়েরা এক ঘণ্টার বেশি স্কুলে থাকতে পারবে না, তারা ওঁকে বাড়িতে সাহায্য করে।

আমরা ঘাসে ঢাকা জমির ওপর ডালপালা ছড়ানো একটা উঁচু নাশপাতি গাছের ছায়ায় বসে আছি। আমি শিশুদের

শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে আমার ধ্যানধারণা মা-বাবাদের বলি, ছেলেমেয়েদের উপস্থিতিতে যা যা বলা সম্ভব সে সবই বলি, কিন্তু প্রতিটি পরিবারের দুর্ভাগ্য ও দুশ্চিন্তা কিছুতেই মাথা থেকে যায় না। প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব দুঃখকষ্ট আর সে দুঃখকষ্ট জগতের সকলের সামনে প্রকাশ করা, অন্য লোকজনের উপস্থিতিতে সে ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া — এ যেন অন্যের মনের ভেতরটা বাইরের দিকে উল্‌টে দেওয়া, যা ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত তাকে সকলের সমক্ষে তুলে ধরা। না, এ সব আমাকে কেবল জেনে রাখতে হবে, কিন্তু মা-বাবাদের কাছে এ সম্পর্কে বলা চলবে না। মা-বাবাদের মনের নিভৃততম কোণ স্পর্শ করার যদি প্রয়োজনও হয় তাহলে তা করতে হবে হাজার বার ভেবেচিন্তে, প্রতিটি শব্দ ওজন করে দেখে কেবল ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্য দিয়ে। যে সব বাবা-মা'র কথা আমি বললাম (আমার অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই বাবা-মায়েরা — চমৎকার লোক) তাঁদের প্রত্যেকেরই হৃদয়ের ক্ষত, দুঃখদুর্দশা, অপমানের জ্বালা, বেদনা, যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা — এমনই নিজস্ব ধরনের যে তা নিয়ে সাধারণ ভাবে কোন কথাবার্তা চলতে পারে না। আমার সামনে যখন উন্মুক্ত হল পাশাপাশি উপবিষ্ট মানুষগুলির ভালো-মন্দে বিজড়িত জটিল রূপ, তখন আমি বুঝতে পারলাম এমন বাবা-মা নেই যাঁরা জেনেশুনে নিজের ছেলেমেয়েদের মন্দ দৃষ্টান্ত দেখান।

ভুলে গেলে চলবে না যে এ সবই হল যুদ্ধের ক্ষত। যুদ্ধপরবর্তী প্রথম পর্ব এখন অনেক দূরে সরে গেছে, যুদ্ধপরবর্তী প্রথম পর্বে আমরা যাদের লালনপালন করেছিলাম তাদের সন্তান-সন্ততিরা বহুকাল হল স্কুলে পড়াশুনা করছে, অনেকে ইতিমধ্যে কৈশোরের মুখে। মনে হতে পারে আজকের

দিনে নবদম্পতিদের পরিবার ত আগাগোড়া সুখে ঝলমল করা উচিত! কিন্তু জীবনে মোটেই তেমন হয় না। এখনও দুঃখ আছে, আছে দুর্ভাগ্য, ট্র্যাজেডি। ...আর সে পর্বে যে কী পরিমাণ ছিল তা ত বলাই বাহুল্য। আমার আনন্দ হল এই দেখে যে অধিকাংশ পরিবারেই মা-বাবার মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল, তাঁরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন।

সাত বছরের শক্তসমর্থ ছেলে ভানিয়া। তার বাবা বড় পরিশ্রমী, কৃষিবিদ, তিনি বড় ভালোবাসেন জমিকে আর মানুষের জন্য কাজ করতে। প্রতি বছর নিজের বাড়ির সংলগ্ন জমিতে তিনি আপেলগাছ ও আঙুরলতার ডজন ডজন চারা তৈরি করে লোকজনদের বিতরণ করেন। তাঁর স্ত্রী — রেশমশিল্পী, সুনিপুণ কর্মী, উদার, সহানুভূতিশীল, সহৃদয় মানুষ, যত্নপরায়ণ জননী। ১৯৩৩-১৯৩৪ সনের কঠিন সময় তিনি চারটি অনাথ শিশুকে নিজেদের পরিবারে স্থান দেন। অনাহারে মৃত্যু থেকে তাদের বাঁচান, নিজের ছেলেমেয়েদের মতন তাদের মানুষ করেন, তারাও ওঁকে মা বলে ডাকে।

ল্যুসিয়া নামে মেয়েটির আশ্চর্য রকমের জমকাল কালো বিনুনি। ওর বাবা খুবই সৎ ও সত্যনিষ্ঠ। এমন সব মানুষ আছে যাদের লোকে বলে থাকে সুন্দর স্বভাবের মানুষ। এ ধরনের মানুষদের অধিকাংশই কোন কীর্তি সম্পাদন করে না। তাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় মানুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ল্যুসিয়ার বাবা কোনকালেই তাঁর মেয়েকে বলেন নি যে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। সংবেদনশীলতা ও মনুষ্যত্ব তিনি তাঁর সন্তানদের শেখান নিজের আচার-আচরণ দিয়ে, স্ত্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহার দিয়ে। ল্যুসিয়ার মায়ের হৃদ্‌রোগ। তিনি

যৌথখামারের বীটের আবাদে কাজ করেন। বাড়ির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনার ভার নিয়েছেন ল্যুসিয়ার বাবা।

কাতিয়ার মা ও বাবা তাঁদের ফলের বাগানকে বাচ্চাদের এক বিচিত্র ক্লাবে পরিণত করেছেন: এখানে তাঁদের চার ছেলেমেয়ের সঙ্গে বসন্তের গোড়া থেকে শরতের শেষ পর্যন্ত আশেপাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা বিশ্রাম করে, খেলাধুলা করে, কলের জলে ধারাস্নান করে। কাতিয়ার বাবা আঙ্গিনায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য খেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফলের বাগানের যাবতীয় ফল শিশুদের ভোগে লাগে।

সানিয়া মেয়েটির চোখ দুটি নীল, সবসময় ভাবমগ্ন। ওর বাবা-মা উদার স্বভাবের, আন্তরিক। শহর থেকে সারা গ্রীষ্মের জন্য তিনটি মেয়ে এসে ওদের বাড়িতে অতিথি হয় — তারা হল সানিয়ার খুড়তুত বোন। সানিয়া অধীর আগ্রহে ওদের প্রতীক্ষায় থাকে। সানিয়ার বাবা বাচ্চাদের জন্য পুকুরে একটা আলাদা স্নানের জায়গা করে দিয়েছেন। এখন তিনি ওদের আরও আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে মোটরবোট বানাতে লেগে গেছেন।

লিদা এসেছে ভালো পরিবার থেকে। তার বাবা ওয়াগন-নির্মাণ-কারখানার শ্রমিক, তিনি সঙ্গীতশিল্পী ও গায়ক। তিনি শিশুদের গান শেখান, বেহালা বাজাতে শেখান, তাৎক্ষণিক কন্সার্টের আয়োজন করেন: বাগানে জনা বিশেক বাচ্চা জড় হয়; ছেলেমেয়েরা বাজনা শোনে, লোকসঙ্গীত শেখে।

পাভেলদের পরিবারে মিলমিশ আছে। চার বছরের ওপরে মা শয্যাগত ছিলেন। মায়ের স্থান নেন বাবা। তিনি যে কেবল কারখানায় কাজ করতেন তা-ই নয়, বাড়ির যাবতীয় কাজও করতেন।

সেরিওজা ছেলেটির রং তামাটে, চোখজোড়া কালো। বাবা, মা আর দুটি সন্তান — এই নিয়ে ওদের পরিবার। ওদের মহলের মধ্যে বেশ সদ্ভাব। ফাঁকা দিন পেলেই পরিবারসুদ্ধ সকলে বনে যায়। সেখানে, বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় তারা চারটি ছোট ছোট লিন্ডেন গাছ লাগিয়েছে। বাড়িতে বাচ্চারা লাগিয়েছে মা, বাবা, দাদু ও দিদিমার জন্য — প্রত্যেকের জন্য একটি করে আপেল গাছ। আমি অনেক সময় ভাবতে ভাবতে তন্ময় হয়ে যাই: কেন এই পরিবারের শিশুরা তাদের বাবা, মা, দাদু ও দিদিমাকে এত ভালোবাসে? হয়ত বা শিশুমনে যা কিছু ভালো এসে জমা হয় সে সবই শতগুণ শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ ভালোবাসা হয়ে মা ও বাবার কাছে ফিরে আসে?

ল্যুবাকে স্কুলে নিয়ে আসে মা-বাবা, দিদিমা, বড় বোন আর ছোট ভাইটি। মেয়েটির পাঁচ ভাই-বোন, আর আছেন ওদের ঠাকুমা-দিদিমা ও দাদু। এই পরিবারে বিনা বাক্যব্যয়ে গুরুজনদের কথা মেনে নেওয়ার যে মনোভাব আছে তার ভিত্তি হল পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ। পরিবারে বড়রা শিশুদের প্রতি যে কেমন শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন, তাদের অনুভূতির যে কত মূল্য দিতে পারেন সে সম্পর্কে অনেক কথা আমি শুনেছি।

সবচেয়ে অল্পবয়সী ছেলে দাঙ্কো। ওদের পরিবারে সুন্দর লৌকিক ঐতিহ্য প্রচলিত আছে। তিন ছেলেমেয়ে — বয়স তাদের ৬,৮ ও ৯ বছর — মা ও বাবা যখন কাজে, তখন তারা ঘরসংসার দেখাশোনা করে। ছোটরা দুপুরের খাবার ও সন্ধ্যায় খাবার বানায়, গোরু দোয়ায়, সব্জি বাগানের শাকসব্জির যত্ন নেয়। গ্রীষ্মকালে মা ও বাবা যখন কাজ থেকে

ফেরেন তখন তাঁদের জন্য তৈরি থাকে স্নানের ব্যবস্থা, পরিষ্কার জামাকাপড়, গরম খাবার, টেবিলের ওপর থাকে... মেঠো ফুলের তোড়া।

পরিবারে বিরাজ করছে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা, বলা যেতে পারে, শ্রমচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা। আর এ ক্ষেত্রে কোন তাড়া নেই, কোন ব্যস্ততা নেই।

ভালিয়ার বাবা ক্রেমেন্‌চুগ-এ মেশিন-নির্মাণ-কারখানায় কাজ করেন, মা কাজ করেন যৌথখামারে। এই সৌহার্দপূর্ণ পরিবারে মা-বাবা এবং তিন ছেলেমেয়ে — সকলেই পড়াশুনা করে। জ্ঞানের প্রতি, বিদ্যালয়ের প্রতি, শিক্ষকদের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ গৃহে বিরাজ করছে তা আমাদের, শিক্ষকদের বড় আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, আনন্দ দেয়। ভালিয়া যখন 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ে ভর্তি হল তখন এই পরিবারের অপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল: জানা গেল ভালিয়ার আপন দিদিমা বলে আমরা যে বৃদ্ধাকে জানতাম তিনি আসলে 'অন্য পরিবারের' লোক, তাঁর আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই, তাঁর দুই ছেলে ফ্রণ্টে মারা যান, ভালিয়াদের পরিবারে তিনি আশ্রয় পান, তিনি হয়ে দাঁড়ান শিশুদের আপন জন। তিনি যে 'অন্য পরিবারের' লোক ভালিয়া তা জানতই না।

ছোট্ট মেয়ে লুদ্যা। চোখজোড়া তার ছাইরঙা। তার মা-বাবা কাজ করেন যৌথখামারে। মা-বাবা শিশুদের মনে সাধারণ কৃষিকাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সঞ্চার করেন। পরিবারে বিরাজ করছে পারিবারিক সম্মানবোধ। বাবা সন্তানদের শেখান: 'লোকের জন্য আমরা যা কিছু করছি তা সুন্দর হওয়া চাই।' গ্রীষ্মকালে বড় ছেলেমেয়েরা বাপের সঙ্গে মাঠে কাজ করতে যায়। লুদ্যা মাসের মধ্যে কয়েকবার মা'র সঙ্গে ওদের

কাছে যায়। এই সফরগুলি মেয়েটির কাছে সত্যিকারের উৎসব।

তানিয়ার বাবা-মা কাজ করেন যৌথখামারের পশুপালন ফার্মে। বাবা-মা যেখানে কাজ করেন দুই মেয়ে গ্রীষ্মকালে প্রায়ই সেখানে যায়। বাবা ও মা তাঁদের সন্তানদের মধ্যে শ্রমের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন। শিক্ষকেরা প্রায়ই যে দৃশ্যটি দেখে চমৎকৃত হন তা এই রকম: পশুপালন ফার্মের এক কোণায় বাবা ছোট একটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেন, সেখানে ভেড়ার বাচ্চা কিংবা বাছুর রাখেন। তানিয়া আর ওর বড় বোন সযত্নে পশুদের পরিচর্যা করে। এ হল শিশুদের প্রিয় খেলা; এ খেলা তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় এই কারণে যে মা আর বাবাও খেলছেন।

শুরা নামে ছেলেটির চোখজোড়া কালো, অনুসন্ধিৎসু, স্নেহমাখা। তার বাবা কাজ করেন রেলে। বাড়িতে আসেন সপ্তাহে একদিন। বাবার আগমন শুরা আর তার ভাইবোনদের কাছে একটা ঘটনা বিশেষ, এই ঘটনা শিশুমনে গভীর ছাপ ফেলে। ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে বাবার প্রতীক্ষা করে: তিনি সবসময় ওদের কিছু না কিছু উপহার দেন। তাঁর উপহার বিশিষ্ট ধরনের: বাবা কাঠ কেটে জন্তুজানোয়ার, মানুষ আর কল্পিত প্রাণীর মূর্তি গড়তে পারেন। বাবা যে-সমস্ত কাহিনী বলেন তাও শিশুদের পরম তৃপ্তি দেয়। ভালো লোকজন খুঁজে বার করার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর আছে। ভালো লোকজনের বিবরণ শিশুদের সামনে যেন জগতের বাতায়ন খুলে দেয়।

ভলোদিয়ার বাবা সেতুনির্মাণকর্মী। মা যৌথখামারে কাজ করেন। মা-বাবার বয়স অল্প। তাঁরা তাঁদের প্রথম সন্তানকে

অত্যন্ত ভালোবাসেন। কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানের বড়ই অভাব। ছেলের খামখেয়ালি আবদার যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পূরণ করার চেষ্টায় তাঁরা তাকে রাজ্যের টুকিটাকি জিনিস উপহার দিয়ে চলেন। ভলোদিয়া মা'র পাশে বসে আছে, হাতে তার দুটো রবারের বল। সে মাকে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু মা তার দিকে কোন আমল দিচ্ছেন না, ছেলের ঠোঁটজোড়া ফুলে উঠল, চোখে — জল।

ভারিয়া মেয়েটির গায়ের রং তামাটে, ডাঁটার মতো ছিপছিপে গড়ন, চোখ কালো, চুল কোঁকড়া। মা তেলকলে ঝাড়ুদারের কাজ করেন, বাবা যুদ্ধের পর থেকে গুরুতর অসুস্থ, বাড়ির সকলে তাঁর সেবাযত্ন করে, কিন্তু বাবার স্বাস্থ্যের অবস্থা আপাতত উন্নত হচ্ছে না। তিন ছেলেমেয়ে অনুভব করে যে মা'র ভাগ্যে কঠিন পরিশ্রমের বোঝা এসে চেপেছে, তারা তাই সর্বশক্তিতে তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করে। মা'র উপার্জন সামান্য, সন্ধ্যায় তিনি জামা আর তোয়ালের ওপর এম্ব্রয়ডারি করে স্বামীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ রোজগার করেন। ভারিয়ার বড় বোন এখনই এম্ব্রয়ডারি শিখে গেছে, সে মাকে সাহায্য করে। ভারিয়াও লৌকিক চিকনের কাজ শিখছে।

শিশু হল মা-বাবার নৈতিক জীবনের দর্পণ। আমি প্রতিটি পরিবারের দোষ ও গুণ সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করি। ভালো মা-বাবাদের সবচেয়ে মূল্যবান যে নৈতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ কোন প্রয়াস ছাড়াই শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তা হল মা ও বাবার মনের ঔদার্য, মানুষের ভালো করার ক্ষমতা। যে পরিবারে মা-বাবা নিজেদের হৃদয়ের ভাগ অন্যদের দেন, মানুষের আনন্দ-বেদনাকে হৃদয়ের কাছাকাছি গ্রহণ করেন,

সেখানে ছেলেমেয়েরা উদার, সংবেদনশীল ও সহৃদয় হয়ে বেড়ে ওঠে। কোন কোন মা-বাবার মধ্যে যে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা যায় তার চেয়ে মন্দ আর কিছু হতে পারে না। কখনও কখনও এই ক্ষতিকর আচরণ নিজের সন্তানের প্রতি অন্ধ, জৈব স্নেহের আকার ধারণ করে, যেমন ঘটেছে ভলোদিয়ার মা-বাবার ক্ষেত্রে। মা-বাবা তাঁদের হৃদয়ের সমস্ত শক্তি যদি সন্তানকে উজার করে দেন, যদি সন্তানের আড়ালে অন্য লোকজন গৌণ হয়ে ঢাকা পড়ে যায় তাহলে এই আত্যন্তিক স্নেহের পরিণাম দুর্ভাগ্যজনক হতে বাধ্য।

আমার কল্পনায় 'আনন্দ নিকেতন' যে কী অভিভাবকদের কাছে তা বলার সময় আমি একথাই ভাবছিলাম। কথাবার্তার প্রকৃতি ছিল বেশ দুরূহ। অভিভাবকদের উদ্দেশে প্রতিটি কথা বলার সময় পরিবারে ভালো-মন্দ যা যা আছে সমস্ত কিছু মনে রাখতে হবে। আমি যখন বলছিলাম যে 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ে বিরাজ করবে সততা, সত্যবাদিতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের মনোভাব তখন কোলিয়ার পরিবার সম্পর্কে চিন্তা আমার মনকে স্বস্তি দিচ্ছিল না। কিন্তু যে মন্দবুদ্ধি ও মিথ্যাচারে এই পরিবারের জীবন আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার কথা আর দশজন মা-বাবার কাছে বলা যায় না। এর ফলে মা স্কুলের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়বে, হয়ত আর কখনও আসবেই না। এখানে দরকার অন্য কিছু, কিন্তু সেটা যে কী অনেক ভেবেও আমি সেই জটিল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলাম না।

আমি অভিভাবকদের সামনে শিশুশিক্ষার ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরলাম। আজ ছয় বছরের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা স্কুলে এসেছে, বারো বছর বাদে ওরা হবে পরিণত মানুষ, ভাবী মা-বাবা।

শিশুরা যাতে দেশপ্রেমিক হয়, মাতৃভূমিকে ও শ্রমজীবী জনগণকে আন্তরিক ভাবে ভালোবাসে, যাতে তারা সৎ, সত্যবাদী কর্মনিষ্ঠ, উদার ও হৃদয়বান হয়, সংবেদনশীল হয়, মন্দ ও মিথ্যার বিরুদ্ধে আপসহীন হয়, বাধাবিপত্তি জয় করার ব্যাপারে সাহসী ও অটল হয়, বিজয়ী হয়, নৈতিক বিচারে সুন্দর হয়, স্বাস্থ্যবান হয়, পোক্ত শরীরের অধিকারী হয় তার জন্য স্কুলের শিক্ষকবর্গ চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখবেন না। শিশুদের হতে হবে বিচক্ষণ মানুষ, উদার মনের অধিকারী, হতে হবে কর্মনিপুণ, উদাত্ত অনুভূতির অধিকারী। শিশু হল পরিবারের দর্পণ; এক বিন্দু জলে যেমন সূর্যের প্রতিফলন ঘটে তেমনি শিশুদের মধ্যেও প্রতিফলন ঘটে মা ও বাবার নৈতিক বিশুদ্ধতা। স্কুলের আর মা-বাবার কাজ হল প্রতিটি শিশুকে সুখী করে তোলা। সুখের প্রকৃতি বহুমুখী। মানুষ যখন নিজের ক্ষমতার প্রকাশ ঘটাতে পারে, শ্রমকে ভালোবাসে, শ্রমের ক্ষেত্রে স্রষ্টা হতে পারে তাতে যেমন সুখ, তেমনি সে যখন পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে, অন্যদের জন্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে তাতেও সুখ, আবার অপরকে ভালোবাসার মধ্যে, নিজে ভালোবাসার পাত্র হতে পারার মধ্যে, শিশুদের সত্যিকারের মানুষ করে তোলার মধ্যেও সুখ আছে। একমাত্র অভিভাবকদের সহায়তায়, সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষকরা শিশুদের অগাধ মানবিক সুখ দিতে পারেন। ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে বাড়ি চলে যায়, আমি মনে করিয়ে দিই: 'আগামী কাল, একত্রিশ আগস্ট, আমাদের 'আনন্দ নিকেতনের' জীবনযাত্রা শুরু হবে।'*

* সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বর থেকে।

এই দিনটি আমার জন্য কী নিয়ে আসবে? আজ ছেলেমেয়েরা মায়েদের হাত ধরে আছে, কাল তারা আসবে একা একা। প্রত্যেকেরই আছে নিজস্ব আনন্দ। প্রত্যেকের জন্য আছে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত, প্রত্যেকের সামনে আছে অনন্ত জীবন। এই দিনটির প্রাক্কালে আমাকে যা সবচেয়ে বেশি ভাবিত করে তোলে তা হল এই যে স্কুল যেন শৈশব-সুখ থেকে শিশুদের বঞ্চিত না করে। বরং বিদ্যালয়-জগতে তাদের এমন ভাবে নিয়ে আসতে হবে যাতে তাদের সামনে নতুন থেকে নতুনতর সুখের উদয় হয়; যাতে জ্ঞানলাভ একঘেয়ে বিদ্যাচর্চায় পরিণত না হয়। আবার সেই সঙ্গে স্কুল যেন আপাত আকর্ষণীয়, অফুরন্ত অসার খেলার আসরে পরিণত না হয়। প্রতিটি দিন যেন শিশুদের জ্ঞানবুদ্ধি, অনুভূতি আর ইচ্ছাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

মুক্তাঙ্গন-বিদ্যালয়

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বাচ্চাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। সকাল ৮টায় এলো ২৯ জন। সাশা এলো না (হয়ত মা'র অবস্থা খারাপ)। ভলোদিয়াও এলো না, হয়ত ঘুমুচ্ছে, ছেলেকে জাগানোর ইচ্ছে হয় নি তার মা'র।

প্রায় সব ছেলেমেয়েই উৎসবের সাজে সেজেছে, পায়ে তাদের নতুন জুতো। জুতো দেখে আমি বিব্রত বোধ করলাম: গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা বহুকাল থেকেই গরমকালে খালি পায়ে হাঁটতে অভ্যস্ত, এতে শরীরও চমৎকার পোক্ত হয়, ঠাণ্ডা লেগে যে-সমস্ত অসুখবিসুখ হয় এ হল তা ঠেকানোর সবচেয়ে ভালো উপায়। মা-বাবারা শিশুদের কচি পা মাটি থেকে, সকালের

শিশির আর রোদের তাপে টাটানো জমি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন কেন? তাঁরা অবশ্য ভালো ভেবেই এগুলো করছেন, কিন্তু এতে ফল মন্দই হচ্ছে: প্রতি বছর উত্তরোত্তর বেশি সংখ্যক গ্রাম্য ছেলেমেয়ে শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা, গলার ব্যথা আর হুপিং কাফ্-এ ভোগে। অথচ শিশুদের এমন ভাবে মানুষ করে তোলা উচিত যাতে তারা না কাঠফাটা রোদ না ঠাণ্ডা — কোনটাকেই ভয় না পায়।

'চল ছেলেমেয়েরা, স্কুলে যাই,' বাচ্চাদের এই বলে আমি বাগানের দিকে রওনা দিলাম। ওরা বিভ্রান্ত হয়ে আমার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, ঠিকই, আমরা স্কুলে যাচ্ছি। আমাদের স্কুল হবে নীল আকাশের নীচে, সবুজ ঘাসের ওপর, ডালাপালা মেলা নাশপাতি গাছের ছায়ায়, আঙুর খেতে, সবুজ মাঠে। এখানে আমরা জুতো খুলব, খালি পায়ে যাব, যেমন আগে তোমাদের হাঁটা অভ্যেস ছিল।' ছেলেমেয়েরা আনন্দে কলরব করে উঠল। গরম আবহাওয়ায় জুতো পায়ে হাঁটা ওদের অভ্যেস নেই, এমন কি ওদের কাছে অস্বস্তিকরও। আমি বললাম, 'কাল খালি পায়ে এসো, আমাদের স্কুলে সেটাই হবে সবচেয়ে ভালো।'

আমরা চললাম দ্রাক্ষাকুঞ্জে। গাছপালায় ঢাকা, শান্ত এক কোণে দ্রাক্ষালতা ঝাঁকড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ধাতুর তৈরী কাঠামোর ওপর লতা ছড়িয়ে পড়ে গড়ে তুলেছে পর্ণকুটির। কুটিরের ভেতরে মাটি কোমল ঘাসে ঢাকা। এখানে নীরবতার রাজ্য, এখান থেকে, এই সবুজ আলো-আঁধারি থেকে সারা জগৎটা সবুজ-সবুজ দেখায়। আমরা ঘাসের ওপর বসলাম।

'এখানেই শুরু হচ্ছে আমাদের স্কুল। এখান থেকে দেখতে থাকব নীল আকাশ, বাগান, গ্রাম আর সূর্য।'

প্রকৃতির মনমাতানো সৌন্দর্যে ছেলেমেয়েরা নির্বাক। পাতার ফাঁকে ফাঁকে ঝুলছে সোনালি রঙের পাকা টসটসে আঙুরের থোকা। বাচ্চাদের ইচ্ছে হচ্ছিল ফল চেখে দেখে। সবুর কর, তা-ও হবে, তবে আগে সৌন্দর্য উপভোগ করা দরকার। বাচ্চারা চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মনে হয় বাগান যেন সবুজ কুয়াসায় ঘেরা — ঠিক যেন রূপকথার জলরাজ্যে। মাটির উপরিভাগ — মাঠ, তৃণভূমি, পথঘাট — যেন মরকত রঙের কুয়াসায় কাঁপছে আর আলোকিত গাছপালার ওপর ঝড়ে পড়ছে সূর্যের ফুলকি।

'সূয্যি ফুলকি ছড়াচ্ছে,' কাতিয়া মৃদুস্বরে বলল।

বাচ্চারা তাদের মনোমুগ্ধকর জগৎ থেকে চোখ আর ফিরাতে পারে না। আমি তখন সূর্য সম্পর্কে রূপকথা বলতে লাগলাম।

'হ্যাঁ, কাতিয়া সুন্দর বলেছে। সূয্যি ফুলকি ছড়াচ্ছে। সূয্যি থাকে অনেক উঁচু আকাশে। তার আছে দুই দত্যি-কামার, আর আছে সোনার নেহাই। ভোরের আগে আগে আগুন রঙা দাড়িওয়ালা কামার দুজন সূয্যির কাছে যায়, সূয্যি তাদের দুই গোছা রুপোর সুতো দেয়। কামারেরা লোহার হাতুড়ি তুলে নেয়, সোনার নেহাইয়ের ওপর রুপোর সুতো রাখে আর সমানে পেটাতে থাকে। তারা পিটিয়ে পিটিয়ে সূয্যির জন্য তৈরি করতে থাকে রুপোর মালা, আর হাতুড়ির ঘায়ে সারা দুনিয়ায় ঠিকরে পড়ে রুপোর ফুলকি। ফুলকি মাটিতে পড়ে, এই ত তোমরাও দেখছ। আর সন্ধেবেলায় কামারেরা হয়রান হয়ে যায়, তারা মালা নিয়ে যায় সূয্যির কাছে। সূয্যি তার সোনালি বিনুনির আর সেই মালা পরে, আর চলে যায় তার মায়াকাননে জিরোতে।'

আমি রূপকথা বলি, সঙ্গে সঙ্গে তার ছবি আঁকি: ড্রইং খাতার সাদা পাতার ওপর ফুটে ওঠে কল্পজগতের প্রতিরূপ: সোনার নেহাইয়ের সামনে — দুই দত্যি-কামার, লোহার হাতুড়ির ঘায়ে ছড়িয়ে পড়ছে রুপোর ফুলকি।

বাচ্চারা রূপকথা শোনে, যাদুরাজ্যের মায়ায় তারা মুগ্ধ, মনে হয় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে তারা ভয় পাচ্ছে, যাতে এই মুগ্ধতার ঘোর কেটে না যায়। তারপরই একসঙ্গে বর্ষিত হয় প্রশ্নবাণ: 'আচ্ছা, দত্যি-কামাররা রাতের বেলায় কী করে?' 'প্রত্যেক বার সুয্যির নতুন মালা কেন?' 'রুপোর ফুলকিগুলো যায় কোথায়? — ওগুলো ত রোজই মাটিতে ঝরে পড়ে?'

ওগো ছেলেমেয়েরা, সবই আমি তোমাদের বলব, আমরা আরও সময় পাব, আর আজ তোমাদের আঙুর খেতে দেব। বাচ্চারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে যতক্ষণ ঝুড়ি ভরে উঠতে থাকে আঙুরের থোকায়। দুটো করে গোছা বিতরণ করি। একটি খেতে বলি, আর অন্যটি দিতে বলি মাকে, বলি মা-ও চেখে দেখুন। বাচ্চারা আশ্চর্য রকম ধৈর্যের পরিচয় দেয় — আঙুরের থোকা কাগজে মোড়ে। এদিকে আমি মনে মনে উদ্বেগ বোধ করি: স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত এতটা পথে এই ধৈর্য রাখতে পারলে হয়! তোলিয়া আর কোলিয়া কি মা'কে আঙুর দেবে? নিনাকে আমি দিই কয়েকটি থোকা: অসুস্থ মা'র জন্য, ছোট বোন আর দিদিমার জন্য। ভারিয়া তিনটি গোছা নেয় বাবার জন্য। মাথায় একটা মতলব খেলে যায়: ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি হওয়া মাত্র তারা যেন নিজেদের আঙুর খেত বানায়। ...ভারিয়াদের বাড়িতে এই শরৎকালেই গোটা দশেক চারা লাগাতে হবে, এক বছর বাদেই সেগুলিতে ফল ধরবে — ওর বাবার পথ্য হবে।

আমরা সবুজ কুয়াসার মায়াজগৎ থেকে বেরিয়ে আসি। আমি বাচ্চাদের বলি:

'আগামীকাল সন্ধ্যার আগে আগে, ছয়টার সময় এসো। ভুলো না যেন।'

আমি দেখতে পাই ছেলেমেয়েরা যেতে চায় না। শেষকালে ওরা সাদা মোড়ক বুকে চেপে যে যার বাড়ির পথ ধরে। আমার জানতে আগ্রহ হয় ওদের মধ্যে কার আঙুর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুবে না! কিন্তু এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করা যায় না; কেউ যদি নিজে থেকে বলে ত ভালো।

মুক্তাঙ্গন-বিদ্যালয়ের প্রথম দিন শেষ হল। ...সেই রাতে আমি সূর্যের রুপোলি ফুলকির স্বপ্ন দেখলাম, খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ ভাবলাম অতঃপর কী করা যায়। আমি বিশদ কোন পরিকল্পনা তৈরি করতাম না, আগে থেকে ঠিক করতাম না কোন দিন ছেলেমেয়েদের কী বলব, কোথায় ওদের নিয়ে যাব। আমাদের স্কুলের জীবন বিকশিত হয়ে উঠত এমন এক ভাব থেকে, যা ছিল আমার প্রেরণাস্বরূপ: শিশু তার স্বভাবে অনুসন্ধিৎসু গবেষক, জগতের আবিষ্কর্তা। সুতরাং তার সামনে অপরূপ জগৎ উদ্‌ঘাটিত হোক জীবন্ত রঙে, উজ্জ্বল ও রোমাঞ্চকর ধ্বনিতে, রূপকথায় ও খেলায়, নিজস্ব সৃষ্টিতে, তার হৃদয়ের প্রেরণাদাত্রী সৌন্দর্যে, মানুষের ভালো করার চেষ্টার মধ্যে। রূপকথা, কল্পনা ও খেলার মধ্য দিয়ে, শিশুর অনবদ্য সৃজনকর্মের মধ্য দিয়ে শিশুর হৃদয়ে প্রবেশের সঠিক পথ পাওয়া যায়। আমি পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে এমন ভাবে শিশুদের পরিচয় ঘটাব যাতে তারা প্রতিদিন তার মধ্যে নতুন কিছুর সন্ধান পায়, যাতে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ হয় **ভাবনা ও প্রকাশের**

উৎসমুখে — নিসর্গের অপরূপ সৌন্দর্যের অভিমুখে **যাত্রা।** আমি যত্ন নেব যাতে আমার প্রতিটি পালিত সন্তান বড় হয়ে বুদ্ধিমানের মতো চিন্তা করতে শেখে, গবেষক হয়, যাতে জ্ঞানের প্রতিটি পদক্ষেপ হৃদয়কে উন্নত করে, ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করে তোলে।

দ্বিতীয় দিন বাচ্চারা সন্ধ্যার আগে আগে স্কুলে এলো। সেপ্টেম্বরের শান্ত দিনের আলো নিভে আসছিল। আমরা গাঁ থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু টিলার ওপর উঠলাম। আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হল এক অপূর্ব দৃশ্য — সূর্যের আলোয় বিশাল তৃণভূমি যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে; আমরা দেখতে পেলাম ছিমছাম পপলারের সারি আর দিগন্তে দূরের টিলাগুলি। আমরা এসে পৌঁছুলাম ভাবনা ও কথার উৎসমুখে। রূপকথা, কল্পনা — এ হল সেই চাবি যা দিয়ে এই উৎসমুখ খোলা যায়, আর খোলামাত্রই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তার সঞ্জীবনী ধারা। আমার মনে পড়ল গতকাল কাতিয়া যে-কথা বলেছিল: ‘সূয্যি ফুলকি ছড়াচ্ছে...’ এখানে আগে থেকেই উল্লেখ করি পরবর্তীকালের একটি ঘটনা: ১২ বছর পরে স্কুল শেষ করার সময় কাতিয়া তার জন্মভূমি সম্পর্কে একটি রচনা লেখে, তাতে নিসর্গের প্রতি নিজের ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে সে এই রূপমূর্তির উল্লেখ করে। বোঝাই যাচ্ছে শিশুর চিন্তাভাবনায় রূপকথার ভাবমূর্তির শক্তি কী বিপুল! অসংখ্য বার আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে পারিপার্শ্বিক জগতে কল্পমূর্তির অধিষ্ঠান ঘটিয়ে, এই সব রূপমূর্তি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা কেবল সৌন্দর্যেরই সন্ধান পায় না, সত্যেরও সন্ধান পায়। রূপকথা ছাড়া, কল্পনার খেলা ছাড়া শিশু বাঁচতে পারে না, রূপকথা ছাড়া পারিপার্শ্বিক জগৎ তার

কাছে সুন্দর হলেও পরিণত হয় ক্যানভাসে আঁকা পটে; রূপকথা সেই চিত্রকে জীবন্ত করে তোলে।

জমকাল ভাষায় বলতে গেলে রূপকথা হল শিশুদের চিন্তাভাবনা ও অভিব্যক্তির আগুনকে উসকে দেওয়ার উপযোগী তাজা হাওয়া। শিশুরা রূপকথা শুনতেই যে কেবল ভালোবাসে তা নয়, তারা রূপকথা সৃষ্টিও করে। আঙুর খেতের লতাপাতার সবুজ দেয়ালের ফাঁক দিয়ে শিশুদের যখন আমি জগৎ দেখাই তখন জানতাম যে ওদের আমি রূপকথা বলব, কিন্তু ঠিক কী ধরনের রূপকথা তা আগে থাকতে আমি ভাবি নি। আমার কল্পনাকে পাখা মেলে ওড়ার প্রেরণা হিশেবে কাজ করল কাতিয়ার কথাগুলি: 'সুয্যি ফুলকি ছড়াচ্ছে...' শিশুরা কত সত্যনিষ্ঠ, নির্ভুল, ব্যঞ্জনাময় রূপই না সৃষ্টি করে, তাদের ভাষা কতই না উজ্জ্বল, বর্ণময়!

আমি চেষ্টা করি বই খোলার আগে, প্রথম শব্দ বানান করে পড়ার আগে ছেলেমেয়েরা যেন দুনিয়ার সবচেয়ে অপরূপ গ্রন্থ — নিসর্গগ্রন্থ পাঠ করে ফেলে।

এখানে, প্রকৃতির মাঝখানে বিশেষ করে যে চিন্তাটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা এই যে প্রকৃতিতে যা সবচেয়ে কমনীয়, যা সূক্ষ্মতম, প্রবল সংবেদনশীল তাই নিয়ে — শিশুর মস্তিষ্ক নিয়ে আমাদের, শিক্ষকদের কাজ করতে হয়। শিশুর মস্তিষ্ক নিয়ে ভাবতে গেলেই মনে হয় কোমল গোলাপ ফুলের ওপর যেন শিশিরবিন্দু টলমল করছে। ফুল তুলতে গিয়ে শিশিরবিন্দু যাতে মাটিতে পড়ে না যায় তার জন্য কত সতর্কতা ও কমনীয়তারই না দরকার হয়। আমাদেরও এই রকমই সতর্কতার প্রয়োজন হয় প্রতি মুহূর্তে, কেননা আমাদের সংস্পর্শে ঘটছে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম ও অতি কমনীয় পদার্থের

সঙ্গে — বিকশমান জীবদেহের অভ্যন্তরীণ মননশীল পদার্থের সঙ্গে।

শিশু চিন্তা করে রূপমূর্তির সাহায্যে। তার মানে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শিক্ষকের মুখে জলবিন্দুর যাত্রা সম্পর্কে কাহিনী শুনতে শুনতে সে তার কল্পনায় এঁকে চলে ভোরের কুয়াসার রুপোলি ঢেউ, কালো মেঘ, বজ্রধ্বনি আর বসন্তকালীন বর্ষণের চিত্র। তার কল্পনায় এই ছবিগুলি যত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ততই গভীর ভাবে সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে প্রকৃতির নিয়ম। তার মস্তিষ্কের কোমল স্নায়ুগুলি এখনও দৃঢ় হয়ে ওঠে নি, সেগুলিকে বিকশিত করে তোলা দরকার, দৃঢ় করে তোলা দরকার।

শিশু চিন্তা করে। ...তার অর্থ এই যে শিশুর মস্তিষ্কের অর্ধগোলকে ত্বকের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ এক শ্রেণীর স্নায়ুমণ্ডলী আছে যা পারিপার্শ্বিক জগতের রূপ (চিত্র, বস্তু, ঘটনা, কথা) গ্রহণ করে এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্নায়ুকোষের মাধ্যমে সংকেত যায় — যেমন যায় সংযোগ-নালী দিয়ে। স্নায়ুতন্ত্রী এই সংবাদকে 'পরিমার্জন করে', প্রণালীবদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধ করে, অন্য তথ্যের পাশাপাশি রাখে, তুলনা করে; ইতিমধ্যে নতুন সংবাদ এসে পড়ে, তাকে বারবার হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, 'পরিমার্জন করতে হয়', নতুন রূপ গ্রহণ ও সংবাদ 'পরিমার্জনের' এই কাজের সঙ্গে যাতে এঁটে ওঠা যায় সেই উদ্দেশ্যে স্নায়ুমডলীর শক্তি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে চোখের পলকে রূপ গ্রহণ থেকে রূপ 'পরিমার্জনের' কাজে নামে।

স্নায়ুমণ্ডলীর এই আশ্চর্য দ্রুত কর্মান্তরণই হল সেই ঘটনা যাকে আমরা বলি চিন্তাশক্তি — বলি, **শিশু ভাবছে**। ...শিশুর

মস্তিষ্কের কোষকলা এত কোমল, উপলব্ধির বিষয় তার উপর এমনই সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যে কোষকলা একমাত্র তখনই স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে পারে যখন উপলব্ধির, ভাবনার বিষয় হয় এমনই রূপ যাকে দেখা যায়, শোনা যায়, যাকে স্পর্শ করা যায়। মননক্রিয়ার যা মূলকথা, অর্থাৎ ভাবনার কর্মান্তরণ, তা সম্ভব একমাত্র তখনই যখন শিশুর সামনে থাকে প্রত্যক্ষ, বাস্তব রূপ অথবা কথার মধ্য দিয়েই রূপসৃষ্টি এত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে যে শিশু যেন কাহিনীতে বিবৃত রূপ দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে, তাকে ছুঁতে পারছে (ঠিক এই কারণেই রূপকথা শিশুদের এত প্রিয়)।

শিশুমস্তিষ্কের প্রকৃতি এমনই যে তার দাবি হল শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি যেন মননের উৎসের কাছে শিক্ষা পায় — যেন শিক্ষা পায় প্রত্যক্ষ রূপের মাঝখানে, সর্বোপরি প্রকৃতির মাঝখানে, যাতে প্রত্যক্ষ রূপ থেকে সেই রূপসংক্রান্ত সংবাদ 'পরিমার্জনায়' চিন্তার কর্মান্তরণ ঘটতে পারে। শিশুকে যদি প্রকৃতি জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়, যদি শিক্ষার প্রথম দিন থেকে শিশু কেবল শব্দই গ্রহণ করে তবে কোষকলাগুলি দ্রুত শ্রান্ত হয়ে পড়ে, শিক্ষকের অভীষ্ট কাজের সঙ্গে সেগুলি এঁটে উঠতে পারে না। কিন্তু এই সব কোষকলাকে ত বিকশিত হতে হবে, দৃঢ় হয়ে উঠতে হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। এখানেই নিহিত আছে সেই ঘটনার কারণ, বহু শিক্ষক প্রায়শই প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন: শিশু হয়ত ক্লাসে চুপচাপ বসে আছে, শিক্ষকের চোখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছে, অথচ একটি কথাও বুঝতে পারছে না, কেননা শিক্ষক বিবরণ দিচ্ছেন

ত দিচ্ছেনই, কেননা নিয়মাবলী নিয়ে ভাবতে হবে, সমস্যা পূরণ করতে হবে, উদাহরণমালার মীমাংসা করতে হবে — এ সবই বিমূর্ত, সাধারণীকৃত, এখানে জীবন্ত রূপ নেই, মস্তিষ্ক শ্রান্ত হয়ে পড়ে। ...এখান থেকেই শুরু হয় পিছিয়ে পড়া। এই কারণেই শিশুর মননক্রিয়া বিকশিত করে তোলা উচিত, তার মননশক্তি দৃঢ় করে তোলা উচিত প্রকৃতির মধ্যে — শিশুর দেহযন্ত্র বিকাশের যে স্বাভাবিক নিয়ম আছে, এ হল তারই দাবি। এই কারণেই প্রকৃতির বুকে যে-কোন ভ্রমণ হল মননক্রিয়ার অনুশীলন, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের শিক্ষা।

আমরা টিলার ওপর বসে থাকি, আমাদের চারপাশে ফড়িংদের মিহি ঐকতান, বাতাসে স্তেপের ঘাসের সুবাস। আমরা চুপচাপ বসে থাকি। শিশুদের কাছে বেশি কথা বলার প্রয়োজন নেই, তাদের গল্প গেলানো উচিত নয়, কথার মধ্যে মজা নেই, আর কথা দিয়ে অরুচি ধরিয়ে দেওয়া বড়ই ক্ষতিকর। শিশুর কাজ হবে কেবল শিক্ষকের মুখের কথা শোনাই নয়, সেই সঙ্গে চুপ করে থাকাও; এই মুহূর্তে সে ভাবে, যে শুনল, যা দেখল তাই নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। শিক্ষকের পক্ষে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল কথনের মাত্রা রক্ষা করা।

শব্দ উপলব্ধির নিষ্ক্রিয় পাত্রে শিশুদের পরিণত করা উচিত নয়। প্রত্যক্ষ হোক আর মুখের কথারই হোক — যে-কোন উজ্জ্বল রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে অনেক সময় ও স্নায়ুর শক্তি প্রয়োজন। শিশুকে ভাবতে শেখানো — শিক্ষকের সূক্ষ্মতম গুণাবলীর একটি। আর প্রকৃতির মাঝখানে শিশুকে শোনার, দেখার ও অনুভব করার সুযোগ দিতে হবে।

আমরা কান পেতে ফড়িংদের ঐকতান শুনি। আমার আনন্দ

হয় এই ভেবে যে বাচ্চারা এই অপূর্ব সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়েছে। মাঠের সৌরভে আর অপূর্ব ধ্বনিপ্রবাহে ভরপুর এই শান্ত সন্ধ্যা তাদের স্মৃতিতে চিরকাল জাগরূক থাকুক। কোন সময় হয়ত তারা ফড়িং নিয়ে রূপকথা রচনা করবে।

এবারে শিশুদের ভাবমগ্ন দৃষ্টি সূর্যাস্তের দিকে নিবদ্ধ। সূর্য দিগন্তের আড়ালে চলে গেল, আকাশে ছড়িয়ে পড়ল গোধূলির কমনীয় রঙের ছটা।

'সুয্যি তাহলে বিশ্রাম নিতে চলে গেল,' লারিসা বলল, তার মুখ সঙ্গে সঙ্গে বিষণ্ণ হয়ে এলো।

'কামারেরা সুয্যিকে রুপোর মালা এনে দিল। ...আচ্ছা, কালকের সেই মালাটা ও কোথায় রাখে?' লিদা জিজ্ঞেস করল।

বাচ্চারা আমার দিকে তাকায়, অপেক্ষা করে রূপকথার বাকি অংশটা আমি কখন বলি, কিন্তু কোন রূপটা যে বেছে নেব আমি তা তখনও ঠিক করি নি। আমাকে সাহায্য করে ফেদিয়া।

'মালা আকাশে গলে মিলে গেল,' সে মৃদুস্বরে বলল।

উৎকণ্ঠিত নীরবতা, আমরা সকলেই অপেক্ষা করে থাকি ফেদিয়া কী বলে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বালক রূপকথার পরিশিষ্ট রচনা করেছে, তবে সে যে চুপ করে গেল তার কারণ হতে পারে শিশুসুলভ সঙ্কোচ। আমি ফেদিয়াকে সাহায্য করি:

'হ্যাঁ, মালা আকাশে গলে মিলে গেল। সারা দিন সুয্যির আগুনপারা বিনুনিতে থাকতে থাকতে মালা হয়ে যায় মোমের মতো নরম। সুয্যি তার গরম হাত দিয়ে মালা ছুঁল, অমনি মালা সোনালি ধারায় সন্ধ্যার আকাশ বয়ে গলগল করে ঝরে পড়ল। সুয্যি বিশ্রামে যেতে যেতে তার শেষ কিরণ দিয়ে ঐ ধারাকে জ্বলজ্বল করে তোলে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওখানে

গোলাপি রঙের খেলা চলছে, ধারা ঝকমকিয়ে উঠছে, কালো হয়ে আসছে — সূর্যি চলে যাচ্ছে দূরে আরও দূরে। এবারে সে গিয়ে ঢুকবে তার মায়াকাননে, সঙ্গে সঙ্গে আকাশে জ্বলে উঠবে তারার দল...'

'আচ্ছা এই তারাগুলো কী? ওরা জ্বলে কেন? কোথা থেকে আসে? দিনের বেলায় ওদের দেখা যায় না কেন?' বাচ্চারা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু অসংখ্য রূপ দিয়ে শিশুদের চৈতন্য আচ্ছন্ন করে দেওয়া ঠিক নয়। আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে, আমি শিশুদের মনোযোগ অন্য দিকে আকর্ষণ করি।

'স্তেপের দিকে তাকিয়ে দেখ। দেখতে পাচ্ছ, দুই পাহাড়ের মাঝখানের সমান জায়গায়, ঘাসে ঢাকা জমিতে আর নীচু জমিতে কী ভাবে আঁধার নেমে আসছে? আর তাকিয়ে দেখ ঐ টিলাগুলোর দিকে — ওরা যেন কেমন নরম নরম হয়ে গেছে, যেন সন্ধ্যার আঁধারে ভেসে চলেছে। টিলাগুলো হয়ে যাচ্ছে ছাইরঙা, ওদের গাগুলো নজর করে দেখ — ওখানে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ?'

'বন... ঝোপঝাড়... গোরুর পাল... ভেড়ার দল আর রাখাল। লোকে মাঠে রাত কাটানোর জন্যে থেকে যাচ্ছে, ধুনি জ্বালাল, কিন্তু ধুনির আগুন দেখা যাচ্ছে না, বাতাসে কেবল ধোঁয়া ভেসে চলেছে...' দ্রুত আঁধারে টিলাগুলি যখন ঢেকে যাচ্ছে তখন তা দেখে শিশুকল্পনা যে কী সৃষ্টি করে সে পরিচয় দিলাম। ছেলেমেয়েদের বাড়ি যেতে বলি, কিন্তু যেতে ওদের মন চায় না। ওরা বলে, আরেকটু বসি। এই সন্ধ্যার সময়টিতে বিশ্বচরাচর যখন রহস্যময় চাদরে ঢাকা পড়ে যায় তখন শিশুকল্পনা উদ্দাম হয়ে ওঠে। আমি কেবল ধরিয়ে দিলাম যে গোধূলির আলো-আঁধারি ও রাত্রের অন্ধকার যেন দূরের

উপত্যকা আর বন-জঙ্গল থেকে নদী হয়ে ভেসে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে শিশুকল্পনায় জন্ম নিল রূপকথার মূর্তি — অন্ধকার আর গোধূলির মূর্তি। সানিয়া এই দুটি 'জীব' সম্পর্কে রূপকথা বলে চলে: ওরা বাস করে বনের ওপারে, দূরের এক গুহার ভেতরে, দিনের বেলায় অন্ধকার গভীর খাদের ভেতরে নেমে যায়, ঘুমায় আর ঘুমের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে (কেন যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা একমাত্র রূপকথার কথকই জানে...)। আর সূয্যি যেই তার মায়াকাননে চলে যান অমনি তারা তাদের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে আসে। তাদের বড় বড় থাবাগুলো নরম পশমে ঢাকা, তাই তাদের পায়ের আওয়াজ কেউ শুনতে পায় না। গোধূলি আর অন্ধকার বড় ভালো, নিরীহ, আদুরে প্রাণী, ওরা কারও মনে আঘাত দেয় না।

গোধূলি আর অন্ধকার কী ভাবে ছোটদের ঘুম পাড়ায় ছেলেমেয়েরা তাই নিয়ে রূপকথা বানানোর জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। আমরা বাড়ির দিকে চলি, ছেলেমেয়েরা চায় কালও সন্ধ্যায় আসে, ভারিয়ার কথায়, তখন 'রূপকথা সুন্দর তৈরী হয়'।

ছেলেমেয়েরা কেন সাগ্রহে রূপকথা শোনে, কেন তারা এত পছন্দ করে সন্ধ্যার আলো-আঁধারি, যখন পরিবেশ নিজেই শিশুকল্পনার পাখা বিস্তারের উপযোগী? কেন রূপকথা অন্য যে-কোন মাধ্যমের তুলনায় প্রকাশ ও চিন্তার শক্তি বেশি পরিমাণে বিকশিত করে তোলে? কারণ এই যে রূপকথার মূর্তিগুলি উজ্জ্বল আবেগের রঙে রঞ্জিত। রূপকথার ভাষা শিশুচৈতন্যে থাকে। যে সব শব্দ কল্পজগতের চিত্র গড়ে তোলে, শিশু যখন সেগুলি শোনে বা উচ্চারণ করে তখন তার হৃদ্‌স্পন্দন যেন থেমে যায়। কেবল রূপকথা শোনাই নয়,

রূপকথা রচনা ছাড়াও স্কুলের শিক্ষা আমার ধারণায় আসে না। 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের প্রথম দুই মাসে ছোটরা যে-সমস্ত রূপকথা ও গল্প বানিয়েছে সেগুলি তুলে দিচ্ছি। এতে পাওয়া যাবে শিশুদের ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা আর দৃষ্টিভঙ্গির জগৎ।

খরগোশছানা (শুরা)

মা আমাকে মখমলের ছোট্ট একটা খরগোশছানা উপহার দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন নববর্ষের আগে আগে। আমি ওটাকে ফার গাছের ওপরে ডালপালার মাঝখানে বসিয়ে দিলাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। ফার গাছ এইটুকুন ছোট ছোট বাতি জ্বলছিল। দেখি কি খরগোশছানা ডাল থেকে লাফিয়ে নেমে ফার গাছের চারপাশে দৌড়ুচ্ছে। দৌড়ুল দৌড়ুল, তারপর আবার ফিরে গেল ফার গাছে।

সূর্যমুখী (কাতিয়া)

সুয্যি উঠল। পাখিরা জেগে উঠল, ভারুই পাখি আকাশে উঠল। সূর্যমুখীও জেগে উঠল। গা ঝাঁকানি দিল, পাপড়ি থেকে শিশির ঝেড়ে ফেলে দিল। সুয্যির দিকে ফিরে বলল: 'পেন্নাম হই, সুয্যিঠাকুর। অনেকক্ষণ তোমার আশায় ছিলাম। দেখছ, আমার হলুদ পাপড়িগুলো তোমার তাপের অভাবে নেতিয়ে পড়েছিল। এখন ওরা খাড়া হয়ে উঠেছে, ওদের আনন্দ হয়েছে। আমি গোল, আমার রং সোনালি — আমি তোমারই মতো গো সুয্যিঠাকুর।'

জমি চাষ (ইউরা)

কম্বাইন গম কেটে ফেলল। গর্ত থেকে সজারু বেরিয়ে এসে দেখে গম নেই, গমের শীষ সরসর আওয়াজ করছে না। সে শরীরটাকে দলা পাকিয়ে ফসল-কাটা মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলল। এদিকে সামনে গুড়ি মেরে আসছিল একটা বিশাল ভয়ঙ্কর জীব — ধাতুর তৈরি

পোকা। আওয়াজ করছে, ঘর্ঘর করছে। তার পেছনে হাল। পেছনে থেকে যাচ্ছে কালো চষা মাঠ। সজারু তার গর্তের ভেতরে বসে থাকে, তাকায় আর অবাক হয়ে যায়। ভাবে: 'এই বিরাট পোকাটা এলো কোত্থেকে?' এটা কিন্তু ট্র্যাক্টর।

লেনিনের দুটি ছবি (ভানিয়া)

আমার দিদি ওলিয়া অক্টোবর দলে ভর্তি হয়েছে। ওর আছে লাল তারা। আর তারার ওপর লেনিনের ছোট ছবি। এখন আমাদের কাছে আছে লেনিনের দুটো ছবি। একটা দেয়ালে, অন্যটা ওলিয়ার তারার ওপর। লেনিন মেহনতীদের সুখের জন্যে লড়েছেন। বাবা বলেন, লেনিন ইস্কুলে পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলেন। আমিও ভালো পড়াশুনা করব। আমি ছোটদের লেনিনবাহিনীতে ভর্তি হব।

ওক গাছের ফল (জিনা)

বাতাস বইল। ওক গাছ থেকে ফল খসে পড়ল। হলুদ, চকচকে— ঠিক যেন পেটানো তামায় তৈরি। পড়ল, আর পড়ে ভাবতে লাগল: 'ডালে কি ভালোই না ছিলাম, কিন্তু এখন আমি জমিতে। এখান থেকে না দেখতে পাওয়া যায় নদী, না বন।' ওর মন খারাপ হয়ে গেল। কাকুতি-মিনতি করে: 'ওক গাছ আমায় ডালে তুলে নাও।' ওক বলে, 'কী বোকা তুই। এই দ্যাখ, আমিও বড় হয়ে উঠেছি জমিতে। তাড়াতাড়ি শেকড় ছাড়, বড় হ। ইয়া উঁচু ওক গাছ হবি।'

প্রকৃতিতে যা যা ঘটে শিশুদের মন যে কেবল তাতেই আলোড়িত হয় তা নয়। শিশুরা চায়, দুনিয়ায় যেন শান্তি বিরাজ করে। তারা জানে যে এমন সব শক্তি আছে যারা যুদ্ধের মতলব আঁটছে। একটি রূপকথায় সাপের কল্পিত রূপের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে এই অশুভ শক্তি।

আমরা লোহার সাপকে হারিয়ে দিলাম (সেরিওজা)

সাগরপারে অনেক অনেক দূরে একটা জলা জায়গায় সে থাকত। আমাদের লোকজনকে সে ঘেন্না করত। অ্যাটম বোমা বানাল। অনেক অনেক বোমা তৈরি করল, সেগুলো পাখায় তুলে নিয়ে উড়ল। সে চেয়েছিল সূর্যের গায়ে ছুঁড়তে। তার ইচ্ছে ছিল সূর্যকে নিভিয়ে দেয়, যাতে আমরা অন্ধকারে মারা যাই। লোহার সাপকে ঘায়েল করার জন্যে আমি সোয়ালো পাখিদের পাঠালাম। পাখিরা ঠোঁটের ডগায় একেক কণা করে সূর্যের ফুলকি নিয়ে উড়তে উড়তে গিয়ে সাপের নাগাল ধরল। তার ডানায় আগুন ছুঁড়ে দিল। লোহার সাপ জলাতে পড়ল, বোমার সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে গেল। সূয্যি দিব্যি খেলা করছে। আর সোয়ালো ফুর্তিতে কিচিরমিচির করছে, ওদের আনন্দ হয়েছে।

এই রূপকথায় শিশুর বিশ্বদৃষ্টির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। পশু ও পাখির অংশগ্রহণ ছাড়া অশুভশক্তির বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধির জয়ের ধারণাই শিশু করতে পারে না। শিশুদের আদরের ধন এই খরগোশছানা আর সোয়ালো পাখিরা — এরা নিছক রূপকথার প্রাণী নয়। এরা হল কল্যাণের প্রতিমূর্তি।

প্রতিদিন পারিপার্শ্বিক জগতে নতুন নতুন জিনিসের সন্ধান নিয়ে আসে। প্রতিটি আবিষ্কারের পরিধান হয় রূপকথা, আর সেই সব রূপকথার স্রষ্টা — শিশুরা। রূপকথার ভাবমূর্তি শিশুদের জন্মভূমির সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে। রূপকথার কল্যাণে, কল্পনা আর সৃষ্টির কল্যাণে জন্মস্থানের যে সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয় তা মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসার উৎসস্বরূপ। মাতৃভূমির মহিমা ও পরাক্রম সম্পর্কে বোধ ও অনুভূতি মানবমনে ধীরে ধীরে দেখা দেয় আর নিজস্ব উৎসের বলেই তার সৌন্দর্য। যে সব তরুণ শিক্ষাব্রতী ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিচ্ছেন তাঁদের একটি পরামর্শ দিতে চাই:

আপনারা যখন জন্মভূমির — সোভিয়েত ইউনিয়নের মহিমা ও পরাক্রম সম্পর্কে আপনাদের প্রথম কথা উচ্চারণ করবেন তখন ভেবেচিন্তে, বিচারবিবেচনা করে সেই মুহূর্তটির জন্য শিশুকে তৈরি করে নেবেন। মুখের কথাকে মহৎ অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হতে হবে, সঞ্জীবিত হতে হবে (লোকের কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে ঠেকুক, আপনার অনুভূতি যদি নির্মল ও সমুন্নত হয় তাহলে এর জন্য ভয় পাবেন না)। কিন্তু আপনার মুখের এই কথা যাতে শিশু হৃদয়ে মুহূর্তের মধ্যে স্পন্দন তুলতে পারে তার জন্য — অলঙ্কারের ভাষায় বলতে গেলে — শিশুচৈতন্যের ক্ষেত্র সযত্নে কর্ষণ করে তাতে সৌন্দর্যের বীজ বপন করা অবশ্যকর্তব্য।

শিশু যেন সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে, তাতে পুলকিত হতে পারে, যে রূপে মাতৃভূমি মূর্ত হয়ে ওঠে তা যেন চিরকালের মতো তার হৃদয়ে, তার স্মৃতিতে থেকে যায়। সৌন্দর্য হল মনুষ্যত্বের, মানুষের সৎ অনুভূতির, হৃদয়ের সম্পর্কের মূলকথা। আমার আনন্দ হয় তোলিয়া, স্লাভা, কোলিয়া, ভিতিয়া ও সাশার কঠোর হৃদয় ধীরে ধীরে কোমল হয়ে আসতে দেখে। আমার ধারণা হল সৌন্দর্যের সামনে বিস্ময়বোধ, হর্ষাবেশ, হাসি যেন শিশুহৃদয়ে প্রবেশের পথ।

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের জীবনে সময়ের কোন কড়াকড়ি বাঁধন ছিল না। ছেলেমেয়েরা কতক্ষণ মুক্তাঙ্গনে থাকবে তার ঠিক ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা — শিশুদের যেন একঘেয়ে না লাগে, যেন শিশুমন বিষণ্ণ হয়ে সেই মুহূর্তটির অপেক্ষা না করে যখন শিক্ষক বলবেন: 'এবারে বাড়ি যাও!' পর্যবেক্ষণের বিষয়ের প্রতি, যে কাজে শিশুরা ব্যস্ত তার প্রতি শিশুদের

আগ্রহ যখন তীব্র হয়ে ওঠে, আমি চেষ্টা করতাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের স্কুলের কাজ শেষ করার। ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহ নিয়ে আগামীকালের প্রতীক্ষায় থাকুক, আগামীকাল তাদের জন্য নতুন নতুন আনন্দের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনুক, সূর্য যে রুপোলি ফুলকি মাটিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে রাতে তারা তার স্বপ্ন দেখুক। শিশুরা একদিন মুক্তাঙ্গন বিদ্যালয়ে থাকে ১ থেকে দেড় ঘণ্টা, অন্য দিন হয়ত ৪ ঘণ্টা — সবই নির্ভর করে শিক্ষক আজ ছেলেমেয়েদের কতটা আনন্দ দিতে পারলেন তার ওপর। আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল এই যে প্রতিটি শিশু যেন আনন্দ উপযোগ করা ছাড়াও আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে, শিক্ষার্থিদলের জীবনে রাখতে পারে নিজের সৃষ্টির অন্তত এক কণা অবদান।

সে বছর শরৎকালে দীর্ঘদিন ঈষদুষ্ণ, শুকনো আবহাওয়া ছিল, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গাছের পাতা হলদেটে হয় নি, কয়েকবার বজ্রধ্বনি হয়, মনে হচ্ছিল যেন গরমকাল ফিরে আসছে, সকালে ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু চকচক করত। ফলে আমাদের কাজের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠল। কয়েক বার আমরা 'আমাদের' টিলায় আসি, মেঘের রাজ্যে 'ভ্রমণ করি'। এই ঘণ্টাগুলি শিশুদের মনে অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যায়। সাদা সাদা, ফুঁয়োফুঁয়ো মেঘখণ্ড তাদের কাছে ছিল আশ্চর্য আবিষ্কারের জগৎ। মেঘের খেয়ালী, দ্রুত পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে ছেলেমেয়েরা দেখতে পায় জন্তুজানোয়ার আর রূপকথার দৈত্য-দানবদের। শিশুকল্পনা দ্রুত পক্ষবিস্তরী পাখির মতো উড়ে চলে মেঘের ওপারের দূর দেশে, নীল সমুদ্র আর বনের ওপারে, দূরের অজানা দেশে

দেশে। আর এই পাখা মেলার মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উদ্ঘাটিত হতে থাকে শিশুর ব্যক্তিগত জগৎ। আকাশে খেয়ালী মেঘখণ্ড ভেসে চলেছে।

'তোমরা কী দেখছ এর ভেতরে?'

'টোকা-মাথায় এক বুড়ো রাখাল লাঠিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,' ভারিয়া বলল। 'ঐ যে দেখুন, ওর পাশে ভেড়ার পাল। সামনে খাড়া শিংওয়ালা ভেড়া, তার পেছনে ভেড়ার বাচ্চা। ...আর বুড়োর সঙ্গে ঝুলছে একটা থলি, থলি থেকে কী যেন বেরিয়ে আছে।'

'এটা বুড়ো নয়,' আপত্তি করে বলল পাভ্লো। এ হল বরফ-বুড়ি, যেমন মূর্তি আমরা বরফ দিয়ে গড়ি শীতকালে। দেখুন, দেখুন, ওর হাতে ঝাঁটা। আর মাথায় মোটেই টোকা নয়, বালতি।'

'না, এটা বরফ-বুড়ি নয়, খড়ের গাদা,' ইউরা বলল। 'গাদার ওপর খড় তোলার লাঠি হাতে দুই রাখাল। দেখুন, নীচে খড় ফেলছে আর ওখানে গাড়ি। ভেড়া আবার কোথায়? ভেড়া নয়, গাড়ি। আর ওটা হল জোয়াল, শিং নয়।'

'এ হল একটা মস্ত বড় খরগোশ। আমি স্বপ্নে ও রকম খরগোশ দেখেছি। আর নীচে মোটেই গাড়ি নয়, খরগোশের লেজ।'

আমার ইচ্ছে, সকলেই যেন কল্পনা করে, কিন্তু কোলিয়া, স্লাভা, তোলিয়া, মিশা কেন যেন চুপ করে থাকে। বয়স্করা, যারা শিশুদের আমোদপ্রমোদে মাতামাতি করাকে নিজেদের মর্যাদাহানিকর বলে মনে করে, তাদের মুখে যেমন কৃপাসূচক তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে ওঠে, কোলিয়ার মুখেও তা লক্ষ্য করে বেদনায় আমার হৃদয়টা কুঁকড়ে গেল। কী ব্যাপার? এর আগে

ত আমি সৌন্দর্যে মুগ্ধতার ছটা ওর চোখে দেখেছি!.. তখনও আমি এই নিয়ে তেমন একটা ভাবি নি, কিন্তু আমার উপলব্ধি বলল: যতক্ষণ না শিশুকে শিশুসুলভ আনন্দে আগ্রহী করে তোলা যাচ্ছে, যতক্ষণ না তার চোখে অকৃত্রিম পুলক জেগে উঠছে, যতক্ষণ না বালক শিশুসুলভ চাপল্যে আগ্রহ বোধ করছে ততক্ষণ তার ওপর শিক্ষামূলক প্রভাবের কোন কথা বলার অধিকার আমার নেই। শিশুকে হতে হবে শিশুসুলভ।

...রূপকথা শুনতে শুনতে শুভ ও অশুভের সংগ্রামের উপলব্ধি যদি তার না ঘটে, যদি খুশির ঝলকের পরিবর্তে তার চোখেমুখে ফুটে ওঠে অবজ্ঞার ভাব তাহলে বুঝতে হবে শিশুমনের কোথাও কোন ভাঙ্গন ধরেছে, তখন শিশুমনকে সংশোধন করতে গেলে প্রভূত শক্তি প্রয়োগ করা দরকার।

এই ত দিগন্তে দেখা দিল অপরূপ মেঘের রেখা, দেখতে উঁচু উঁচু দেয়াল আর চৌকিমিনারে ঘেরা অপরূপ প্রাসাদের মতো। শিশুকল্পনা প্রাসাদের অস্পষ্ট দেহরেখাকে পূর্ণ অবয়ব দান করে, ইউরা ইতিমধ্যে বলে চলেছে মায়ারাজ্যের রূপকথা। তিন ভুবনের পারে সেই রাজ্য। সে বলে দুষ্ট ডাইনী বুড়ি বাবা-ইয়াগার কথা আর যে মহাবীর সুন্দরীকে বাঁচায় তার কথা। এদিকে ভিতিয়ার কল্পনায় গড়ে ওঠে আরেক রূপকথা। আমাদের দেশের সীমানার ওপারে, পাহাড়-পর্বতের মাঝখানে কোথায় যেন থাকে এক ভয়ংকর জীব, সে যুদ্ধের মতলব আঁটে। কল্পনার পাখা বালককে নিয়ে যায় উড়ো-জাহাজে চাপিয়ে, সে জাহাজ মুহূর্তের মধ্যে পেঁছুতে পারে সেই গুহার ওপরে, যেখানে বাস করে ঐ অশুভ শক্তি, ধ্বংস করতে পারে অকল্যাণকে, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারে চিরশান্তি।

তারপর আমি বিবরণ দিই দূর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের, বলি চিরগ্রীষ্ম আর অপরূপ নক্ষত্রপুঞ্জের কথা, আসমানী রঙা সমুদ্র আর তন্বী তমাল-তালের কথা। এখানে বাস্তবের সঙ্গে রূপকথা বিজড়িত হয়ে যায়, আমি দূর জগতের বাতায়ন যেন সামান্য খুলে দিই। আমি বিবরণ দিই পৃথিবী ও নানা জাতির, সাগর ও সহাসাগরের, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগতের, প্রাকৃতিক ঘটনার।

বলতে শুরু করি সেই জগতের কথা যেখানে মানুষ মানুষকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। মেহনতীদের, বিশেষত শিশুদের দুঃখদুর্দশায় স্পষ্ট ছবি থেকে শিশুচৈতন্য আলোড়িত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে জগতে শুভ ও অশুভের নিদারুণ সংগ্রাম চলছে, আর আমাদের জনগণ হল মানুষের সুখ, সম্মান ও মুক্তির সংগ্রামী। আমি চেষ্টা করি যাতে আমার প্রতিটি পালিত সন্তান ছোট বয়স থেকে সামাজিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে — মানুষে মানুষে শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন মনোভাব পোষণ করে, যাতে আমাদের দেশ বিশ্বের প্রথম মুক্ত-শ্রমের দেশ হিশেবে তার অপরিসীম অনুরাগ অর্জন করে। আমার কাছে শিক্ষাক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির একটি হল এই যে শিশুচৈতন্যে অকল্যাণ কোন বিমূর্ত শক্তি না হয়ে যেন দুনিয়ার সমস্ত সৎ মানুষের অনিষ্টকর বাস্তব শক্তি হয়ে দেখা দেয়। আমি শিশুদের বলতাম সেই সব দেশের কথা যেখানে সম্পদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি ও জমিদারদের কুক্ষিগত, যেখানে মেহনতী মানুষ ন্যূনতম প্রয়োজনের সামগ্রী থেকে বঞ্চিত। 'সাম্রাজ্যবাদ' নামে বিমূর্ত ধারণা যাতে শিশুরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তার জন্য আমার কোন ব্যস্ততা ছিল না। সময় হলেই তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। যে বয়সের কথা আমি বলছি

সেখানে সুস্পষ্ট উপস্থাপনা ও সেই উপস্থাপনার হৃদয়গ্রাহী বর্ণিমা চূড়ান্ত তাৎপর্য বহন করে।

শিশুদের সমস্ত আনন্দ-বেদনার ভাগীদার হয়ে শিক্ষক যে বিবরণ দেন তা হয় শিশুর পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্ত, তার সমৃদ্ধ অন্তর্জীবন বিকাশের অপরিহার্য শর্ত। এই সব বিবরণের শিক্ষামূলক তাৎপর্য এখানেই যে শিশুরা তা শোনে এমন পরিবেশে যখন জন্ম নেয় রূপকথার কল্পমূর্তি: শান্ত সন্ধ্যায়, যখন আকাশে জ্বলে ওঠে প্রথম তারাদল; বনের মাঝখানে, ক্যাম্পফায়ারের সামনে, আরামদায়ক কুটিরে, উনুনের ধিকিধিকি কয়লার আঁচে, যখন জানলার বাইরে ঝরঝর ধারে ঝরছে শরতের বারিধারা, বিষণ্ণ সুর তুলেছে ঠাণ্ডা বাতাস। বিবরণ হওয়া চাই উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য, নাতিদীর্ঘ, অসংখ্য তথ্য চাপিয়ে দেওয়া, রাজ্যের ধারণা শিশুদের মনে পুরে দেওয়া ঠিক নয় — তাতে বিবরণের সংবেদনশীলতা ভোঁতা হয়ে যায়, তখন আর কিছুতেই শিশুর উৎসাহ জাগিয়ে তোলা যায় না।

শিক্ষাদাতাদের কাছে আমার পরামর্শ হল এই: শিশুদের অনুভূতি, বোধশক্তি ও কল্পনাশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করুন, অসীম জগতের বাতায়ন **ধীরে ধীরে** উন্মুক্ত করুন, তাকে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ খুলে দেবেন না, এমন প্রশস্ত দ্বারে পরিণত করবেন না যার ভেতর দিয়ে আমাদের ইচ্ছার অজ্ঞাতে, বিবৃত বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে শিশুরা ধাবিত হবে — গড়িয়ে পড়বে গোলকের মতো। ...তারা প্রথমে বহুসংখ্যক বস্তুর সামনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; এগুলি বস্তুত তখনও তাদের অজানাই থেকে গিয়ে অতঃপর পরিণত হয় তাদের অভ্যস্ত বস্তুতে, শূন্যগর্ভ শব্দে — এর বেশি কিছু নয়।

মুক্তাঙ্গন-বিদ্যালয় আমাকে শেখায় কী ভাবে শিশুদের

সামনে পারিপার্শ্বিক জগতের বাতায়ন খুলতে হয়, আর জীবনের এই শিক্ষা ও জ্ঞান আমি সকল শিক্ষকের কাছে পেঁীছে দিতে চেষ্টা করি। আমি তাঁদের পরামর্শ দিই, শিশুদের ওপর অজস্র ধারায় জ্ঞান বর্ষণ করবেন না, পাঠের সময় অধ্যয়নের বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনারা যা যা জানেন তার সমস্তটা বলার চেষ্টা করবেন না — অজস্র জ্ঞানের চাপে পড়ে অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শিশুর সামনে পারিপার্শ্বিক জগতের কোন একটি মাত্র বিষয় উদ্‌ঘাটন করতে জানা চাই, তবে এমন ভাবে উদ্‌ঘাটন করবেন যাতে শিশুদের সামনে জীবনের একটি খণ্ডাংশ রামধনুর সাতরঙে রঙিন হয়ে দেখা দেয়। শিশু যা জানতে পারল সেই বিষয়ে যাতে বারবার ফিরে আসার ইচ্ছে তার হয় সেই জন্য সবসময় বিবরণ খানিকটা অসম্পূর্ণ রেখে দিন।

মানুষের চিন্তাজগতের সাফল্যের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ অসংখ্য বই রচনা করেছে। কোন একটা বইয়ের সৌন্দর্য, জ্ঞানগর্ভতা, চিন্তার গভীরতা শিশুদের সামনে তুলে ধরুন, কিন্তু এমন ভাবে তুলে ধরুন যাতে প্রতিটি শিশু পড়তে ভালোবাসে, যাতে প্রতিটি শিশু কারও সাহায্য ছাড়াই গ্রন্থ-সমুদ্রে সাঁতার দিতে প্রস্তুত থাকে। শিশুরা পারিপার্শ্বিক জগতের যে-সমস্ত বিষয় ও ঘটনা স্বচক্ষে দেখে সে সম্পর্কে তাদের উজ্জ্বল, সংক্ষিপ্ত, আবেগপূর্ণ বিবরণকে আমি সবসময় **প্রাণোচ্ছল বাণীর উৎস সন্ধানে 'পর্যটন'** আখ্যা দিতাম। এই 'পর্যটন' সম্পর্কে আমার নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ভাগ আমি শিক্ষকদের দিতাম। প্রাথমিক শ্রেণীতে যে-সমস্ত শিক্ষক পড়ান তারা আমার দৃষ্টান্তে এই একই ধরনের **'পর্যটনে'** নামলেন। ক্লাসঘরের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হল, ছেলেমেয়েরা সবুজ

ঘাসের ওপর, নির্মল বাতাসে বেরিয়ে আসতে লাগল। গ্রন্থপাঠ ও পাটীগণিতের ক্লাসগুলি, বিশেষত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায়ই চলতে লাগল নীল আকাশের নীচে। তার মানে বিদ্যাভ্যাস প্রত্যাখ্যান নয়, নিসর্গ জগতে গ্রন্থ ও বিজ্ঞানের বর্জন নয়। বরং তার বিপরীত — এবং ফলে বিদ্যাচর্চা ঐশ্বর্যমণ্ডিত হল, গ্রন্থ ও বিজ্ঞান জীবন্ত হয়ে উঠল।

প্রায়ই ক্লাসের পর প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে শিক্ষাদানরত সব শিক্ষক টিচার্স-রুমে জমায়েত হতেন; পারিপার্শ্বিক জগতের জ্ঞান, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন শিশুর কাছে যাতে একঘেয়ে, নীরস ব্যাপারে পরিণত না হয় তার জন্য কী করা যায় এই নিয়ে তাঁরা পরামর্শ করতেন। এই যৌথ সৃজনী প্রয়াসের ফলে জন্ম নিল এক নতুন চিন্তা — শিশুকে কৃষিশ্রম প্রযুক্তির জ্ঞানদান, ধীরে ধীরে আদর্শ ব্যক্তিদের কাজের পরিচয়দান। প্রাণোচ্ছল বাণীর উৎস সন্ধানে নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের 'পর্যটন' পরিকল্পনা কালে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে কর্মরত শিক্ষকেরা আমার পরামর্শক্রমে যে যে ধরনের কৃষিশ্রম বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালে, শরৎকালে ও শীতকালে ভাবনাচিন্তা ও বাচনক্রিয়া বিকাশের পক্ষে ব্যবহারের সবচেয়ে উপযোগী সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পরিধি নির্ধারণ করলেন।

আমাদের 'স্বপ্নপুরী'

স্কুল থেকে কিছু দূরে, গ্রামের বাইরে — গাছপালা ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা বিরাট একটা খাত। ছোটদের কাছে এটা হল গভীর বন, রহস্য আর অজানায় পরিপূর্ণ। একদিন আমি খাতের গায়ে গুহার প্রবেশ-মুখ লক্ষ্য করলাম। দেখা গেল

গুহার ভেতরটা প্রশস্ত, তার দেয়ালগুলো খটখটে মজবুত। আরে এ যে রীতিমতো রত্নভাণ্ডার দেখছি! এটাই হবে আমাদের 'স্বপ্নপুরী'। আমি যখন ছেলেমেয়েদের প্রথম গুহায় নিয়ে এলাম তখন ওদের আনন্দ দেখে কে! বাচ্চারা কলরব করে উঠল, গান গাইল, একে অন্যকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করল, লুকোচুরি খেলল। ঐ দিন আমরা মেঝেয় শুকনো ঘাস বিছালাম।

প্রথমে আমরা স্রেফ এই রহস্যময় রাজ্যকে উপভোগ করতে লাগলাম, তাকে বসবাসের উপযোগী করলাম, আরামপ্রদ করে তুললাম: দেয়ালে গোটা কয়েক ছবি আঁটলাম, প্রবেশপথ বড় করলাম, একটা ছোট টেবিল বানালাম। সময় সময় যাতে উনুন জ্বালানো যায় সেই উদ্দেশ্যে একটা উনুন বানানোর প্রস্তাবে বাচ্চারা সানন্দে সায় দিল।

আমরা চুল্লির জন্য গভীর গর্ত খুঁড়লাম, চিমনির জন্য একটা ছিদ্র করলাম। বাড়তি মাটি, কাদামাটি ও ইট বয়ে আনলাম। সোজা পরিশ্রমের কাজ নয়, কিন্তু আমাদের মনে মনে স্বপ্ন ছিল — চুল্লি হবে। দু'সপ্তাহ লাগল আমাদের ওটা বানাতে। সকলেই কাজে ডুবে গেল; আমাদের দলের কাজের প্রতি যাদের ঔদাসীন্য আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেই কোলিয়া, স্লাভা ও তোলিয়া — এরা পর্যন্ত দূরে সরে থাকতে পারল না। এখন তাদের চোখ উৎসাহে ঘন ঘন ঝকঝক করতে লাগল, কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় কিছুতেই আর ভাটা পড়ে না। সাশা, ল্যুদা ও ভালিয়ার মতো যারা লাজুক, ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত স্বাভাবের — তারাও এই আকর্ষণীয় কাজে উৎসাহ বোধ করল। আমার আরও বেশি করে দৃঢ় প্রত্যয় হল যে দলের আবেগ-উদ্দীপনাময়

অবস্থা — আনন্দ ও প্রেরণাদীপ্ত অবস্থা হল এক বিপুল মানসিক শক্তি, যা শিশুদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে, দলের সকলে যে কাজ করে তার প্রতি উদাসীনদের মনে উৎসাহ জাগায়।

অবশেষে আমরা চুল্লিতে আগুন ধরালাম। শুকনো ডালপালা দিব্যি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ধরণীর বুকে সন্ধ্যা নেমে আসে। আমাদের এই আশ্রয়টা আলোকিত, আরামের। খাতের ঢাল গাছপালা ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা, আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকি; ওখান থেকে, রহস্যময় নিবিড় অরণ্য থেকে আমাদের সামনে দেখা দেয় রূপকথার কল্পমূর্তিরা। ওরা যেন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমাদের অনুরোধ করে: আমাদের কথা বল। গাছপালা ও ঝোপঝাড় গোধূলির ঈষৎ স্বচ্ছ ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়, সে ধোঁয়ার রং নীলাভ, তারপর তা হয়ে যায় বেগনি। এই ধোঁয়ার মধ্যে গাছপালার দেহরেখাগুলি যে রূপে ধরা দেয় তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

এই ধরনের মুহূর্তে শিশুরা সোৎসাহে কল্পনার জাল বোনে, রূপকথা বানায়।

‘খাতের ঢালে ছড়ানো ছিটানো গাছগুলো দেখতে কিসের মতো বল ত?’ আমি প্রশ্ন করি — শিশুদের উদ্দেশে ততটা নয়, যতটা আমার নিজের ভাবনার উদ্দেশে। আমার মনে হয় ওরা যেন শ্যামল জলপ্রপাত — প্রবল বেগে খাত থেকে নীচে ঝরে পড়তে পড়তে এখন জমে গেছে, পরিণত হয়েছে মরকতের কিংবা আগ্নেয় শিলার বিশাল মূর্তিতে। আচ্ছা, আমি যে ভাবে ভাবছি ছেলেমেয়েদের অন্তত একজনের চিন্তাও কি সেই ধারায় বিকাশ পাবে? সন্ধ্যার এই মুহূর্তটিই হল সেই সময় যখন শিশুদের ভাবনাচিন্তার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

আমি লক্ষ্য করি একটি শিশুর চিন্তাভাবনার স্রোত বয়ে চলে দ্রুত, উদ্দাম গতিতে, জন্ম দেয় নব নব রূপের, আরেকজনের চিন্তাভাবনা হয়ত বয়ে চলছে জলভারে পরিপূর্ণ প্রশস্ত নদীর মতো; সে নদী বিশাল, তার গভীরতা রহস্যময়, কিন্তু গতি তার মন্থর। এমন কি স্রোত আছে কি নেই লক্ষ্যই করা যায় না, কিন্তু সে নদী প্রবল, অদম্য, নতুন গর্ভে তার মুখ ফেরানো যায় না; অথচ অন্য ছেলেমেয়েদের ভাবনার দ্রুত, স্বচ্ছন্দ ক্ষিপ্র প্রবাহকে যেন বাধা দেওয়া যায় আর বাধা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা ধাবিত হবে নতুন খাতে। শুরা গাছপালার মাথায় দেখতে পেল গোরুর পাল, কিন্তু যেই সেরিওজা জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তাহলে চরে কোথায়? ওখানে ত আর ঘাস নেই!' — অমনি শুরার ভাবনা বয়ে চলল নতুন খাতে: তখন আর গোরু নয়, ওগুলো হল মেঘ — মেঘের দল রাতে বিশ্রাম করার জন্য মাটিতে নেমে এসেছে। ইউরার চিন্তাও ঠিক এই রকমই তাড়াতাড়ি উড়ে যায়। এদিকে মিশা ও নিনা চুপচাপ, একাগ্র মনে তাকিয়ে আছে — কী দেখছে ওরা? ইতিমধ্যে শিশুকল্পনার দৌলতে বেশ কিছু রূপ আমাদের চোখের ওপর দিয়ে ভেসে গেল, অথচ মিশা ও নিনার মুখে কোন কথা নেই। স্লাভাও চুপ করে থাকে। ওদের মাথায় কি সত্যি সত্যিই একটি ভাবনাও খেলল না? বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে এলো। এমন সময় সব ছেলেদের মধ্যে যে সবচেয়ে স্বল্পবাক সেই মিশা বলে উঠল:

'এটা হল এক ক্ষ্যাপা ষাঁড়, শিং বাগিয়ে পাহাড়ের পাথরের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু ওটাকে পেরিয়ে যেতে না পেরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঐ দেখ, ষাঁড়টা এখন যেন ফুঁসে উঠছে, এখুনি খাতটাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে।'

যত মূর্তি আমাদের সামনে ভিড় করে এসেছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সব যেন উধাও হয়ে গেল। আমরা দেখতে পেলাম গাছের দঙ্গলের সঙ্গে যেন সত্যি সত্যিই অক্ষমতাজনিত ক্রোধে থমকে যাওয়া ষাঁড়ের আশ্চর্য রকমের মিল আছে। ছেলেমেয়েরা কলরব করে ওঠে: ঐ যে ষাঁড়টা খাতের তলে কী রকম শক্ত করে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখ, দেখ, ওর কাঁধটা কেমন বেঁকে গেছে — শিরাগুলো বোধহয় কাঁপছে, আর শিং মাটিতে বসিয়ে দিয়েছে।

ওঃ, ভেবে বার কারছে বটে মিশা! আমাদের মাথার ওপর যখন উজ্জ্বল, জীবন্ত মূর্তি একের পর এক আন্দোলিত হচ্ছিল তখন তার ভাবনার প্রবাহ বয়ে চলছিল নিজস্ব খাতে। সে মনোযোগ দিয়ে বন্ধুদের কথা শুনছিল, কিন্তু একটি রূপও তার মনে ধরে নি। বালকের কল্পনা অত্যুজ্জ্বল, সম্পূর্ণ পার্থিব। শিশু হয়ত জীবনে যা দেখেছে, যা তার চৈতন্যে ছাপ ফেলেছে তারই সাক্ষাৎ পেয়েছে। অথচ ভাবনাচিন্তায় মন্থরগতি এমন স্বল্পভাষীরা ক্লাসে কী অসুবিধায়ই না পড়ে! শিক্ষক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছ থেকে উত্তর পেতে চান, শিশু কী ভাবে কিন্তা করে তা ভাবার অবকাশ তাঁর নেই — চটপট উত্তর দিলেই — নম্বর। মন্থরগতি অথচ বিশাল যে নদী তার প্রবাহ দ্রুত করা যায় না — এ খেয়াল শিক্ষকের আদৌ নেই। সে প্রবাহ তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বয়ে চলুক না কেন, তার জল নির্দিষ্ট স্থানে ঠিকই পৌঁছুবে, কিন্তু তাড়া দিয়ে কোন লাভ নেই, সেই বিশাল নদীকে নম্বরের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে কাজ নেই — কোন লাভ হবে না।

...জন্ম থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত — মানবদেহ বিকাশের পর্ব অন্যান্য জীবের দেহ বিকাশের তুলনায় সর্বাপেক্ষা

দীর্ঘকালীন। এই তথ্য নিয়ে প্রতিটি শিক্ষক ভাবেন কি? ২০ বছর বয়স পর্যন্ত, এমন কি তারও বেশি সময় মানবদেহের বৃদ্ধি, বিকাশ ও দৃঢ়তাপ্রাপ্তি ঘটে। মানবদেহ বিকাশপর্বের দীর্ঘস্থায়িত্বের মধ্যে নিহিত আছে প্রকৃতির বিপুল রহস্য। প্রকৃতি নিজেই যেন স্নায়ুব্যবস্থার — মস্তিষ্কের অর্ধগোলকস্থিত ত্বকের — বিকাশ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠার জন্য, তার কার্যকলাপ অনুশীলনের জন্য এই পর্বটিকে স্থির করে দিয়েছে। মানুষ এই কারণেই মানুষ হয়ে ওঠে যে সুদীর্ঘকাল ধরে তাকে **স্নায়ুব্যবস্থার শৈশব পর্বের** মধ্য দিয়ে, **মস্তিষ্কের শৈশব অবস্থার** মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

শিশু কোটি কোটি কোষকলা নিয়ে জগতে আবির্ভূত হয়। ঐ সমস্ত কোষকলা পরিবেশের আবেদনে সূক্ষ্ম ভাবে সাড়া দেয় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনায় কার্যপ্রণালী পূরণেও সক্ষম। এই কোষকলাগুলি তার চৈতন্যের বস্তুগত ভিত্তি রচনা করে। জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্তির সময় পর্যন্ত, বয়ঃপ্রাপ্তি থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রকৃতি একটিও নতুন কোষকলা যোগ করে না। স্নায়ুব্যবস্থার শৈশব পর্বে চিন্তাশীল পদার্থের কোষকলাগুলিকে দৈনন্দিন সক্রিয় কার্যকলাপ অনুশীলন করতে হবে আর এই অনুশীলনের বনিয়াদ হল গ্রহণক্ষমতা, পর্যবেক্ষণ, অনুধ্যান।

পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, তার মর্মমূলে প্রবেশের শিক্ষালাভের আগে শৈশবে মননচর্চার পর্ব অতিক্রম করতে হবে। এই চর্চার অর্থ হল বস্তু ও ঘটনার কল্পমূর্তি গঠন; শিশু জীবন্ত রূপ দেখে, অতঃপর কল্পনা করে, নিজের কল্পনায় তার রূপ গড়ে তোলে। বাস্তব বিষয় দর্শন এবং মনে মনে কল্পমূর্তি গঠন —

ভাবক্রিয়ার এই দুই পর্যায়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। রূপকথার কল্পমূর্তি শিশুরা উপলব্ধি করছে, হৃদয়ঙ্গম করছে, তারা নিজেরাই তাকে আবার গড়ে তুলছে উজ্জ্বল বাস্তবতা-রূপে। কল্পমূর্তি গঠন—এ হল এমন এক সুপ্রশস্ত ভূমি যার উপর বিকশিত হয়ে ওঠে ভাবনার পর্যাপ্ত মুকুল।

ভাবনার শৈশব পর্বে মাননক্রিয়াকে পারিপার্শ্বিক জগতের জীবন্ত, উজ্জ্বল, প্রত্যক্ষ বিষয়ের সঙ্গে যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। গোড়ায় কার্যকারণ-সম্পর্ক নিয়ে শিশুর ভাবার দরকার নেই, সে কেবল জিনিসটাকে ভালো ভাবে দেখুক, তার ভেতরে নতুন কিছু আবিষ্কার করুক। গোধূলির আলো-আঁধারিতে বিজড়িত গাছপালার মধ্যে ক্ষিপ্ত ষাঁড়কে দেখতে পেল। এটা নিছক শিশুকল্পনার খেলা নয়, ভাবনার শৈল্পিক উপাদান, কাব্যিক উপাদানও বটে। আরেকটি শিশু সেই একই গাছপালার মধ্যে দেখতে পায় নিজস্ব ধরনের, অন্য একটা কিছু — সে সেই রূপের উপর আরোপ করে উপলব্ধি, কল্পনা ও চিন্তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি শিশু কেবল উপলব্ধিই করে না, আঁকে, রচনা করে, সৃষ্টি করে। শিশুর বিশ্বদর্শন — স্বকীয় শিল্পকর্ম। শিশুর উপলব্ধ, সেই সঙ্গে তার সৃষ্ট রূপ — উজ্জ্বল আবেগের বর্ণসুষমায় মণ্ডিত। পারিপার্শ্বিক জগতের রূপ উপলব্ধির সময় এবং তার সঙ্গে কল্পিত কিছু যোগ করার সময় শিশুরা পরম আনন্দ উপভোগ করে। উপলব্ধির আবেগময় পরিতৃপ্তি হল শিশুর সৃজনকর্মের মানসিক উদ্দীপনা। আমার গভীর বিশ্বাস এই যে হৃদয়াবেগের উদ্দীপনা ছাড়া শিশুমস্তিষ্কের কোষকলার স্বাভাবিক বিকাশ অসম্ভব।

...শুরু হল শরৎকালের দিন — আশ্চর্য রকমের উষ্ণ দিন।

আমরা এক জায়গায় বসে থাকতাম না, আমরা মাঠে মাঠে আর উপবনে হাঁটাহাঁটি করতাম, কেবল কদাচিৎ আমাদের সেই 'স্বপ্নপুরীতে' উঁকি মেরে দেখতাম। গাঁ থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ছেলেমেয়েরা বার করল একটা টিলা, যেখান থেকে দেখা যায় বাগানে বাগানে ঢাকা গ্রাম, দূর প্রান্তর, নীল নীল টিলা আর বনাঞ্চলের অপূর্ব দৃশ্য। বাতাস অপূর্ব নির্মল, স্বচ্ছ, মাটির ওপরে উড়ছে মাকড়সার রুপোলি জাল, নীল আকাশের বুকে ঘন ঘন আবির্ভাব ঘটছে বাসাবদলকারী পাখিদের ঝাঁক। আমাদের ছোট টিলাটির অদূরে ছড়িয়ে আছে উপবন, উপবনের প্রান্তে প্রচুর বনগোলাপের ঝোপ। ঘন লাল রঙের পুঁতির মতো বুনোফল, ডালপালায় ঝুলে থাকা মাকড়সার রুপোলি জাল আমাদের মুগ্ধ করল, প্রতিটি ঝোপের দেহরেখা আমাদের মনে গেঁথে গেল, আমরা গ্রামের উপকণ্ঠের ছিমছাম পপলার গাছের সারি আর বাগান মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলাম। প্রতি দিনই শিশুরা কিছু না কিছু নতুন আবিষ্কার করে, আমাদের চোখের সামনে সবুজ উপবন রক্তাম্বর ধারণ করল, পাতাগুলি অপরূপ বর্ণের ঐশ্বর্যে ঝকমকিয়ে উঠল। এই সব আবিষ্কার শিশুদের পরম পুলকিত করে তোলে।

প্রাণোচ্ছল বাণী ও সৃজনী চিন্তার উৎস এত ঐশ্বর্যপূর্ণ ও অফুরান ছিল যে প্রতি ঘণ্টায় যদি আমরা একটি করে আবিষ্কার করতে পারতাম তাহলে সেগুলি বহু বছরের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হত। আমাদের সামনে লাল টুকটুকে বুনোফলের গোছায় ছাওয়া ঝোপ, ফল থেকে ফলে — মাকড়সার রুপোলি জাল, তার ওপর কাঁপছে ভোরের শিশিরবিন্দু। বিন্দুগুলো দেখাচ্ছে কাঁচা হলুদ রঙের। আমরা মুগ্ধ হয়ে ঝোপের সামনে

দাঁড়িয়ে থাকি, আমাদের চোখের সামনে ঘটে যায় আশ্চর্য ব্যাপার: মাকড়সার জালের প্রান্তগুলি থেকে শিশিরবিন্দু যেন জীবন্ত হয়ে নড়েচড়ে চলেছে, মনে হয় জালের মাঝখানের ঝুলন্ত জায়গাটায় এসে গড়িয়ে পড়ছে, একটি শিশিরবিন্দু আরেকটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, অথচ ওগুলো বাড়ছে না কেন, মাটিতেই বা পড়ছে না কেন? আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণে মগ্ন হয়ে আছি: দেখা গেল শিশিরবিন্দুগুলি চটপট শুকিয়ে যাচ্ছে, চোখের সামনে আকারে ছোট হয়ে যাচ্ছে, তারপর একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'সুয্যি শিশির খেয়ে ফেলেছে,' লারিসা ফিসফিস করে বলল। শিশুকল্পনায় গড়া এই রূপ ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করল, দেখতে দেখতে জন্ম নিল নতুন এক রূপকথা।

পারিপার্শ্বিক জগৎ যার উৎস, সেই প্রবল প্রেরণা সম্পর্কে আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষকদের জানাতে চাই। আমি তাঁদের এই পরামর্শ দিই যে ভাবনার প্রথম শিক্ষা ক্লাসরুমে না হয়ে, ক্লাসের ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে না হয়ে হওয়া উচিত প্রকৃতির মাঝে। আরও একটি কথা বলতে চাই: যথার্থ চিন্তা সর্বদাই রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে পরিপূর্ণ; শিশু যে মুহূর্তে শব্দের সৌরভ অনুভব করে সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ে সঞ্চিত হয় প্রেরণা। মাঠে যান, পার্কে যান, চিন্তার উৎস থেকে পান করুন, এই জিয়ন বারিই আপনাদের শিক্ষার্থীদের করে তুলবে জ্ঞানী গবেষক, অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলি মানুষ ও কবি। আমার বারবার এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে: কাব্যিক ও হৃদয়াবেগপূর্ণ নান্দনিক প্রবাহ ছাড়া শিশুর পূর্ণমাত্রায় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ অসম্ভব। শিশুচিন্তার প্রকৃতি নিজেই কাব্য সৃষ্টির দাবি করে। সৌন্দর্য ও প্রাণবন্ত চিন্তা সূর্য ও ফুলের

মতোই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কান্বিত। কাব্যসৃষ্টি শুরু হয় সৌন্দর্যদর্শন থেকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপলব্ধিকে তীব্র করে, সৃজনী চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে, কথাকে ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোলে। মানুষ কেন শৈশবেই মাতৃভাষার এত বেশি সংখ্যক শব্দ আয়ত্তে আনে? তার কারণ এই পর্বেই তার সামনে প্রথম উন্মুক্ত হয় পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য। তার কারণ প্রতিটি শব্দে সে কেবল ভাবনারই সন্ধান পায় না, সৌন্দর্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আমেজও অনুভব করে।

স্বাস্থ্যের উৎস — প্রকৃতি

অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে যে অসফল সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশের পিছিয়ে থাকার কারণ হল খারাপ স্বাস্থ্য, কোন না কোন রকমের অসুস্থতা কিংবা ব্যাধি, যে ব্যাধি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকিঞ্চিৎকর এবং একমাত্র মা-বাবা, চিকিৎসক ও শিক্ষকের সম্মিলিত প্রয়াসে সারিয়ে তোলা যায়। শিশুদের সজীবতা ও প্রাণচঞ্চলতার জন্য হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তবাহ ব্যবস্থা, শ্বাসনালী, পাকস্থলী ও অন্ত্রের অসুস্থতা ও ব্যাধি গোপন থাকে, অগোচরে থাকে এবং প্রায়শই তা রোগ হয়ে প্রকাশ না পেয়ে স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবস্থার বিচ্যুতি হয়ে দেখা দেয়। দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে যাকে আমরা চিন্তাশক্তির ধীরগামিতা বলি বহু ক্ষেত্রেই তা হল সাধারণ অসুস্থতার পরিণাম, কোন শারীরতত্ত্বঘটিত পরিবর্তন অথবা অর্ধগোলকের ত্বকে যে কোষকলাসমূহ আছে তাদের কার্যপ্রণালী ব্যাহত হওয়ার ফলও নয়। তবে এ ধরনের অসুস্থতা শিশু নিজেও অনুভব করে না। কোন কোন শিশুর

অবশ্য পীড়াজনিত ফেকাসে চেহারা, ক্ষুধামান্দ্য লক্ষ্য করা যায়। খাওয়ার ব্যবস্থা সামান্য ভালো করতে গেলেই শরীরে ফুসকুরি ওঠে। অতি খুঁটিনাটি বিশ্লেষণেও কিছু পাওয়া যায় না: সবই যেন ঠিক চলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় দীর্ঘ সময় ঘরে থাকার ফলে দৈহিক উপাদান-বিনিময়ে যে ব্যাঘাত ঘটে তার দিকে আমরা মনোযোগ দিই না। এই ব্যাঘাতের ফলে শিশু মস্তিষ্কচালিত একাগ্র শ্রমের ক্ষমতা হারায়।

কোন কোন শিশুকে দেখতে সুস্থ মনে হলেও তাদের কাজ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার পর প্রচ্ছন্ন কোন অসুস্থতার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আরও একটি কৌতূহলজনক ব্যাপার এই যে প্রচ্ছন্ন অসুস্থতা ও ব্যাধি বিশেষ করে প্রকট হয়ে পড়ে তখনই যখন শিক্ষক ক্লাসের প্রতিটি মুহূর্ত কঠিন বুদ্ধিচর্চায় পরিপূর্ণ করে তোলার চেষ্টায় থাকেন। 'ক্লাসের একটি মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না' — শিক্ষকের এই মনোভাবের সঙ্গে কোন কোন শিশু একেবারেই তাল রেখে চলতে পারে না। আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে এই দ্রুত গতির সঙ্গে তাল রাখা সাধ্যাতীত এবং তা সম্পূর্ণ সুস্থ ছেলেমেয়েদের পক্ষে পর্যন্ত ক্ষতিকারক। বুদ্ধিবৃত্তির উপর অতিরিক্ত চাপের ফল এই যে ছেলেমেয়েদের চোখ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, তাদের গতিভঙ্গি হয় নিস্তেজ। শিশুর তখন আর কিছুই করার ক্ষমতা থাকে না, তার একমাত্র দরকার হল তাজা বাতাস, অথচ শিক্ষক তাকে জুতে রেখেছেন আর 'জল্দি, হট্ হট্' বলে তাড়া দিয়ে চলেছেন।

'আনন্দ নিকেতনে' কাজ করার প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমি শিশুদের স্বাস্থ্য লক্ষ্য করে দেখলাম। সব ছেলেমেয়েই গ্রামে, প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়ে উঠলে কী হবে তাদের কেউ কেউ

ফেকাসে, কারও কারও বুকের গড়ন দুর্বল। আর ভলোদিয়া, কাতিয়া ও সানিয়া ত বলতে গেলে অস্থিচর্মসার — এতই ওরা রোগা ও দুর্বল। বাড়িতে প্রায় সকলেরই খাওয়া-দাওয়া ভালো: কোন কোন শিশুর ক্ষেত্রে দুর্বলতা ও রোগের প্রধান কারণ এই যে তারা বাস করত অনেকটা হট্ হাউস-এর পরিবেশে: কোথায় কখন সামান্য ঠাণ্ডা বাতাস লেগে যায় এই নিয়ে মায়েদের দুশ্চিন্তা। ছেলেমেয়েরা তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ত। 'আনন্দ নিকেতনে' জীবনযাত্রার গোড়ার দিকে তারা অতি কষ্টে কিলোমিটারখানেক পথ পাড়ি দেয়। এই ছেলেমেয়েদের মা-বাবারা ওদের ক্ষুধামান্দ্যের জন্য অভিযোগ করেন।

আমি মা-বাবাদের বুঝিয়ে বললাম যে ঠাণ্ডা থেকে ছেলেমেয়েদের যত আড়াল করে রাখবেন ততই ওরা দুর্বল হবে। গরমের দিনে শিশুদের খালি পায়ে স্কুলে পাঠানোর সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি জানালাম, সকলেই তাতে রাজি হলেন। শিশুদের কাছে এটা ছিল বড় আনন্দের ব্যাপার। একবার আমরা মাঠে ঈষদুষ্ণ মুষলধার বর্ষণের মধ্যে পড়লাম। ছেলেমেয়েদের বাড়ি যেতে হল এখানে-ওখানে জমা জলের ওপর দিয়ে, মা-বাবাদের আশঙ্কা সত্ত্বেও কেউই কিন্তু অসুখে পড়ল না। আমাদের নিয়ম হল এই যে শরৎকালে, বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় একটি মুহূর্তও ঘরে থাকা চলবে না। 'আনন্দ নিকেতনের' প্রথম ৩-৪ সপ্তাহ ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন ২-৩ কিলোমিটার পথ হাঁটত; পরের মাসে — ৪-৫ কিলোমিটার, তৃতীয় মাসে — ৬। এই সব হাঁটাহাঁটিই চলত মাঠে, তৃণভূমিতে, বনে, উপবনে। ছেলেমেয়েরা দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করত তা তাদের নজরে পড়ত না, কেননা কত কিলোমিটার পার হতে হবে সে রকম কোন লক্ষ্য তাদের

সামনে থাকত না। চলাচল, হাঁটাহাঁটি — এ ছিল অন্যান্য লক্ষ্য অর্জনের উপায়স্বরূপে। শিশুর ইচ্ছে করে পায়ে হেঁটে যেতে, যেহেতু সে নিজেকে জগতের আবিষ্কারক বলে অনুভব করে। শিশুরা বাড়িতে আসত শ্রান্ত হয়ে, কিন্তু তারা সুখ পেত, তারা প্রাণোচ্ছলতায় ভরপুর হয়ে উঠত।

নির্মল বায়ুতে কয়েক কিলোমিটার পার হওয়ার পর, মা-বাবার ভাষায়, ছেলেমেয়েদের 'রাক্ষসের মতো' খিদে পায়। যে-দিন যে-দিন আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বনে যাওয়ার আয়োজন করতাম, ওদের বলতাম রুটি, পেঁয়াজ, নুন, জল আর কয়েকটা কাঁচা আলু যেন সঙ্গে করে আনে। গোড়ায় মা-বাবাদের সন্দেহ হত: ছেলেমেয়েরা কি এ সব খাবে? আরে, ঘরে এর চেয়ে কত পুষ্টিকর খাবারই খেতে চায় না! কিন্তু দেখা গেল, বনের ভেতরে রুটি, পিঁয়াজ, আলু — সবই দারুণ মুখরোচক খাবার। তাছাড়া ওদের ক্ষুধাও বৃদ্ধি পেল। যাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল রীতিমতো করুণ, এক মাস বাদেই তাদের গালে গোলাপী ছোপ ধরল, মায়েরা বাচ্চাদের ক্ষুধার প্রশংসা না করে পারলেন না: খামখেয়ালিপনা গেছে, বাচ্চারা যা দাও তা-ই খায়।

গতির মধ্যে থাকা— শরীর পোক্ত করার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। বাচ্চারা ছুটোছুটি করতে ভালোবাসে, খেলতে ভালোবাসে। ওদের জন্য খেলার চত্বর বানানো হল। খেলাধূলা আর খোলা হাওয়ায় আমোদপ্রমোদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা হল, কিন্তু আমার সাধ ছিল আরও কিছু করার। আমার ইচ্ছে ছিল শিশুদের মেরি-গো-রাউন্ড ও দোলনার আয়োজন করি; ইচ্ছে ছিল ছুটোছুটির খেলাগুলি যেন রূপকথার সঙ্গে যুক্ত হয়, যেন তারা কল্পজগতের অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমি ইতিমধ্যে আমাদের মেরি-গো-রাউন্ডের কাঠের চক্রের ওপর

কুঁজো ঘোড়া, হাতি, ছাইরঙা নেকড়ে ও ধূর্ত শিয়ালের মূর্তি কল্পনা করতে লাগলাম; শিশু কেবল দুলবেই না, সে যে কুঁজো ঘোড়ার পিঠে কিংবা ছাইরঙা নেকড়ের পিঠে চেপেছে তার জন্য উত্তেজনাও অনুভব করবে। এ সবই আপাতত পরিকল্পনা, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ছয় মাস বাদে, হয়ত বা এক বছর বাদে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। মেরি-গো-রাউন্ড জুড়ে বানানোর জন্য উপকরণ আমি যোগাড় করে ফেললাম। একথাও ভাবলাম যে শীতকালের জন্য ছেলেমেয়েদের প্রস্তুত করতে হবে, যাতে শীতকালে যত বেশি পারা যায় খোলা হাওয়ায় তারা থাকতে পারে।

বেশ কয়েক বছর ধরে একটা প্রশ্ন আমাকে ভাবিয়ে তোলে: বহু ছেলেমেয়ের দৃষ্টিশক্তি খারাপ কেন? কেন তৃতীয় শ্রেণীতেই শিশুকে চশমা পরতে হয়? বয়ঃকনিষ্ঠ বহু শিশুকে লক্ষ্য করার পর এই সিদ্ধান্তে এলাম যে এর কারণ অতিরিক্ত পঠন ততটা নয় যতটা হল পথ্যব্যবস্থার ত্রুটি, বিশেষ করে ভিটামিনের ঘাটতি — শিশু শারীরিক দিক থেকে পোক্ত হয়ে ওঠে না, সহজেই সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন কিছু কিছু রোগ আছে ছেলেবেলায় যাদের কবলে পড়ে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সঠিক পথ্যব্যবস্থা, খাঁটি খাবার, শরীর পোক্ত করা — এ সবই শিশুকে ব্যাধি থেকে রক্ষা করে, তাকে পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য উপভোগের সুখ দেয়।

যুদ্ধ-পরবর্তী প্রথম বছরগুলিতে বহু শিশুরই স্পষ্টত স্নায়বিক পীড়ার প্রবণতা ছিল। আমার কোন কোন শিক্ষার্থীর (বিশেষত তোলিয়া, কোলিয়া, স্লাভা ও ফেদিয়ার) ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায় বিষণ্ণতায়, জীবনবিমুখতায়। আমি চেষ্টা করি যাতে শিশুদের চাপা স্বভাব, ভীরুতা, কুণ্ঠা, অসুস্থ ধরনের

লাজুকতা স্নায়বিক পীড়ার আকার ধারণ না করে। যৌথ জীবনযাত্রা যাতে শিশুদের আনন্দ দেয় সেই উদ্দেশ্যে আমরা, বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে কর্মরত শিক্ষকেরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্তে আসি যে পরিবারে শিশুর জীবনে যে-সমস্ত দুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় স্কুলের পরিবেশে সেগুলির উপশম ঘটানো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সংবেদনশীল শিশুহৃদয়ে কোন অসুস্থতার স্পর্শ যাতে না লাগে সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষকেরা জানার চেষ্টা করেন কোন শিশুর মনে কী ঘটছে, কী রকম মন নিয়ে সে স্কুলে এসেছে। যদি দেখা যেত কোন শিশুর মনোজীবনে এমন কোন ঘটনার ছাপ পাওয়া যাচ্ছে যার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত, তাহলে আমরা আমাদের 'মনঃসমীক্ষণ সেমিনার' নামে পরিচিত সভাগুলিতে সেই বিষয়ে আলোচনা করতাম। স্কুলের শিক্ষকদের উচিত শিশুর দুঃখকষ্টের উপশম ঘটানো।

বিশেষত বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার সেই সব শিশুদের প্রতি যাদের মন শোকে-দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছে। তোলিয়া, সাশা, কোলিয়া, পেত্রিক ও স্লাভার স্নায়ু সময় সময় দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ওদের যে কাউকে একটু ছুঁতে গেলেই সে 'ফুঁপিয়ে' কেঁদে উঠতে পারে, কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে। কোন কোন দিন এমন হয় যে ওদের কোন প্রশ্নই করা যায় না। প্রভাব খাটানোর যে পদ্ধতি অন্যদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে ফলপ্রসূ তা এদের ক্ষেত্রে মোটেই গ্রাহ্য নয়। চিকিৎসকদের বৈজ্ঞানিক রচনাবলীতে আমি **'চিকিৎসাভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞান'** নামে এক ধারণার সন্ধান পেলাম। যে-সমস্ত শিশুর পীড়াগ্রস্ত মানসিক অবস্থা আচরণের উপর ছাপ ফেলে তাদের শিক্ষাদানের

মূলকথা এখানে মোটামুটি সঠিক ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। চিকিৎসাভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব হল প্রথমত, যে শিশুর পীড়াগ্রস্ত মন সহজেই আহত হয় তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া; দ্বিতীয়ত, বিদ্যালয়-জীবনের সমস্ত রীতি ও ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে বিষণ্ণ ভাবনা ও দুশ্চিন্তা থেকে শিশুদের মন দূরে সরিয়ে রাখা যায়, তাদের মধ্যে প্রাণোচ্ছল অনুভূতি জাগিয়ে তোলা যায়; তৃতীয়ত, কোন অবস্থায়ই শিশু যেন বুঝতে না পারে যে তাকে অসুস্থ মনে করা হচ্ছে।

স্কুলে ভলোদিয়া নামে একটি ছেলে ছিল, তার ছিল স্নায়বিক ক্ষোভোন্মাদনার পূর্বলক্ষণ। আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলাম এই কারণে যে মা-বাবা ছেলের গুণে মুগ্ধ। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের এই বলে বুঝ দেন তাঁদের ছেলে অসাধারণ শিশু। আমার ভয় হত যে অনিবার্য কারণবশত মোহভঙ্গ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবার প্রতি, সাধারণভাবে গুরুজনদের প্রতি ছেলেটির বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেতে পারে। আমার মতে, এই ধরনের শিশুদের চিকিৎসার প্রধান উপায় হল অন্য লোকজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও বিনয়ের শিক্ষাদান। ভলোদিয়া যাতে তার প্রতিটি আপনজনের মধ্যে মানুষকে অনুভব করতে পারে আমি তার জন্য চেষ্টা করতাম।

যে-সমস্ত শিশু চিন্তার ব্যাপারে মন্থর, চাপা ধরনের চিকিৎসাভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞানে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। হৃদ্‌যন্ত্রের পেশী বা অন্ত্রের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেমন গভীর মনোযোগ ও ধৈর্যের দরকার অর্ধগোলকস্থিত মস্তিষ্কের ত্বকের কোষকলার নিস্তেজ ভব ও নিষ্ক্রিয়তার ক্ষেত্রেও তাই। তবে এই চিকিৎসার জন্য দরকার হাজার গুণ

বেশি সতর্কতা ও শিক্ষাকৌশল, প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

শিশুমাত্রেই শিল্পী

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ বাদেই আমি ছেলেমেয়েদের বললাম: 'কাল ড্রইং খাতা ও পেন্সিল নিয়ে এসো, আমরা ছবি আঁকব।' পরদিন আমরা স্কুলের লন্-এ বসলাম। আমি ওদের বললাম: 'নিজেদের চারদিকে চেয়ে দেখ। যা সুন্দর দেখতে পাবে, যা তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে তা-ই আঁক।'

আমাদের সামনে ছিল শরৎকালের রোদে ঝলমলে স্কুলের বাগান আর পরীক্ষামূলক জমি। শিশুরা কলরব করে উঠল: কারও ভালো লাগছিল সবুজ রঙের সুন্দর কুমড়ো, কারও — মাটিতে হেলে-পড়া সূর্যমুখীর মাথা, কারও — পায়রার বাসা, কারও বা — আঙুরের থোকা। শুরা আকাশে ভেসে-চলা হালকা ফুঁয়ো ফুঁয়ো মেঘখণ্ডে মুগ্ধ। সেরিওজার ভালো লাগছিল পুকুরের আয়নার মতো চকচকে জলের বুকে হাঁসের দল। দাঙেকার ইচ্ছে হচ্ছিল মাছেদের আঁকে — সে উৎসাহভরে বলল, একদিন কাকার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিল: মাছ ওঠে নি, তবে মাছেদের 'খেলা' ওরা দেখেছে।

'আমি সূয্যি আঁকতে চাই,' তিনা বলল।

নিস্তব্ধতা নেমে এলো। বাচ্চারা একাগ্রমনে ছবি এঁকে চলল। অংকনশিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আমি অনেক পড়েছি, কিন্তু এখন আমার সামনে জীবন্ত শিশুর দল। আমি দেখতে পেলাম

যে শিশুর আঁকা ছবি, আঁকার প্রক্রিয়া — এ হল শিশুর অন্তর্জীবনের একটি কণা। শিশুরা যে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে কোন কিছু এনে নিছক কাগজের ওপর ফেলে তা নয়, তারা সে জগতে বাস করে, সেখানে প্রবেশ করে, তারা যেন সৌন্দর্যের স্রষ্টা, তারা সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করে। ভানিয়া তার কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে আছে, মৌচাক আঁকছে, মৌচাকের পাশে — গাছ, তাতে বিরাট বিরাট ফুল, ফুলের ওপর — মৌমাছি, প্রায় মৌচাকের সমানই বিরাট। বালকের দুই গাল লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, চোখে তার উৎসাহের দীপ্তি, দেখে শিক্ষকের বড় আনন্দ হয়।

শিশুদের রচনা — তাদের অন্তর্জীবনের গভীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্ষেত্র, আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা — এতে উজ্জ্বল ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত মৌলিকতা। এই মৌলিকতাকে সকলের জন্য একমাত্র ও অবশ্যগ্রাহ্য কোন নিয়মের আওতায় ফেলা যায় না।

কোলিয়া বলল না তার কী ভালো লাগল, সে কী আঁকে এই ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হই। ছেলেটির ড্রইং খাতায় আমি দেখলাম ডালপালাওয়ালা একটা গাছ, তাতে বড় বড় গোল গোল ফল — তার মানে আপেল গাছ; গাছটি কিরণমালায় আচ্ছন্ন এক ঝাঁক ছোট ছোট তারায় ঘেরা, গাছের অনেক ওপরে — কাস্তের মতো চাঁদ। এই কৌতূহলোদ্দীপক ছবির আড়ালে শিশুর কী ভাবনা ও অনুভূতি যে নিহিত আছে তা জানতে আমার বড় ইচ্ছে হয় — কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি, আমরা যখন আশেপাশের জগৎ লক্ষ্য করছিলাম তখন তার চোখে যে উৎসাহের দীপ্তি ফুটে উঠেছিল এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

'আপেল গাছের ওপরে এই তারাগুলো কী?' কোলিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম।

'এগুলো তারা নয়,' ছেলেটি বলল। 'এগুলো রুপোর ফুলকি — চাঁদ থেকে বাগানে ঝরে পড়ে। চাঁদেরও ত দৈত্য-কামার আছে, তাই না?'

'নিশ্চয়ই আছে,' আমি জবাব দিই, সন্ধ্যার এই নির্জন মুহূর্তে যে চিন্তা বালককে আলোড়িত করে তোলে তাতে আমি অবাক হয়ে যাই। তার মানে সে রাতের আকাশ তাকিয়ে দেখেছে, চাঁদের আলোয় মুগ্ধ হয়েছে, আপেল গাছের ওপর আবছা দীপ্তির এই রোমাঞ্চকর মণ্ডল লক্ষ্য করেছে।

'কিন্তু এই দৈত্য-কামাররা রাতে আবার কোন সুতোর ওপর হাতুড়ির ঘা মারে?' ছেলেটি আপন মনে ভাবতে ভাবতে বলে। আমার মনে হল রাতের আকাশ, চাঁদের ম্লান দীপ্তি আর নক্ষত্রমণ্ডলীর সমবেত নৃত্য স্মৃতি থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে সে যতটা ব্যস্ত শিক্ষকের প্রতি ততটা মনোযোগী নয়। আমার ভয় হল বালকের সৃজনী প্রেরণার বিঘ্ন না ঘটাই। যেখানে যেখানে কল্যাণকর অনুভূতির উৎস পচ্ছন্ন আছে, সৃষ্টিকর্ম যে শিশুমনে সেই সব গহনতম প্রদেশের উদ্‌ঘাটন ঘটায় তা আবিষ্কার করে আনন্দে আমার হৃদয় নেচে উঠল। শিশুকে পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক অজানতে এই স্থানগুলিও স্পর্শ করে যান।

লারিসার দৃষ্টান্তে আমি দৈত্য-কামার আঁকতে লেগে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল, আমি মন্দ আঁকি না। কামার দুজন সত্যিকারের হাতুড়ি পিটিয়ের মতো হল, নেহাইও হল তেমনি — যেমন দেখা যায় যৌথখামারের কামারশালায়। আমি যে একজন বয়স্ক লোক সে কথা ভুলে গিয়ে মনে এক আনন্দের অনুভূতি

পেলাম: আমার কামারেরা লারিসার কামারের চেয়ে অবশ্যই ভালো হবে। কিন্তু আমার আঁকা ছবি ছোটদের তেমন একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল না, অথচ লারিসাকে ঘিরে দেখা দিয়েছে গোটা একটা দঙ্গল। 'ও কী আঁকল?' আমি ভাবলাম। ছেলেমেয়েদের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম: শিশুর আঁকা ছবিতে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলে ত মনে হল না, কিন্তু সবাই কেন মুগ্ধ, অথচ আমার ছবির দিকে কোন মনোযোগই নেই? মেয়েটির আঁকা ছবি আমি যত মন দিয়ে দেখি ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ছোটদের বিশ্বদর্শন নিজস্ব ধরনের, তাদের শিল্পরূপায়ণের যে উপকরণ তার ভাষাও নিজস্ব, যত চেষ্টাই আমি করি না কেন এই ভাষা নকল করা আমার অসাধ্য। আমার দত্যি-কামারদের মাথায় সাধারণ টুপি, তাদের গায়ে অ্যাপ্রন, তাদের লম্বা লম্বা দাড়ি, পায়ে হাই বুট। কিন্তু ওর আঁকা বিরাট বিরাট দুই কামারের মাথায় জাঁকাল চুল আর সেই চুলের রাশির চারধারে জ্বলছে ফুলকির জ্যোতি। তাদের দাড়ি — নিছক দাড়ি নয়, আগুনের কুণ্ডলী। বিশাল বিশাল হাতুড়ি মাথার প্রায় দ্বিগুণ। ...শিশুর কাছে এটা সত্যের বিচ্যুতি ত নয়ই, বরং জাজ্বল্যমান সত্য — শক্তিমান মানুষের মধ্যে ও প্রাকৃতিক অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে যে অকল্পনীয় শক্তি, কৌশল, রূপকথাসুলভ সাধারণ ধারণা নিহিত আছে সেই সত্য। শিশুকল্পনার এই অপূর্ব ভাষার উপর আমাদের ভাষা, বয়স্কদের ভাষা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। শিশুরা নিজেদের মধ্যে তাদের নিজেদের ভাষায়ই কথা বলুক। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের আমি বলি: শিশুদের অনুপাত, পরিপ্রেক্ষিত ও মাত্রা সম্পর্কে জ্ঞান দিন — এ সবই ভালো, কিন্তু সেই সঙ্গে শিশুকল্পনার পরিসরও দিন,

রূপকথার আলোকে বিশ্বদর্শনের যে ক্ষমতা শিশুদের আছে তা বিনষ্ট করবেন না।

প্রতিটি শিশুই বলতে চায় সে কী এঁকেছে। আর এই সব বর্ণনার মধ্যে মণিরত্নের মতো ঝলমল করে ওঠে উজ্জ্বল রূপ, উপমা। অঙ্কনবিদ্যা শিশুদের ভাষাভঙ্গির বিকাশ ঘটায়।

এখন আমরা মাঠে, বনে প্রায় সবসময় যাই ড্রইং খাতা আর পেন্সিল নিয়ে। স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বয়ঃকনিষ্ঠদের জন্য বানিয়ে দিল ছোট ছোট ড্রইং খাতা, সেগুলি ইচ্ছে করলে পকেটেও রাখা যায়। আমাদের স্কুলের জীবনযাত্রা শুরু হওয়ার কয়েক মাস পরে, বসন্তকালে আমি এক বিরাট ড্রইং খাতা বানালাম — তাতে যে-কোন ছেলেমেয়ে ইচ্ছে হলে আশেপাশের জগতে যা তার ভালো লাগে তা-ই আঁকতে পারত।

জীবন্ত ও সুন্দর জিনিসের প্রতি যত্ন

পারিপার্শ্বিক জগতের জীবন্ত ও সুন্দর জিনিসের প্রতি কোন কোন শিশুর ঔদাসীন্য আমাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে, শিশুদের আচরণে আপাত দুর্বোধ্য নৃশংসতার পরিচয় পেয়ে আমি উদ্বেগ বোধ করি। আমরা তৃণভূমির ওপর দিয়ে চলেছি, ঘাসের ওপর উড়ছে প্রজাপতি, ভ্রমর আর ঝিঁঝিঁ পোকার দল। ইউরা একটা ঝিঁঝিঁ পোকাকে ধরল পকেট থেকে কাচের টুকরো বার করে পোকাটাকে আধাআধি কেটে ফেলল, তার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে ‘গবেষণা’ করতে লেগে গেল। স্কুলের এলাকার একটা নির্জন কোণে বহু বছর হল সোয়ালো পাখিদের

কয়েকটি পরিবারের বাস। একবার, আমরা সেখানে গেলাম, সোয়ালোদের বাসা নিয়ে কয়েকটি কথা বলেছি কি বলি নি অমনি দেখি শুরা পাখির বাসায় ঢিল ছুঁড়ল। আঙ্গিনায় যে সব সুন্দর সুন্দর ফুল জন্মায় শিক্ষার্থীরা সকলেই সেগুলির যত্ন নেয়, কিন্তু ল্যুসিয়া কেয়ারির কাছে গিয়ে ফুল গাছ ছিঁড়ে ফেলল। সবগুলি ঘটনাই ঘটে 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম পর্বে। সুন্দরের প্রতি শিশুদের মুগ্ধতাকে কোন সুন্দর জিনিসের ভাগ্যের প্রতি ঔদাসীন্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে দেখে আমি বিস্মিত হই। আমার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বহু আগে থাকতেই আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে সৌন্দর্যমুগ্ধতা সুকুমার বৃত্তির প্রথম অংকুর মাত্র — তাকে বিকশিত করা দরকার, কার্যকলাপের প্রতি সক্রিয় প্রবণতায় পরিণত করা দরকার। বিশেষত আমি উদ্বেগ বোধ করি কোলিয়া ও তোলিয়ার আচরণে। কোলিয়ার ছিল চড়াইয়ের বাসা ভাঙ্গার কেমন যেন এক প্রচণ্ড উৎসাহ। অন্যদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম ভাঙ্গা বাসা থেকে সদ্যোজাত পাখির ছানারা মাটিতে পড়ে গেলে সে নাকি তাদের তেলকলের নর্দমার পাইপের ভেতরে ফেলে দেয়। চড়াইয়ের ছানারা অনেকক্ষণ ধরে চিঁচিঁ করে আর কোলিয়া পাইপের গায়ে কান লাগিয়ে শোনে। কোলিয়া না হয় তাদের পরিবারে হিংসার রূপ দেখেছে, কিন্তু যে সব ছেলেমেয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে বাস করে তাদের মধ্যেও শিশুসুলভ নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ও সৌন্দর্যের প্রতি ঔদাসীন্য ও হিংসার এই সব 'ছোটখাটো' প্রকাশই কিন্তু ধীরে ধীরে অনুভূতিশূন্য নির্দয়তার আকার ধারণ করতে পারে। অথচ সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কথা হল, এগুলি যে কেন নিন্দনীয় তা শিশুরা বুঝতে পারত না।

শিশুদের মনে উজ্জ্বল, উদার অনুভূতি কী ভাবে জাগিয়ে তোলা যায়, কী ভাবে তাদের হৃদয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা যায় প্রাণিজগৎ ও সুন্দরের প্রতি যত্নপরায়ণ মনোভাব, তাদের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা? একবার মাঠে বেড়ানোর সময় আমরা ঘাসের মধ্যে একটা ভারুই পাখিকে পেলাম, তার একটা ডানা সামান্য কাটা। পাখিটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডানা ঝাপটে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না। বাচ্চারা ওকে ধরে ফেলল। জীবনের এই ছোট্ট পিণ্ডটা হাতে পড়ে ধুকপুক করতে লাগল, পুঁতির মতো চোখ জোড়া তার তখন ভয়ার্ত, সে তাকাচ্ছিল নীল আকাশের দিকে। কোলিয়া পাখিটাকে হাতের মুঠোয় ধরে চাপ দিল, পাখি করুণ কণ্ঠে চিঁচিঁ করে উঠল। বাচ্চারা হেসে উঠল। 'আচ্ছা এই যে পাখিটাকে ওর জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সকলে ফাঁকা মাঠের মধ্যে ফেলে চলে গেছে, তার প্রতি একজনেরও কি কোন দরদ নেই?' এই ভেবে আমি ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালাম। লিদা, তানিয়া, দাঙ্কো, সেরিওজা ও নিনার চোখে জল দেখা গেল।

'পাখিটাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন?' করুণ কণ্ঠে কোলিয়াকে বলল লিদা।

'তোর কি কষ্ট হচ্ছে ওর জন্যে?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল। 'নে না, নিয়ে ওর সেবা কর,' এই বলে সে পাখিটাকে লিদার দিকে ছুঁড়ে দিল।

'কষ্ট ত হচ্ছেই, আর সেবাও করব,' পাখিটাকে আদর করতে করতে লিদা বলল।

আমরা তখন বনের প্রান্তে। আমি ছেলেমেয়েদের বললাম যে শরৎকালে বাসাবদলকারী পাখিরা দূরের পথ ধরে। ফাঁকা

মাঠে রয়ে যায় দলছাড়া এক আধটা পাখি — ঐ পাখিটার ডানা খানিকটা কেটে গেছে, কোন হিংস্র প্রাণীর নখরের কবল থেকে পাখিটা ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় ফস্‌কে পালিয়েছে। ...কিন্তু সামনে দারুণ শীত — বরফঝড় আর হিম। এই ভারুই পাখিটার অবস্থা কী হবে? বেচারি জমে যাবে। অথচ দেখ, ও কী চমৎকার গান গায়, কান জুড়ানো গানে বসন্তে ও গ্রীষ্মে স্তেপ ভরিয়ে তোলে। ভারুই হল সূর্যপুত্র। রূপকথায় আছে: 'সূর্যের আগুন থেকে এই পাখির জন্ম।' আর তোমাদের মধ্যে কে না জানে, যখন দারুণ হিম পড়ে আঙ্গুল জমে আড়ষ্ট হয়ে যায়, যখন কনকনে হাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে তখন কী ব্যথাই না লাগে। তোমরা তখন তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে যাও, চুল্লির গরম চাও, প্রাণ জুড়ানো আগুনের তাপ চাও। ...কিন্তু পাখি যাবে কোথায়? কে ওকে ঠাঁই দেবে? ও যে জমে বরফ হয়ে যাবে।'

'আমরা ওকে মরে যেতে দেব না,' ভারিয়া বলল। 'ওকে একটা গরম জায়গায় রাখব, বাসা বানিয়ে দেব, বসন্তের পথ চেয়ে থাকুক।'

বাচ্চারা হুড়োহুড়ি করে বলে যেতে লাগল কী ভাবে ভারুই পাখির থাকার জায়গা তৈরি করবে। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে শীতকালে পাখিটাকে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে রাখে। চুপ করে থাকে কেবল কোলিয়া, তোলিয়া এবং আরও কয়েকটি ছেলে।

'আরে শোন, ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কী দরকার? স্কুলে ওর জন্যে গরম দেখে বাসা তৈরি করব, ওকে খাওয়াব, সারিয়ে তুলব, আর বসন্তকালের নীল আকাশে ছেড়ে দেব।'

আমরা পাখিটাকে স্কুলে বয়ে নিয়ে এলাম, খাঁচায় রাখলাম, ছোটদের জন্য যে আলাদা ঘর ছিল সেখানে খাঁচাটা রাখলাম।

রোজ সকালে বাচ্চাদের মধ্যে কেউ না কেউ পাখির কাছে আসত। ছোটরা খাবার নিয়ে আসত।

কয়েকদিন বাদে কাতিয়া নিয়ে এলো একটা কাঠঠোক্‌রা পাখি। বাবা পাখিটাকে বনের মধ্যে পান — কোন হিংস্র জন্তুর খপ্পরে সে পড়েছিল, কিন্তু আশ্চর্য ভাবে বেঁচে যায়। কাঠঠোক্‌রার ডানা দুটো নিস্তেজ হয়ে ঝুলছিল, ওর পিঠে জমাট বেঁধে ছিল রক্ত। ভারুই পাখির সঙ্গেই ওকে রেখে দেওয়া হল। কাঠঠোক্‌রাকে যে কী খাবার দিতে হয় তা কারোই জানা ছিল না — পোকামাকড় দিতে হয় নাকি? কোথায় খোঁজা যায় — গাছের ছালবাকলের নীচে?

'আমি কিন্তু জানি,' বাহাদুরী করে বলল কোলিয়া। 'ও কেবল পোকামাকড়ই খায় না, ভালোবাসে নতুন কুঁড়ি, ঘাসের বীজ। আমি দেখেছি...' ছেলেটা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। বোধহয় ও কোন সময় কাঠঠোক্‌রা শিকার করেছে।

'তা বেশ ত, তুমি যখন জানই কাঠঠোক্‌রাকে কী ভাবে খাওয়াতে হয় তখন ওর জন্যে খাবার যোগাড় কর। দেখছ, ও কেমন করুণ ভাবে তাকাচ্ছে।'

কোলিয়া রোজ পাখির জন্য খাবার আনতে লাগল। প্রাণীর প্রতি মায়া কিন্তু তখনও তার ছিল না। বন্ধুবান্ধবরা বলবে, ওঃ দ্যাখ দেখি আমাদের কোলিয়া কেমন ছেলে — পাখিদের কী খাওয়াতে হয় জানে! স্রেফ এই বাহাদুরী পাওয়াতেই তার আনন্দ। সুকুমার বৃত্তির জাগরণ না হয় অহঙ্কার থেকেই শুরু হোক — তাতেও ক্ষতি নেই। ভালো কাজ অভ্যাসে পরিণত হোক, পরে তা হৃদয়কে প্রবুদ্ধ করবে।

আমার মনে পড়ল, তুমি কেমন মানুষ হতে চাও — ছেলেদের

কাছে এই প্রশ্ন করে শত শত জায়গা থেকে আমি উত্তর পেয়েছি — আমি চাই আমার অনেক জোর হোক, আমি চাই সাহসী হতে, বাহাদুর হতে, বুদ্ধিমান, চটপটে হতে, নির্ভীক হতে... কেউই কিন্তু বলে নি উদার হতে চাই। কেন শৌর্য ও সাহসের মতো সদ্গুণের পাশাপাশি উদারতা স্থান পায় না? কেন ছেলেরা তাদের দয়াগুণের জন্য লজ্জা পর্যন্ত বোধ করে? অথচ উদারতা ছাড়া — একে অন্যকে হৃদয়ের যে অকৃত্রিম উষ্ণতা দান করে তা ছাড়া অন্তরের সৌন্দর্য সম্ভব নয়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের দয়ামায়া কম কেন? — এই নিয়েও আমি ভাবি। হয়ত এটা আমার মনের ভুল? না, ব্যাপারটা কিন্তু সত্যিই। মেয়েদের দয়ামায়া, সমবেদনা অনেক বেশি, তাদের মমতা অনেক বেশি হয়ত এই কারণে যে ছোট বয়স থেকেই অচেতন ভাবে তাদের মনে মাতৃত্বের সহজাত প্রবৃত্তি থাকে।

ফেদিয়া যে দিন সকালবেলায় স্কুলে ওরিওল পাখি নিয়ে এলো সেই দিনটি ছোটদের কাছে হয়ে দাঁড়াল উৎসব বিশেষ। এই পাখিটারও কী কারণে যেন ওড়ার ক্ষমতা ছিল না। ফেদিয়া পশুপালন খামারের কাছে ঝোপের মধ্যে ওকে পায়। পাখির বহু বর্ণের সুন্দর পালক থেকে বাচ্চারা আর চোখ ফেরাতে পারে না। 'পাখিদের ডাক্তারখানায়' (বাচ্চারা তাদের ঘরের কোণটিকে এই নাম দেয়) আমাদের দিন কাটল। কোস্তিয়া নিয়ে এলো একটা লিকলিকে, দুর্বল চড়াইয়ের ছানা, ওটাকে সে কুড়িয়ে আনে পথের ধার থেকে। চড়াইছানাটা দানা, রুটির গুঁড়ো — কিছুই খায় না। পাখির অসুখে ছেলেটার মন ভার হয়ে যায়। আমাদের চড়াইছানা মারা যেতে আমরা সবাই কষ্ট পাই। কোস্তিয়া কেঁদে ফেলে। মেয়েরাও

কাঁদে। কোলিয়া বিষণ্ণ হয়ে থাকে, বিশেষ কোন কথাবার্তা বলে না।

আমার মনে পড়ল ইয়ানুশ কর্চাকের উক্তি: 'শিশুর উজ্জ্বল গণতন্ত্র শাসকমহল বলে কিছু জানে না। খেতমজুরের ঘাম, ক্ষুধাপীড়িত সমবয়সী শিশু তাকে অকালে মুষড়ে দেয়, সে জানে খেতের ঘোড়া আর জবাই করা মুরগীর ভাগ্য। তার অন্তরঙ্গ হল কুকুর ও পাখি, সমান সমান — প্রজাপতি ও ফুল, আর পাথরে ও ঝিনুকে সে দেখতে পায় তার সহোদরকে। হঠাৎ কিছু একটা হয়ে ওঠার দম্ভ শিশুর কাছে অপরিচিত, সে তাই জানে না যে প্রাণ আছে কেবল মানুষের।' হ্যাঁ তাই বটে, কিন্তু **উদারস্বভাবের শিশু** আকাশ থেকে পড়ে না। তাকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হয়।

একবার গিরিখাতে বেড়ানোর সময় ছেলেমেয়েরা একটা খরগোশছানাকে দেখতে পেল — ওর পা জখম হয়েছে। খরগোশছানাকে ওরা নিজেদের ঘরে বয়ে নিয়ে এলো, তাকে নতুন খাঁচায় রাখল। হল আরও একটি আরোগ্যশালা — পশু-আরোগ্যশালা। এক সপ্তাহ বাদে লারিসা নিয়ে এলো একটা জিরজিরে বিড়ালছানা — ঠাণ্ডায় সেটা ঠকঠক করে কাঁপছিল। তাকে খরগোশছানার সঙ্গে একই খাঁচায় রাখা হল। বাচ্চাদের অনেক কাজ জুটে গেল: ওরা খরগোশের বাচ্চার জন্য গাজর আনে, বিড়ালছানার জন্য আনে দুধ। একদিন সকালে আমরা যখন দেখতে পেলাম বিড়ালছানা আর খরগোশের বাচ্চা একে অন্যের গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে তখন ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ হল তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। পাছে ওদের ঘুম ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে বাচ্চারা ফিসফিস করে কথাবার্তা বলছিল।

শীতকালে 'পাখিদের ডাক্তারখানায়' দেখা দিল গুটিকয়েক নীলকণ্ঠ পাখি — শীতযাপনের জন্য যে সব পাখি আসে তাদের খাবার দেওয়ার একটা জায়গা আছে, তারই পাশ থেকে বাচ্চারা ওদের কুরিয়ে আনে। আরও একটি ঘটনায় আমি বড় আনন্দ পেলাম: কোন কোন বাড়িতে বাচ্চারা নিজস্ব 'পাখিদের ডাক্তারখানা' আর চিড়িয়াখানা বানিয়েছে। আর আমাদের ঘরে যখন ছোট ছোট মাছসমেত অ্যাকোয়ারিয়াম এলো তারপর থেকে ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবাদের কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল: বাড়িতে অ্যাকোয়ারিয়ামের ব্যবস্থা কর। বহু মা-বাবা স্কুলে এসে জিজ্ঞেস করেন কী ভাবে এর ব্যবস্থা করা যায়। অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য মাছ আর উদ্ভিদ যোগাড় করা কঠিন। মাছের খাবারের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু ছেলেমেয়েরা গোঁ ধরে থাকায় সব বাধাই অতিক্রম করা গেল: ওরা না মা-বাবাকে না আমাকে — কাউকেই শান্তি দেয় না। স্লাভা আর তিনার মায়েরা এলেন, বললেন ছেলেরা জ্বালিয়ে খাচ্ছে, বলে অন্যদের সোনালি মাছ আছে, আমাদের নেই। ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের কাছে সাহায্য চাইতে হল। সে সময় স্কুলে ওয়ার্কশপ ছিল না, অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরীর ঝামেলা ঘাড়ে পড়তে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রথম ওয়ার্কশপ বানাতে হল।

আমরা যখন ছোট্ট ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত অ্যাকোয়ারিয়ামের সামনে বসে বসে মুগ্ধ হয়ে সোনালি মাছ দেখতাম সেই সন্ধ্যাগুলি কখনও ভোলা যায় না। আমি ছেলেমেয়েদের সাগরের অতল গর্ভের গল্প বলতাম, সামুদ্রিক প্রাণীদের অসাধারণ আকর্ষণীয় জীবনযাত্রার বিবরণ দিতাম। স্কুল শেষ করার বহুকাল পরে, পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়ার পরও আমার

ছাত্রছাত্রীরা সারা জীবন এই সন্ধ্যাগুলি স্মরণে রাখে। সম্প্রতি কোলিয়া আমাকে বলে:

'ঐ ল্যাম্পটা প্রায়ই আমি স্বপ্নে দেখতাম। তার আলো আমার কাছে ছিল জ্ঞানের প্রথম উৎস। আমার আরও বেশি করে জানার ইচ্ছে হত সমুদ্রের অতল গর্ভের রহস্য, আজব মাছেদের কথা।'

২৪ বছর বয়স্ক কোন মানুষ যদি এত আন্তরিকতা ভরে মাছ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে তার মানে ব্যাপারটা ফেল্‌না নয়। এ হল সুকুমার বৃত্তির অন্যতম ধারা। আমি নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি কখন পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য সবচেয়ে উদাসীন হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে উদার অনুভূতিতে — স্নেহপরায়ণতায়, সমবেদনায়। শরৎকালের প্রথম হিম পড়ার ঘটনাটি কখনও ভুলব না। আমরা বাগানে গোলাপ ঝাড়ের দিকে গেলাম, দেখতে পেলাম উজ্জ্বল ফুটন্ত ফুল, কোমল পাপড়িগুলির উপর বিন্দু বিন্দু শিশির। ফুলটা আশ্চর্য উপায়ে ঠাণ্ডা হিমের রাতে বেঁচে গেছে, আমরা ফুলটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে শিগ্‌গিরই হিমে এ সৌন্দর্যর আর কিছু থাকবে না। কোলিয়ার চোখের ওপর আমার চোখ পড়ল: এই প্রথম আমি ওর চোখে দেখতে পেলাম বিপন্ন ভাব, উদ্বেগের ছায়া — খাঁটি শিশুসুলভ অনুভূতি। তারপর আমরা গেলাম হট্‌ হাউসে, যেখানে কয়েকটি টবে রাখা আছে আমাদের অঞ্চলের পক্ষে দুর্লভ ফুলের গাছ — রডডেন্‌ড্রন, ক্যাক্‌টাস। ছোট্ট টকটকে ফুলের পাশে বসলাম — ক্যাক্‌টাস ফুটেছে। অনেকক্ষণ ধরে আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

সুন্দরের প্রতি যত্ন ধীরে ধীরে শিশুদের জীবনে স্থান পেল।

১৯৫১ সনের শরৎকালের শেষ দিকে, যখন গাছপালা পত্রশূন্য হয়ে পড়ল, সেই সময় আমরা বনে গিয়ে একটা লিন্ডেনের চারা তুলে নিয়ে এলাম, সেটাকে স্কুলের এলাকায় বসিয়ে দিলাম। গাছটি হয়ে দাঁড়াল আমাদের বন্ধু। ওটা যেন একটা জীবন্ত প্রাণী, আমাদের যত্ন ও উদ্বেগ অনুভব করার, ভোগ করার ক্ষমতা যেন ওর আছে — এই ভাবে আমরা ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতাম, কল্পনা করতাম, ওর সম্পর্কে রূপকথা রচনা করতাম। ঈষদুষ্ণ বৃষ্টি যখন পড়ত তখন ছেলেমেয়েরা আনন্দ পেত: আমাদের বন্ধুর আর্দ্রতা দরকার। আমরা দুর্ভাবনার মধ্যে থাকতাম যখন মাটি হিমে জমে যেত, মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যেত হাড়কাঁপানো হাওয়া: আমাদের বন্ধুর ঠান্ডা লাগছে। মেয়েরা কয়েকটি নলখাগড়ার ডাঁটা নিয়ে এসে গাছের কান্ডের চারধারে পেঁচিয়ে দেয়। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের বন্ধুর কাছে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলাম, উত্তেজিত হয়ে লক্ষ্য করতাম কচি পাতা বেরোচ্ছে কিনা। প্রথম কিশলয় শিশুদের মনে পরম পুলক সঞ্চার করল: গাছটা বেঁচে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে আমরা আমাদের লিন্ডেনে জল দিতাম।

স্নেহ ও ঔদার্যের, সমবেত হিতৈষার যৌথ অনুভূতি — কী বিরাট শক্তিই না ধরে! এই অনুভূতি প্রবল ধারার মতো, পরম উদাসীনদেরও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কোলিয়া, তোলিয়া, স্লাভা ও পেত্রিক যে রকম উত্তেজিত হয়ে তাদের বন্ধু সবুজ লিন্ডেনের কাছে যায়, অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছদের খাওয়াতে গিয়ে তাদের চোখ যেমন দীপ্ত হয়ে ওঠে তা দেখে আমার আনন্দ হয়।

শীতের হিমে ছোট্ট লিন্ডেনের ঠান্ডা লাগবে ভেবে যাদের

বুক এক সময় কেঁপে উঠত তারা হয়ে উঠল সাবালক, পরিণত মানুষ। আমাদের বন্ধু হল ডালপালাওয়ালা বিরাট গাছ। এখন তার কাছে তরুণ-তরুণীরা আসে, আসে অল্পবয়সী মা-বাবারা। তারা যখন তাদের শৈশবের সোনালি শরতের স্মৃতিচারণ করে তখন তাদের হৃদয় উদার অনুভূতির তরঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে সুকুমার বৃত্তিগুলি শৈশবেই দৃঢ়সংসক্ত হওয়া দরকার, আর মনুষ্যত্ব, ঔদার্য, স্নেহপরায়ণতা, হিতৈষা জন্ম নেয় পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে, শ্রমের মধ্যে। সুকুমার বৃত্তি, আবেগচর্চা — এ হল মনুষ্যত্বের কেন্দ্রবিন্দু। সুকুমার বৃত্তি যদি ছেলেবেলায় শেখানো না যায় তাহলে আর কখনই শেখানো যাবে না, কেননা খাঁটি মানবিক এই বৃত্তি প্রথম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মাতৃভাষার শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই মনে গেঁথে যায়। শৈশবে মানুষকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে আবেগ-অনুভূতি চর্চার পাঠশালা — সুকুমার বৃত্তিশিক্ষার পাঠশালা।

শ্রমজগতে আমাদের পর্যটন

'শ্রম যাতে শিশুদের অতি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক চাহিদা হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য কী করা যায়?' — এই প্রশ্নটি আমাদের শিক্ষকদের সকলকে ভাবিত করে তোলে। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে কর্মরত শিক্ষকেরা শিক্ষাদানের প্রথম দিন থেকে স্কুলের বাগানে শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষামূলক জমিতে সাধ্যমতো শ্রমনিয়োগে শিশুদের আকর্ষণ করেন। আমরা

একটা ছোটখাটো হট্ হাউস বানাই — সেখানে শিশুরা শীতকালে কাজ করে। শিশু-শ্রমকে কী ভাবে উচ্চ আদর্শগত প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা যায় এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার পর শিক্ষকেরা ঠিক করলেন প্রতি বছর ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয়ের বার্ষিকী উপলক্ষে* একটি করে ওক গাছ লাগাতে হবে। এটা হবে আমাদের আনন্দের জীবন্ত কালপঞ্জী।

কেবল নিসর্গজগৎ নয়, শ্রম, সৃজন ও গঠনের জগৎও যাতে শিশুদের ঘিরে রাখে তার মধ্যেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক কাজের সন্ধান পাই। মানবিক সৌন্দর্য উজ্জ্বলতম রূপে প্রকাশ পায় শ্রমে।

আমাদের 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের শ্রমজগৎ 'পর্যটন' শুরু হল। প্রথম 'পর্যটন' ছিল যৌথখামারের শস্যভাণ্ডারে। এই দিনটির কথা ছেলেমেয়েরা কখনও ভুলবে না। ওরা দেখতে পেল গমের রাশি — হাজার হাজার সেণ্টনার শস্য। যে সব মানুষ উচ্চ পরিমাণে খাদ্যশস্য ফলায়, ভানিয়ার বাবা তাদের কথা আমাদের বললেন। কম্বাইন চালক গ্রিগোরি আন্দ্রেয়েভিচ বাচ্চাদের মাঠে নিয়ে গেলেন — মাঠ গ্রামের পাশেই, শস্যভাণ্ডারের ঠিক পেছনে। তিনি বললেন: 'এই যে, এই একশ' হেক্টর খেতে আমি এ বছর চার হাজার সেণ্টনার ফসল ওঠাই। আর মোট দশ বছরে আমি আমার কম্বাইন দিয়ে যে পরিমাণ ফসল তুলেছি তা আলেক্সান্দ্রিয়ার মতো একটা শহরের প্রয়োজন মেটাতে পারে।'

এই বিশ্ববীক্ষা কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েও বটে।

---

* ১৯৪৫ সনের ৯ মে ফাশিস্ত জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের বিজয় উপলক্ষে প্রতি বছর বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

মেহনতী মানুষের সৌন্দর্য শিশুদের বিস্মিত করে। মানুষের জন্য গর্বে তাদের মন ভরে ওঠে। এই অনুভূতি আরও গভীর হয়ে দাঁড়ায় যখন শ্রমজগতে 'পর্যটনের' সময় ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবাদের দেখা পায়। পশুপালন খামারে ওরা জানতে পারল যে তানিয়ার মা দেড় হাজর মানুষের জন্য দুধ সরবরাহ করেন। ঈষদুষ্ণ শরতের দিনে আমরা গেলাম যন্ত্র-নির্মাণের কারখানায়। সেখানে ভালিয়ার বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা। তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলেন ঢালাইয়ের ওয়ার্কশপে — সেখানে গলানো হয় কাঁচা লোহা। মানুষ কঠিন পদার্থকে পরিণত করছে লাল টকটকে আগুনের নদীতে, মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে আর শ্রমে সে নদী পরিণত হচ্ছে ধাতুপিণ্ডে — শিশুরা যে-সমস্ত রূপকথা শুনেছে, যে-সমস্ত রূপকথা তারা বানিয়েছে এটা সম্ভবত ছিল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। আমার দেখে বড় আনন্দ হল যে শিশুদের সৃজনকর্ম নতুন এক ভাববস্তুতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে: যে-সমস্ত মহাবীর অগ্নিগর্ভ ধাতুর নদী বানায় ছেলেমেয়েরা তাদের নিয়ে রূপকথা সৃষ্টি করতে লাগল, ধাতুবিদ শ্রমিকদের ছবি আঁকল। ঢালাই কর্মশালা প্রথম পরিদর্শন মনে অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলল। শিশুরা আগে যা দেখেছিল তা যেন এখন তারা দেখতে পেল নতুন দৃষ্টিতে: ধাতু যদি না থাকত তা হলে মানুষ বাঁচতে পারত না, একদিনও পরিশ্রম করতে পারত না। শ্রমিক, ধাতুবিদ, যন্ত্রনির্মাণকারী — এরা হল জীবনের প্রকৃত স্রষ্টা। তাদের প্রতি আমার শিক্ষার্থীদের গভীর শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হল।

কারিগরদের সঙ্গে — গাড়ি ও ট্র্যাক্টর ডিপোর ফোরম্যান — মিস্ত্রী ও টার্নারদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারও চিত্তাকর্ষক

হয়। এখানে ছেলেমেয়েরা দেখতে পেল কী ভাবে ধাতুপিণ্ড থেকে ট্র্যাক্টর ও কম্বাইনের পার্টস তৈরি হয়। লারিসার বাবার নিপুণ হাতে যে স্ক্রু তৈরি হয় তা ছাড়া যন্ত্র কাজ করতে পারে না। ছেলেমেয়েরা রুদ্ধশ্বাসে দেখে তিনি কী ভাবে কাজ করেন।

মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সামাজিক জীবন সর্বোপরি উদ্‌ঘাটিত হয় তার মানবকল্যাণধর্মী শ্রমের মধ্যে। মানুষ অন্যের জন্য কী ভাবে পরিশ্রম করছে তার মধ্যেই প্রকাশ পায় মানুষের মনুষ্যত্ববোধ। আমার অন্যতম প্রাথমিক প্রয়াস ছিল যাতে শিশুদের পরিবেশের মধ্যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এই দিকটার প্রকাশ ঘটে। আমি চেষ্টা করি প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে যা যা সংশ্লিষ্ট আছে কেবল তাই নয়, যা আমাদের দেশের নতুন মানুষের মর্মমূলস্বরূপ — জন্মভূমি, সমাজ ও মানুষের প্রতি সেই সেবার মনোভাবও যেন শিশুদের মুগ্ধ করে, তাদের অনুপ্রাণিত করে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শিশুর ভালোবাসা — মানুষের নৈতিক গুণাবলীর উৎস।

নিসর্গ-সঙ্গীত

সঙ্গীত, সুরলহরী, গীতধ্বনির সৌন্দর্য — মানুষের নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বাহন, হৃদয়ের মহত্ব ও মনের নির্মলতার উৎসস্বরূপ। প্রকৃতি, নৈতিক সম্পর্ক আর শ্রমের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সঙ্গীত। সঙ্গীতের কল্যাণে কেবল পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যে নয় নিজের মধ্যেও মানুষ অনুভব করে উদাত্ত ভাব, মহিমা ও সৌন্দর্যের জাগরণ। সঙ্গীত হল স্বশিক্ষার এক শক্তিশালী বাহন।

একই শিক্ষার্থীদের কচি বয়স থেকে পরিণতি লাভের পর্ব

পর্যন্ত আত্মিক বিকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে শিশুদের উপর সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশনের স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত প্রভাব সঠিক নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার সহায়ক ত হয়ই না, বরং তার ক্ষতিই করে। বিশেষ করে ক্ষতিকর হল ঢালাও স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গীতের প্রভাব। শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে আমি যাকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হল এই যে সাঙ্গীতিক রচনার উপলব্ধি পর্যায়ক্রমে চালিয়ে যেতে হবে এমন পটভূমিকা উপলব্ধির সঙ্গে, যেখানে মানুষ সঙ্গীতের সৌন্দর্য বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। সেই পটভূমিকা হল মাঠ ও তৃণভূমির নীরবতা, ওক কাননের মর্মরধ্বনি, নীল আকাশে পাখির গান, পাকা গমের শীষের সরসের আওয়াজ, মৌমাছি ও ভ্রমরের গুনগুন ধ্বনি। এ সবই হল প্রকৃতির সঙ্গীত, সেই উৎসস্থল যেখান থেকে মানুষ সুরসৃষ্টির সময় আহরণ করে তার প্রেরণা।

সাধারণভাবে নন্দনতাত্ত্বিক উপলব্ধিতে এবং বিশেষত সঙ্গীত উপলব্ধিতে যা উল্লেখযোগ্য তা হল সেই মনস্তাত্ত্বিক অভিপ্রায়, যার দ্বারা শিক্ষক পরিচালিত হয়ে থাকেন সৌন্দর্যের জগতে শিশুদের দীক্ষাদান কালে। আমার প্রধান অভিপ্রায় ছিল সৌন্দর্যের প্রতি আবেগপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপনের **ক্ষমতা** গঠনের এবং নন্দনতাত্ত্বিক প্রকৃতির কোন প্রভাবের **তাগিদ** সৃষ্টির শিক্ষাদান। আমার দৃষ্টিতে, শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এই যে স্কুল মানুষকে সুন্দরের জগতে বাস করতে শেখাবে; মানুষ তখন সৌন্দর্য ছাড়া বাঁচতে পারবে না, জগতের সৌন্দর্য তার অন্তঃকরণেও সৃষ্টি করবে সৌন্দর্য।

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ে বেশি করে মনোযোগ দেওয়া হয় সঙ্গীত শোনার প্রতি — সাঙ্গীতিক রচনা আর নিসর্গ-

সঙ্গীত শোনার প্রতি। এক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল সুরের প্রতি আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তোলা, অতঃপর ধীরে ধীরে শিশুদের বুঝিয়ে দেওয়া যে সঙ্গীতের সৌন্দর্যের উৎস হল পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য; সঙ্গীতের সুর যেন মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছে: থাম, কান পেতে নিসর্গ-সঙ্গীত শোন, জগতের সৌন্দর্য উপভোগ কর, তাকে সযত্নে রক্ষা কর, তাকে বৃদ্ধি কর। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে মানুষ যেমন মাতৃভাষা, তেমনি সঙ্গীতবিদ্যার অ আ ক খ'ও আয়ত্তে আনতে পারে — অর্থাৎ সুরের সৌন্দর্য উপলব্ধির, বোঝার, অনুভবের, উপভোগের ক্ষমতা রাখে — একমাত্র শৈশবে। ছোটবেলায় যা হাতছাড়া হয়ে গেছে পূর্ণ বয়সে তা পূরণ করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। শিশুমন যেমন মাতৃভাষার শব্দের প্রতি তেমনি সঙ্গীতের সুরের প্রতিও সমান অনুভূতিশীল। অতি শৈশবে সাঙ্গীতিক রচনার সৌন্দর্য যদি শিশুর হৃদয়ে পেঁছে দেওয়া যায়, শিশু যদি ধ্বনির মধ্যে মানবিক অনুভূতির বহু বিচিত্র আমেজ অনুভব করতে পারে তাহলে সে সংস্কৃতির এমন ধাপে উঠতে পারে যে ধাপে আর কোন উপায়ে পেঁছনু সম্ভব নয়। সঙ্গীতের সুরের সৌন্দর্যবোধ শিশুর সামনে উন্মুক্ত করে তার নিজস্ব সৌন্দর্য — ছোট মানুষটি অনুভব করে নিজের যোগ্যতা। সঙ্গীতশিক্ষা — সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার শিক্ষা নয়, এ হল সর্বোপরি মানুষ হওয়ার শিক্ষা।

...শরৎকালের গোড়ার দিকে স্বচ্ছ বাতাসে যখন প্রতিটি ধ্বনি স্পষ্ট শোনা যায়, তখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমরা সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত সবুজ লন্-এ বসে থাকতাম। আমি রিম্স্কি-কোর্সাকভের 'জার সালতানের রূপকথা' অপেরা

থেকে ‘ভ্রমরের আকাশভ্রমণ’ অংশের সুর ওদের শুনতে দিলাম। সঙ্গীত শিশুদের মনে আবেগদীপ্ত সাড়া জাগাল। ওরা বলল: ‘ভোমরা কখনও এগিয়ে আসছে, কখনও দূরে সরে যাচ্ছে। ছোট ছোট পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে...’ আরও একবার বাজনাটা শুনলাম। তারপর গেলাম মধুভরা ফুটন্ত ফুল দেখতে। শিশুরা মৌমাছি আর ভ্রমরের গুঞ্জন শোনে। ঐ ত ঝাঁকড়া চেহারার বিরাট ভ্রমরটা কখনও ফুলের ওপরে উঠছে, কখনও নামছে। শিশুরা পরম পুলকিত: আরে টেপে যে রকম সুর বাজছিল এ প্রায় সেই রকমই! তবে সুরকারের রচনায় এমন একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে, যা সুরকার আড়ি পেতে প্রকৃতি থেকে শুনে আমাদের দিয়েছেন। বাচ্চারা আরও একবার টেপের বাজনাটা শুনতে চায়।

একদিন বাদে আমরা সকালে ফুটন্ত মধুভরা ফুলের জমিটাতে গেলাম। ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে মৌমাছিদের গুঞ্জন, ঝাঁকড়া ভ্রমরের গুনগুন আওয়াজ ধরার চেষ্টা করে। এর আগে পর্যন্ত তাদের কাছে যা ছিল সাধারণ ব্যাপার এখন তা খুলে দিল সৌন্দর্যের দ্বার -- এমনই সঙ্গীতের শক্তি।

আমি শোনানোর জন্য এমন সব বাজনা বাছতাম যেখানে শিশুদের বোঝার উপযোগী করে স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে তাদের আশেপাশে শোনা সুর: পাখির কলতান, পাতার মর্মরধ্বনি, বজ্রধ্বনি, নদীর কলধ্বনি, বাতাসের হুহুধ্বনি। ...এক্ষেত্রে আমি মাত্রার ব্যাপারে সচেতন থাকতাম। আবারও বলি, সঙ্গীতের মাত্রাতিরিক্ত ধারা শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকর; তাতে বিহ্বলতা দেখা দিতে পারে, অতঃপর মনের সংবেদনশীলতাই ভোঁতা হয়ে যেতে পারে। আমি মাসে দুটির বেশি বাজনা শোনাতাম না, কিন্তু প্রতিটি বাজনা শোনানোর

সময় পরিচালনা করতাম বড় রকমের শিক্ষাকর্ম, যার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের বারবার বাজনা শোনার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলা, প্রতিবারই বাজনা শোনার সময় যাতে তারা রচনার মধ্যে নতুন সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা।

আমরা ওক কাননের ভেতরে চলেছি। শেষ শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল শান্ত দিন, সূর্যের কিরণে গাছপালার বহুবর্ণের সাজসজ্জা জ্বলছে, শরতের পাখিদের গান শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে ট্র্যাক্টরের ঘর্ঘর আওয়াজ, আকাশে আসমানী রঙের মেলা — উড়ে চলেছে হাঁসের ঝাঁক। আমরা চাইকোভ্স্কির 'শরতের গান (অক্টোবর)' শুনি। হলদে রং ধরা ওক গাছের পাতার মৃদু শিহরণ, স্বচ্ছ বাতাসের সুবাস, পথপার্শ্বের ম্লান ডেইজী ফুল — পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির এই অনুপম সৌন্দর্য শিশুরা আগে লক্ষ্য করে নি, কিন্তু এখন সঙ্গীত তাদের সেই সৌন্দর্য উপলব্ধিতে সাহায্য করে।

শিশুদের মেজাজ প্রফুল্ল, তারা আনন্দিত, কিন্তু গম্ভীর সুর ঈষৎ বিষণ্ণতা সঞ্চার করে। ওরা অনুভব করে মেঘবাদলের দিন ঘনিয়ে আসছে, ঘনিয়ে আসছে ঠান্ডা তুষার ঝঞ্ঝার দিন যখন তাড়াতাড়ি নেমে আসে সন্ধ্যার আঁধার। সঙ্গীতের সুরের প্রভাবে তারা গ্রীষ্মের সৌন্দর্যের কথা বলে, সোনালি শরতের প্রথম দিনগুলির কথা বলে। প্রতিটি শিশুই উজ্জ্বল, ব্যঞ্জনাময় কিছু না কিছু মনে করে রাখে, এখন গ্রীষ্ম ও শরতের রূপ শিশুচৈতন্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে দেখা দেয়। যেমন, লারিসা বলে: 'বাবার সঙ্গে খাতে গিয়েছিলাম, খাতের ঢালের গা সবুজ — বন, বন আর বন, রোদে ঝলমলে বন। কোথায় যেন ঘুঘু পাখি ডাকছিল। কী সুন্দর, ওঃ কী সুন্দর!.. ইচ্ছে হচ্ছিল কেবলই চলি, আর সূর্য্যি যেন সব সময়ই

আলো দেয়। ঘুঘু পাখি যখন ডাকে তখন মনে হয় গাছের পাতা আড়ষ্ট হয়ে কান পেতে শোনে।'

শুরা স্মৃতিচারণ করে বলল: 'মা আমাকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। মা কাজ করছিলেন কম্বাইনের ধারে। কাকা কম্বাইন চালান -- আমি কাকার সঙ্গে কম্বাইনে বসে যাচ্ছিলাম। তারপর ঘুম পেয়ে গেল। মা আমাকে তাজা খড়ের গাদায় রেখে দিলেন। আমি নীল আকাশের দিকে তাকালাম, আর অমনি ভেসে উঠল খড়ের গাদা, মাটির অনেক অনেক ওপরে উঠে গেল। আমি কখনও ছোট্ট পাখিটার দিকে এগিয়ে যাই— আর পাখিটা কেবলই আকাশে ঝটপট করে — কখনও আবার আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাই। আমার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে বেড়ায় ফড়িংয়ের দল — পুরো দল বেঁধে গান গায়, পাখিটার মুখোমুখি ওড়ে। এই ভাবে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে যখন উঠলাম তখনও পাখিটা আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে, আর ফড়িংয়েরা আরও জোর গান ধরেছে।'

আমরা আরও একবার চাইকোভ্স্কির সুরটা বাজিয়ে শুনলাম, আমি অনুভব করলাম শিশুরা তার মধ্যে অবিস্মরণীয় গ্রীষ্ম ও শরতের সৌন্দর্য সম্পর্কে তাদের প্রাণের স্মৃতিচিত্রের সন্ধান পেয়েছে। শিশুরা নতুন নতুন স্মৃতিকথা শোনে।

'আমি আর বাবা মিলে একগাড়ি খড় নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি খড়ের গাদার ওপর শুয়ে থাকি — আকাশে তারারা মিটমিট করেছে। মাঠে বটের পাখি গান ধরেছে। তারাগুলো এত কাছাকাছি এসে গেল যে মনে হল হাত বাড়ালেই ধরা যায়, যেন ছোট বাতি।'

এ হল জিনার স্মৃতিকথা। আমি শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাই। আরে এই জিনাই না সবসময় চুপ করে থাকত!

ওকে মেরে কেটে ফেললেও কথা বার করা যায় না। অথচ গান কিনা তাকে দিয়ে কথা বলিয়ে ছাড়ল!

সঙ্গীত — ভাবনার শক্তিমান উৎসস্থল। সঙ্গীত-শিক্ষা ছাড়া শিশুর প্রকৃত মানসিক বিকাশ অসম্ভব। সঙ্গীতের প্রাথমিক উৎস কেবল পারিপার্শ্বিক জগৎ নয়, স্বয়ং মানুষ, তার অন্তর্জগৎ, মননক্রিয়া আর ভাষাও বটে। সাঙ্গীতিক রূপ মানুষের সামনে বস্তু ও বাস্তব ঘটনার বিশেষত্ব অন্য ভাবে উদ্‌ঘাটন করে। সঙ্গীত শিশুর সামনে নতুন আলোকে যে সব বস্তু ও ঘটনার উদ্‌ঘাটন ঘটায়, শিশুর মনোযোগ যেন সেগুলির উপর কেন্দ্রীভূত হয়, আর তার চিন্তা এঁকে চলে উজ্জ্বল চিত্র; সে চিত্র তখন হতে চায় বাঙ্‌ময়। শিশু জগতে নতুন নতুন ধারণা ও চিন্তাভাবনার উপাদান পেয়ে ভাষার সাহায্যে সৃজনে রত হয়।

সঙ্গীতের সুর শিশুদের উজ্জ্বল ধারণায় প্রবুদ্ধ করে। বুদ্ধিবৃত্তির সৃজনীশক্তি শেখানোর এ এক অতুলনীয় বাহন। গ্রিগের সঙ্গীতের সুর শুনে শিশুরা মনে মনে কল্পনা করে রূপকথার গুহা, দুর্ভেদ্য বন আর উদার স্বভাবের ও দুর্বৃত্ত প্রাণীদের রূপ। যারা রীতিমতো স্বল্পভাষী তারাও মুখর হতে চায়; শিশুরা পেন্সিল ও ড্রইং খাতার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, কাগজে আঁকতে চায় রূপকথার কল্পমূর্তির ছবি। সঙ্গীত সবচেয়ে নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির শিশুদেরও চিন্তা উদ্দীপিত করে তোলে। সঙ্গীত যেন মনন-কোষে এক যাদুকরী শক্তি সঞ্চার করে। সঙ্গীতের প্রভাবে মানসিক শক্তির এই যে বিকাশ তার মধ্যে আমি মননক্রিয়ার আবেগের উৎস দেখতে পাই।

শীতের দিনে আমাদের সবগুলো পায়ে-চলা পথ যখন বরফে ঢেকে গেল তখন আমরা স্কুলের ঘরে বসে চাইকোভ্‌স্কি,

গ্রিগ, শুবার্ট ও শুমানের সঙ্গীত শুনতাম। সন্ধ্যার আঁধারে শিশুরা পরম আনন্দ উপভোগ করত বিশেষত রূপকথা শুনে। আমি প্রথমে শিশুদের ইউক্রেনীয় লৌকিক রূপকথা ডাইনী 'বাবা-ইয়াগার' গল্প বলি, তারপর আমরা চাইকোভ্স্কির 'বাবা-ইয়াগার' সুর শুনি। এই সঙ্গীতের প্রভাবে যে কল্পমূর্তি ও ধারণার জন্ম হল তার ঐশ্বর্য ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। শিশুরা কল্পনায় ধাবিত হয় দূর পাহাড়-পর্বতের ওপারে, বন-উপবন ছাড়িয়ে, নীল আকাশের ওপারে, গোপন রহস্যময় গুহায় আর গিরিখাতে। ইউরার কল্পনায় পাজী ডাইনী বুড়ি বাবা-ইয়াগা পরিণত হল মানুষের শত্রুতে — সে মানুষের আনন্দের ওপর — গানের ওপর হামলা করে। 'ও একটা বড় টব নিল, হামানদিস্তায় চেপে বসে গোটা দুনিয়ার ওপর দিয়ে উড়তে থাকে। যে-ই গান শোনে অমনি নেমে আসে সেই জায়গায় যেখানে লোকে গান করছে, আমোদ করছে; হামানদিস্তার ওপর টব দিয়ে ঘা মারে, লোকে চুপ মেরে যায়, ভুলে যায় কী ভাবে গান করতে হয় — গান টবে লুকানো হয়েছে কিনা। এই ভাবে বাবা-ইয়াগা সব গান টবের ভেতরে লুকিয়ে ফেলে। রয়ে গেল কেবল একটি গাইয়ে রাখাল। সে বাঁশী বাজিয়ে গান গায়। ডাইনী টব দিয়ে হামানদিস্তার ওপর যতই ঘা মারুক না কেন কিছুই করতে পারে না: বাঁশীটা মন্ত্রপড়া কিনা। বাবা-ইয়াগা ত রাগে-দুঃখে জ্বলেপুড়ে যায়, সে তার গানের টবের ওপরে বসে থাকে, এদিকে দুনিয়ায় কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই, কেউ গান গায় না, কেউ আমোদ ফুর্তি করে না, কেবল রাখাল-বালক বাঁশী বাজায়। সে ঘুমিয়ে পড়ল। বাবা-ইয়াগা ওর বাঁশী চুরি করে নিল। ছেলেটা ঘুম থেকে জেগে উঠল। সাহসী ছেলেদের

জুটিয়ে নিয়ে চলল বাবা-ইয়াগার কাছে...' এর পর ইউরার কল্পনা — রাখাল-বালক কী ভাবে গানকে মুক্ত করল, কী ভাবে লোকে আবার আনন্দ ফিরে পেল। আশ্চর্য ঘটনা: সঙ্গীতের প্রভাবে শিশুর ধারণায় রূপকথার প্রাণীদের এত উজ্জ্বল রূপ গড়ে ওঠে, তাদের ভালো ও মন্দ রূপ এমনই মূর্ত হয়ে ওঠে যে মনে হয় তারা যেন ন্যায়সংগ্রামে নেমেছে।

শিশুদের মধ্যে আমি যখন চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করি তখনই আমি তাদের নিয়ে আসি ওক কাননে কিংবা বাগানে, আমরা সঙ্গীত শুনি — সে সঙ্গীত জাগিয়ে তোলে ভালো ও মন্দের স্পষ্ট ধারণা।

শীতকালে আমাদের স্কুলে আরও নতুন নতুন ভাবুকের স্বরূপ প্রকাশ পেল। ছোট্ট দাঙকো এতই লাজুক যে তার মুখ থেকে কথাই বার করা যায় না। কিন্তু এই ছেলেও একদিন বাবা-ইয়াগা সম্পর্কে নিজের বানানো রূপকথা বলল। সেটা অবশ্য অনেকটা ইউরার রূপকথার মতো ছিল। দাঙকোর রূপ-কথায় বাবা-ইয়াগা হামানদিস্তা চড়ে সারা দুনিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় আর সব ফুল ছিঁড়ে ফেলে; সে তার নরক-রান্নাঘরে এসে নামে, টবটা উনুনের ওপর রাখে — সব ফুল নষ্ট হয়ে যায়। শিশুরা প্রায়ই উদার চরিত্রের নায়ক রূপে নিজেদের কল্পনা করে, তাই দাঙকো বলল: 'আমি কিন্তু সবগুলো ফুলের বীচি জড় করে সেগুলোকে মাটিতে বুনে দিলাম। আবার ফুল ফুটল। বাবা-ইয়াগা একথা জানতে পারল, সে রাগে তার হামানদিস্তা আর হাড়-বার-করা পা ভেঙ্গে ফেলল, এখন আর সে লোকের মন্দ করতে পারে না।'

এই সব গল্পের পর প্রায়ই শিক্ষার বাধাবিপত্তি ও ত্রুটি নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আমার আলোচনা হত। আমরা একবাক্যে

সিদ্ধান্তে এলাম: শিক্ষাদানের সময় আমরা ভুলে যাই যে স্কুলে যারা শিক্ষা নিচ্ছে তাদের অধিকাংশই সর্বোপরি শিশু। শিশুদের মাথায় সাজানো সত্য, সাধারণীকৃত ধারণা, অনুমান পুরে দিতে গিয়ে শিক্ষক সময় সময় ভাবনা ও প্রাণোচ্ছল বাণীর উৎসের ধারেকাছে ঘেঁষার সুযোগ পর্যন্ত শিশুদের দেন না, স্বপ্ন, কল্পনা ও সৃজনের ডানা বেঁধে রাখেন। জীবন্ত, সক্রিয়, কর্মপ্রবণ প্রাণী থেকে শিশু পরিণত হয় যেন স্মৃতিশক্তির যন্ত্রে। ...না, এমন হওয়া উচিত নয়। পাথরের প্রাচীর দিয়ে পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে শিশুদের আড়াল করে রাখা ঠিক নয়। অন্তর্জীবনের আনন্দ থেকে শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা চলবে না। শিশুর অন্তর্জীবন একমাত্র তখনই পূর্ণমূল্যের, যখন শিশু বাস করে খেলার জগতে, রূপকথা, সঙ্গীত, কল্পনা ও সৃষ্টি জগতে।

বলাই বাহুল্য শিক্ষা হালকা খেলাধূলা হতে পারে না, হতে পারে না অখণ্ড ও স্থায়ী আনন্দের ব্যাপার। শিক্ষা — সর্বোপরি শ্রম। কিন্তু এই শ্রম সংগঠন করতে গিয়ে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি, নীতিজ্ঞান, আবেগবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ বিকাশের প্রতিটি স্তরে তার অন্তর্জগতের বৈশিষ্ট্যও বিবেচনা করে দেখতে হবে। বয়স্কব্যক্তির মানসিক শ্রমের সঙ্গে শিশুর মানসিক শ্রমের প্রভেদ আছে। বয়স্কব্যক্তির কাছে জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত লক্ষ্য তার বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগের মূল প্রেরণা হলেও শিশুর কাছে তা নয়। পড়াশুনার আকাঙ্ক্ষার উৎস নিহিত আছে শিশুর মানসিক শ্রমের অন্তর-প্রকৃতিতে, ভাবনার আবেগদীপ্ত বর্ণসুষমায়, বুদ্ধিপ্রয়োগের অভিজ্ঞতায়। এই উৎস ফুরিয়ে গেলে কোন উপায়েই শিশুকে বই পড়তে বাধ্য করা যাবে না।

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের প্রথম শীতকালের কথা আমি কখনই ভুলব না। সঙ্গীত, কল্পনা, সৃজন যদি না থাকত তা হলে আরামপ্রদ উষ্ণ ক্লাসরুম দেখতে দেখতে নিষ্প্রাণ হয়ে যেত। সঙ্গীত আশ্চর্য সুধা দিয়ে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎকে পরিপূর্ণ করে রাখত। জানুয়ারির সন্ধ্যার অন্ধকারে, চাঁদের নীচে রুপোলি গালিচার দীপ্তিতে, তুষার ঝঞ্ঝার ঘূর্ণিতে, জমাট-বাঁধা পুকুরের মড়মড় আওয়াজে — সর্বত্রই আমরা দেখতে পেতাম আমাদের কল্পনায় সৃষ্ট রূপকথার প্রাণীদের।

'আনন্দ নিকেতনের' প্রথম বসন্ত এলো, জলাধারার কুলু-কুলুধ্বনি উঠল, স্নো-ড্রপ ফুল ফুটল, আপেল আর নাসপাতি গাছ ছেয়ে গেল সাদা সাদা ফুলে — ফুলের রাজ্যে বেজে উঠল মৌমাছির গুঞ্জন। এই সময় আমরা শুনতাম বসন্তের বনের সঙ্গীত, নীল আকাশ, তৃণভূমি আর স্তেপের সঙ্গীত।

শান্ত সন্ধ্যায় আমরা গেলাম তৃণভূমিতে। আমাদের সামনে কোমল পাতায় ছাওয়া পুসি-উইলো, পুকুরে ছায়া পড়েছে অতলস্পর্শী আকাশের, নীল আকাশের বুকে উড়ছে রাজহাঁসের ঝাঁক। আমরা কান পেতে শুনি অপরূপ সন্ধ্যার গীতধ্বনি। পুকুরের বুকে কোথায় যেন শোনা গেল আশ্চর্য ধ্বনি — মনে হল কে যেন পিয়ানোর রীড সামান্য স্পর্শ করল, মনে হল বেজে উঠল পুকুর, বেজে উঠল তীরভূমি আর নীল আকাশ। 'কী ব্যাপার?' ভানিয়া ফিসফিস করে বলল। 'এ হল বসন্তের মাঠের বাজনা,' আমি ছেলেমেয়েদের বললাম। 'পুকুরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নীল আকাশের ছায়া। অনেক গভীরে আছে স্ফটিকের বিশাল ঘণ্টা। সেখানে, এক আশ্চর্য প্রাসাদে থাকে সুন্দরী বসন্তরানী। সোনার হাতুড়ি দিয়ে সে স্ফটিকের

ঘণ্টা স্পর্শ করল— সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল মাঠে।'

শব্দটা আবার হল। কোলিয়া হেসে বলল: 'আরে এ ত ব্যাঙের ডাক।' আমার ভয় হল ছেলেমেয়েরা হেসে উঠবে, যে মুগ্ধতা ওদের সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা কেটে যাবে। কিন্তু কেউ চমকাল না পর্যন্ত। 'হয়ত ব্যাঙ, আবার নাও হতে পারে,' সাশা বলল। 'আর হলই বা ব্যাঙ, গান গাইছে ত মাঠ।'

ওর কথার উত্তরেই যেন পাশের একটা পুকুরের বুকে আওয়াজ উঠল, কয়েক মুহূর্ত পরে সাড়া দিল দূরের তৃণভূমি। আমরা বসন্তের তৃণভূমির আশ্চর্য সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এই সঙ্গীত — আশাবাদী দৃষ্টিতে বিশ্ব-উপলব্ধির সঞ্জীবনী উৎস। এরই সাহায্যে শিশুরা সৌন্দর্যের মধ্যে অস্তিত্বের আনন্দ বুঝতে পারল, উদ্‌ঘাটন করতে পারল, অনুভব করতে পারল।

এপ্রিলের প্রথম রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে, যখন রোদের হল্‌কায় প্রাচীন টিলাগুলি ধিকিধিকি কাঁপতে থাকে, সেই সময় আমরা স্তেপে বেরিয়ে এলাম ভারুই পাখির গান শুনতে। নীল আকাশের গায়ে পাখা ঝাপটাচ্ছে জীবনের এক ধূসর পিণ্ড, আমাদের কানে ভেসে আসছে সোনালি ঘণ্টার মৃদুধ্বনি; হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেল, ধূসর পিণ্ডটা মাটির দিকে নেমে আসে; স্নিগ্ধ শ্যামল গমের খেতের ওপর পাখিটা ডানা টানটান করে ভেসে চলে, ধীরে ধীরে যেন এক অদৃশ্য সুতোয় টান দিতে দিতে ক্রমাগত ওপরে উঠতে থাকে। আমরা এখন যা শুনতে পাচ্ছি তা ঘণ্টাধ্বনি নয়, রুপোলি তারের বাজনা। ...আমার ইচ্ছে হচ্ছিল এই অপূর্ব সঙ্গীত যেন শিশুদের মনে গেঁথে থাকে, যেন পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্যের প্রতি

তাদের দৃষ্টি খুলে দেয়। আমি তাই ভারুই পাখির রূপকথা বলি।

'এ হল সূর্যপুত্র। শীতকালে সুয্যি আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যায়, মাটি তুষারে ঢেকে যায়, হিমে জমাট বেঁধে যায়। আস্তে আস্তে সুয্যি আমাদের কাছে ফিরে আসে, বরফ গলানো তার পক্ষে কঠিন। সে তখন বরফের স্তূপের ওপর গরম গরম ফুলকি ছুঁড়তে থাকে। যেখানে ফুলকি পড়ে সেখানে বরফ গলে চাপড়া বেরিয়ে আসে, জমির পিণ্ড জীবন্ত হয়ে ওঠে, জন্ম নেয় এক আশ্চর্য পাখি — ভারুই পাখি। সে নীল আকাশে ওঠে, ওড়ে সূর্যের মুখোমুখি। ওড়ে আর গান গায়। এদিকে সূর্য রুপোলি ফুলকি ছড়ায়। ভারুই নীল আকাশে ভেসে থাকে, মাটির দিকে তাকায়, দেখতে পায় সবচেয়ে জ্বলজ্বলে ফুলকিটি। দেখতে পেয়ে সে ঢেলার মতো মাটির দিকে নেমে আসে, ফুলকিটাকে আঁকড়ে ধরে, আর ফুলকিও চোখের পলকে হয়ে যায় মিহি রুপোলি সুতো। ভারুই পাখি সুতোর একটা দিক নামিয়ে দিল মাটির দিকে, সুতো ঝুলতে লাগল গমের শীষের ওপর, আরেকটা দিক টানতে টানতে নিয়ে সে ক্রমাগত উঠতে লাগল ওপরে, সূর্যের দিকে, নীল আকাশের দিকে। দেখছ, ওপরে উঠতে ওর কত কষ্ট হচ্ছে, ওর ছাইরঙা ডানা কেমন কাঁপছে। রুপোলি সুতোয় বাজনা বাজছে, যেন তারের আওয়াজ, আর ভারুই যত ওপরে উঠছে তারের বাজনার আওয়াজও তত চড়া হচ্ছে। ভারুই রুপোলি সুতোটা টেনে নিয়ে যায় একেবারে সুয্যির কাছে, তারপর আবার মাটিতে ফিরে আসে, আবার খোঁজ করে ফুলকির।'

রূপকথা প্রকৃতির সত্যিকারের নিয়ম জানার পথে বাধা হয়ে

দাঁড়ায় না ত? না, বরং তার উল্‌টো — জানার পথ সহজ করে দেয়। শিশুরা ভালোমতোই জানে যে একখণ্ড জমি চেতন পদার্থে পরিণত হতে পারে না, যেমন তারা জানে দত্যি-কামার বা বাবা-ইয়াগা ডাইনী বলে কেউ নেই। কিন্তু শিশুদের যদি এ সব না থাকত, যদি শুভ-অশুভের সংগ্রামের বোধ তাদের না হত, যদি তারা উপলব্ধি করতে না পারত যে রূপকথায় প্রতিফলিত হয়েছে সত্য, মান-মর্যাদা ও সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা তা হলে তাদের জগৎ হত সংকীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর।

ভারুই পাখির রূপকথা শিশুদের সাহায্য করল নিসর্গ-সঙ্গীত বুঝতে, তাদের সঙ্গীতের সুর শোনার উপযোগী করে তুলল। স্কুলে ফিরে এসে আমরা চাইকোভ্‌স্কির 'ভারুই পাখির গান' শুনি। সঙ্গীতের অপূর্ব ধ্বনির মধ্যে রুপোলি ঘণ্টার আওয়াজ এবং সূর্যের সঙ্গে শ্যামল শস্যক্ষেত্রের সংযোগ রচনাকারী মিহি রুপোলি তারের ধ্বনিপ্রবাহ ধরতে পেরে ছেলেমেয়েরা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ছোটদের ইচ্ছে হয় রূপকথার এই পাখি সম্পর্কে তাদের ধারণা উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ করে: তারা রূপকথায় শোনা ভারুই পাখি, রুপোলি ফুলকি আর মাটি থেকে সূর্য অবধি টানা তারের রূপ ছবিতে ফুটিয়ে তোলে।

ছেলেমেয়েরা যে সব সঙ্গীত পছন্দ করে সেগুলি নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আমাদের সঙ্গীতের অ্যালবাম। সময় সময় আমরা আমাদের ঘরে আসি, বাজনা শুনি। আমার মাথায় খেলল সঙ্গীতের ভাণ্ডার থেকে প্রতি বছর একটু একটু করে সেরা রচনা নিতে পারলে কেমন হয়? — গড়ে তুলব 'গানবাজনার ঘর'। সেখানে আমরা গান করা, পিয়ানো ও

বেহালা বাজানো শিখব — তবে এ হল ভবিষ্যতের কথা, আপাতত আমাদের সাদাসিধে বাঁশী চর্চা করেই দেখা যাক না।

এক মেঘলা দিনে আমরা এল্‌ডারের কুঞ্জবনে গেলাম, এল্‌ডারের ডাঁটা কেটে বাঁশী বানালাম। ডাঁটা পালিশ করে তাতে ফুটো করলাম। আমি ফুর্তিবাজ রাখাল সম্পর্কে ইউক্রেনীয় লোকগীতির সুর বাজালাম। শিশুরা যা আনন্দ পেল তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। প্রত্যেকের ইচ্ছে হল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় নিজের শক্তি পরীক্ষা করে দেখে, সকলেই নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র পাওয়ার স্বপ্ন দেখে। প্রত্যেকে যে যার বাঁশী তৈরি করে নিল। দেখা গেল লিদা, লারিসা, ইউরা, তিনা, সেরিওজা ও কোস্তিয়ার সঙ্গীতের ব্যাপারে সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি আছে, সুরবোধ আছে। কয়েকদিন বাদেই বাচ্চারা লোকগীতি ও নাচের বাজনা বাজাতে শুরু করল। সেই শান্ত সন্ধ্যার মুহূর্তটি কখনও ভুলব না যখন তিনা ইউক্রেনীয় লোকগীতির একটি সুর বাজিয়ে শোনাল। মেয়েটির চোখ দুটি জ্বলছিল, দুই গাল লাল হয়ে উঠেছিল। ওর মা আমাকে বললেন যে তিনা বাঁশী নিয়ে অনেকক্ষণ বাড়ির বাগানে বসে থাকে, নিজের মনেই কী যেন কল্পনা করে, সুর বাজায়, আর ধ্যানস্থ হয়ে আকাশের দিকে, গাছপালার দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন আমি খুব ভোরে স্কুলে এলাম। চারদিকে — নিস্তব্ধতা। এমন সময় কোথা থেকে যেন, বাগানের গহন কোন জায়গা থেকে ভেসে এলো বাঁশীর মৃদু আওয়াজ। আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। কে যেন আপন খেয়ালে বাঁশী বাজাচ্ছে, বাজান সুরটা স্পষ্টতই ছিল তাৎক্ষণিক রচনা। গোটা সুর জুড়ে বিশেষ করে প্রকাশ পাচ্ছে বিষণ্ণতা — উজ্জ্বল, খাঁটি বিষণ্ণতা। সঙ্গীতশিল্পীর সুরসাধনায় যাতে ব্যাঘাত না

ঘটে সেই উদ্দেশ্যে আমি সন্তর্পণে গোলাপ ঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঘাসের ওপর বসে ছিল তিনা। মনে হল বাঁশী যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর অস্তিত্বের অংশ। মেয়েটি তাকিয়ে ছিল ফুটন্ত গোলাপের দিকে, তার চোখজোড়া—দরদী, কোমল। এখন সুরটা আমার বোধগম্য হল: ওর বাজনার বিষয় ছিল সুন্দর ফুল, বসন্তের নীলাকাশ। আমার কাছে যা বিষণ্ণতা বলে মনে হচ্ছিল তা আসলে ছিল মনের উদ্বেগ — ও ধ্বনির মধ্য দিয়ে সঞ্চার করছিল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা।

কোস্তিয়াও বাঁশীতে আগ্রহী হয়ে পড়ল। ছেলেটির পক্ষে এক হাতে বাজানো কঠিন ছিল, কিন্তু দেখতে দেখতে সে কয়েকটি লোকগীতির সুর বাজাতে শিখে গেল, তারপর নিজেই 'সুর ভেবে' বার করতে লাগল — কল্পনা করতে লাগল, সঙ্গীতে নিজের ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি, মনোভাব সঞ্চারের চেষ্টা করল। একদিন বসন্তকালে ঝড়বৃষ্টির সময় আমরা আমাদের 'স্বপ্নপুরীতে' বসে ছিলাম। বজ্রপাত থেমে যেতে পৃথিবীর বুকে উঠল রামধনু — আমরা সবাই চুপ করে ছিলাম, দৃশ্যটির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। মৃদু সুর শোনা গেল— বাজাচ্ছিল কোস্তিয়া। বাজনায় ধরা পড়ল নদীর কলকলধ্বনি, এরপর তার জায়গায় এলো ভয়ংকর গুরুগুরু আওয়াজ — বাজডাকা মেঘ এগিয়ে আসছে, দূরে মেঘের আওয়াজ। ছেলেটা ভুলে গেল যে সকলে ওর বাজনা শুনছে, সে নিজের সৃষ্টিতে সম্পূর্ণ মগ্ন। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতে তার নজরে পড়ল বন্ধুবান্ধবের তন্ময় দৃষ্টি, সে লজ্জা পেয়ে গেল। ...এমন কথা মোটেই বলছি না যে ওদের সকলেই সঙ্গীতশিল্পী হবে, তবে আমার গভীর বিশ্বাস এই যে প্রত্যেক মানুষেরই সুর উপলব্ধির ক্ষমতা বিকশিত করে তোলা যায়।

এই সাদামাঠা লোকসঙ্গীতের শখ ছিল আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কখনও কখনও প্রকাশ পেত বাজনার বিশেষ মেজাজ: ছেলেমেয়েরা বসে বাজাতে চায়। প্রায়ই এটা ঘটত শান্ত সন্ধ্যায়, সূর্যাস্তের পর, যখন সূর্য দিগন্তের আড়ালে চলে গেলেও কিছুক্ষণের জন্য তার দীপ্তিতে ধরণী আলোকিত হয়ে থাকত।

বাজনার ব্যাপারে কোলিয়ার প্রখর শ্রবণশক্তি ছিল। সে চটপট লোকগীতির সুর বাজানো শিখে ফেলল। একবার আমরা যখন বন থেকে বাড়ি ফিরছিলাম তখন আমি কোলিয়াকে বললাম: 'মনে আছে যারা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে রূপোর মালা তৈরি করে সেই কামারদের ছবি তুই এঁকেছিলি? এখন চেষ্টা কর দেখি, বাঁশীর সুরে ঐ কামারদের কথা বলতে — বল দেখি কেমন করে ওরা হাতুড়ির ঘা মারে, কেমন করে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে ঠাণ্ডা ফুলকি...'

'না না ওগুলো ঠাণ্ডা নয়,' ও উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ জানাল। 'ওগুলো গরম, ওঃ, দারুণ গরম...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তা ত বটেই, গরমই বটে। ...তাছাড়া হাতুড়ি আর নেহাইয়ের ঠোকাঠুকিতে কি ঠাণ্ডা কিছু বেরোতে পারে? আমিও বাঁশীতে বলার চেষ্টা করব কামারদের কথা — সূর্যের কামারদের কথা।'

পরদিন সকালে আমরা স্কুলের বাগানে এলাম। আমরা আমাদের বাঁশীর সহজ-সরল সুরে আশ্চর্য কামারদের কথা বললাম। আমরা কেবল যে একে অন্যকে বুঝতেই পারছিলাম তা নয়, আমরা অনুভব করতে পারছিলাম সেই মেজাজ যার প্রভাবে আমাদের এই সুরের উদ্ভব। আমি মনোযোগ দিয়ে কোলিয়ার 'কামার' সঙ্গীত শুনি। ও যে কেবল কামারদের

হাতুড়ির মৃদু সুরেলা ধ্বনিই সঞ্চার করেছে তা নয়, শক্তিতে নিজের মুগ্ধতাও প্রকাশ করেছে। মাটিতে ও বাগানে যে রুপোলি কণাগুলি ঝরে ঝরে পড়ছে তাতে সে মুগ্ধ, সে বিষণ্ন এই ভেবে যে সমগ্র ধরণী তার দৃষ্টিতে আসছে না। তার ইচ্ছে হচ্ছে যে সৌন্দর্যকে সে ভাসা ভাসা অনুভব করছে তাকে দেখে।

হ্যাঁ, আমি এই শিশুর অন্তরলোকের পথ দেখতে পেলাম। সঙ্গীতের সুর অন্তরকে শিক্ষিত করে তোলে, অনুভূতির মানবায়ন ঘটায়। কথার মতো সঙ্গীতেও প্রকৃত মানবীয় গুণ ব্যক্ত হয়। সঙ্গীতের প্রতি শিশুর সংবেদনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে আমরা তার চিন্তা ও প্রয়াসকে মহিমান্বিত করে তুলি। কাজটা হচ্ছে এই যে সঙ্গীতের সুর যেন প্রতিটি হৃদয়ে মানবিক অনুভূতির সঞ্জীবনী উৎস খুলে দেয়। মাতৃভাষার রোমাঞ্চকর শব্দের মধ্যে যেমন, তেমনি সঙ্গীতের সুরের মধ্যেও শিশুর সামনে উন্মুক্ত হয় পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য। কিন্তু সুর — মানবিক অনুভূতির এই ভাষা — শিশুমনে কেবল জগতের সৌন্দর্যই পৌঁছে দেয় না। সুর মানুষের সামনে মানবিক মহিমা ও মর্যাদার উদ্ঘাটন ঘটায়। সঙ্গীত উপভোগের মুহূর্তে শিশু অনুভব করে যে সে খাঁটি মানুষ। শিশুমন — সংবেদনশীল সঙ্গীতশিল্পীর মন। তাতে তন্ত্রী টান টান বাঁধা আছে — কেউ যদি সে তন্ত্রী স্পর্শ করতে পারে তা হলে তাতে বেজে উঠবে মধুর সঙ্গীত। এটা কেবল আলঙ্কারিক অর্থে নয়, সরাসরি অর্থেও বটে। খেলাধুলা ছাড়া, রূপকথা ছাড়া ছেলেবেলা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব সঙ্গীত ছাড়া।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সঙ্গীত হল সর্বাপেক্ষা অনুকূল

এমন পটভূমি যার ওপর গড়ে ওঠে শিক্ষক ও শিশুদের আত্মিক মেলামেশা। সঙ্গীত যেন মানুষের হৃদয় উন্মুক্ত করে। সুর শুনতে শুনতে, সুরসৌন্দর্যের মর্মোপলব্ধির সময়, তাতে মুগ্ধ হওয়ার সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হয়ে পড়ে অন্তরঙ্গতর, ঘনিষ্ঠতর।

এই সহমর্মিতা কেবল সঙ্গীতই দিতে পারে, আর সহমর্মিতার এই মুহূর্তটিতে শিক্ষক শিশুর মধ্যে এমন বস্তুর সন্ধান পান যা সঙ্গীতের সাহায্য ছাড়া আর কখনই পেতেন না। সঙ্গীতের ধ্বনির প্রভাবে হৃদয় যখন সমুন্নত উপলব্ধিতে সমাচ্ছন্ন, তখন শিশু বিশ্বাস করে নিজের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা আপনাকে বলবে। এই রকমই এক মুহূর্তে কোলিয়া আমাকে বলে যে তার একটা ড্রয়িং খাতা আছে যেখানে যা যা তাকে চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন করে তোলে, তাকে আনন্দ দেয় তার ছবি সে আঁকে। পরে ছেলেটা আমাকে তার আঁকা ছবিগুলি দেখায়। আমার সামনে উন্মুক্ত হল স্বপ্নের জগৎ। কোলিয়ার ইচ্ছে ট্র্যাক্টর চালায়, সীমান্তরক্ষী হয়।

শীতের আনন্দ আর ঝামেলা

শীতকাল। ...এই অপরূপ সময়টার মধ্যে শিশুর শিক্ষাদীক্ষা ও বিকাশের কী অপূর্ব সম্ভাবনাই না নিহিত আছে! যাঁরা ভাবেন যে শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার সময় কেবল গ্রীষ্মকাল তাঁরা খুব ভুল করে থাকেন। স্বাস্থ্যকে শক্ত করে তোলার জন্য যদি শীতকালের অর্থাৎ শীতের পরিমিত হিম, প্রচুর অথচ নরম তুষারপাতের সুযোগ গ্রহণ না করা হয় তা হলে গ্রীষ্মকালেও কোন উপকার হবে না। আমি শিশুদের হিমের মধ্যে থাকতে

অভ্যাস করালাম, নির্মল হিমশীতল বায়ুসেবনে অভ্যাস করালাম।

সকালে আমরা স্কুলের হট্ হাউস-এ যাই সূর্যোদয় দেখতে। সূর্যের আলো হট্ হাউস-এর করিডরে, বরফজমা কাচের ওপর সিঁদুরে রঙে খেয়ালী নক্সা এঁকে দিত। প্রতিটি কাচের টুকরোর ওপর আমাদের কল্পনা অদ্ভুত অদ্ভুত জগতের ছবি আঁকত: আমরা দেখতে পেতাম কল্পজগতের জন্তুজানোয়ার, রহস্যময় গিরিখাত, মেঘ, ফুল। এখানে বরফজমা কাচের সামনে ছেলেমেয়েরা কেবল রূপকথাই রচনা করে না। তারা পড়তেও শেখে। এ বিষয়ে আমি পরে বলব।

সূর্যের দেখা পাওয়ার পর ছেলেমেয়েরা করিডর থেকে হট্ হাউস-এ প্রবেশের দ্বার খুলত, প্রবেশ করত ফুলের রাজ্যে। শীতকালে আমাদের একটা হট্ হাউস-এ চন্দ্রমল্লিকা ফোটে। প্রতিটি শিশুর এখানে ছিল নিজের ফুল — নিজের বন্ধু। শিশুরা গাছে জল দিত। এই মুহূর্তগুলি ছিল আনন্দের: ছোট ছোট জলবিন্দুর ওপর রামধনুর ঝিকিমিকি খেলত, শিশুরা মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকত, স্বপ্ন দেখত গ্রীষ্মকালের। ...এখানে সূর্যের সেতু — সোনালি রামধনু সম্পর্কে রূপকথা জন্ম নেয়।

প্রতিবার তুষার ঝঞ্ঝার পর শীতের সাদা চাদর যখন নবরূপ ধারণ করত তখন আমরা তুষারের স্তূপ দেখার জন্য স্কুলের বাগানে যেতাম। তুষারের স্তূপ — এ এক আশ্চর্য জগৎ; মেঘের জগতের মতোই রহস্যময় ও অপ্রত্যাশিত। খেয়ালী তুষার স্তূপগুলির মধ্যে শিশুরা দেখতে পেত দুর্গম পাহাড়ের চুড়োয় রূপকথার দুর্গ, সমুদ্রের জমাট ঢেউ, সাদা রাজহাঁস, ছাইরঙা নেকড়ে, ধূর্ত শেয়াল। একদিন প্রকৃতি যেন বিশেষ করে

আমাদের জন্যই সৃষ্টি করল রূপকথার জাহাজ — পালতোলা জাহাজ, তাতে আছে ক্যাপ্টেনের সেতু, নোঙ্গর আর জলদস্যুর দল — জলদস্যুরা যেন দূরের কোন জায়গা নিরীক্ষণ করছে। বাতাস ও সূর্য যে পর্যন্ত জাহাজটাকে না ভাঙল সে পর্যন্ত পর পর কয়েক দিন আমরা ওটাকে দেখতে যাই। আর সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমেয়েরা স্কুলে জমায়েত হত, আমার মুখ থেকে শুনত জলদস্যুদের কথা, অন্যায় ভাবে অপমানিত ও দুর্বল মানুষদের মুক্তিদাতা — উদার লোকজনের কথা, শুভ ও অশুভের সংগ্রাম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের জয়লাভের কাহিনী।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যখন পড়ত তখন আমরা বেড়াতে যেতাম না। অল্পস্বল্প হিম হলে ছেলেমেয়েরা বাইরেই থাকত। একটু গরম পড়তে শুরু হল আমাদের সত্যিকারের উৎসব। পাইওনয়িররা আমাদের তুষারনগরী গঠনে সাহায্য করে। তুষারফলক দিয়ে তারা আশ্রয়স্থল বানায় — সেটা দেখতে হল অনেকটা গুহার মতো। এখানেও বিশ্রাম ও কাজের সময় সঙ্গী হল রূপকথা ও খেলাধূলা। আমরা মেরু অভিযাত্রী সেজে খেলা খেলতাম। আমি শিশুদের মহামৌন বরফরাজ্যের রূপকথা বলতাম। তাতে মানুষের সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে জড়িত থাকত কল্পনা। সূর্যের কিরণে বাচ্চাদের সেই আশ্রয়স্থান গলে যেতে তাদের মন খারাপ হয়ে যায়।

শীতকালে আমরা দুবার বনে যাই — একবার মোটরগাড়িতে, আরেকবার ঘোড়ায় চড়ে। মৃদু হিমের ছাঁট গালে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কেউই ঠাণ্ডার জন্য অভিযোগ করে না। শীতকালের বনে কাটানো দিনগুলিও শিশুদের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকে। আমরা শীতকালের বনের সঙ্গীত শুনি,

পাখিদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করি। বনের গিরিখাতের ভেতরে আমরা একটা প্রস্রবণ দেখতে পেলাম — সেটা তখনও জমে যায় নি। আমরা ক্যাম্পফায়ারের ধারে শরীর গরম করলাম, জাউ রান্না করলাম। গোধূলির সৌন্দর্য উপভোগ করলাম, আমাদের সামনে তুষারে ঢাকা ডালপালার বর্ণিমা পালটাতে লাগল -- কখনও হালকা গোলাপী, কখনও কমলা, কখনও রক্তিম, কখনও বা নীলচে বেগনী। সূর্য তার অসাধারণ খেয়ালি কল্পনায় আর সৌন্দর্যে শিশুদের এমন মাতিয়ে তুলল যে সূর্যের রূপকথা নবরূপে ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠল। এখানে আমরা কবিতা বানালাম, সে কবিতায় শিশুরা শীতের বন সম্পর্কে তাদের ধারণা ব্যক্ত করল। কাতিয়া তুষারের সাজ-পরা দেবদারুর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বলল:

'দেবদারু ঘুমোচ্ছে।'

জিনা আরও উজ্জ্বল একটা রূপ আঁকল:

'গ্রীষ্ম অবধি দেয় দেবদারু ঘুম...'

'বসন্ত অবধি দেয় দেবদারু ঘুম,' সেরিওজা বলল, অমনি সকলে অনুভব করল এই কথাগুলির সঙ্গীতপ্রাণতা। বাচ্চাদের ইচ্ছে হচ্ছিল বন্ধুর ভাবনার জের টানে।

'ঘুম ঘুম চোখে তার স্বপ্নের ধুম,' ওদের মধ্যে কে যেন বলে উঠল।

বসন্ত অবধি দেয় দেবাদারু ঘুম।
ঘুম ঘুম চোখে তার স্বপ্নের ধুম...

ছেলেমেয়েরা গান ধরল, নিজেরাই যে গান বেঁধেছে এজন্য তারা গর্ব অনুভব করল। শীতের এই সন্ধ্যা আমার সামনে শিশুর আন্তর ঐশ্বর্যের গোটা জগৎ তুলে ধরল। আমার এই মত চূড়ান্ত

ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল যে শিশুদের ভাবতে শেখানো, তাদের মানসিক শক্তি ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো সরাসরি ভাব ও ভাষার উৎসস্থলেই বাঞ্ছনীয়।

শীতকালীন প্রকৃতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে শিশুদের সামনে উন্মুক্ত হয় মেঘমুক্ত শান্ত হিমেল সন্ধ্যায়। আমরা বাগানের কোথাও দাঁড়িয়ে থাকি, রক্তিম প্রদোষের দিকে তাকাই, প্রথম নক্ষত্রমালার প্রতীক্ষা করি। সন্ধ্যার আলোয় উদ্ভাসিত তুষারপুঞ্জকে মনে হত গোলাপী, তারপর ফিকে বেগনী। এই মুহূর্তগুলিতে যে সব অনুভূতি শিশুদের আচ্ছন্ন করত তার প্রকাশ ঘটত কথায় আর সুরে। অনুপম সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মনে পড়ে যায় লোকগীতির সুর। আমরা মুগ্ধ হয়ে স্কুলে ফিরে যাই, চুল্লিতে আগুন জ্বলাই, গান গাই।

শীতকালের শান্ত সকালে ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হয় প্রভাতকিরণে। তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে সৌন্দর্যের অনুধ্যান করে। তারা নিজেদের পুলক প্রকাশের ভাষা খোঁজে। আমি তাদের ভাষার সন্ধান পেতে সাহায্য করি। প্রতিটি প্রাপ্তি কেবল যে আনন্দেই উদ্বুদ্ধ করে তুলত তা নয়, তা মননশক্তির বিস্ফুরণও হত।

ভারুই পাখির প্রথম উৎসব

শীতকালে পাখিদের খাঁচা আর পশুদের 'ডাক্তারখানার' ধারে আমরা স্বপ্ন দেখতাম বসন্তের ঈষদুষ্ণ দিনের, যখন আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা নীল আকাশে উড়বে, লাফিয়ে কুঞ্জবনে যাবে। অবশেষে এলো সেই দীর্ঘপ্রতীক্ষিত উৎসব। আকাশে যে দিন প্রথম ভারুই পাখি দেখা গেল তার একদিন বাদে

আমরা পশুপাখির খাঁচা বয়ে নিয়ে এলাম টিলার চুড়োয়। স্তেপ পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত। ছেলেমেয়েরা খাঁচা খুলতেই ভারুই, কাঠঠোক্‌রা, ওরিঅল, খরগোশ মাঠে বেরিয়ে এলো। আমাদের ভারুই পাখি দেখতে দেখতে আকাশে উঠে গিয়ে গান ধরল; ও এখন আবার নেমে আসছে মাটির দিকে। ...আমরা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, প্রাণীদের জীবন রক্ষা করতে পেয়েছি ভেবে আনন্দ অনুভব করি।

এই মুহূর্তে আমার মনে খেলে গেল ভবিষ্যতের ভাবনা: প্রতি বছর আমরা টিলার চুড়োয় আসি ভারুই পাখির উৎসব পালন করতে।

ভারুই পাখির উৎসব যেন বসন্ত ও গ্রীষ্মের সন্ধিস্থল হয়ে দেখা দিল। শিশুরা পাখির ছানার জীবন রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্মানের ব্যাপার বলে গণ্য করল। প্রতিটি শিশুরই দেখা দিল 'জীবন ও সৌন্দর্যের' নিজস্ব 'নিভৃত লোক'। ভারুই পাখির রূপ, সূর্যকরোজ্জ্বল মাঠের ওপর তার সুরের রেশ— এ সবই শিশুদের অন্তর্লোকে চিরস্থায়ী আসন লাভ করল। ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে উৎসবের প্রতীক্ষায় থাকত — তার আরও কারণ এই যে এদিনটির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে শিল্পসৃষ্টির প্রবল উদ্দীপনা: মায়েদের সঙ্গে মিলে ওরা সাদা ময়দার কাই দিয়ে তৈরি করত নানা রকমের পাখি, নিজেদের তৈরী জিনিস নিয়ে আসত স্কুলে। ছোটদের ক্ষুদ্র সৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠত ভালোবাসার অনুভূতি, প্রতিটি শিশু নিজের মতো করে সৌন্দর্য সম্পর্কে তার ধারণার রূপ দিত।

শরৎকালে ছেলেমেয়েরা বিষণ্ন মনে বাসাবদলকারী পাখিদের কাছ থেকে বিদায় নেয়। এই বিষাদ মানবহৃদয়কে মহিমান্বিত করে তোলে। এছাড়া সহৃদয়তার অস্তিত্ব নেই।

আমাদের লেখাপড়া চর্চা

বাচ্চারা কী ভাবে পড়তে ও লিখতে শিখল তার বিবরণ দেব। প্রিয় পাঠকবর্গ, আমি এখানে যা যা বলব তাকে লেখাপড়া শেখার নতুন কোন পদ্ধতি বলে মনে করবেন না। আমি আমাদের সৃজনকর্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে গভীর চিন্তায় লিপ্ত হই নি — শিশুদের সৃজনকর্ম বলতে যা বোঝায় এ হল ঠিক তাই, যাকে বলা যায় শিশুদের বিদ্যাদানের সহায়ক সৃজনকর্ম — তাই লেখাপড়া শেখানোর জন্য দীর্ঘকালের পরীক্ষিত যে পদ্ধতি আছে এটাকে কোনমতেই তার কোন বিকল্প মনে করা ঠিক হবে না। এই সৃজনকর্মের জন্ম হয় মাঠে ও তৃণভূমিতে, ওককাননের ছায়ায়, স্তেপের উষ্ণ বায়ুতে, গ্রীষ্মকালের প্রভাতে ও শীতের সন্ধ্যায়।

শিশুর বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম পর্বে পড়া ও লেখা তার পক্ষে যে কী কঠিন, ক্লান্তিকর, নীরস হয়ে দাঁড়ায় সে-সম্পর্কে আমি বহু বছর ধরে ভেবেছি, ভেবেছি জ্ঞানের কণ্টকাকীর্ণ পথে শিশুরা কত ব্যর্থতারই না সম্মুখীন হয় — আর এ সবেরই কারণ এই যে শিক্ষা হয়ে পড়ে খাঁটি পুঁথিগত। আমি লক্ষ্য করেছি, ক্লাসে অক্ষর চেনার জন্য শিশু কত প্রয়াসই না ব্যয় করে। এদিকে অক্ষরগুলি যেন তার চোখের সামনে নাচতে থাকে, মিলেমিশে রূপ নেয় এমন এক নক্সায় যার মর্মোদ্ধার করা অসম্ভব। সেই সঙ্গে আমি এও লক্ষ্য করেছি যে শিশুরা কত সহজেই না অক্ষর মনে রাখে, অক্ষর দিয়ে শব্দ রচনা করে যখন এই শিক্ষা ব্যাপারটি কোন ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, যখন তা সম্পর্কিত হয় খেলাধূলার সঙ্গে, আর বিশেষত যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল যখন শিশুর কাছ থেকে

কেউ দাবি করে না: শিখতেই হবে, না শিখলে খারাপ হবে।

বিদ্যালয়-জীবনের গোড়া থেকেই শিক্ষার কণ্টকাকীর্ণ পথে শিশুর সামনে উপাস্যবস্তু হয়ে দেখা দেয় নম্বর। কোন কোন শিশুর পক্ষে তা ভালো, উৎসাহব্যঞ্জক, আবার কারও কারও পক্ষে — রূঢ়, নির্মম, অকরুণ। কেন এরকম হয়, কেন তা একজনের পৃষ্ঠপোষকতা করে, আরেকজনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে — শিশুদের কাছে দুর্বোধ্য। সাত বছরের শিশু কী করে বুঝবে তার নিজের শ্রমের উপর, ব্যক্তিগত প্রয়াসের উপর নম্বর পাওয়া ব্যাপারটার নির্ভরতা — তার পক্ষে এটা তখনও বোধাতীত। সে চেষ্টা করে হয় তার উপাস্যকে তুষ্ট করতে নয়ত — বেগতিক দেখলে — তাকে ঠকাতে, ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এমন এক শিক্ষালাভে যার উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত আনন্দ উপভোগ নয় — নম্বর পাওয়া। আমি অবশ্য বিদ্যালয়-জীবন থেকে নম্বর উঠিয়ে দেওয়ার একেবারেই পক্ষপাতী নই। না, নম্বরকে এড়ানোর কোন উপায় নেই। তবে নম্বর শিশুর কাছে তখনই আসা উচিত যখন সে শিক্ষার ব্যাপারে খাটানো ব্যক্তিগত প্রয়াসের উপর নিজের মানসিক শ্রমের উৎকর্ষতার নির্ভরতা বুঝতে পারবে।

আর সবচেয়ে বড় কথা, আমার মতে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নম্বরের কাছ থেকে দাবি হল তার আশাবাদী, প্রাণোচ্ছল বনিয়াদ। নম্বর আলস্য ও অমনোযোগিতার শাস্তি না হয়ে যেন হয় অধ্যাবসায়ের পুরস্কার। খারাপ নম্বরকে যদি শিক্ষক অলস ঘোড়াকে চাঙ্গা করে তোলার চাবুক বলে ভাবেন আর ভালো নম্বরকে যদি মনে করেন মিঠাইমণ্ডা তাহলে অচিরেই চাবুকের মতো মিঠাইমণ্ডার উপরও শিশুর বিতৃষ্ণা এসে যাবে।

শূন্য বা ঐ জাতীয় নম্বর — অত্যন্ত ধারাল ও সূক্ষ্ম হাতিয়ার — প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে এ হাতিয়ার সবসময় হাতের পাঁচ হিশেবে থাকে, কিন্তু তিনি কখনই তা কাজে লাগান না। জেনে রাখুন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাতিয়ারটি এই কারণেই থাকা উচিত যাতে তাকে কখনও কাজে লাগানো না হয়। শিক্ষকের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রাজ্ঞতা এখানেই যে শিশু যেন কখনও নিজের শক্তির ওপর আস্থা না হারায়, সে যেন কখনও অনুভব না করে যে সে কোন সুবিধা করতে পারছে না। প্রতিটি কাজ হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর পক্ষে অগ্রগতির প্রেরণাস্বরূপ — অন্তত স্বল্প পরিমাণে হলেও। সাত বছরের বাচ্চা সবে স্কুলে প্রবেশ করেছে, এখনও অ-আ'র কোন প্রভেদ শেখে নি — হঠাৎ তাকে দেওয়া হল খারাপ নম্বর। ব্যাপারটা সে বুঝে উঠতে পারে না, এমন কি গোড়ায় না পায় দুঃখ, না অনুভব করে উদ্বেগ। সে স্রেফ হতচকিত হয়ে পড়ে। 'শিশুর অজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা করুন', পোল্যান্ডের শিক্ষাবিদ ইয়ানুশ কর্চাকের এই কথাগুলি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

শিক্ষক যখন মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে সুগভীর প্রাজ্ঞতার অধিকারী হন — যখন শিশুর অজ্ঞতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ জন্মায় একমাত্র তখনই খারাপ নম্বরের ধার ও সূক্ষ্মতা থাকবে, কিন্তু তা কখনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহৃত হবে না।

শিশুদের থাকতে দিতে হবে সৌন্দর্যের জগতে, খেলাধুলা, রূপকথা, ছবি আঁকা, গান বাজনা, কল্পনা আর সৃষ্টির জগতে। এমন কি যখন আমরা শিশুকে লেখাপড়া শেখাতে চাই তখনও এই জগতের পরিমণ্ডলে তাকে রাখতে হবে। জ্ঞানের

সোপানের প্রথম ধাপে ওঠার সময় শিশু মনে মনে কী রকম অনুভব করবে, তার কী অভিজ্ঞতা হবে — এরই ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতে জ্ঞানলোকে তার যাত্রাপথ। একথা ভাবতেই ভয় লাগে যে এই ধাপ অনেক শিশুর কাছে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। স্কুলের জীবন ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন, দেখবেন, অক্ষরজ্ঞান চর্চার পর্বেই বহু শিশু নিজের শক্তির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তাই বলি, আসুন, এই ধাপ বয়ে এমন ভাবে ওপরে ওঠা যাক যাতে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, যাতে জ্ঞানের পথে প্রতিটি পদক্ষেপ পিঠের দুর্বিষহ বোঝায় অবসন্ন, শক্তিক্ষয়প্রাপ্ত পথিকের ক্লান্ত পদযাত্রা না হয়ে পাখির মহিমাদীপ্ত পক্ষসঞ্চারণ হয়।

আমি শব্দের উৎসস্থলে শিশুদের নিয়ে 'পর্যটন' শুরু করলাম: জগতের সৌন্দর্যের দিকে শিশুদের চোখ খুলে দিলাম, সেই সঙ্গে শব্দের সঙ্গীত শিশুদের হৃদয়ে পেঁৗছে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। শব্দ যাতে শিশুর কাছে বস্তু, পদার্থ ও ঘটনার নিছক প্রতীক না হয়ে নিজস্ব আবেগের বর্ণসুষমা — নিজস্ব ঘ্রাণ, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আমেজ বহন করে আনে এই চেষ্টায় আমি ফল লাভ করলাম। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে শিশুরা যেন সুরের মতো শব্দও মনোযোগ দিয়ে শোনে, যেন শব্দের সৌন্দর্য এবং জগতের যে অংশ সে শব্দ প্রকাশ করে তার সৌন্দর্য মানুষের ভাষার সঙ্গীতদ্যোতক চিত্রের প্রতি — অক্ষরের প্রতি তার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। শিশু যতক্ষণ না শব্দের সৌরভ অনুভব করছে, যতক্ষণ না শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করছে ততক্ষণ বর্ণপরিচয় মোটেই শুরু করা যাবে না, আর শিক্ষক যদি সে কাজ করেন তা হলে তিনি শিশুকে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে ফেলবেন

(শিশু অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই কঠিনতা জয় করে, তবে তার জন্য তাকে মূল্য দিতে হয় বিরাট)।

লেখাপড়া শেখানোর প্রক্রিয়া তখনই সহজ হবে যখন অক্ষরজ্ঞান শিশুর কাছে প্রাণবান রূপ, ধ্বনি ও সুরে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, হৃদয়গ্রাহী জীবনখণ্ড হয়ে দাঁড়াবে। শিশুর মনে রাখার বিষয়কে সর্বোপরি আকর্ষণীয় হতে হবে। বর্ণপরিচয়কে অঙ্কনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হতে হবে।

ভাষার উৎসভূমিতে 'পর্যটনের' সময় আমরা যেতাম ড্রইং খাতা আর পেন্সিল নিয়ে। আমাদের একটা 'পর্যটনের' কথা বলি। আমার উদ্দেশ্য ছিল 'মাঠ' শব্দটির সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার পরিচয় ছেলেমেয়েদের দিই। পুকুরের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে পুসি-উইলো, আমরা তার নীচে বসলাম। দূরে সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে সবুজ মাঠ। ছেলেমেয়েদের বললাম: 'দেখ আমাদের সামনে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে। ঘাসের ওপর প্রজাপতি উড়ছে, মৌমাছি গুনগুন করছে। দূরে — একপাল গোরু চরছে, খেলনার মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে মাঠ যেন একটা হালকা সবুজ নদী, আর গাছপালা — ঘন সবুজ পার। গোরুর পাল সেই নদীতে চান করছে। দেখ, শরতের এই প্রথম দিকে কত সুন্দর সুন্দর ফুলে মাঠ ছেয়ে গেছে। এসো, মাঠের গান কান পেতে শোনা যাক: শুনতে পাচ্ছ পোকামাকড়ের মিহি গুনগুন আওয়াজ, ফড়িংদের গান?'

আমি ড্রইং খাতায় মাঠের ছবি আঁকি; আঁকি গোরু আর হাঁস — হাঁসেরা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সাদা সাদা ফেঁসোর মতো, আর আঁকি প্রায় নজরে না পড়ার মতো ধোঁয়া, দিগন্তে সাদা মেঘ। শান্ত সন্ধ্যার সৌন্দর্যে শিশুরা মুগ্ধ, ওরাও আঁকে। আমি ছবির নীচে লিখি: 'মাঠ'। অধিকাংশ শিশুর কাছেই

অক্ষর হল ছবি। আর প্রতিটি ছবিই কিছু না কিছু মনে করিয়ে দেয়। আমরাও সেই ভাবেই আঁকলাম। যেমন, ঘাসের দুটো ডাঁটা একসঙ্গে আঁকলাম — হল আ-কার চিহ্ন। বাচ্চারাও সোৎসাহে তাদের ছবির নীচে 'মাঠ' শব্দটা লেখে। তারপর আমরা এই শব্দটা পড়ি। নিসর্গ-সঙ্গীতের প্রতি সংবেদনশীলতা শব্দের ধ্বনি উপলব্ধিতে শিশুদের সাহায্য করে। প্রতিটি অক্ষরের আঁচড় মনে গেঁথে বসে, ছেলেমেয়েরা প্রতিটি রেখায় সঞ্চার করে প্রাণবন্ত ধ্বনি, অক্ষর সহজেই মনে থেকে যায়। শব্দের ছবি গৃহীত হয় যেন এক অখণ্ড রূপে, ওরা শব্দ পড়ে — আর এই পাঠ ধ্বনিবিশ্লেষ ও ধ্বনিসংশ্লেষের দীর্ঘকালীন চর্চার ফল নয়, এ হল শিশুদের সদ্য-আঁকা ছবির দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের উপযোগী ধ্বনিময় ও সঙ্গীতধর্মী রূপ সচেতন পুনরুৎপাদনের ফল। দৃশ্য ও ধ্বনি উপলব্ধির এই অখণ্ডতার ফলে অক্ষর আর ছোট শব্দ — দুইই এককালে মনে রাখা যায়। মনে করবেন না, এটা বর্ণপরিচয়ের কোন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার। বিজ্ঞানে যা হয়েছে এ হল তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ: যা মনে রাখার কোন বাধ্যবাধকতা নেই তা অনেক সহজে মনে থাকে; গ্রাহ্য রূপের আবেগময় বর্ণসুষমা — মনে রাখার ব্যাপারে অসাধারণ বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে।

শব্দের দৃশ্যরূপ, ধ্বনি ও আবেগধর্মী বর্ণসুষমার ঐক্য আদৌ শব্দের স্বতন্ত্র, পৃথক পৃথক ধ্বনিবিশ্লেষণকে অগ্রাহ্য করে না। বরং তার উলটো — 'মাঠ' শব্দটির ধ্বনি মনোযোগ দিয়ে শোনার সময় ছেলেমেয়েরা শব্দের ভিতরকার প্রতিটি ধ্বনিকে বিচ্ছিন্ন করে, বুঝতে পারে যে শব্দ হল পৃথক পৃথক ধ্বনির সমষ্টি আর প্রতিটি ধ্বনির দ্যোতক একটি করে অক্ষর আছে।

কয়েক দিন বাদে নতুন 'পর্যটন'। আমরা সকালে স্কুলের বাগানে আসি, সূর্যকে অভ্যর্থনা জানাই। লন্-এর ঘাস, গাছের পাতা, আঙুরগুচ্ছ, হলুদ নাশপাতি, জামরঙের প্লাম—সব কিছুর গায়ে বিন্দু বিন্দু শিশির। প্রতিটি শিশিরবিন্দুতে ঝিকমিক করছে সূর্যের ফুলকি। ফুলকিগুলো এক জায়গায় মিলিয়ে যাচ্ছে, হাজির হচ্ছে অন্য জায়গায়। যেন কতক শিশিরবিন্দু সূর্য পান করছে, কতক ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এটা মনের ভুল। আসলে শিশিরবিন্দুতে ফুলকি দেখা যায় তখনই যখন সূর্যের আলো তার ওপর এসে পড়ে। কিন্তু শিশির যায় কোথায়? কতক বিন্দু উবে যায়, কতক ধীরে ধীরে ঘাসের ডাঁটা বয়ে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়, মাটি সেগুলিকে শুষে নেয়। শিশির না থাকলে ঘাস ও ফুল শুকিয়ে যেত। তারপর আমরা অ্যাস্টার, নেস্টার্টিয়াম ও গোলাপ ফুলের ওপর শিশিরের ঝলমলে বিন্দু দেখি। আমি ঘাসের ডাঁটা, নেস্টার্টিয়াম ফুল, সূর্য আর ঝিকিমিকি ফুলকিসমেত শিশিরবিন্দু আঁকি। ছেলেমেয়েরাও আঁকে। ছবির নীচে লিখি: 'শিশির'। অক্ষরগুলি এমন ভাবে আঁকি যে বাচ্চাদের কাছে দেখতে হয় সূর্য আর শিশিরবিন্দুর মতো। ছবি হয়ে ওঠা অক্ষরগুলি পড়ি। বাচ্চারা সকলেই যে যার মতো অক্ষরগুলি লেখে — আঁকার মধ্যে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে যে যার ধারণা প্রকাশ করে।

বাচ্চাদের সকলকে বলি শিশিরবিন্দু সমেত ঘাসের ডাঁটা আঁকতে। ওরা ওদের ছবির নীচে 'শিশির' শব্দটি লেখে। শিশুরা আঁকল, লিখল — কথাটা বলা সহজ। তাদের কাছে কিন্তু যেমন ছবি, তেমনি ঐ লেখাটাও রূপ, ধ্বনি, রং ও উপলব্ধির এক পরিপূর্ণ জগৎ। প্রতিটি অক্ষর

শিশুর চৈতন্যে প্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে, তাই গোটা শব্দ এবং প্রতিটি অক্ষরও সে সহজেই মনে রাখতে পারে।

কয়েকদিন ধরে আমরা বারবার শিশিরবিন্দুর সৌন্দর্য উপভোগ করি, বারবার ছবি আঁকি আর লিখি। আর প্রতিটি নতুন ছবি—নিয়মিত কোন অনুশীলন নয়, সৃজনকর্ম। 'শিশির' শব্দটি নিয়ে আমাদের সৃজনকর্ম চলল দু-তিন সপ্তাহ। প্রতিটি ছেলেমেয়ে তার পছন্দসই ডাঁটা কিংবা ডাল আঁকে, শব্দের ধ্বনি হৃদয়ঙ্গম করে, শব্দের পৃথক পৃথক ধ্বনি বিশ্লেষণ করে, সেগুলিকে অক্ষরে রূপ দেয়। পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুর সঙ্গে অক্ষরের মিল—বস্তুতই শিশুদের সৃজনকর্ম, কল্পনা, রূপকথা।

ড্রইং খাতার মলাটের ওপর আমি শিরনামা লিখি: 'মাতৃভাষার শব্দ'। 'এই ড্রইং খাতা আমরা অনেক বছর ধরে রেখে দেব,' আমি বাচ্চাদের বললাম, 'রেখে দেব যত দিন না তোমরা স্কুল শেষ করছ, বড় হচ্ছে। তোমাদের প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ড্রইং খাতা থাকবে, আর এটা হবে আমাদের সকলের ড্রইং খাতা।'

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল, প্রাণবন্ত ভাষার উৎসসন্ধানে আমাদের নতুন নতুন 'পর্যটন' চলল। বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় হল গ্রাম, পাইন বন, ওক, উইলো, বন, ধোঁয়া, বরফ, পাহাড়, শীষ, আকাশ, খড়, উপবন, লাইম, আপেল গাছ, মেঘ, টিলা—এই সব শব্দের সঙ্গে পরিচয়। বসন্তকালে আমাদের 'পর্যটনের' উপলক্ষ হল ফুল, লাইলাক, লিলি, আঙুর, পুকুর, নদী, সরোবর, মেঘ, বৃষ্টি, বাজ, ভোর, পায়রা, পপলার, চেরী। প্রতিবার 'মাতৃভাষার শব্দ' ড্রইং খাতায়

সেই বাচ্চাই ছবি আঁকত যার মনে শব্দ সবচেয়ে উজ্জ্বল ধারণা, অনুভূতি ও স্মৃতির জাগরণ ঘটাত। মাতৃভাষার সৌন্দর্যে কেউই উদাসীন থাকতে পারল না। ১৯৫২ সনের বসন্তের মধ্যেই, অর্থাৎ আমাদের কাজ শুরুর মাস আষ্টেক বাদেই ছেলেমেয়েরা সব অক্ষর জেনে গেল, তারা শব্দ লিখতে পারত, পড়তে পারত।

এখানে যান্ত্রিক ভাবে এই অভিজ্ঞতা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। এই পদ্ধতিতে লিখতে ও পড়তে শেখানো — এক ধরনের সৃজনকর্ম; কোন সৃজনকর্মই গতানুগতিক ধারায় চলে না। নতুন কিছু গ্রহণ করা যেতে পারে একমাত্র সৃজনী মন নিয়ে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে শিশুদের সামনে বর্ণপরিচয়ের ও পড়তে শেখার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। জ্ঞানের প্রথম ধাপে ছেলেমেয়েরা উঠছিল খেলাধূলার মধ্য দিয়ে; তাদের মানসজীবন সৌন্দর্যে, রূপকথায়, সঙ্গীতে, কল্পনায়, সৃজনে আর ভাববিলাসিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। যা শিশুদের অনুভূতিকে আলোড়িত করত তা তারা ভালো করে মনে রাখত, তারা সৌন্দর্যে মুগ্ধ হত। আমি অবাক হয়ে গেলাম এই দেখে যে বহু ছেলেমেয়ে কেবল মুখের কথায় তাদের অনুভূতি প্রকাশ না করে লিখেও প্রকাশ করতে চায়।

একবার আমরা বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বনের ভেতরে পাহারাদারের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। মেঘ গুরগুর করে উঠল, বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। মাটির ওপর ছোট ছোট পংক্তির আকারে শিলাবৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ছিল। বৃষ্টির পরও সেগুলি কিছুক্ষণ সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে ছিল। মেঘের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি মারল, ছোট ছোট শিলগুলি সবুজ

হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা মহানন্দে চিৎকার করে উঠল: 'ওঃ কী সুন্দর!' পরদিন বাচ্চাদের ইচ্ছে হল গতকাল যা দেখেছে তা আঁকবে। ইউরা, সেরিওজা, শুরা, গালিয়া ত তাদের ছবির নীচে কিছু কিছু করে লিখেই ফেলল। ওরা তখনই ভালো পড়তে পারত, আমি দেখলাম তাদের প্রথম লেখা রচনা। সেগুলি এই রকম: 'মেঘ ঘাসে শিল ছড়িয়ে দিয়েছে', 'সবুজ ঘাসে সাদা শিলাবৃষ্টি', 'সূর্য সাদা শিলাবৃষ্টিকে গলিয়ে দিল', 'বাজ ঢেলে দিয়েছে সাদা শিল'।

এই নিদর্শনে আমার আরও একবার প্রত্যয় হল: শিশুরা ভাবনা ও ভাষার প্রাথমিক উৎসের—পারিপার্শ্বিক জগতের যত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবে ততই তাদের ভাষা বেশি ঐশ্বর্যময় ও ভাবগর্ভ হয়ে উঠবে। আমার বিশ্বাস ছিল এই যে শিগ্গিরই আমার ছেলেমেয়েরা সকলেই ছোট আকারের রচনা লিখতে পারবে। ১৯৫২ সনের গ্রীষ্মকালে আমার এই বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণিত হল। স্কুলের এলাকার এক কোণায় লাগান হয়েছিল পপি ফুলের গাছ। গাছের ডাঁটাগুলি যখন নানা রঙের শত শত ফুলে জ্বল জ্বল করছে তখন আমি ছেলেমেয়েদের ওখানে নিয়ে এলাম। সৌন্দর্য শিশুমনে আনন্দানুভূতির তরঙ্গ জাগিয়ে তুলল। আমরা অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে ফুলগুলি দেখতে লাগলাম, মৌমাছির গুঞ্জন শুনলাম। পর দিন ড্রইং খাতা আর রঙিন পেন্সিল নিয়ে ঐ জায়গাটায় এলাম। ছেলেমেয়েরা আঁকতে বসে গেল, আমি তাদের পপি বীজের রূপকথা বললাম, বললাম যে রামধনু ওকে সাত রঙের সৌন্দর্য উপহার দিয়েছে। অনেক ছেলেমেয়েই তাদের মুগ্ধতা ভাষায় প্রকাশ করতে চাইল, তারা স্পষ্ট, ভাবগর্ভ রচনা লিখে ফেলল: 'পপি ফুলের গালিচা ঝলমল করছে' (তানিয়া), 'পপি ফুলের গালিচা মাটি ঢেকে

দিয়েছে' (নিনা), 'পপি ফুটল, সূর্য খুশি' (জিনা), 'পপির গালিচার ওপর মৌমাছি গুনগুন করছে' (গালিয়া), 'সূর্য মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছে লাল, নীল, গোলাপী ফুল' (লারিসা), 'নীল পাপড়ির ওপর ঝাঁকড়া ভোমরা' (সেরিওজা), 'সরু ডাঁটায় ফুলেরা দুলছে' (শুরা), 'পপি ফুলের ভেতরে সূর্য খেলছে' (কোলিয়া), 'আকাশ থেকে পড়ল নীল পাপড়ি, মাটিতে ফুটে উঠল গালিচা' (কাতিয়া)। ছবিসমেত এই লেখাগুলি ছেলেমেয়েরা পরে তাদের ড্রইং খাতা থেকে 'মাতৃভাষার শব্দ' ড্রইং খাতায় তোলে।

আমরা যখন সূর্যমুখীর মাঠে, বাক হুইটের জাঁকাল মাঠে 'পর্যটন' করি তখন শিশুদের কল্পনা প্রাণোচ্ছল নির্ঝর হয়ে, উজ্জ্বল রূপ নিয়ে খেলা করে। পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য শিশুদের যত বেশি উদ্দীপিত করে তোলে ততই অক্ষর তাদের মনে গভীর দাগ কেটে বসে, যদিও এই লক্ষ্যটি কখনও মুখ্য হয়ে সামনে দেখা দিত না। আমার ক্রমেই এই বিশ্বাস দৃঢ় হতে লাগল যে বর্ণাঢ্য রূপে বিশ্বদর্শন এবং সৌন্দর্যের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা—এ হল শিশুর মননের হৃদয় ও প্রাণসত্তা। শিশুর মনন—শিল্পসম্মত, বর্ণাঢ্য, ভাবাবেশে পরিপূর্ণ মনন। শিশু যাতে বুদ্ধিমান, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তার জন্য অতি শৈশব থেকে শিল্পীর দৃষ্টিতে বিশ্বদর্শনের সুখ তাকে দিতে হবে।

শিশু যখন সুন্দরকে দেখে, অনুভব করে তখন তার চৈতন্যে কল্পনা, সৃজন ও প্রাণবন্ত ভাবনার কী অফুরান প্রবাহই না উৎসারিত হয়। প্রাণবান শব্দের উৎস অভিমুখে আমাদের এক 'পর্যটনের' কথা আমি কখনই বিস্মৃত হব না। গ্রীষ্মের এক দিনে আমরা যৌথখামারের মৌচাষের বাগানে গেলাম। মৌচাষী

দাদু আমাদের টাটকা মধু আর ঝরনার ঠান্ডা জল দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বাচ্চারা আপেল গাছের নীচে বসল, জমকাল বাক হুইটের মাঠের সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল। মৌমাছির দল স্তেপে ওড়া শেষ করে মৌচাকে ফিরে আসছিল, তারা ঠান্ডা জলের ক্ষীণ স্রোতধারার ওপর মৃদু গুঞ্জন করছিল। 'ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে ফুল, কুঞ্জবন, বাক্ হুইট আর সূর্যমুখীর কথা, ঝলমলে পপি ফুল আর নীল ঘাসফুলের কথা,' ছেলেমেয়েরা বলল।

পাঁচ বছর বাদে আমার শিক্ষার্থীরা যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে, তখন আমি ওদের লিখতে বলি রূপকথা—'মৌমাছিরা কী নিয়ে গুনগুন করে'; সঙ্গে সঙ্গে জুন মাসের এই দিনটির অবিস্মরণীয় ছাপ ধারণ করে সুস্পষ্ট আকার, ভাবনার প্রাণবন্ত প্রবাহ। হ্যাঁ, খুব ছেলেবেলায় যার ওপর টান পড়েছে তা কখনই ভোলা যায় না। তাই দেখতে হবে শৈশব যেন শিশুদের চৈতন্যে চিরকালের জন্য মাতৃভাষার সৌন্দর্য, পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য স্মৃতিবদ্ধ করে রাখে। দেখতে হবে জ্ঞানের খাড়া ও কঠিন সোপানে প্রথম পদক্ষেপ যেন সৌন্দর্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

শিশুদের অক্ষরপরিচয়ের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের অন্তর্লোকে গ্রন্থ আরও বেশি স্থান করে নিতে লাগল। আমরা ছবিওয়ালা বইয়ের ছোট গ্রন্থাগার তৈরি করে ফেললাম। দুর্ভাগ্যবশত বইয়ের দোকানে ভালো কিছু পাওয়া গেল না তাই আমাকে নিজেকেই বই আঁকতে ও লিখতে হল। প্রথম যে ছবির বই আমি আঁকি তা ছিল তুষার দাদু, দুষ্ট সৎমা, ভালো সৎ মেয়ে আর অলস মেয়ে সম্পর্কে ইউক্রেনীয় লোককথা। বইটি দাঁড়াল বেশ বড়ই—৩০ পৃষ্ঠারও বেশি,

প্রতিটি পৃষ্ঠায় একটি করে ছবি আর কয়েকটি বাক্য (কখনও কখনও একটি বাক্য)। ১৯৫২ সনের বসন্তকালের মধ্যে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই অনর্গল পড়তে শিখে গেল। বিশেষ করে ভালো পড়তে পারত ভারিয়া, কোলিয়া, গালিয়া, লারিসা, সেরিওজা ও লিদা। আমরা লন্-এ বসে থাকি, আমাদের মধ্যে কেউ একজন ছবির বই খুলে পড়তে থাকে। ...ব্যাপারটি নিছক শব্দ আর শব্দ দিয়ে তৈরি বাক্য পড়া নয়। এ হল সৃজনকর্ম। রূপকথা পড়তে পড়তে শিশু যেন ছবিতে রূপায়িত জগতে চলে যায়। তার পাঠের ভঙ্গি ভালোমানুষ তুষার দাদু, দুষ্ট সৎমা, পরিশ্রমী ও কোমল স্বভাবের সৎ মেয়ে, অলস ও নিষ্ঠুর মেয়ের অনুভূতি ও কার্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সঞ্চার করে। ছেলেমেয়েরা পাঠের মর্ম গভীর ভাবে উপলব্ধি করে: তারা হিংসাকে ঘৃণা করে, শুভবুদ্ধির জয়ে আনন্দ অনুভব করে।

কৌতূহলের বিষয় এই যে শিশুরা কত বার যে রূপকথাটা পড়ে তার ইয়ত্তা নেই, তথাপি সবসময়ই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শোনে। আমার মনে পড়ল শিক্ষকের উদ্বেগ: ছেলেমেয়েরা কেন একঘেয়ে ভাবলেশহীন সুরে পড়ে? কেন শিশুদের পাঠে ক্বচিৎ শুনতে পাওয়া যায় ভাবাবেগের ব্যঞ্জনা? তার কারণ এই যে বহু ক্ষেত্রে পাঠ হয় শিশুদের মনোজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের ভাবনা, অনুভূতি ও ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন। শিশুর মন আলোড়িত করে এক জিনিস, অথচ সে পড়ছে আরেক জিনিস সম্পর্কে। পাঠ একমাত্র তখনই শিশুর জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে যখন শব্দ তার অন্তরের অন্তস্তলকে স্পর্শ করে।

আমরা নতুন নতুন ছবির বই বানাতে লাগলাম। ইউরা, সেরিওজা, কাতিয়া, লিউবা, লিদা, লারিসা ছবি আঁকল। এমন

একটিও বাচ্চা ছিল না যার আঁকতে ইচ্ছে হত না। বর্ণপরিচয়ের বাধা অতিক্রম করা গেল প্রধানত আঁকার প্রতি আগ্রহের কল্যাণে।

১৯৫২ সনের গ্রীষ্মকালে ছেলেমেয়েরা ছাপার অক্ষরে ছোট ছোট শিশুপাঠ্য বই পড়তে শুরু করল। সেগুলির মধ্যে ছিল লেভ তলস্তয় কর্তৃক পরিমার্জিত লোককথা ও ক. উশিনস্কির 'মাতৃভাষা' থেকে ছোট ছোট কাহিনী, রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশকিন, মিখাইল লেরমনতভ ও নিকোলাই নেক্রাসভের কবিতা, ইউক্রেনীয় কবি তারাস শেভচেঙ্কো, লেসিয়া উক্রাইনকা ও ইভান ফ্রাঙ্কোর কবিতা। একবার উশিনস্কির সংকলন থেকে 'বাচ্চারা, স্কুলে এসে জোট' নামে কবিতাটা পড়ে বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে সেটা মুখস্থ করে ফেলে। এতে আমি আনন্দ পেলাম, আবার উদ্বিগ্ন হলাম বর্ণমালা থেকে শুরু করে পাঠের জন্য নির্দিষ্ট বহু বইয়ের কথা ভেবে, যেখানে থাকে আনাড়ি ধরনের কবিতার ছড়াছড়ি। কেরানির ভাষায় লেখা নীরস কবিতা শব্দের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে বরং কাব্যিক অনুভূতিই নষ্ট করে ফেলে বলে মনে হয়।

নিজের প্রতিটি সাফল্য, প্রতিটি বাধাবিপত্তি নিয়ে আমি শিক্ষকদের সঙ্গে মত বিনিময় করতাম। প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষার জন্য প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের শিশুদের প্রস্তুত করে তোলা আমাদের স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে কর্মরত শিক্ষকদের সমষ্টিগত দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল। শিক্ষকদের সৃজনী অভিজ্ঞতায় প্রতি বছর শিক্ষাদানের পদ্ধতি—আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, ক্লাস-বহির্ভূত ও স্কুল-বহির্ভূত শিক্ষাকর্ম উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করে গভীরতা প্রাপ্ত হয়; আর উক্ত

পদ্ধতি শিশুদের মানসিক বিকাশের ঐক্য সাধনে এবং সাফল্যের সঙ্গে পড়াশুনা করার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এই সব দক্ষতার মধ্যে পাঠের স্থান প্রথম।

যে-সমস্ত শিক্ষক প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের শিশুদের শিক্ষাদীক্ষার কাজে মেতেছেন আজ কয়েক বছর হল তাঁরা এত সাফল্য অর্জন করেছেন যে তাঁদের পালিত সন্তানেরা ক্লাসে শিক্ষালাভের গোড়াতেই পড়তে শিখে যায়। এর ফলে কেবল প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে নয়, মাধ্যমিক এবং উচ্চ শ্রেণীগুলিতেও শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সহজ হয়ে আসে। আমাদের দীর্ঘকালীন সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষার সময় শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে, সৃজনশীল মানসিক শ্রমে দ্রুত, ভাবগর্ভ, সচেতন পাঠের ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। সে সিদ্ধান্তের মূলকথা এই যে শিশু যত অল্প বয়সে পড়তে শুরু করে, পাঠ যতই তার সমগ্র মনোজীবনের সঙ্গে অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত হয়, ততই জটিল হয় পাঠের সময় তার মননক্রিয়ার ধারা, ততই বেশি করে পাঠ থেকে লাভ করা যায় মানসিক বিকাশ। যে শিশু ৭ বছরের আগে পড়তে শিখেছে সে অর্জন করে পরম মূল্যবান দক্ষতা: চোখ ও মন দিয়ে শব্দ ও বাক্যাংশ গ্রহণে তার ক্ষমতা উচ্চারণ করে পড়াকে ছাড়িয়ে যায়। পড়ার সময় শিশু শব্দে আটকে থাকে না, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ের জন্য বই থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়ার সুযোগ তার আছে এবং উচ্চারণে যা দাঁড়াবে এই সময়ের মধ্যে সে তা ভাবে, হৃদয়ঙ্গম করে। এই ভাবে শিশু একই সঙ্গে পড়ে ও ভাবে, হৃদয়ঙ্গম করে, মনে মনে ধারণা করে।

আমাদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ঠিক এই ধরনের দ্রুত পাঠই সচেতন শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

মানুষের মাঝে তোমার বাস

স্কুলের এলাকার এক নির্জন কোণে পাইওনিয়ররা চন্দ্রমল্লিকা লাগিয়েছিল। শরৎকালে এখানে সাদা, নীল ও গোলাপী রঙের ফুল ফুটল। উজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ একটি দিনে আমি আমার ছেলেমেয়েদের এখানে নিয়ে এলাম। ফুলের প্রাচুর্যে বাচ্চারা মহা খুশি। কিন্তু তিক্ত অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে সৌন্দর্যের প্রতি শিশুদের এই মুগ্ধতা অনেক সময় স্বার্থপর হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিশু ফুল ছিঁড়তে পারে—ব্যাপারটা তার কাছে বিন্দুমাত্র নিন্দনীয় বলে নাও ঠেকতে পারে। এবারেও তা-ই হল। আমি দেখতে পেলাম বাচ্চাদের হাতে হাতে একটা-দুটো করে অনেকগুলো ফুল গেল। যখন প্রায় অর্ধেক ফুল চলে গেল তখন কাতিয়া চেঁচিয়ে বলল:

'চন্দ্রমল্লিকা ছেঁড়া কি ভালো?'

তার কথার মধ্যে কোন আশ্চর্যের ভাব ছিল না, বিক্ষোভও ছিল না। মেয়েটির নেহাৎই জিজ্ঞাসা। আমি কোন জবাব দিলাম না। এই দিনটি শিশুদের কাছে শিক্ষণীয় হোক। ওরা আরও কয়েকটা ফুল তুলল, জায়গাটা হতশ্রী হয়ে পড়ল, লন্‌টা খালি খালি দেখাচ্ছিল। শিশুমনে সৌন্দর্যমুগ্ধ যে আবেগ দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তা নিভে গেল। ওরা বুঝতে পারছিল না ফুল নিয়ে কী করবে।

'কী হল, জায়গাটা সুন্দর?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'এই

যে, যে-ডাঁটাগুলো থেকে তোমরা ফুল ছিঁড়ে ফেললে সেগুলো কি সুন্দর?'

ছেলেমেয়েরা চুপ করে থাকে। তারপর একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল:

'না, বিচ্ছিরি...'

'এখন আমরা কোথায় গিয়ে ফুল দেখে আনন্দ করব?'

'এই ফুলগুলো লাগিয়েছে পাইওনিয়ররা,' আমি ছেলেমেয়েদের বললাম। 'ওরা সুন্দর জিনিস দেখে আনন্দ করার জন্যে এখানে আসবে—এসে কী দেখবে? ভুলে যেও না তোমরা মানুষের মাঝে বাস করছ। প্রত্যেকেই চায় সুন্দর জিনিস দেখে আনন্দ পেতে। আমাদের স্কুলে অনেক ফুল আছে, আচ্ছা ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে যদি একটি করে ফুল ছিঁড়ে নেয় তাহলে কী দাঁড়াবে? কিছুই থাকবে না। লোকের আর আনন্দ পাওয়া কিছু থাকবে না। সুন্দর জিনিস ভাঙ্গার জন্যে নয়, নষ্ট করার জন্যে নয়, তা গড়তে হয়। শরৎকাল আসবে, শুরু হবে ঠান্ডা দিন। আমরা এই চন্দ্রমল্লিকাগুলোকে উঠিয়ে লাগাব হট্ হাউস-এ। আমরা সৌন্দর্য দেখে আনন্দ করব। একটা ফুল ছিঁড়তে গেলে দশটা বড় করে তুলতে হয়।'

কয়েক দিন বাদে আমরা আরেকটা লন্-এ গেলাম। এখানে ছিল আরও বেশি সংখ্যায় চন্দ্রমল্লিকা। বাচ্চারা এবারে আর ফুল ছিঁড়ল না। তারা সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল।

মানুষের জন্য সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টির আহ্বানের প্রতি শিশুহৃদয় সংবেদনশীল — কেবল যা গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে আহ্বানের অনুসরণে নিয়োগ করতে হবে শ্রম। শিশু যদি অনুভব করতে পারে যে তার পাশে পাশে লোকজন আছে এবং সে তার কাজকর্মের মধ্য দিয়ে তাদের আনন্দ দিতে

পারে, তাহলে সে অন্য লোকের স্বার্থের মাপকাঠিতে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে মাপতে শেখে। আর উদারতা ও মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষার পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের আকাঙ্ক্ষার সীমা যে না জানে সে কখনই সুনাগরিক হতে পারে না। স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অপরের দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন লোকজন ঠিক তাদের ভেতর থেকেই গড়ে ওঠে যারা শিশুকালে কেবল নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকেই জানে, আর দশজনের স্বার্থ দেখে না। আপাত দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অথচ বস্তুত অতি জটিল এই মানবিক অভ্যাসকে — আকাঙ্ক্ষাকে — নিয়ন্ত্রণ করতে জানাটাই হল মনুষ্যত্ববোধের, সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা ও অভ্যন্তরীণ আত্মশাসনের উৎস, আর এছাড়া বিবেকের অস্তিত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই মানুষের মতো মানুষের।

এখানে ফের জোর দিয়ে উল্লেখ করতে হয় মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষায় কনিষ্ঠ বয়ঃসীমার গুরুত্ব। নীতিজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, অভ্যাস — এ সবই অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। অলঙ্কারের ভাষায় বলতে গেলে, অনুভূতি হল উচ্চ নৈতিক আচরণের অনুকূল জমি। যেখানে সংবেদনশীলতা নেই, পারিপার্শ্বিক জগৎকে উপলব্ধির সূক্ষ্মতা নেই সেখানে বৃদ্ধি পায় নির্দয়, নির্মম লোকজন। শখের অনুভূতিপ্রবণতা, সংবেদনশীলতা শৈশবেই রূপ পরিগ্রহ করে। শৈশব যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে সে ক্ষতি আর কখনও পূরণ করা যায় না।

মানবিক সম্পর্কের জটিল জগতের সঙ্গে শিশুর পরিচয় সাধন — শিক্ষাদীক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির একটি। শিশুরা আনন্দ ছাড়া থাকতে পারে না। শৈশব যাতে সুখী হয় তার জন্য আমাদের সমাজ চেষ্টার ত্রুটি করে না। কিন্তু আনন্দ

চিন্তাভাবনাহীন হওয়া উচিত নয়। বড়রা যত্ন করে যে আনন্দের তরুকে বড় করে তুলেছে, শিশু যখন কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করে, লোকের কী থাকল না থাকল সে চিন্তা না করে সেখান থেকে ফল ছেঁড়ে, তখন বুঝতে হবে সে হারিয়েছে মানুষের পরম গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম—হারিয়েছে বিবেক। শিশু যখন উপলব্ধি করে যে সে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভাবী নাগরিক, তার আগে তাকে শিখতে হবে কী করে উপকারের প্রতিদানে উপকার করতে হয়, নিজের হাতে মানুষের সুখ ও আনন্দ গড়ে তুলতে হয়।

'আনন্দ নিকেতন' স্থাপিত হওয়ার আগেই বেশ কয়েক বছর ধরে যে চিন্তাটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তা এই যে বহু মা-বাবাই নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতি সহজাত অন্ধ ভালোবাসাবশত তাদের মধ্যে কেবল ভালোটাই দেখেন, চরিত্রের খারাপ দিকগুলি লক্ষ্য করেন না। মনে পড়ছে একটি ঘটনা—৪ বছরের ছেলে পায়খানায় না গিয়ে মা আর পাড়া পড়শীদের চোখের সামনে প্রয়োজনীয় কাজটা সারল। মা কিন্তু রাগ করলেন না বরং গদগদ কণ্ঠে বললেন: 'দেখছেন আমাদের ছেলে কেমন—কিছুতেই ঘাবড়ায় না।' চার বছরের বাচ্চার আবদারে দৃষ্টিতে, ফোলানো ঠোঁটে, অবজ্ঞাপূর্ণ হাসিতে তখনই আন্দাজ করা যাচ্ছিল তার নীচতা; আর এই নীচতাকে যদি ঢিট না করা যায়, অন্য লোকে তাকে কী দৃষ্টিতে দেখছে সে সম্পর্কে যদি তাকে সচেতন না করে তোলা যায় তা হলে কালে সে পরিণত হবে দুর্বৃত্তে।

ভলোদিয়ার মা'র সঙ্গে আমাকে একাধিকবার কথাবার্তা বলতে হয়েছে। যেই তিনি কোন কথা বলতে শুরু করেন অমনি ছেলে তাঁর পোশাক ধরে টানাটানি করে, হাত ধরে

ঝোলাঝুলি করে—সবসময়ই ছেলের কোন না কোন একটা জরুরী কাজ আছে। নাছোড়বান্দা ভাব ও আলগা আলগা থাকার মনোভাব—ব্যক্তিসর্বস্বতারই দুই প্রকারভেদ, আর এর উৎস হল সাতখুন মাপ, গদগদ ভাব ও শাস্তি না দেওয়া। বাবা-মা'দের মধ্যে কেউ কেউ (দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন শিক্ষকও) মনে করেন যে শিশুদের সঙ্গে কথাবার্তায় সবসময় শিশুসুলভ কোন সুর অনুসরণ করা উচিত; এই সুরের মধ্যে শিশুর সংবেদনশীল কান গদগদ ভাব ধরে ফেলে। বয়স্ক ব্যক্তির আধো আধো কথাবার্তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শিশুর অমার্জিত হৃদয়ে খামখেয়ালিপনা জাগে। এই সুর যে কী রকম বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে সে বিপদ সম্পর্কে আমি সবসময় সতর্ক ছিলাম এবং আমার সামনে যে আছে সে যে শিশু একথা মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত না হয়েও আমি খুদে মানুষটির মধ্যে দেখতাম ভবিষ্যতের সাবালক নাগরিককে। মানুষের জন্য শ্রমের প্রসঙ্গ যখন উঠত তখন এই ধরনের ব্যবহার আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে হত। শিশুদের শ্রমের সঙ্গে অনেক সময়ই সবচেয়ে খারাপ যে জিনিসটা দেখা যায় তা হল এমন মনোভাব যেন তারা বড়দের কৃতার্থ করছে, তাই বিরাট প্রশংসা, এমন কি পুরস্কার তাদের প্রাপ্য।

...শরৎকালে আমরা মাটি খুঁড়ে চন্দ্রমল্লিকা তুলে হট্ হাউস-এ নিয়ে এলাম। গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের কাছে এটা সাধ্যানুযায়ী শ্রম। ছেলেমেয়েরা রোজ চমৎকার ফুলগাছের ঝাড়ে জল দিত, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করত কবে প্রথম ফুল ফুটবে। হট্ হাউস এক অপরূপ স্থানে পরিণত হল। 'আচ্ছা, এবারে এখানে অতিথিদের ডেকে আনা যাক,' আমি ওদের পরামর্শ দিলাম। 'আচ্ছা, কাদের ডাকব?' অনেকেরই

ছোট ছোট ভাইবোন ছিল। ছেলেমেয়েরা ওদের হট্ হাউস-এ নিয়ে এলো। বাচ্চারা ফুলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, কিন্তু আমার ছাত্রছাত্রীরা ফুল ছিঁড়তে দিল না।

'আমরা যদি অনেক ফুল ফোটাতে পারি তাহলে আটই মার্চের মহিলাদিবসে তোমাদের সব্বাইয়ের মা'দের একটা করে চন্দ্রমল্লিকা দিতে পারি,' আমি ছেলেমেয়েদের বললাম। এই উদ্দেশ্যটা শিশুদের উৎসাহিত করে তুলল, মার্চের গোড়াতেই আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ফুল হয়ে গেল। উৎসবের দিনে মায়েদের নিমন্ত্রণ করলাম, তাদের হট্ হাউস দেখালাম, একটা করে সুন্দর ফুল দিলাম। গালিয়ার সৎমা স্কুলে এসেছিলেন। মেয়েটি তাঁকে চন্দ্রমল্লিকা উপহার দিল। বহুবার আমি গালিয়াকে সৎমার সঙ্গে তার ব্যবহার সম্পর্কে বলেছি, বুঝিয়েছি যে ওর সৎমা ভালো মানুষ—আমার কথা শেষ পর্যন্ত মেয়েটির মনকে স্পর্শ করেছে। কোলিয়া ও তোলিয়ার মায়েরা, সাশার দিদিমা আর কোস্তিয়ার সৎমাও যে উৎসব উপলক্ষে এসেছেন, তাতে আমার আনন্দ হল।

ছোট শিশুকে অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। মহত্ত্ব সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর কথা সবসময়ই যে তার চেতনাকে স্পর্শ করে এমন নয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের সৌন্দর্য ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে সক্ষম। 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রার প্রথম দিন থেকে আমার প্রয়াস ছিল যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী অন্যের আনন্দ-বেদনা, দুঃখকষ্ট অনুভব করতে পারে। শরৎকালে ও বসন্তকালে আমরা প্রায়ই মৌচাষী আন্দ্রেই দাদুর অতিথি হতাম। এই বৃদ্ধের পরিবার ছিল না, একাকীত্ব—বড় দুঃখের। শিশুরা অনুভব করতে পারল যে প্রতিবারই আমাদের আগমনে আন্দ্রেই

দাদু আনন্দ পান। মৌচাষের জায়গায় যাওয়ার আগে আমি ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিই—দাদুর জন্য আপেল, আঙুর, প্লাম নিয়ে যাব—উনি আনন্দ পাবেন, মেঠো ফুল যোগাড় করে নিয়ে যাবে — তাতে তিনি খুশি হবেন। মানুষের মনোবৃত্তি, মর্মপীড়া ও অনুভূতির প্রতি শিশুদের হৃদয় উত্তরত্তোর সংবেদনশীল হয়ে উঠতে লাগল। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই খুঁজে বার করতে লাগল কী ধরনের আনন্দ বৃদ্ধকে দেওয়া যায়। একদিন আমরা বনের ভেতরে জাউ রান্না করছিলাম। ক্যাম্পফায়ার যখন জ্বলতে থাকে সেই মুহূর্তে শিশুদের মনে কত আনন্দেরই না সঞ্চার করে। ...ঠিক এই আনন্দের মুহূর্তেই ভারিয়া অন্যমনস্ক ভাবে বলল:

'আন্দ্রেই দাদু কিন্তু এখন একা।'

ছেলেমেয়েরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। বয়স্কদের কারও কারও কাছে এই দৃশ্যটি হয়ত ভাবপ্রবণ বলে ঠেকতে পারে, হয়ত কেউ কেউ ভাবতে পারেন: সাত বছরের শিশুর পক্ষে কি এমন ভাবাবেগ সম্ভব? হ্যাঁ, প্রিয় শিক্ষক মশাইরা, সম্ভব, যদি আপনারা ঠিক এই বয়সেই শিশুমনের সংবেদনশীলতা ধারাল করে তোলেন, যদি শিশুর হৃদয়ে পেঁছে দিতে পারেন এই পরম সত্য যে তোমার বাস মানুষের মাঝে—শিশুর ইচ্ছে হবে নিজের আনন্দের ভাগ অন্যদের দেওয়ার এবং সে যখন আমোদফুর্তি করছে তখন তার বন্ধু একা পড়ে আছে এই ভেবে সে মনে মনে দারুণ কষ্ট পাবে।

ছেলেমেয়েরা ঠিক করল তাদের আনন্দের ভাগ আন্দ্রেই দাদুকে দেবে। 'চল, আমরা ওকে চর্বি দেওয়া জাউ দিয়ে আসি,' কোস্তিয়া বলল। ওর কথাগুলিকে সকলে সহর্ষে স্বাগত জানাল। বাচ্চারা যে পরিমাণ জাউ ওঁকে এনে দিল তা

বোধহয় দারুণ ক্ষুধার্ত কোন লোকের পক্ষেও খেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। মৌচাষের জায়গায় আমরা আরও এক প্রস্থ খেলাম — দাদুর সঙ্গে।

আনন্দ-বেদনার প্রতি সংবেদনশীলতার শিক্ষা একমাত্র ছেলেবেলায়ই হয়ে থাকে। এই বয়সে মানুষের দুঃখদুর্দশা, মনোবেদনা ও একাকীত্বের প্রতি হৃদয় বিশেষ করে অনুভূতিশীল। অন্য লোকের জায়গায় মনে মনে নিজেকে কল্পনা করে শিশুর যেন রূপান্তর ঘটে। মনে আছে একদিন বন থেকে ফেরার সময় আমরা একটা নিঃসঙ্গ কুটিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম—কুটিরটা ছিল সম্পূর্ণ খোলা মাঠের ওপর। আমি বাচ্চাদের বললাম যে এখানে যিনি থাকেন তিনি পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে পঙ্গু; তিনি অসুস্থ, আপেল গাছ, আঙুর খেতে লাগাতে পারেন না। ছোটদের চোখে জল দেখা দিল। প্রত্যেকেই অসুস্থ মানুষটির একাকীত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল। আমরা দুটি আপেল গাছ আর আঙুরখেতের দুটি ঝোপ লাগালাম—এটা ছিল মানুষের জন্য আমাদের উপহার। আর আমরা যা অর্জন করলাম তা মহামূল্যবান—অন্যের জন্য সুখ সৃষ্টির আনন্দ।

অন্য মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি সংবেদনশীল, সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়ার শিক্ষা—সোভিয়েত বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মানুষ একমাত্র তখনই মানুষের বন্ধু, সুহৃদ, ভাই হতে পারে যখন অন্যের দুঃখ তার ব্যক্তিগত দুঃখ হয়ে দাঁড়ায়। **শিশু যেন হৃদয় দিয়ে অন্যকে অনুভব করতে পারে—** শিক্ষাদানের যে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আমি নিজের সামনে রাখি তাকে এই ভাবে সূত্রবদ্ধ করা যেতে পারে।

শিশুর সাথী, বন্ধু, মা-বাবা—যার সংস্পর্শে সে এসেছে

এমন যে-কোন স্বদেশবাসীর হৃদয় সম্পর্কে শিশু যদি উদাসীন হয়, কোন মানুষের অন্তরকরণে কী আছে তা যদি সে তার চোখ দেখে বুঝতে না পারে তাহলে সে কখনই সত্যিকারের মানুষ হতে পারবে না। আমি চেষ্টা করি নিজের শিক্ষার্থীদের হৃদয়ের সংবেদনশীলতা এমন ধারাল করে তুলতে যাতে তারা মানুষের চোখ দেখে বুঝতে পারে তার অনুভূতি, মর্মপীড়া, আনন্দ ও বেদনা—সে মানুষের সংস্পর্শে শিশু প্রত্যহই আসুক কিংবা 'দৈবাৎ' আসুক।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন থেকে ফিরছিলাম। দেখি রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর বসে আছেন এক দাদু। কী কারণে যেন তিনি উদভ্রান্ত। 'লোকটার কী যেন হয়েছে,' আমি ছেলেমেয়েদের বললাম। 'হয়ত পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হয়ত বা কিছু হারিয়েছে?' আমরা বৃদ্ধের সামনে এগিয়ে যাই, জিজ্ঞেস করি, 'আপনাকে কী করে সাহায্য করতে পারি দাদু?' বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'ধন্যবাদ বাছারা,' তিনি বললেন, 'তোমরা সাহায্য করতে চাইলে কী হবে—পারবে না। আমার বড় দুঃখ। বুড়ি হাসপাতালে মারা যেতে বসেছে। এই ত তার কাছে চলেছি, বাসের অপেক্ষায় আছি। সাহায্য অবশ্য তোমরা করতে পারবে না, তবু মন অনেকটা হালকা হল—দুনিয়ায় ভালো লোক আছে।' বাচ্চারা চুপ করে গেল। এতক্ষণ ওরা নিশ্চিন্তে কলরব করছিল—এখন চুপ। বৃদ্ধের বিষণ্ণ কথাগুলির ছাপ মনে নিয়ে ওরা যে যার বাড়ির দিকে চলল। আরও একটু খেলবে বলে ওরা ঠিক করেছিল, কিন্তু আপনা আপনিই অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গেল যে খেলার কথা ভুলে গিয়ে ওরা যে যার বাড়ির পথ ধরল।

অনুভব করতে শেখানো—শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে

কঠিন ব্যাপার। সহৃদয়তা, সংবেদনশীলতা, সমবেদনা ও দরদের শিক্ষা—এ হল মৈত্রী, সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব। শিশু তখনই অন্যের সূক্ষ্মতম মর্মপীড়া অনুভব করে যখন সে মানুষের সুখ, আনন্দ ও মানসিক শান্তির জন্য কিছু করে। মা-বাবা, দাদু-দিদিমার প্রতি ক্ষুদ্র শিশুর ভালোবাসা যদি কল্যাণসৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয় তাহলে তা পরিণত হয় স্বার্থপর অনুভূতিতে: শিশু মা'কে ভালোবাসে যেহেতু মা তার আনন্দের উৎস, যেহেতু নিজের আনন্দের জন্য মা'কে তার দরকার। অথচ শিশুমনকে শিক্ষিত করে তোলা উচিত খাঁটি মানবপ্রেমের শিক্ষায়—অন্যের ভাগ্যের জন্য সে যাতে উদ্বিগ্ন হয়, উৎকণ্ঠিত হয়, ভাবে, মর্মপীড়া অনুভব করে। সত্যিকারের ভালোবাসা একমাত্র তারই হৃদয়ে জন্মায় যে অন্যের ভাগ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। যার প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত এমন বন্ধু শিশুদের থাকা কতই না গুরুত্বপূর্ণ। আমার শিক্ষার্থীদের তেমন বন্ধু হয়ে দাঁড়ান মৌচাষী আন্দ্রেই দাদু। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হল যে শিশু অন্য মানুষের প্রতি যত বেশি যত্নশীল হয় ততই বন্ধুদের প্রতি, মা-বাবার প্রতি তার মন বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। আমি আন্দ্রেই দাদুর কঠিন জীবনের কথা ছেলেমেয়েদের বললাম: তাঁর দুই ছেলে ফ্রন্টে নিহত হয়, স্ত্রী মারা যান। তিনি নিঃসঙ্গ বোধ করেন।

'ছেলেমেয়েরা, আমরা ঘনঘন দাদুর কাছে যাব। প্রত্যেক বারই কোন না কোন ভাবে তাঁকে আনন্দ দেব।'

আমরা যখন তাঁর অতিথি হওয়ার উদ্যোগ নিই তখন প্রত্যেকেই ভাবে: দাদুকে কী ভাবে খুশি করা যায়? ছেলেমেয়েরা তাঁকে উপহার দেয় ড্রইং খাতা, যেখানে আমাদের প্রত্যেকের আঁকা ছবি আছে। ওরা নদীর ধারে নানা রঙের

বহু পাথর কুড়োয়—আন্দ্রেই দাদুকে দেয়। দাদু কাঠ কেটে একটা ঝাঁপি তৈরি করে পাথরগুলি তাতে রাখেন—আমাদের উপহার দেন। ছেলেরা তাদের বন্ধুর জন্য খড়ের টুপি তৈরি করে। দাদু আমাদের জন্য কাঠ কেটে খরগোশ, শিয়াল, ভেড়া—এই রকম জন্তুজানোয়ারের কয়েকটি মূর্তি বানান।

শিশুরা যত বেশি আন্তরিক সেবাযত্ন তাদের বন্ধুকে করতে থাকে ততই বেশি করে তাদের চোখে পড়ে নিজেদের চারপাশের দুঃখকষ্ট, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। ওরা দেখতে পেল যে নিনা ও সাশা প্রায়ই মুখ ভার করে স্কুলে আসে, তাদের চোখে বিষাদের ছায়া, চিন্তার ছাপ। বাচ্চারা দুই বোনকে জিজ্ঞেস করে: মা কেমন আছে? মা'র অবস্থা খারাপ, তাই মেয়েরা বিষণ্ণ। ...কল্যাণকর অনুভূতি তখনই হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সাথীর দুঃখ লাঘবের উদ্দেশ্যে শিশু কোন কাজ করে। আমরা কয়েক বার নিনা ও সাশাদের বাড়ি যাই, বাগানের আগাছা সাফ করি, সবজি বাগানের আলু তুলতে সাহায্য করি। প্রতিবার ছেলেমেয়েরা যখন বনে যাওয়ার আয়োজন করে তখনই একটা প্রশ্ন তাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে: আচ্ছা, নিনা ও সাশা আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে ত? কেননা এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন তাদের থেকে যেতে হয়েছে বাড়িতে—বাবাকে সাহায্য করা দরকার। আমরা আমাদের সকলের আনন্দের দিনের আগের দিন তাই নিনা ও সাশাদের বাড়ি যাই, যে ভাবে পারি সাহায্য করি।

সমাজে বাস করার অর্থ হল অপরের সাফল্য ও শান্তির খাতিরে নিজের আনন্দ বর্জন করা। শিশুর সামনে দুঃখ, দুর্ভাগ্য, চোখের জল, অথচ সে নিজের আনন্দে মশগুল—এমন ঘটনা হয়ত আমাদের সকলেরই চোখে পড়েছে। আবার

এমনও ঘটে যে ছেলের আনন্দের ভরা পাত্র থেকে যাতে একটি বিন্দুও ছলকে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে মা সমস্ত রকম দুঃখবেদনা ও দুশ্চিন্তা থেকে তার মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা করেন। এ হল খোলাখুলি স্বার্থপরতার শিক্ষা। মানবজীবনের অন্ধকার দিক থেকে শিশুকে দূরে সরিয়ে রাখবেন না। শিশু জানুক যে আমাদের জীবনে কেবল আনন্দই নেই, দুঃখও আছে। অপরের দুঃখ শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করুক।

মানুষ ছেলেবেলায় কোন কোন উৎস থেকে নিজের আনন্দ আহরণ করেছে, শেষ বিচারে তারই উপর নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের নৈতিক রূপ। আনন্দ যদি হয় ভাবনাচিন্তাহীন, দাবিদাওয়াপূর্ণ, শিশু যদি না জানে দুঃখ কী, অনাদর কী, কষ্ট কী তা হলে সে বড় হয়ে হবে স্বার্থপর, হবে মানুষের প্রতি উদাসীন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমাদের শিক্ষার্থীরা যেন জানতে পারে কাকে বলে পরম আনন্দ — মানুষের প্রতি শত্রুবশত বিচলিত বোধ করার আনন্দ।

আছি দশে — মিলেমিশে

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম দিন থেকেই আমার চেষ্টা ছিল শিক্ষার্থিমণ্ডলীর মধ্যে পারিবারিক সৌহার্দ, সহৃদয়তা, সমবেদনা ও সাহায্যের মনোভাব, পারস্পরিক আস্থা সঞ্চার করা। সেপ্টেম্বর মাসে — আমাদের তিনটি ছেলেমেয়ে — ভিতিয়া, ভালিয়া ও কোলিয়ার জন্মদিন। আমরা দলের সকলে মিলে ওদের জন্মদিন উদ্‌যাপন করলাম: স্কুলের ক্যান্টিনে পিঠে তৈরি হল, ওদের আমরা ছবি আর বই উপহার দিলাম। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে

কোলিয়াদের বাড়িতে না ছেলেমেয়েদের না বাবা-মা'র—কারোই জন্মদিন পালন করা হয় না। ছেলেটার জীবনে ওটা ছিল প্রথম উৎসব। বন্ধুদের মনোযোগে সে অভিভূত হয়ে পড়ে।

শৈশবে প্রতিটি শিশুই চায় দরদ, স্নেহ। শিশু যদি নির্দয়তার পরিবেশে বড় হয় তাহলে সে কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। স্কুল পুরোপুরি পরিবারের, বিশেষত মা'র জায়গা নিতে পারে না, তবে শিশু যদি বাড়িতে স্নেহ, সহৃদয়তা ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে আমাদের, শিক্ষকদের তার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।

আমাদের শিক্ষার্থিমণ্ডলী এখন বৈষয়িক সম্পদের অধিকারী; দলের নিজস্ব গোপন রহস্য, দুশ্চিন্তা ও পরিতাপের বিষয় আছে। আলমারিতে থাকত খেলনাপাতি, পেন্সিল ও খাতা। আমাদের 'স্বপ্নপুরীতে' ছিল 'খাদ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার'—আমরা সেখানে রাখতাম আলু, খাদ্যশস্য, তেল-ঘি, পেঁয়াজ—অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে বাইরে যখন শরতের বৃষ্টি ঝরছে তখন যা যা অবশ্য দরকার সে সবই। আমাদের পরিবারের সব সদস্যই—ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তবে তাদের মধ্যে দাঙেকা, তিনা, ভালিয়া—এরা কয়েকজন ছিল বিশেষ করে ছোট। পথে, বনের মধ্যে ছোটদের সাহায্য করা সকলেই নিজেদের কর্তব্য বলে গণ্য করত।

কোন কোন ছেলেমেয়ে যদি অজ্ঞাত কারণে বাড়িতে থেকে যেত তাহলে সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুরা তাদের বাড়ি গিয়ে জেনে আসত কারও অসুখবিসুখ করেছে কিনা। এটা হয়ে দাঁড়ায় একটা ভালো প্রথা। অনুরাগ—অন্তরাত্মার পরম গুরুত্বপূর্ণ তাগিদের ভিত্তিভূমি; আর এই তাগিদ ছাড়া, মানুষের জন্য আকুলতা ছাড়া মানুষে মানুষে কমিউনিস্টসুলভ পারস্পরিক

সম্পর্ক ধারণাই করা যায় না। আমি চেষ্টা করি সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা, অন্তর সম্পদের পারস্পরিক আদানপ্রদান যেন প্রতিটি শিশুর আনন্দের, পরিপূর্ণ অনুভূতি ও মর্মপীড়ার উৎস হয়ে দেখা দেয়। প্রত্যেকেই যেন সমষ্টিতে নিজস্ব কিছু না কিছু যোগ করে, অন্যদের জন্য সুখ ও আনন্দ সৃষ্টি করে।

কাজ করতে গিয়ে আমি শিশু-শিক্ষার্থিমণ্ডলীকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে বহু অসুবিধার সম্মুখীন হই এবং সেগুলিকে দূর করার উদ্দেশ্যে যাঁরা শিশুর অন্তঃকরণ, শিক্ষার্থিমণ্ডলীর নাড়ীর স্পন্দন সূক্ষ্ম ভাবে অনুভব করতে পারেন এমন সমস্ত শিক্ষাবিদ আর প্রাথমিক শ্রেণীতে কর্মরত শিক্ষকদের সঙ্গে আমি আলোচনা করতাম। সময় সময় আমরা জড় হতাম সন্ধ্যাবেলায়, যখন স্কুলের দালানে এবং স্কুলের এলাকায় শিশুকণ্ঠের কলরব স্তব্ধ হয়ে যেত। শিশু-কর্মিমণ্ডলীর জীবনের বহুমুখিতা সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই কার কী ধারণা এই নিয়ে আমরা মত-বিনিময় করতাম। আমাদের সকলেরই ভালোমতো জানা আছে যে উপলব্ধির শুরু পরিবারে — তার সূত্রপাত সেই মুহূর্ত থেকে যখন মায়ের ঘুমপাড়ানী গান শুনে শিশু মা'র দিকে তাকিয়ে প্রথম হাসি হাসে। পৃথিবীতে যা কিছু ভালো আছে, যা কিছু উদার, পরম সুন্দর সে সম্পর্কে প্রথম বোধ — মানুষে মানুষে ভালোবাসার বোধ—যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জন্মায়, যাতে শিশুর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় তার মা ও বাবা—এটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিবারে যদি এমন খাঁটি মনুষ্যত্বের ঘাটতি থাকে, যদি আদৌ তা না থাকে তখন বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল তা কী পরিমাণে দিতে

পারে? শিশুর সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ মনের সামনে কী ভাবে উদ্‌ঘাটন করা যায় মানবহৃদয়ের উদারতা ও সৌন্দর্য?

সন্ধ্যাকালীন আলোচনা, পরামর্শ ও ভাবনাচিন্তার এই সব মুহূর্তে তিলে তিলে আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণা — আমার দৃষ্টিতে — মূল্যবান ধারণা, যা পরিণত হয় আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীর দৃঢ়বিশ্বাসে: শিশুমণ্ডলী তখনই শিক্ষালাভের উপযোগী শক্তি হয় যখন তা প্রতিটি মানুষকে সমুন্নত করে, প্রত্যেকের মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত করে।

আমাদের স্কুলের সেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতার যে-সমস্ত মূল্যবান কণিকা পেলাম সেগুলিকে আমি সযত্নে জড় করলাম, আমি চেষ্টা করলাম যাতে শিক্ষার্থিমণ্ডলীতে শিশুদের পরস্পরের সৌহার্দপূর্ণ, আন্তরিক সম্পর্কের মধ্যে ভালো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হয়। সমবেত কর্মসম্পর্কের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা, সহৃদয়তার সঞ্চার আমার স্থায়ী চিন্তাভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। শিশুদের সমষ্টিজীবনের বহুমুখীনতা আমার ধারণায় যে ভাবে দেখা দিতে লাগল তা কেবল সমবেত শ্রমে, একক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত সমমতাবলম্বীদের সহযোগিতা নয়, একের প্রতি অন্যের পারস্পরিক সংবেদনশীলতা, বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে অপরের আনন্দ-বেদনা উপলব্ধির ক্ষমতাও বটে। সমবেত কর্মসম্পর্কের এই সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার মধ্যেই নিহিত আছে ভালো হওয়ার প্রয়াসের মহত্ত্ব। এই প্রয়াস লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নয়, লোকে যাতে তোমাকে প্রশংসা করে তার জন্য নয়, এর উৎস নিজের মহত্ত্ব অনুভবের স্বাভাবিক দাবি থেকে।

এরপর থেকে আমার শিক্ষকতার বাকি সবগুলি বছরই ছিল

বস্তুত শিশুদের, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের, কিশোর-কিশোরীদের মানবিক মর্যাদাবোধ উন্নয়নের চিন্তাভাবনায় নিয়োজিত। এরই উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে থাকে এবং এখনও গড়ে উঠছে সমষ্টিকর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক। সমাজের অংশরূপে শিশুদের সমষ্টিজীবনকে আমি চিরকালই মানুষের সমুন্নতি সাধনের কর্তব্যভুক্ত করে দেখার চেষ্টা করেছি। এই কর্তব্যেরই বশীভূত ছিল শিশুদের সৃজনকর্ম, তাদের প্রবণতা, ক্ষমতা ও মেধার বিকাশ।

স্বাস্থ্যের বাগানে আমাদের বাস

আর এক মাস বাদেই আমার পালিত সন্তানেরা স্কুলের ছাত্রছাত্রী হবে। এগিয়ে এলো গ্রীষ্মকালের চমৎকার মাস—আগস্ট। জুলাইয়ের গরমে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসত খুব ভোরে কিংবা সন্ধ্যার মুখে। কারও কারও বাড়ি ছিল দূরে—খেতে হলে তাদের দূরে যেতে হত, তাই প্রায়ই ছয়-সাত জন থেকে যেত স্কুলে ক্যাণ্টিনে খাওয়ার জন্য। আমার মাথায় একটা চিন্তা খেলল: ছেলেমেয়েরা এক মাস না হয় বাড়িতে না-ই থাকল—থাকল হয়ত বাগানে বা পুকুরের ধারে কোথাও। পুকুরের ধারের জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল; গাছপালার জঙ্গলের মধ্যে পাইওনিয়ররা কয়েকটি কুটির বানাতে আমাদের সাহায্য করল—যৌথখামারের তরমুজখেতের চৌকিদাররা এ রকম কুটিরেই সারা গ্রীষ্মকাল কাটায়। কুটিরের মাটিতে খড় বিছানা হল, আঁকার জন্য টেবিলও বানানো হল। আমাদের কুটিরগুলোর লাগোয়া ছিল যৌথখামারের বিরাট বাগান। বাগান হবে আমাদের বিশ্রামের প্রধান জায়গা—মালি রাজি হল। কুটিরের

পাশে বানানো হল রান্নাঘর, যৌথখামার আমাদের খাদ্যদ্রব্য দিল, একজন পাচকও ঠিক করে দিল। সানিয়ার বাবা স্নানের ঘাট বানিয়ে দিলেন, পাশেই ছিল একটা মোটর-বোট — ওটা দেখে ছেলেদের চোখ চকচক করে ওঠে।

আমাদের বাসস্থান আর বিশ্রামের জায়গাটাকে মা-বাবারা নাম দিয়েছিলেন 'স্বাস্থ্যের বাগান'। স্বাস্থ্যের বাগানে আমাদের দলের জীবনযাত্রা শুরু হয়ে গেল। পুরো এক মাস আমরা খোলা হাওয়ায় থাকলাম। উঠতাম ভোরে — সূর্য ওঠার আগে। স্নান করতাম পুকুরে, ব্যায়াম করতাম, সকালের খাবার খেয়ে বনে, বাগানে, মাঠে — কোথাও ঘুরতে বেরিয়ে পড়তাম। এই এক মাসে আমরা শব্দের উৎসমুখে সবচেয়ে আকর্ষণীয় 'পর্যটন' পর্ব সমাধা করি। আমরা স্তেপের টিলার চূড়া থেকে ভোরের আলো আর সূর্যোদয় দেখি, দেখতে পাই শত শত সোয়ালো পাখি বাস উঠিয়ে গরম প্রদেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জমায়েত হচ্ছে; সূর্যের আলো আর ভোরের বাতাস কুয়াসায় ঢাকা নদীর ওপর থেকে কুয়াসার সাদা আস্তরণ সরিয়ে দিচ্ছে। মাঠে, তৃণভূমিতে কিংবা বনে ছেলেমেয়েরা দ্বিতীয় দফায় প্রাতরাশ করত: তারা খেত আপেল, নাশপাতি, প্লাম, নতুন আলু সেদ্ধ, সেই সঙ্গে তাজা শশা, তরমুজ, ফুটি, ভুট্টার দানা সেদ্ধ, টমেটো। আগস্ট — ফলফুল ও শাকসবজির সময়; এই সময় প্রতিটি বাচ্চা অন্তত দুই কিলোগ্রাম আপেল ও নাশপাতি খেত। আন্দ্রেই দাদু রোজ আমাদের জন্য মধু নিয়ে আসতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা টাটকা দুধ পান করত। পাচক টাটকা শাকসবজি দিয়ে আমাদের জন্য মুখরোচক সুপ বানাত।

রোদে ছেলেমেয়েদের গায়ের চামড়া পুড়ল; তারা ইজার ও

গেঞ্জী পরে খালি পায়ে রোজ পর্যটনে বেরোত, মোটর-বোটে চেপে বেড়াত।

স্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া, সূর্যের আলো, জল, হাওয়া, সাধ্যমতো শ্রম ও বিশ্রামের সমন্বয় — এ সবই হল স্বাস্থ্যের অতুলনীয় সঞ্জীবনী উৎস।

প্রথম শিক্ষাবর্ষের প্রাক্কালে চিন্তাভাবনা

আমাদের 'আনন্দ নিকেতনের' জীবনযাত্রা সমাপ্তির মুখে। শিগ্গিরই আমার ছেলেমেয়েরা হবে স্কুলের ছাত্রছাত্রী — এই চিন্তায় আমার যেমন আনন্দ হল তেমনি উদ্বেগও হল। আনন্দ এই কারণে যে আরও কয়েক বছর আমার ছেলেমেয়েদের জীবন, শ্রম ও জ্ঞানচর্চার পথে চালিয়ে নিয়ে যাব, আর এই এক বছরে ওরা শক্তসমর্থ হয়ে উঠেছে, রোদে পুড়েছে, তামাটে হয়েছে।

'আনন্দ নিকেতনে' আমাদের অবস্থানের দিন যখন শেষ হল তখন আমি মনে মনে তুলনা করলাম ভালোদিয়া, কাতিয়া, সানিয়া, তোলিয়া, ভারিয়া, কোস্তিয়া আজ থেকে এক বছর আগে কী ছিল এবং এখন কী হয়েছে। ওরা ছিল ফেকাসে, রোগা, ওদের চোখের নীচে নীল রগ দেখা যেত। আর এখন সকলেই রোদে পুড়েছে, সকলেরই লেগেছে গোলাপী রঙের ছোপ — দুধে-আলতায় রং আর কাকে বলে! আরও আনন্দ হচ্ছিল এই ভেবে যে ব্ল্যাকবোর্ড ও চক ছাড়া, ফেকাসে ছবি আর কাটা বর্ণমালা ছাড়াই ওরা জ্ঞানের প্রথম ধাপে উঠেছে — লিখতে ও পড়তে শিখেছে। ক্লাসঘরের ব্ল্যাকবোর্ডের আয়তক্ষেত্র

দিয়ে যারা এই ধাপ শুরু করে তাদের চেয়ে ওদের যাত্রা এখন অনেক সহজ হবে।

ব্যক্তিগত শিক্ষা-প্রণালীকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি, ধরাবাঁধা গৎ-এর প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আছে। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতারই দাবি এই যে জ্ঞানার্জনের সূত্রপাত যেন হয় ধীরেসুস্থে, বিদ্যাশিক্ষা—শিশুর অতি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠোর শ্রমসাধ্য এই কাজ—যেন সেই সঙ্গে শিশুদের আত্মিক ও শারীরিক শক্তির দৃঢ়তাসাধনে সক্ষম এক আনন্দদায়ক শ্রমও হতে পারে। যারা এখনও শ্রমের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, বুঝতে পারে না বাধাবিপত্তির প্রকৃত মর্ম সেই ছোটদের পক্ষে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে।

হাজার বার লোকে বলেছে: বিদ্যাশিক্ষা—শ্রম, তাকে খেলায় পরিণত করা উচিত নয়। কিন্তু তাই বলে শ্রম ও খেলার মধ্যে চীনের প্রাচীর তুলে দেওয়াও ঠিক নয়। শিশুর জীবনে, বিশেষত প্রাক্‌বিদ্যালয় বয়ঃসীমার শিশুর জীবনে খেলার স্থান যে কী তা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে দেখা যাক। তার কাছে খেলা—অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খেলার মধ্য দিয়ে শিশুদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় জগৎ, বিকশিত হয় ব্যক্তিমানুষের সৃজনী ক্ষমতা। খেলা ছাড়া পূর্ণমাত্রায় মানসিক বিকাশ হয় না, হতে পারে না। খেলা হল এক বিশাল আলোকিত বাতায়ন যা ভেদ করে অন্তর্লোকে প্রবাহিত হয় পারিপার্শ্বিক জগৎসংক্রান্ত ধারণার, বোধের সঞ্জীবনী ধারা। খেলা—এমন এক স্ফুলিঙ্গ যা অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলের আগুন জ্বালিয়ে তোলে। তাই শিশু যদি খেলার ছলে লিখতে শেখে, যদি বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রমের সঙ্গে খেলার সমন্বয় ঘটে, যদি শিক্ষক ঘনঘন না-ই বলেন, 'আচ্ছা,

খেলা হল ত, এবারে এসো কাজ করা যাক!'—তাতে দোষের কিছুই নেই।

খেলার অর্থ ব্যাপক ও বহুমুখী। বাচ্চারা যখন ছুটাছুটি করে, ক্ষিপ্রতা ও গতির পাল্লা দেয় কেবল তখনই যে খেলে তা নয়। সৃজনীক্ষমতা ও কল্পনার বিপুল প্রয়োগের মধ্যেও খেলা থাকতে পারে। মানসিক শক্তির খেলা ছাড়া, সৃজনী কল্পনা ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা ধারণাই করা যায় না—বিশেষত প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে। যেখানে সৌন্দর্য আছে, ব্যাপক অর্থে, খেলার সূত্রপাত সেখানে। কিন্তু ছোট শিশুর শ্রম যেহেতু নন্দনতাত্ত্বিক বনিয়াদ ছাড়া অর্থহীন সেই কারণে ছোট বয়সে শ্রমসংক্রান্ত কার্যকলাপ খেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। স্কুলের জমিতে ফসল তোলা যে দিন শুরু হয় সেই দিনটি সমারোহপূর্ণ—ছেলেমেয়েরা উৎসবের সাজ পরে আসে; প্রথম কাটা শস্যের মঞ্জরী রাখা হয় টেবিলক্লথে ঢাকা টেবিলের ওপর, একটা ফুলদানিতে। এতে আছে গভীর অর্থপূর্ণ খেলা। কিন্তু খেলা তখনই শিক্ষামূল্য হারায় যখন তা কৃত্রিম ভাবে শ্রমের সঙ্গে 'সম্পর্কিত' হয়, যখন সৌন্দর্যের মধ্যে পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে মানুষের আবেগ-অনুভূতিপূর্ণ মূল্যায়ন প্রকাশ পায় না।

অমীমাংসিত থেকে যাচ্ছে একটি প্রশ্ন: কোন সময় বর্ণপরিচয় শুরু করা সবচেয়ে ভালো—শিশু যখন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থী হল তখন, না আরও কিছু আগে—প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে? অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের শিক্ষকগোষ্ঠী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে স্কুলে শিশুর জীবনে আকস্মিক পরিবর্তন আনা ঠিক নয়। শিশু আগে যে কাজ করত স্কুলের শিক্ষার্থী হওয়ার পরও তা-ই চালিয়ে যাক না কেন। তার

জীবনে নতুনের প্রকাশ ঘটুক ধীরে ধীরে, নতুন নতুন ধারণার প্রবল ধারায় তাকে বিভ্রান্ত করে দিয়ে কাজ নেই।

আমার মতে, আঁকা ও খেলাধুলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত বর্ণপরিচয়ই প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের শিক্ষাদীক্ষা এবং স্কুলের শিক্ষার মধ্যে অন্যতম সংযোগরক্ষাকারী সেতু হতে পারে। বর্ণমালার ছবিতে আমার শিক্ষার্থীরা আবিষ্কার করে শিশির বিন্দুতে সূর্যের ফুলকির সৌন্দর্য, পুকুরের ঘাটের ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকা একশ' বছরের ওক গাছ আর নীল আকাশের বুকে বকপাঁতির সৌন্দর্য, জুলাইয়ের গরম দিনের শেষে ঘুমিয়ে পড়া তৃণভূমির সৌন্দর্য। ছেলেমেয়েরা হয়ত এখনও তেমন সুন্দর করে অক্ষর লিখতে জানে না—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল এই যে তারা প্রতিটি ছবিতে হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করে। ছেলেমেয়েরা যে শব্দের বর্ণসুষমা ও গীতিব্যঞ্জনা বুঝতে শুরু করেছে তাতেও আমি আনন্দিত হলাম। ওদের চেতনায় উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য, কাব্যিক চিন্তার দৃঢ় ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে। অঙ্কনবিদ্যা শিশুদের অন্তর্জীবনে স্থান পেল। ওরা ছবির মধ্যে নিজেদের অনুভূতি, ভাবনাচিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করে। গানবাজনা শোনা আমার শিক্ষার্থীদের আন্তরাত্মার দাবি হয়ে দেখা দিল।

নৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে শিশুদের প্রথম পদক্ষেপ লক্ষ্য করেও আনন্দ অনুভব করলাম: ওরা মানবিক আচরণের সৌন্দর্য জগতে প্রবেশ করেছে, অপরের আনন্দ-বেদনার প্রতি সংবেদনশীলতা তাদের হৃদয়ে জেগেছে, মানুষের জন্য সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টির সুখ তারা এখন উপলব্ধি করতে পারে। যে সময় শিশু প্রথম স্কুলে প্রবেশ করে তখন থেকে শুরু করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সর্বাঙ্গীণ বিকশিত ব্যক্তিত্বের জগতে তার

প্রবেশ—শিক্ষার এই দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া আমার ধারণায় সর্বোপরি হল মানবিক অনুভূতির শিক্ষাদান: যাকে আমরা শিক্ষা দিই সে যেন গভীর ভাবে অনুভব করতে পারে যে তার আশেপাশের লোকজনদেরও তারই মতো দুঃখকষ্ট ও বেদনা থাকতে পারে। ছেলেমেয়েরা যে তাদের সমবয়সীদের কিংবা তাদের চেয়ে বড় সঙ্গীসাথী ও মা-বাবার—মোটকথা, বড়দের আলোড়িত অনুভূতিতে দ্রুত অনুপ্রাণিত হতে পারে, ওরা যে সেই সব অনুভূতির সহমর্মী হতে শিখেছে তাতে আমি আনন্দিত হই। ছেলেমেয়েরা জীবনে যারই সংস্পর্শে আসুক না কেন তার মধ্যেই দেখতে পেত সর্বোপরি মানুষকে। এই ঘটনা ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের।

আনন্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমি উদ্বেগও বোধ করি। দৈনন্দিন মানসিক শ্রম শিশুদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে—পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি ওদের সজীব আগ্রহ আমি জাগিয়ে রাখতে পারব কি? প্রতিটি শিশু নিজের মতো করে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখে, নিজের মতো করে বস্তু ও ঘটনাকে উপলব্ধি করে, নিজের মতো করে ভাবে—উদ্দাম গতিশীল জলোচ্ছ্বাসকে এবং জলভারে পরিপূর্ণ শান্তি ও মন্থরগতি নদীকে আমি উপলব্ধির জগতে প্রবাহিত করতে পারব কি?

আরও বেশি উদ্বিগ্ন আমি হই প্রতিটি শিশুর মনোজগতের কথা ভেবে। আমার সামনে আছে সংবেদনশীল, কোমল, অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়। শিশুদের সংস্পর্শে যত বেশি আসি ততই স্পষ্ট দেখতে পাই আমার কথা ও দৃষ্টি, আমার পরামর্শ ও মন্তব্যের সুর বোঝার ক্ষমতা তাদের কত বৃদ্ধি পাচ্ছে! আমার সামনে ৩১ জন ছেলেমেয়ে—৩১টি জগৎ।

কোলিয়া ও কোস্তিয়া, ভারিয়া ও তিনা, দাঙ্কো ও লারিসা, ভলোদিয়া ও সাশা—এদের মধ্যে এখনই, এই প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বেই কত না পার্থক্য। ...আর নিজস্ব, ব্যক্তিগত, গভীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দিন দিন, সপ্তাহ থেকে সপ্তাহান্তরে ক্রমাগতই প্রকট হয়ে, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দেবে। হৃদয়ের সংগোপনে কোথায় যেন প্রতিটি শিশুর আছে নিজস্ব তন্ত্রী, সে তন্ত্রী ধ্বনিত হয় নিজস্ব ভঙ্গিতে, তাই আমার কথা যাতে মনে সাড়া জাগায় তার জন্য নিজেকে এই তন্ত্রীর সুরে বাঁধতে হয়। শিশু হয়ত কোন ব্যাপারে উৎকণ্ঠিত, ব্যথিত, অথচ শিক্ষক তা জানেন না—এতে শিশুহৃদয়ে যে কী দারুণ মর্মপীড়া জন্মায় তা আমি বহুবার লক্ষ্য করেছি। শিশু প্রতিদিন কী ভাবনাচিন্তা করে, তার মনে কী আছে তা কি আমার পক্ষে জানা সম্ভব হবে? আমি কি তাদের প্রতি সবসময় সুবিচার করতে পারব?

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি আমাকে আমার সমগ্র কর্মকালে ভাবিয়ে তুলত তা হল কী ভাবে সমাজ জীবনযাত্রার বৃহৎ জগতের সঙ্গে স্কুলের ছোট ছোট শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো যায়, প্রতিটি শিশু কেবল তার নিজের গ্রাম, যে নদীর তীরে সে শৈশবের আদিপর্ব কাটিয়েছে তার সৌন্দর্য ছাড়াও যাতে নিজের জন্মভূমির বিশাল, অসীম জগৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে তার জন্য কী করা উচিত? কী করা উচিত যাতে প্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের সৌন্দর্যকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে বৈরভাবাপন্ন শক্তি জনগণকে দাসত্ববন্দনে আবদ্ধ করে, তার প্রতি—সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তার ঘৃণা জন্মায়, যাতে সে সোভিয়েত জনগণের সাফল্যকে—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আমাদের দেশের জাতিসমূহের মুক্তি, সম্মান ও মৈত্রীকে রক্ষা

করতে পারে? কী ভাবে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সঙ্গে নাগরিক শিক্ষাদীক্ষার সম্মিলন ঘটানো যেতে পারে? স্কুলের বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া—বড় জটিল সমস্যা। বয়সের যেমন দাবি সেই অনুযায়ী এ সমস্যার সমাধান আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি?

শৈশব পর্ব

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচয়

১৯৫২ সনের আগস্ট মাসের শেষদিনের এক রৌদ্রোজ্জ্বল শান্ত প্রভাতে স্কুলের দালানের সামনে সবুজ লন্-এ সমস্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও মা-বাবাদের সমাবেশ ঘটল। শিক্ষাবর্ষ সূচনার অব্যবহিত পূর্ববর্তী এই আনুষ্ঠানিক দিনটি বহুকাল হল আমাদের এখানে বিদ্যালয় ও গ্রথের ঐতিহ্যমূলক উৎসব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ দিন সকালের উৎসবটি বিশেষ রোমাঞ্চকর ছিল।

১৬টি ছেলে আর ১৫টি মেয়ে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এসেছেন তাদের মা-বাবারা, অনেকের ঠাকুমা-দিদিমা ও দাদুরা। কোলিয়া ও তোলিয়ার মা'দেরও দেখা যাচ্ছে। গালিয়ার কাঁধের ওপর হাত রেখেছেন তার সৎমা। এক বছর আগে হলে মেয়েটি ভুরু কোঁচকাত—এখন কিন্তু তা করছে না। সকলেই আমাদের অভিনন্দন জানান, শুভকামনা করেন। দশম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ছোটদের সামনে এগিয়ে আসে, প্রত্যেককে দেয় স্মারক উপহার—বই, তাতে লেখা আছে এই কথাগুলি: 'ছোট বন্ধুটি, তোমার যাত্রা শুভ হোক। বইটা যত্ন করে রেখো। এই বইটা সারা জীবন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিক স্কুলের উৎসবের কথা, যে দিন তুমি স্কুলের শিক্ষার্থী হলে সে দিনের কথা। তোমার পারিবারিক গ্রন্থাগারে চিরকাল সযত্নে রাখা থাক।' (বহু বছর কেটে গেছে, আমার ছাত্রছাত্রীরা

সাবালক হয়েছে, ওরা সকলেই কিন্তু এই বইটিকে পবিত্র বস্তুরূপে, স্বর্ণময় শৈশবের অমূল্য স্মৃতি হিশেবে সংরক্ষণ করছে)।

বাবা-মায়েদের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা, শিক্ষক আর দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা—আমরা সকলে মিলে বাগানে যাই। কিশোর-কিশোরীরা সযত্নে আপেলের চারা মাটি কুপিয়ে তোলে এবং মাটির ডেলা সমেত ওটাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, ঝটপট সেটাকে গর্তে বসিয়ে দেয়। বাচ্চাদের প্রত্যেকে এক মুঠো করে মাটি তুলে নিল—গর্ত বুজানো হল। ওরা গাছটায় জল দিল, তারপর যে যার বাড়ি চলে গেল। আগামীকাল ওরা স্কুলে আসবে, শুরু হবে ওদের প্রথম পাঠ। চার বছর ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবে, চার বছর আমি ওদের পড়াব, শিক্ষাদীক্ষা দেব। এই দিনটির প্রাক্কালে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে একটি চিন্তা: 'প্রাথমিক বিদ্যালয় বলতে কী বোঝায় ?' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিরাট, নির্ধারক ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়। 'প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে জ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়', 'প্রাথমিক শ্রেণী হল বনিয়াদেরও বনিয়াদ'—মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীগুলিতে শিক্ষার অসঙ্গতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে ভাসা ভাসা, আলগা আলগা জ্ঞান সম্পর্কে যখন কথা ওঠে তখন এ ধরনের উক্তি প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রায়ই এই বলে দোষ দেওয়া হয় যে ভবিষ্যতে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ক্ষমতা ও জ্ঞানের নির্দিষ্ট কোন পরিমণ্ডলী শিশুদের সে দিতে পারে নি।

বাস্তবিকই, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বোপরি কাজ হওয়া উচিত কী ভাবে পড়াশুনা শিখতে হয়

তা শেখানো। ইয়ান আমোস কমেন্স্কি (১৫৯২-১৬৭০), ক. দ. উশিন্স্কি ও ফ.-আ. ডিস্টারভেগের (১৭৯০-১৮৬৬) মতো বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা এ সম্পর্কে বলেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল অটুট জ্ঞান ও দক্ষতার সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলী শিক্ষার্থীদের দান করা। শিখতে জানা ব্যাপারটির মধ্যে নিহিত আছে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেকগুলি দক্ষতা—পড়তে ও লিখতে পারার নৈপুণ্য, প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষনের, ভাবনার এবং শব্দের মাধ্যমে নিজের চিন্তা ব্যক্ত করার নৈপুণ্য। অলংকারের ভাষায় বলতে গেলে, এই নৈপুণ্যগুলি হল সেই হাতিয়ার যাদের সাহায্য ছাড়া জ্ঞানার্জন অসম্ভব।

প্রাথমিক শ্রেণীতে শিশুদের শিক্ষাদানের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের গভীর ভাবে কী মনে রাখা উচিত, তাদের স্মৃতিতে কিসের স্থান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং কীই বা তাদের করতে পারা উচিত তা সঠিক নির্ধারণ করা।

কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা এতেই শেষ হয়ে যায় না। এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না যে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে শিক্ষককে কাজ করতে হয় শিশুকে নিয়ে।

প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে—৭ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের শিক্ষার পর্বটি মানুষ হয়ে ওঠার পর্ব। অবশ্য প্রাথমিক শ্রেণী শেষ হওয়ার আগেই যে এ প্রক্রিয়ার সমাপ্তি ঘটে তা নয়। তবে এই পর্বেই মানবজীবনের নিবিড়তম গুণাবলীর সূচনা। ভবিষ্যতে সাফল্যের সঙ্গে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিশুকে এই পর্বে ভাবী বিদ্যাশিক্ষার প্রস্তুতি

নিলেই চলবে না, জ্ঞান ও নৈপুণ্যের ঝুড়ি বোঝাই করলেই চলবে না। প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষাকাল—নীতিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ-অনুভূতি, দেহ ও নন্দনতাত্ত্বিক বোধ বিকাশের গোটা একটি পর্ব।

আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে হাজার হাজার ভালো ভালো শিক্ষক আছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শিশুর কাছে জ্ঞানের আলোক মাত্র নন, তাঁরা প্রকৃত অর্থেই জীবনের শিক্ষাদাতা, শিক্ষাগুরু। সোভিয়েত দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়—সর্বস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি। তবে একথাও না বলে উপায় নেই যে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশেষত আট ক্লাসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শ্রেণীগুলি, মারাত্মক ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। কোন কোন স্কুলের প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে শিক্ষার্থীর ভাগ্য আমার কাছে তেমন ভালো বলে মনে হল না: শিশুর পিঠে আছে ঝুলি—শিক্ষক চেষ্টা করেন যত বেশি বোঝা তাতে পুরে দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট সীমা অবধি অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ শ্রেণীগুলিতে শিক্ষা পর্যন্ত এই বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া—এতেই শিক্ষক অনেক সময় দেখতে পান শিক্ষার্থীর জীবন ও কার্যকলাপের অর্থ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হল জ্ঞানের একটি সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে শিক্ষার্থীকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এই কাজে স্পষ্ট ধারণার একান্ত অভাব এবং অনিশ্চয়তার ফলে কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, শিক্ষার পরবর্তী ধারাও দুর্বল হয়ে পড়ে। জ্ঞান, দক্ষতা, ব্যবহারিক কর্মকৌশল শিশুকে দিতে হবে। এগুলির সুস্পষ্ট পরিধি নির্ধারণ ছাড়া বিদ্যালয় কল্পনা করা যায় না। বহু স্কুলে শিক্ষার প্রাথমিক বিজ্ঞানের অন্যতম মারাত্মক ত্রুটি এই যে শিক্ষকের প্রায়ই নজর এড়িয়ে যায় শিক্ষার প্রথম,

দ্বিতীয় ইত্যাদি পর্যায়ে কোন্ কোন্ নিয়ম, সংজ্ঞা শিশুর গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, মনে রাখা উচিত, কোন্ কোন্ শব্দ তার ঠিকমতো লিখতে শেখা উচিত এবং কোন সময়েই তাদের সঠিক বানান ভোলা উচিত নয়। শিশুদের মানসিক শ্রমকে সহজসাধ্য করার চেষ্টায় কোন কোন শিক্ষক বিস্মৃত হন যে শিশুকে কোন ব্যাপার জানলেই হবে না, কোন ব্যাপারে আগ্রহী হলেই হবে না, রীতিমতো মুখস্থ রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে শিশুর সাধারণ বিকাশ সম্পর্কে অনেক কথা চলছে। সাধারণ বিকাশ—অবশ্যই জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাদীক্ষার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু যে-সমস্ত প্রাথমিক জ্ঞান মনে না থাকলে, স্মৃতিতে দৃঢ়মূল না হলে সাধারণ বিকাশই সম্ভব নয় তাদের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সাধারণ বিকাশ বলতে বোঝায় ক্রমাগত জ্ঞানার্জন আর তার জন্য দরকার পড়াশুনা করতে শেখা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে যে-সমস্ত সমস্যা আছে সেগুলির যাবতীয় বিশেষ গুরুত্ব সত্ত্বেও ভুলে গেলে চলবে না যে শিক্ষকের কাজ হল এমন মানুষকে নিয়ে যাকে যেতে হচ্ছে স্নায়ুব্যবস্থা গঠনের বিক্ষুব্ধ পর্বের মধ্য দিয়ে। জ্ঞানার্জনের, জ্ঞানকে মনে রাখার, স্মৃতির ভান্ডারে রাখার এক তৈরী, সজীব ব্যবস্থারূপে শিক্ষক যদি শিশুর মস্তিষ্ককে দেখেন তা হলে ভুল করবেন। ৭-১১ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শিশুদের মগজে প্রবল বিকাশ চলতে থাকে। শিক্ষক যখন ভুলে যান যে মানুষের স্নায়ুব্যবস্থার বিকাশের প্রতি, তার কোষকলা দৃঢ়তাসাধনের প্রতি যত্নপর হওয়া উচিত, তখন শিক্ষা শিশুকে ভোঁতা করে দেয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য অবিরাম জ্ঞানসঞ্চয়ন নয়, স্মৃতিশক্তির তালিম দেওয়া নয়, মুখস্থবিদ্যা নয়। মুখস্থবিদ্যা মানুষকে ভোঁতা করে দেয়, তার মাথা ঘুরিয়ে দেয়; এতে কারও কোন প্রয়োজন নেই, যেমন শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমনি তার মানসিক বিকাশের পক্ষেও এই বিদ্যা ক্ষতিকর। আমার লক্ষ্য ছিল শিক্ষা যেন সমৃদ্ধ অন্তর্লোকের অংশবিশেষ হয় আর সেই অংশবিশেষ যেন শিশুর বিকাশে, তার বুদ্ধিবৃত্তির সমৃদ্ধিসাধনে সহায়ক হয়। মুখস্থবিদ্যা নয়, খেলাধুলো, রূপকথা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত, কল্পনা ও সৃজনের জগতে পুরোদমে প্রবাহিত বুদ্ধিমার্গীয় জীবন—এই হবে আমার পালিত সন্তানদের শিক্ষা। আমি চাই শিশুরা যেন পর্যটক হয়, তারা যেন এই জগতে আবিষ্কর্তা ও স্রষ্টা হয়। পর্যবেক্ষণ, ভাবনাচিন্তা ও বিচারবিবেচনার ক্ষমতা, শ্রমের আনন্দ অনুভব করতে পারা, সৃজনের জন্য গর্ববোধ, মানুষের জন্য সৌন্দর্য ও আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতা, সেই সৃষ্টির মধ্যে সুখের সন্ধানপ্রাপ্তির, প্রকৃতি, সঙ্গীত ও শিল্পের সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা, ঐ একই সৌন্দর্য দিয়ে নিজের অন্তর্লোকের সমৃদ্ধিসাধনের, অন্যের আনন্দ-বেদনাকে আপনার বলে গ্রহণ করার, এবং অন্যের ভাগ্যকে নিয়ে ব্যক্তিগত ভাগ্যের মতোই গভীর ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা—আমার কাছে এ-ই ছিল শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ। সেই সঙ্গে বিস্মৃত হলে চলবে না সুস্পষ্ট, কঠোর ভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য: শিশুদের ঠিক কী জানা উচিত, কোন্ কোন্ শব্দ তাদের লিখতে শেখা উচিত, কোন্‌গুলির বানান তাদের কখনই ভুললে চলবে না, অঙ্কের কোন্ কোন্ নিয়ম তাদের চিরকাল মনে রাখা উচিত। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে মাতৃভাষার কোন্ কোন্ শব্দ শিশুদের

মনে রাখা উচিত, 'আনন্দ নিকেতনে' শিক্ষা দেওয়ার সময়ই আমি তার একটা তালিকা তৈরি করি।

মানসিক শ্রমের পদ্ধতি, রীতি ও প্রণালী আয়ত্তের মধ্যে আমি শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার বিপুল গুরুত্ব লক্ষ্য করি। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিকে স্কুলের বহু পরিচালক ও পরিদর্শক যে কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন তাতে আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হয়। স্কুলের পরিদর্শক এলে সর্বোপরি আগ্রহ দেখান ওপরের ক্লাস আর মাধ্যমিক শ্রেণীগুলির প্রতি, আর ছোট ক্লাসের প্রতি তাঁর মনোভাবটা এমন যেন ওখানে সত্যিকারের পড়াশুনা হয় না, হয় ছোটদের খেলাধুলা। শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণীতে ওঠামাত্রই এই খেলাধুলায় মাতামাতির জায়গায় স্থান নেয় ওদের জ্ঞানের পরিধি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা।

কোন রকম মাতামাতি নয়—ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজে নামার সময় আমি এই কর্তব্যটি সামনে রাখলাম। দ্বিতীয় শ্রেণী শেষ করার আগেই তাদের এত দ্রুত পড়তে শিখতে হবে, তাদের পাঠকে এমন ভাবগর্ভ ও সচেতন হতে হবে যে তারা যেন চোখ দিয়ে এক নজরে ছোট ছোট বাক্যকে এবং বড় বড় বাক্যের সম্পূর্ণ অর্থবোধক অংশকে অখণ্ড সামগ্রিকতারূপে গ্রহণ করতে পারে। পাঠ হল চিন্তাক্রিয়া ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্যতম উৎস। আমি চিন্তা করে দেখলাম, আমার কাজ হওয়া উচিত শিশুকে এমন ভাবে পড়তে শেখানো যাতে **পড়তে পড়তে** সে **ভাবতেও** পারে। শিশুর পক্ষে পাঠ হওয়া উচিত জ্ঞানার্জনের সূক্ষ্মতম উপায়, সেই সঙ্গে ঐশ্বর্যপূর্ণ অন্তর্জীবনের উৎস।

১৯৫২ সনের শরৎকাল থেকে ১৯৫৬ সনের বসন্তকাল—এই চার বছর সময়ের মধ্যে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ দুটি কর্তব্য

আমি কী ভাবে সম্পাদন করি এই অধ্যায়ে তার বিবরণ দেব: প্রথমত আমি শিশুদের গভীর, দৃঢ় ভিত্তিমূলক জ্ঞান দিই, দ্বিতীয়ত মুখস্থবিদ্যা প্রত্যাখ্যান করে শিশুদের অন্তর্জীবনের প্রতি, তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিই।

স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্য

একটি কথা আমি বারবার জোর দিয়ে বলতে পিছপা নই: স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন—শিক্ষকের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুদের প্রাণোচ্ছলতা ও স্ফূর্তির উপর নির্ভর করে তাদের অন্তর্জীবন, বিশ্ববীক্ষা, মানসিক বিকাশ, জ্ঞানের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা, আত্মশক্তিতে আস্থা। শিক্ষাদানের প্রথম ৪ বছর শিশুদের জন্য যে যত্ন ও উদ্বেগ আমার ছিল তার সামগ্রিক হিসাব নিতে গেলে দেখা যাবে যে অর্ধেকই গেছে স্বাস্থ্যের পেছনে।

পরিবারের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ না রাখলে স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া অসম্ভব। অধিকাংশ সময়ই, বিশেষত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রথম দু'বছর, মা-বাবাদের সঙ্গে আলোচনার বিষয় ছিল বাচ্চাদের স্বাস্থ্য। আমি অভিভাবকদের বললাম যে তাঁদের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে শেখার জন্য কোন কাজ দেওয়া হবে না। নিয়ম ও সংজ্ঞা ওরা মনে রাখতে শিখবে ক্লাসে পড়ার সময়। বাড়িতে শিক্ষার্থীদের কাজ হবে প্রধানত কতকগুলি অনুশীলনী পূরণ করা; সেগুলির উদ্দেশ্য—বিষয় যাতে গভীর ভাবে অনুধাবন করা যায় সে ব্যাপারে সাহায্য করা। তাছাড়া বাড়িতে ছেলেমেয়েরা পড়বে, ছবি আঁকবে, প্রাকৃতিক ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে, পারিপার্শ্বিক জগতের বিষয় ও ঘটনাবলী সম্পর্কে ছোট ছোট রচনা লিখবে,

যে কবিতা ভালো লাগে তা মুখস্থ করবে। বাড়িতে মানসিক শ্রম যেন ক্লান্তিকর না হয়, তবে এই শ্রমকে এড়ানোও সম্ভব নয়। এমন মনে করা ঠিক নয় যে ক্লাসে শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে বলে বাড়িতে পড়াশুনা করার একেবারেই প্রয়োজন নেই। এমন ধারণার মধ্যে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য ও নিয়মের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না এই কারণেই যে ক্লাসে এক নাগাড়ে ৩-৪ ঘণ্টা পড়াশুনার মধ্যে সমগ্র মানসিক শ্রম কেন্দ্রীভূত করা যায় না।

শিশুরা যাতে বেশি করে খোলা হাওয়ায় থাকে, যাতে দেরি করে না ঘুমোয়, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠে, ঘুমোনোর সময় যাতে জানলা ফাঁক করা থাকে সেদিকে মা-বাবারা দৃষ্টি রাখবেন বলে কথা দিলেন। পুরো গ্রীষ্মকাল, শরৎ ও বসন্তের ঈষদুষ্ণ মাসগুলিতে ছেলেমেয়েরা ঘরের বাইরে ছাড়া আর কোথাও ঘুমুতে পারবে না—মা-বাবাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমরা এটাও ঠিক করে নিলাম। মা-বাবারা বৃষ্টি থেকে গা বাঁচানোর জন্য চালা তৈরি করে তার নীচে খড় বিছিয়ে ঘুমোনোর বিশেষ জায়গা বানিয়ে দিলেন। বাচ্চাদের খুব পছন্দ হল। প্রতিটি পরিবারে, যেখানেই শিক্ষার্থী আছে, বাড়ির সংলগ্ন জমিতে, বাগানে থাকতে হবে কুঞ্জ—যাতে বসন্তের শুরু থেকে শরতের শেষ পর্যন্ত সেখানে বই পড়া যায়, ছবি আঁকা যায়, বিশ্রাম করা যায়। কয়েক বছর আগেই মা-বাবাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও ব্যাপারটা আমরা ঠিক করে নিয়েছিলাম। যাদের মায়েরা বাচ্চাদের জন্য নিজেরা কুঞ্জ বানাতে পারলেন না তাঁদের সাহায্য করল স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা।

'আনন্দ নিকেতনে' থাকতেই ছেলেমেয়েরা প্রাতঃকালীন ব্যায়ামচর্চায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল

এই অভ্যাস যাতে বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখা। আমার এই বিশ্বাস জন্মাল যে ব্যায়ামচর্চার অভ্যাস খুব ছোটবেলায়ই দৃঢ়মূলবদ্ধ হয়। মা-বাবারা শিশুদের রোজ একই সময় ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করান। খোলা বাতাসে ব্যায়ামচর্চার পর ছেলেমেয়েরা হাত মুখ ধোয়। গ্রীষ্মকালে পুকুরে স্নান করার অভ্যাস তাদের হয়; তাছাড়া অনেক মা-বাবাই উঠোনে কিংবা বাগানে স্নানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বছরে ছয় মাস (মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) শিশুরা ধারা জলে স্নান করত। অভ্যাসটা এমনই পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়াল যে শীতকালেও তারা কোমর পর্যন্ত শরীর ধুত—অবশ্য ঘরে।

অভিভাবক সমাজের সহায়তায় খোলা জায়গায় ধারাস্নানের ৬টি ব্যবস্থা করা গেল। তিনা, তোলিয়া, কোস্তিয়া, লারিসা, নিনা, সাশা ও স্লাভার জন্য এগুলির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ওরাই এগুলি ব্যবহার করত। কোন কোন ছেলেমেয়ের জন্মগত ভাবে শারীরিক কিছু কিছু খুঁত ছিল — যেমন, কেউ কোলকুঁজো, কারও দৈহিক গঠনে, কারও বা মুখাবয়বে আনুপাতিক অসঙ্গতি। ঐ সব ছেলেমেয়ে যাতে ধারাজলে স্নান করে এবং প্রাতঃকালীন ব্যায়ামচর্চা করে সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল। ...মানুষকে সুস্থ হলেই চলবে না, তাকে সুন্দর হতে হবে; সৌন্দর্য ত স্বাস্থ্যের সঙ্গে, মানবদেহের সুসমঞ্জস বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

শিশুর খাদ্যের ওপর নির্ভর করে তার শরীরের বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য, অনুপাত, অস্থির কোষকলার এবং বিশেষত বুকের খাঁচার সঠিক বিকাশ ত বটেই। বহু বছরের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে খাদ্যে খনিজ পদার্থ ও বহু অণু-উপাদান না থাকায় অস্থিপঞ্জরের কোন কোন অংশের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি

ঘটে, আর সে ত্রুটি সারা জীবনের মতোই থেকে যায়। তা যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি নজর দিতাম যাতে খাদ্যে পূর্ণমূল্যের ভিটামিন থাকে, যাতে খাদ্যে খনিজ পদার্থের সঙ্গে ভিটামিনের সমন্বয় ঘটে।

এর আগে কয়েক বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে ও বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে আমি যে সিদ্ধান্তে আসি তা উদ্বেগজনক: বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেমেয়েদের শতকরা ২৫ জনই সকালের খাবার না খেয়ে স্কুলে আসে—সকালে তাদের খিদে পায় না; ৩০ শতাংশ স্বাভাবিক পুষ্টির পক্ষে যতটা প্রয়োজন সকালে তার অর্ধেকেরও কম খায়; ২৩ শতাংশ ছেলেমেয়ে পূর্ণমূল্যসম্পন্ন প্রাতরাশের অর্ধেক খায়; কেবল ২২ শতাংশ খায় প্রয়োজনীয় মাত্রা অনুযায়ী। যে শিশু প্রাতরাশ না খেয়ে স্কুলে আসে, কয়েক ঘণ্টা ক্লাসে থাকার পর তার পাকস্থলীতে খিঁচ ধরে, তার মাথা ঘুরতে থাকে। এরপর শিশু বাড়ি ফিরে এলো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার পেটে কিছু পড়ে নি, সত্যিকারের সুস্থ ক্ষুধা তার নেই (মা-বাবারা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে বাচ্চা সাধারণ পুষ্টিকর খাবার খেতে চায় না, চায় 'স্বাদের খাবার')।

ক্ষুধামান্দ্য—স্বাস্থ্যের পক্ষে নিদারুণ অভিশাপ, অসুস্থতা ও ব্যাধির উৎস। এর প্রধান কারণ—বদ্ধ ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, বৈচিত্র্যহীন মানসিক শ্রম, খোলা হাওয়ায় বিচিত্র কার্যকলাপের অভাব—মোটের ওপর, 'অক্সিজেন বুভুক্ষা'—শিশু সারা দিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিপূর্ণ বাতাসে নিশ্বাস নিশ্বাস নিচ্ছে। বহু বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে লক্ষ্য করেছি আরও একটি অস্বস্তিকর জিনিস: শরীরের অভ্যন্তরীণ যে-সমস্ত গ্রন্থির রসনিঃসরণ পরিপাকক্রিয়ার পক্ষে

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিপূর্ণ ঘরের ভিতরে দীর্ঘকাল অবস্থান করলে সেগুলি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরন্তু এই রোগ স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায় এবং কোন রকম চিকিৎসায়ই আর সারে না। পরিপাক যন্ত্রের গুরুতর অসুস্থতার আরও কারণ এই যে ক্ষুধা উদ্রেকের উদ্দেশ্যে মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের নানা রকম লোভনীয় খাদ্য, বিশেষত মিষ্টি, দিয়ে থাকেন। 'অক্সিজেনের অভাব' ঘটতে না দেওয়া, পূর্ণমাত্রায় অনুকূল আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা—এর মধ্যেই নিহিত ছিল স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নগ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

আমি মা-বাবাদের পরামর্শ দিলাম তাঁরা যেন ছেলেমেয়েদের জন্য সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার রান্না করেন, শীতকালের জন্য বেশি করে প্রচুর ভিটামিনযুক্ত ফল মজুত করে রাখেন। এই সময় আমাদের কয়েকটি মৌচাক ছিল, তাই শীতকালে স্কুলের ক্যান্টিনে ছোটদের খেতে দেওয়ার মতো মধু আমাদের হত।

দিনরাত্রির অধিকাংশ সময়ই শিশুরা খোলা হাওয়ায় থাকত, বহু নড়াচড়া করত, কায়িক পরিশ্রম করত, স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি গিয়ে পাঠ্য বই নিয়ে বসত না। এই সব কারণে তাদের ক্ষুধাও চমৎকার হত। সকালে ছেলেমেয়েরা সকলেই পূর্ণ মূল্যের প্রাতরাশ খেত; স্কুলে আসার তিন ঘণ্টা বাদে (স্কুলের ক্লাস শুরু হওয়ার প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে) স্কুলের ক্যান্টিনে দুপুরের খাবার খেত: খেত গরম গরম মাংসের সুপ, কাটলেট, এক গেলাস দুধ, মাখন দেয়া রুটি। ক্লাস শেষ হওয়ার পর (স্কুলে দুপুরের আহারের ৩-৩·৫ ঘণ্টা পরে) খাবার খেত বাড়িতে।

দিনের দ্বিতীয়ার্ধ ছেলেমেয়েরা কাটাত খোলা হাওয়ায়—

তখন তারা স্কুলেই থাকুক কিংবা বাড়িতেই থাকুক। কেবল বৃষ্টিবাদলা বা তুষার ঝঞ্ঝার সময় ওরা ঘরে থাকত।

শিশুর সুসমঞ্জস বিকাশের ক্ষেত্রে সবই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বাড়ির জন্য কী কী অনুশীলনী শিশুকে দেওয়া হয়, কী ভাবে এবং কখন সে সেগুলি পূরণ করে—এরই ওপর নির্ভর করছে তার স্বাস্থ্য। বাড়িতে স্বাধীন ভাবে মানসিক শ্রম প্রয়োগের বিশেষ আবেগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শিশু যখন অনিচ্ছায় বই নিয়ে বসে, তখন কেবল তার অন্তরাত্মার শক্তিই পীড়িত হয় না, অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার যে জটিল ব্যবস্থা আছে তার উপরও প্রতিকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। এমন বহু ঘটনার কথা আমার জানা আছে যখন জ্ঞানের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণাবশত শিশুর পরিপাকক্রিয়ায় গুরুতর গোলযোগ দেখা দেয়, পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগ দেখা দেয়।

শরৎকাল, বসন্তকাল ও শীতকালের ছুটি যখন হত তখন আমরা সবসময় কাটাতাম খোলা হাওয়ায়, প্রকৃতির মধ্যে—আমাদের অভিযান চলত, অভিযানের মাঝে মাঝে আমরা বিরতি দিতাম, আমরা বনে-জঙ্গলে ঘুরতাম, খেলাধুলা করতাম। ...প্রথম শীতকালীন ছুটির সময়ই ছেলেমেয়েরা স্কী শুরু করে দিল, তারা বনে যেত, উঁচু জায়গা থেকে স্কী করে নীচে নামত। 'আনন্দ নিকেতনে' থাকতে আমরা শীতকালে যে রকম করতাম এখানেও তেমনি তুষার নগরী বানালাম, বরফের চাকা বানালাম। ছেলেমেয়েরা যখন পাইওনিয়র হল তখন তারা বনে নিজেদের বাহিনীর অত্যন্ত আকর্ষণীয় সমাবেশ ঘটাত।

শীতকালে খোলা হাওয়ায় পরিশ্রম আমাদের কাছে স্বাস্থ্যের পরম গুরুত্বপূর্ণ উৎসস্বরূপ ছিল। সহনীয় হিমের সময়

(—১০ ডিগ্রী পর্যন্ত) ৮ বছরের ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে একবার ২ ঘণ্টা করে পরিশ্রম করত, ৯-১০ বছরের ছেলেমেয়েরা করত ৩ ঘণ্টা করে, ১১ বছরের ছেলেমেয়েরা —৪ ঘণ্টা করে। ওরা নল্‌খাগড়া দিয়ে গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে বাঁধত, ঠান্ডা থেকে উদ্ভিদকে রক্ষা করার জন্য ছোট ছোট স্ট্রেচারে করে বরফ বয়ে নিয়ে যেত, এই রকম আরও অনেক কাজ করত। খোলা হাওয়ায় এই পরিশ্রম—দেহব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে তোলার, সর্দিকাশি জাতীয় রোগ নিবারণের চমৎকার উপায়।

গ্রীষ্মকালের ছুটিতে ছেলেমেয়েদের অভিযান চলত, তারা তৃণভূমিতে, মাঠে, বনে পর্যটন করত। প্রকৃতির সঙ্গে কয়েক মাস অবাধ মেলামেশা যেমন ছোটদের স্বাস্থ্য মজবুত করার পক্ষে তেমনি তাদের মানসিক বিকাশের পক্ষেও প্রচুর ফলপ্রসূ হয়। প্রথম শ্রেণী শেষ করার পর ওরা আগস্ট মাসটা কাটায় যৌথখামারের বাগানে আর মৌচাষের জায়গায়। দ্বিতীয় শ্রেণী শেষ করার পর কাটায় যৌথখামারের তরমুজখেতে।

আগস্ট। প্রকৃতি এ সময় উজার করে দেয় তার দান। এই সময়টা প্রকৃতির সৌন্দর্য চরম বিকাশ লাভ করে, এ হল শ্রমের বিজয়পর্ব। বাতাস এই সময় হয় বিশেষ নির্মল, স্বচ্ছ, উদ্দীপনাময়, যেন কাটা গম, পাকা ফুটি, আঙুর আর আপেলের সৌরভে ভরপুর। গ্রীষ্ম ও শরৎকালের মধ্যবর্তী এই সময়টিতে গ্রামের বাতাস জীবাণুনাশক পদার্থে ভরপুর। ফুসফুসের রোগ, সর্দিকাশি, বাতব্যাধি যদি নিবারণ করতে চান, যদি শিশুর স্বাস্থ্যকে মজবুত করে তুলতে চান তাহলে এই সময় তাকে দিনরাত বাইরে থাকতে দিন।

একবার ছেলেমেয়েরা যৌথখামারের তরমুজখেতে দিন কাটায়। প্রচুর তরমুজ আর ফুটি দিয়ে ওদের আপ্যায়ন করা হল। স্তেপের মনোমুগ্ধকর, মুক্ত প্রান্তরের কাছ থেকে বিদায় নিতে আমাদের মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। ঐ দিন সন্ধ্যায় যৌথখামারের সভাপতি তরমুজখেতে চারটি নতুন কুটির নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। একদিন বাদেই কুটির নির্মাণ শেষ হল। আমি যখন ছেলেমেয়েদের বললাম যে আমরা তরমুজখেতে বিশ্রাম করব তখন ওরা বিশ্বাসই করতে পারল না, বলল: 'আমাদের কি ওখানে থাকতে দেবে?' বিশ্বাস করল কেবল তখনই, যখন দেখতে পেল তাদের জন্য খড়ে ছাওয়া কুটির। এখানে আমরা রাতও কাটাব জানতে পেয়ে ছেলেমেয়েরা দারুণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। কুটিরের মাটিতে সুগন্ধী খড় বিছিয়ে দেওয়া হল, চাদর আর কম্বল আনা হল, হাতমুখ ধোয়ার জায়গা হল। মা-বাবারা বানিয়ে দিলেন রান্নাঘর, ছেলেমেয়েদের খাবার যোগাড় করে দিলেন। দুটি কুটিরে ছেলেরা, দুটিতে—মেয়েরা। তরমুজখেতে একমাস—নীল আকাশ আর উজ্জ্বল সূর্যের মধুর গানের মতো ছেলেমেয়েদের স্মৃতিতে চিরজীবনের জন্য গাঁথা হয়ে থাকে।

আমরা ভোর হতে না হতে উঠে পড়তাম, রাতের ঘুমের পর জাগ্রত প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করতাম, শিশিরের ওপর দিয়ে হাঁটতাম, কাঠের বিরাট পিপেতে ভরে প্রস্রবণের জল এনে হাতমুখ ধোয়ার জলের টবে ঢেলে দেওয়া হত—আমরা সেই জলে হাতমুখ ধুতাম। প্রাতঃকালীন ব্যায়ামচর্চা, ঠাণ্ডা জলে কোমর পর্যন্ত শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ধোয়া, টমেটো দিয়ে আলু-সিদ্ধ আর তরমুজ—সবই ছিল শিশুদের কাছে পরম উপভোগের বিষয়। প্রাতরাশের পর আমরা কাজ

করতাম—ফুটি ও তরমুজ সংগ্রহের কাজে যৌথখামারীদের সাহায্য করতাম।

শহরের ছেলেমেয়েরা তাদের মা-বাবাদের সঙ্গে এসে আমাদের এখানে অতিথি হত। আমরা গর্বভরে ওদের তরমুজখেত দেখাতাম, তরমুজ আর ফুটি দিয়ে ওদের আপ্যায়ন করতাম। বাচ্চারা বাইরের চেহারা দেখে বলে দিতে পারত তরমুজ পেকেছে কিনা। তরমুজখেতের পাশে লাগানো হয়েছিল মধুলতার গুল্ম, আগস্টে যৌথখামারের মৌচাষের ব্যবস্থা এখানে স্থানান্তরিত হত, আমরা রোজ আন্দ্রেই দাদুর অতিথি হতাম, তার জন্য তরমুজ নিয়ে যেতাম আর নিয়ে যেতাম আমাদের জন্য আমাদের রাঁধুনি পাশা মাসী যে কাটলেট তৈরি করতেন গরম গরম তারই খানকতক। আন্দ্রেই দাদু আমাদের ক্লাসের জন্য মৌমাছি সমেত একটা চাক উপহার দেন। 'তোমাদের স্কুলের জমির জন্য নিয়ে যাও,' তিনি বললেন। বাচ্চারা আগ্রহের সঙ্গে মৌমাছির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করত।

ছেলেমেয়েরা রোজ পুকুরে স্নান করত, বনে যেত, স্তেপে মেঠো ফুল সংগ্রহ করত, আন্দ্রেই দাদু আর পাশা মাসীকে সেগুলি উপহার দিত। দুপুরের প্রচন্ড তাপের সময় বাচ্চারা কুটিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত, শোয়ার আগে হাওয়া খেলার জন্য তারা দেয়াল খুলে কয়েকটা 'জানলা' করে নিত, জানলায় ঝুলিয়ে দিত মেঠো লতাপাতা, যাদের ঘ্রাণ মশা ও মাছিরা সহ্য করতে পারে না। বাইরে গরম, কুটিরের ভেতরটা ঠাণ্ডা। 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের সূচনা থেকেই আমরা ছোটদের মুখোমুখি খোলা জানলার বায়ুস্রোতে অভ্যস্ত হতে শেখাই; অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে মানুষ যদি ছোটবেলা থেকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তাহলে মুখোমুখি খোলা জানলার বায়ুস্রোতে

ভয়ের কোন কারণ নেই। বদ্ধ ঘরে গুমোট হাওয়ার মধ্যে থাকতে না পারার অভ্যাস গড়ে তোলা স্বাস্থ্য ও অনাময় ব্যবস্থার অভ্যাস গড়ে তোলার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

গরম কমে এলেই ছেলেমেয়েরা কাজ করতে যেত: সন্ধ্যার আগে আগে লোকে প্রায়ই তরমুজ ও ফুটির জন্য তরমুজখেতে আসত। সূর্যাস্তের পর মাঠ, টিলা আর তৃণভূমি যখন বেগনি রঙের ধোঁয়ার আচ্ছন্ন হয়ে যেত আর আকাশে একের পর এক তারা জ্বলে উঠত তখন ছেলেমেয়েরা একটা কুটিরের ধারে এসে জড় হত। সন্ধ্যার সময় বিশেষ করে শুনতে ইচ্ছে হয় রূপকথা আর অসাধারণ অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও ভ্রমণের কাহিনী, বীরত্বপূর্ণ কীর্তির কাহিনী। আমি বলতাম আমাদের লোককথায় কল্পিত চরিত্রের কাহিনী—জলপরী ও ডাইনীর কথা আর শরৎরানীর কথা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী এই শরৎরানী আগস্টের শান্ত রাতে উপহার নিয়ে আসেন উর্বরতা।

রাতের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা বহুবার শুনেছি আশ্চর্য সুর: কিছুদিন আগে যেখানে গম কাটা হয়েছে সেই মাঠের ওপর এই সুরেলা ধ্বনি শোনা যেত—বাঁশীর সুরের মতো। গান গাইত সম্ভবত আমাদের অজানা কোন পাখি, কিন্তু শিশুকল্পনায় গড়ে ওঠে এক দরদী প্রাণীর কল্পমূর্তি—গমের শীষের গুচ্ছ মাথায় এক ছোট বালকের মূর্তি। সে বাঁশী বাজিয়ে লোককে আনন্দ দেয়। এই প্রাণীটিকে বাচ্চারা 'সূর্যমুকুল' নাম দেয়। ওদের কল্পনায়, সূর্যমুকুল হল সূর্য আর উর্বরা ধরণীর সন্তান। গমের শীষ যেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তার জন্ম। ফসল তোলা হয়ে গেলে সে সুগন্ধী খড়ের গাদার মধ্যে আশ্রয় নেয়, সন্ধ্যায় সে গান

গায়—সে গান যেমন আনন্দের তেমনি বিষাদের: শীত এগিয়ে আসছে, তাকে এখন চলে যেতে হবে ধরণীর উষ্ণ গর্ভে, যেখানে প্রচ্ছন্ন আছে উর্বরতার সঞ্জীবনী রসধারা। গম সবুজ হয়ে উঠলেই সূর্যমুকুল আবার ফসলের খেতে আসবে, অপূর্ব গানে মেতে উঠবে।

মনে হতে পারে, শিশুরা প্রায়ই প্রকৃতির উপর রূপ আরোপ করে থাকে এবং কল্পনা হয়ত তাদের বাস্তব থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মোটেই তা নয়। কেননা এই রূপকথায় বিষয় ত জীবন, উর্বরতাশক্তি, মানুষ; এ হল প্রেরণার শক্তিমান উৎস।

শিশুরা যখন রূপকথার চরিত্রে প্রভাবিত হয় তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে: কোন এক সময় শোনা কিংবা পড়া শব্দ যেন চেতনার গহনে জাগ্রত হয়ে ওঠে, উজ্জ্বল বর্ণসুষমায় ঝলমল করে, মাঠ আর তৃণভূমির সৌরভে ভরপুর হয়ে ওঠে—শিশু তখন সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করে কাব্যময় রূপ।

পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন প্রসঙ্গ যেখানে স্বাস্থ্য সেখানে রূপকথা, কল্পমূর্তি, শিশুদের সৃজনকর্মের কথা উঠছে কেন? তার কারণ এই যে এ হল শিশুদের আনন্দ, আর আনন্দ ছাড়া সুস্থ শরীর ও সুস্থ আত্মার সুসমন্বয় সম্ভব নয়। মাঠের সৌন্দর্য, তারার ঝিকিমিকি, ফড়িংয়ের অবিরাম গীত আর মেঠো ফুলের গন্ধে মুগ্ধ শিশু যদি গান রচনা করে তার অর্থ, শিশুর মধ্যে এই দেহ ও আত্মার চূড়ান্ত সমন্বয় ঘটেছে। মানুষের, বিশেষত শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন—স্বাস্থ্য ও অনাময়ের নিছক কতকগুলি বিধিনিয়ম পালন নয়, রুটিন, পথ্য, শ্রম ও বিশ্রামের নির্দিষ্ট কিছু দাবি মেনে চলা নয়। এ হল সর্বোপরি সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক শক্তির পরিপূর্ণ

সামঞ্জস্যবিধানের কাজ আর সেই সামঞ্জস্যের চূড়ান্ত পরিচয়—সৃজনের আনন্দ।

তৃতীয় শ্রেণী শেষ করার পর আমরা গরমের ছুটি কাটালাম ফলের বাগিচায়, তবে এবারে অন্য জায়গায়—আঙুরখেতের পাশে। ছেলেমেয়েরা আবাদে কাজ করত: ঝুড়িতে আঙুরের গোছা সাজিয়ে রাখার ব্যাপারে বড়দের সাহায্য করত। সকালে ও সন্ধ্যায় স্নান করত পুকুরে। বাচ্চারা মাথা খাটিয়ে একটা আকর্ষণীয় খেলা বার করল: ওদের কল্পনায় তিনটি নৌকো নিয়ে তিমিশিকারের নৌবহর তৈরি হল, ছোট সরোবরটি হল সমুদ্র, আমরা গোপন অনুসন্ধানে যেতাম, তিমির খোঁজ করতাম। ...এখানে আমরা বাঁশী বানালাম; সন্ধ্যায় আমাদের বাজনার মজলিস বসত। আমরা লোকগীতির সুর বাজাতাম, গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা, বজ্রপাত আর রক্তিম আকাশ নিয়ে, বাঁধের কাছের রহস্যজনক পাকদহ আর বাসবদলকারী পাখিদের নিয়ে গান বাঁধতাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত আমাদের মনোজীবনে উত্তরোত্তর বেশিমাত্রার স্থান নিতে লাগল। বাচ্চারা যেখানেই বিশ্রাম করতে যেত সেখানেই তারা টেপ্-এ তোলা সঙ্গীত শুনত—সে সঙ্গীত হত বিশিষ্ট সুরকারদের রচনা আর লোকগীতি।

শিক্ষার চতুর্থ বর্ষ শেষ হল, ১৯৫৬ সনের গ্রীষ্ম এলো। ছেলেমেয়েদের বিশ্রামের জায়গা হল ওককাননের পাশে, সরোবর তীরের তৃণভূমি। ডালপালা দিয়ে কুটির বানানো হল, কুটিরের ওপর খড় ফেলে চাল তৈরি হল। মা-বাবারা স্নানের ঘাট আর রান্নাঘর নির্মাণের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করলেন। এখন ছেলেমেয়েরা রাঁধুনিকে রান্নার কাজে সাহায্য করে, রুটি, আলু, মাছ, দুধ, শাকসব্জি আনতে গাঁয়ে যায়।

আমাদের হেফাজতে ছিল ২০টি বাছুর ও ২টি ঘোড়া। দিনের বেলায় বাচ্চারা বাছুরগুলিকে চরাত আর সন্ধ্যায় ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট খোঁয়াড়ে পুরে রাখত। খোঁয়াড়টা তৈরি করা হয়েছিল সরোবরের ধারে। সকলেই ঘোড়ায় চড়া শিখল, ওরা ঘোড়ায় চেপে গাঁয়ে খাদ্যসামগ্রী আনতে যেত। এ ব্যাপারে পালা অনুসরণের কড়াকড়ি নিয়ম ছিল: সকলেরই ইচ্ছে হত ঘোড়ায় চেপে কয়েক কিলোমিটার ছোটে। আমার আনন্দ হল এই দেখে যে ভলোদিয়া, সানিয়া ও তিনা বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার হয়ে উঠেছে—ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর ফলে ওদের স্বাস্থ্য মজবুত হয়েছে।

সে বছর ছেলেমেয়েরা গভীর সরোবরে স্নান করার সময় ভালো সাঁতার কাটতে শিখল। স্নান করার জন্য আমি নিরাপদ একটি জায়গা বেছে নিই এবং প্রতিবার একটি করে বাচ্চাকে নিয়ে সাঁতার কাটতে নামি।

বিশেষ করে আনন্দের হত ঘাসকাটার দিনগুলি। আমরা বড়দের বিচালি শুকোতে ও স্তূপ করে রাখার কাজে সাহায্য করতাম, আর সন্ধ্যাবেলায় উঁচু গাদার ওপর গিয়ে বসতাম। এই সময় শিশুরা বিশেষ মুগ্ধ হত: তাদের শুনতে ইচ্ছে হত তারাদের কথা, দূর দূর বিশ্বের কথা। নক্ষত্রখচিত চাঁদোয়ার নীচে শিশুদের মনে হত তারা যেন মহাজগতের মুখোমুখি হয়েছে, তারা শিক্ষককে প্রশ্ন করত: 'পৃথিবী, সূর্য, তারা— এ সব কোথা থেকে এলো?' আমার বিশ্বাস এই যে যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমার সামনে বিস্ময়, আশ্চর্যবোধ বুদ্ধি ও অনুভূতিকে অভিভূত করে ফেলে তখনই শিশুচেতনায় এমন সব প্রশ্ন জেগে ওঠে।

আমার চিরকাল মনে থাকবে একটি ঘটনা। একবার নক্ষত্রজগৎ

সম্পর্কে একটি বিবরণ শোনার পর, বাচ্চারা প্রশ্ন করল: 'আচ্ছা আরও দূরে কী আছে?' আমি যখন বললাম যে ওখানেও, দৃশ্য জগৎগুলির ওপারেও আছে মহাজগৎ আর সে সব জগতের সংখ্যা অগণন, অসংখ্য, তখন ওরা অবাক হয়ে গেল: 'তাহলে জগতের শেষ কথায়?' জগৎ যে অন্তহীন এই সত্য তাদের কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য। মনে আছে, শিশুরা এই সত্য শোনার পর বিস্মিত হয়ে চুপ করে গেল, তারা অন্তহীনতা ব্যাপারটি ধারণায় আনার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সেই রাতে অনেকক্ষণ বাচ্চাদের চোখে ঘুম এলো না। অনেকেই দূরের সূর্য আর গ্রহের স্বপ্ন দেখল। পর দিন ছেলেমেয়েদের থেকে থেকে ব্যাকুল করে তোলে সেই এক প্রশ্ন: অন্তহীনতা ব্যাপারটি কী? স্কুলজীবনের গোটা পর্বে এই প্রশ্নটি আমার শিক্ষার্থীদের কাছে তার তাক-লাগানো নবত্ব হারায় নি।

...'আনন্দ নিকেতনে' শিশুদের শিক্ষাদানের সময় গোড়া থেকেই আমি খেলাধুলা চর্চার ওপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করি। ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাহায্যে আমরা খেলার মাঠ তৈরি করি, দোলনার ব্যবস্থা করি। আমাদের যথেষ্ট সংখ্যক বল ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতেই ছেলেমেয়েরা টেবিল-টেনিস খেলতে শুরু করল। ডিসকাস ও বল ছোঁড়ায় এবং দড়ি ও লাঠি বয়ে ওঠায় ওদের আগ্রহ দেখা গেল।

পুরো গরমকালটা ছেলেমেয়েরা খালি পায়ে হাঁটত, বৃষ্টি বাদলার পরোয়া করত না। আমার কাছে এটাই ছিল দেহ মজবুত করে তোলার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করার তিনটি ঘটনা ঘটে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে—কেউই অসুস্থ হল না।

আমার মতে, সর্দিজাতীয় যাবতীয় সম্ভাব্য রোগ প্রতিরোধের শিক্ষা দেওয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়ার যখন আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে সেই সময় অর্ধেকের বেশি ছেলেমেয়ের হাঁচি শুরু হয়ে যেত। এই অস্বস্তিকর ঘটনা নিয়ে আমি অনেক কাল ধরেই ভাবি। এমন কি বাচ্চার শরীরের তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি নাও পায় তবু এমন অসুস্থ অবস্থায় স্বাভাবিক ভাবে কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সর্দি চটপট সারিয়ে তোলার মতো কোন ওষুধও নেই। চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন প্রমাণ আছে যে সর্দির বহু প্রকারভেদই আসলে সংক্রামক ব্যাধি নয়, তা হল পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তনবশত সংবেদনশীল দেহযন্ত্রের উপর প্রতিক্রিয়া। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বিশেষ করে সংবেদনশীল হল পা। সামান্যতম ঠাণ্ডা লাগায় ভয়ে পা যদি সাবধানে রাখা হয় তাহলে যে সর্দিরোগ সংক্রামক নয় তার কবলেও পড়ার সম্ভাবনা থাকে। আমাদের শিক্ষাকর্মের মধ্যে শরীর মজবুত করার যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার শুরুই হয় পা ধাতস্থ করা দিয়ে। এক্ষেত্রে, বলাই বাহুল্য, শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থাও বিবেচনা করে দেখা হয়। পা ধাতস্থ করে তোলার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন মেয়াদের জন্য বিশেষ কোন অনুশীলনী নেই। সবসময় সাধারণ বিধিব্যবস্থা পালন করে চলা দরকার, হট্ হাউস-এর পরিবেশে শিশুকে অভ্যস্ত হতে না দেওয়া, এমন কোন বাড়তি যত্ন না নেওয়া যাতে শরীরের প্রতিরক্ষাক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। শিশু যদি গ্রীষ্মকালে খালি পায়ে না হাঁটে তাহলে স্নানে ও ভিজে গামছায় গা মোছানোয় কোন কাজই হবে না।

...অবশেষে ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করল।

ছুটির শেষ দিন। সরোবরে স্নান করার পর ওরা জড় হল সবুজ লন্‌-এ — সকলেরই মজবুত স্বাস্থ্য, সকলেই রোদে পোড়া, সুন্দর। ওদের বয়স এগারো, কিন্তু ওদের দেখায় ১২-১৩ বছর বয়সের শক্তসমর্থ ছেলেমেয়ের মতো। এমন কি ছোট্ট দাঙেকা, যাকে অনেক দিন পর্যন্ত সবাই 'খুদে' বলে ডাকত, সেও মাথায় হয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর অনেক ছেলেমেয়েরই সমান।

প্রতি বছর চিকিৎসক কয়েক বার করে শিশুদের দৃষ্টিশক্তি, হৃদ্‌যন্ত্র, ফুসফুস পরীক্ষা করতেন। প্রথম শ্রেণীতে চারটি ছেলেমেয়ের দৃষ্টিশক্তি খারাপ ছিল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে— দুজনের, তৃতীয় শ্রেণীতে সে রকম ঘটনা একটিও ছিল না। জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হল যে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা— চোখের রোগ নয়, এ হল শিশুর দেহাভ্যন্তরে শারীরিক ও আত্মিক বিকাশের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐক্যের অভাব। প্রথম দু'বছরের ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেল ৩টি ছেলেমেয়ের হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী ধমনীর দৌর্বল্যের উপসর্গ আছে, ২ জনের আছে কোন এক সময় প্লুরিসিতে ভোগার ফলে কিছু জটিলতা, দুজনের আছে ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ, একজনের চোরা ক্ষয়রোগ আছে বলে সন্দেহ করা হল। প্রাথমিক শ্রেণী শেষ করার মুহূর্তে একটি শিশুর হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী ধমনীর দৌর্বল্যের সন্ধান পাওয়া গেল—তাও আবার শিক্ষার প্রথম ২ বছরে যেমন ছিল সে তুলনায় অনেক কম।

শিক্ষা — মনোজীবনের অংশবিশেষ

বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে প্রকৃতি, খেলাধূলা, সৌন্দর্য, সঙ্গীত, কল্পনা ও সৃষ্টির যে আশ্চর্য জগৎ শিশুদের চারধারে ছিল, ক্লাসঘরের দরজা যাতে সে জগৎ থেকে তাদের আড়াল

রচনা না করে এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্কুল জীবনের গোড়ার মাস ও বছরগুলিতে বিদ্যাশিক্ষা যেন একমাত্র কার্যকলাপে পরিণত না হয়। শিশু একমাত্র তখনই স্কুলকে ভালোবাসবে, যখন আগে যে আনন্দের স্বাদ সে পেয়েছে, শিক্ষক মুক্তহস্তে সেই একই আনন্দ তাকে বিতরণ করবেন। সেই সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষাকে শিশুর আনন্দের উপযোগী করে নিলে চলবে না, শিশুর যাতে একঘেয়ে না লাগে একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে সহজ করে তোলা উচিত হবে না। ধীরে ধীরে শিশুকে প্রস্তুত করতে হবে সমগ্র মানবজীবনের প্রধানতম কাজের জন্য — তাকে পরিচালনা করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ, অটল সাধনার দিকে। আর এর জন্য শিশুকে চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতেই হবে।

আমি দেখতে পেলাম, শিক্ষকতার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল শিশুদের মধ্যে সচেষ্ট, সৃজনশীল মানসিক শ্রমের অভ্যাস সঞ্চার করা। শিক্ষক কিংবা শিশু নিজেই যে লক্ষ্য তার সামনে রেখেছে মানসিক প্রয়াসকে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করতে গেলে উক্ত মুহূর্তে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু থেকে কী ভাবে মনোযোগ সরিয়ে রাখা যায় তা শিশুকে জানতে হবে। শিশুরা যাতে একাগ্রতায় অভ্যস্ত হতে পারে সে বিষয়ে আমি সচেষ্ট হই। একমাত্র এই শর্তেই মানসিক শ্রম প্রিয় কাজ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তব্য — ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের কেবল শারীরিক শ্রমে নয়, বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমেও অভ্যস্ত করে তোলা। বুদ্ধিমার্গীয় শ্রমের সারমর্ম যে মানসিক প্রয়াস খাটানো, বস্তু, তথ্য ও ঘটনার খুঁটিনাটি ও অন্তর্নিহিত বিরোধ, বিচিত্র জটিলতা ও সূক্ষ্মতার মর্মমূলে

প্রবেশ — শিশুদের তা বোঝা উচিত। এমন করা কোন মতেই ঠিক হবে না যাতে শিক্ষার্থীদের কাছে সবকিছু সহজসাধ্য হয়, যাতে শিশু না জানতে পারে বাধাবিপত্তি কাকে বলে। জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শ্রমচর্চা এবং মানসিক শ্রমের আত্মশাসনের শিক্ষাও চলতে থাকে। বুদ্ধিমার্গীয় শিক্ষা — মনোজীবনের অন্যতম ক্ষেত্র, যেখানে শিক্ষকের প্রভাব স্বশিক্ষার সঙ্গে সুসমঞ্জসরূপে মিলে যায়। ইচ্ছাশক্তির শিক্ষা শুরু হয় মনে মনে নিজের সামনে উদ্দেশ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে, মানসিক শক্তি একত্রীকরণ, উপলব্ধির চেষ্টা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ দিয়ে। আমার ধারণায়, শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এই যে শিশুরা যেন মানসিক শ্রমের মধ্যেই উপলব্ধি করতে পারে কঠিন কাকে বলে।

বিদ্যাশিক্ষার সময় শিশু যদি সহজেই সব পেয়ে যায় তাহলে ধীরে ধীরে তার মধ্যে সঞ্চারিত হয় ভাবনার আলস্য, যা মানুষকে নষ্ট করে, জীবনের প্রতি তার হালকা মনোভাব গড়ে তোলে। ভাবতে অবাক লাগলে ভাবনার আলস্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিকাশ লাভ করে ক্ষমতাবান শিশুদের মধ্যে, যখন বিদ্যাশিক্ষার সময় তেমন কোন শ্রম তাদের প্রয়োগ করতে হয় না। আর ভাবনার আলস্য সবচেয়ে বেশি বিকাশ লাভ করে নীচের ক্লাসে, যখন অন্য শিশুরা প্রচুর মানসিক শক্তি খাটিয়ে যা আয়ত্ত করছে ক্ষমতাবান শিশু তা সহজেই আয়ত্তে আনার পর বস্তুত আলস্যে সময় কাটাচ্ছে। দেখতে হবে শিক্ষার্থীদের যেন আলস্য না আসে — এ-ও শিক্ষকতার বিশেষ এক ধরনের কর্তব্য।

আমাদের প্রথম শ্রেণীর স্থান হল পৃথক একটি ছোট বাড়িতে। আমাদের ক্লাসের ঘরটি ছিল বিরাট, খোলামেলা, ঘরের

জানলাগুলি পুব আর দক্ষিণ দিকে, ক্লাসঘরে সবসময়ই প্রচুর আলো। জানলার নীচেই—কিছু বাদাম গাছ, সেগুলির পিছনে আপেল, নাসপাতি আর অ্যাপ্রিকটের গাছ, আরও দূরে—ওক উপবন। কেবল আমাদের বাড়িটাই নয়, স্কুলের অন্যান্য ঘরও গাছপালার মধ্যে ডুবে আছে। গাছের পাতা বাতাসকে অক্সিজেনে সমৃদ্ধ করে। স্কুলের এলাকায় সবসময় নিস্তব্ধতা। আমাদের ক্লাসঘরের লাগোয়া বিরাট করিডর, সেখান থেকে দরজা দিয়ে যাওয়া যায় আরও একটা ঘরে: আমাদের ইচ্ছে ছিল এখানে রূপকথার ঘর বানাব।

দেউড়ির সামনে—কংক্রিটে বাঁধানো চত্বর। সেখানে আছে জুতো ধোয়ার বন্দোবস্ত (বৃষ্টির জমিয়ে রাখা জল কাজে লাগানো হয়)। চত্বর থেকে চলে গেছে কয়েকটি পথ। পথের দু'পাশে সারি সারি পীচফলের গাছ, লিণ্ডেন আর বাদাম গাছ। একটি পথ চলে গেছে স্কুলের আঙ্গিনার মাঝখানে অবস্থিত বিশাল আঙুরখেতের দিকে, আরেকটি—আমাদের সবচেয়ে কাছের পড়শীদের দিকে—পঞ্চম শ্রেণীর দুটি বিভাগের ক্লাস যেখানে বসে সেই ছোট বাড়িটার দিকে; অন্যটি—সবুজ লন্ আর উপবনের দিকে, আরও একটি—ঝোপঝাড়ে ছাওয়া খাতের মুখে।

সেই সময়ই আমার মনে হয় যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাসগুলি পৃথক একটি দালানে হলে ভালো হয়। ঐ ক্লাসগুলির, বিশেষত প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা, শ্রম ও বিশ্রামের নিজেদের বিশেষ নিয়ম আছে। সাধারণত বড় বড় দলবল সচরাচর হৈ হট্টগোল, চেঁচামেচি করে, স্কুলের বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেমেয়েদের পক্ষে সে পরিবেশ ক্ষতিকর। পুরোমাত্রায় মানসিক বিকাশের জন্য দরকার—নীরবতা। ছোট

ছোট ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ পারা যায় এর কল্যাণ ভোগ করুক। দীর্ঘকালীন পর্যবেক্ষণের ফলে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে স্কুলজীবনের প্রথম দিকে শিশু যে পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে তা তাকে বিহ্বল করে ফেলে। বাচ্চারা মানসিক পরিশ্রমে ততটা ক্লান্ত হয় না যতটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে ক্লাসের আগে এবং পিরিয়ডের ফাঁকে সবসময় হৈ হট্টগোল ও ছুটোছুটির ফলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা থেকে। টিফিনের পর প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের অবস্থা আমি পাঁচ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করি। আধ-ঘণ্টা ওরা স্কুলের একটা বিরাট দঙ্গলের গোলমাল, হৈ হট্টগোল ও ঠেলাঠেলির পরিবেশের মধ্যে থাকে। টিফিন পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা ক্লাসে যায়, অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের শান্ত করতেই পাঠের দশ মিনিট ব্যয় করেন। প্রথম শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যেখানে বিরতির সময় নিজেদের ছোটখাটো দলে মিলে বিশ্রাম করে সেখানে পরিস্থিতি দেখা যেত অন্য রকম। শিশুদের শান্ত করতে, তাদের উত্তেজনা প্রশমন করতে সেক্ষেত্রে ২ মিনিটের বেশি সময় লাগত না।

অসংযত চেঁচামেচি, ছুটোছুটি — স্কুলের আদর্শ চিত্র নয়। শিশুদের আনন্দের নদী যত জলভারপূর্ণই হোক না কেন তার তীরভূমি থাকা উচিত, সেই তীরভূমি শিশুদের আবেগ উচ্ছ্বাসকে সংযত করে রাখবে।

বর্তমানে আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাস হয় গাছপালায় ঘেরা এক স্বাচ্ছন্দ্যকর, নিভৃত বাড়িতে। শিশুদের জন্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তা পালাক্রমে শ্রম ও বিশ্রামের সহায়ক।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি ধীরে ধীরে শিশুদের পরিচয়

দিলাম তাদের নতুন জীবনের। 'আনন্দ নিকেতনের' শিক্ষার সঙ্গে এখানকার বিদ্যাশিক্ষার বস্তুত তখনও তেমন কোন হেরফের ছিল না, আমার সেটা করা ইচ্ছেও ছিল না। সেপ্টেম্বরে আমরা দিনে ৪০ মিনিটের বেশি ক্লাসে থাকতাম না, আক্টোবরে থাকতাম ঘণ্টা দুয়েক। এই সময়টা নির্দিষ্ট ছিল হাতের লেখা ও অঙ্কের জন্য। বাকি দু'ঘণ্টা আমরা কাটাতাম খোলা হাওয়ায়। বাচ্চারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত **আসল ক্লাসের** — ক্লাসের পড়াশুনাকে তারা এই নাম দিয়েছিল। তাদের এই ইচ্ছায় আমার আনন্দ হত, আমি ভাবতাম: 'তোমরা যদি জানতে তোমাদের সমবয়সীরা বদ্ধ ঘরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কী অধীর আগ্রহেই না বিরতির ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করে থাকে!'

ক্লাসের পড়াশুনার ব্যাপারে শিশুদের ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তোলা — পূর্ণমাত্রায় শ্রমশিক্ষার, নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত। চরম লক্ষ্য হল মানুষকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করতে শেখানো। ক্লাসের পাঠ এমন কোন দুঃখজনক অবশ্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপার নয় যার সঙ্গে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক আপস করে নিতে হয়। ক্লাসের পাঠ — মানসিক শ্রমের সর্বাপেক্ষা অনুকূল পরিস্থিতি, তবে সেই পরিস্থিতির জন্য শিশুকে প্রস্তুত করতে হয় ধীরে ধীরে — স্কুলের বয়ঃকনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাস চালানোর বিশেষত্ব এখানেই। যে পরিস্থিতি ভবিষ্যতে মানসিক শ্রমের অনুকূল হতে পারত, হঠাৎই প্রতিদিন চার ঘণ্টা করে ক্লাসে শিশুদের খাটতে বাধ্য করলে তা তাদের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

ক্লাসে আমরা বর্ণপরিচয় পড়তাম, অক্ষর লিখতাম, এটা-ওটা নানা চিহ্ন আঁকতাম, সমস্যা বানাতাম ও পূরণ করতাম — এ

সবই ধীরে ধীরে শিশুদের বহুমুখী মনোজীবনে স্থান করে নিতে লাগল, একঘেয়েমিতে ওদের ক্লান্ত করত না। বর্ণপরিচয়ে একই জিনিস বহুবার পড়তে আমাদের হত না — ছেলেমেয়েদের সকলেরই ভালোমতো অক্ষর পরিচয় ছিল, তাই পড়ার কৌশল উদ্ভাবনের জন্য আমাকে বহুবিধ সক্রিয় কার্যকলাপের আশ্রয় নিতে হত। শিশুরা প্রকৃতি সম্পর্কে ছোট ছোট রচনা লিখত। বর্ণপরিচয় ধরে ধরে একই বিষয় বারবার পড়ার ফলে পঠনক্ষমতার যে বিকাশ হয় এতে তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় বিকাশ পেতে লাগল।

প্রতিটি শিশুর যাতে অবশ্যপ্রয়োজনীয় পঠনপ্রণালী গড়ে ওঠে আমি সেদিকে নজর রাখতাম। অনুশীলন ছাড়া, পঠনের নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়া কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। অক্ষর জানাটাই সব নয়, যুক্তাক্ষর এবং শব্দও পড়তে জানা সব নয়। পঠন হল জগতের বাতায়ন, জ্ঞানের পরম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, পঠন হওয়া চাই স্বচ্ছন্দ, দ্রুত — একমাত্র তখনই এই হাতিয়ার হবে কাজের উপযোগী। আমার প্রয়াস ছিল যাতে সক্রিয় কার্যকলাপের বহুবিধ রূপ — ভাবগর্ভ পঠন, লিখন ও অঙ্কন — সবই পঠনকে আধা-স্বয়ংচালিত প্রক্রিয়ায় পরিণত করে, যাতে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই বহু সিলেব্‌লের বড় বড় শব্দকে শিশুরা চোখের দৃষ্টিতে এককেটি অখন্ড একক রূপে গ্রহণ করতে পারে। আমি যখন প্রকৃতি সম্পর্কে ছোটখাটো রচনা লেখার আশ্রয় নিতাম, যখন এ ধরনের কাজের প্রতি শিশুদের সজীব আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতাম তখন প্রকৃতপ্রস্তাবে তা হত ছোটদের ভালোমতো পড়তে শেখানো — এই একটি লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রণালী।

এ ধরনের একটি 'ফন্দি' হিশেবে গণ্য করা যেতে পারে

বিদ্যাভ্যাস কালে শ্রমের বহুবিধ রূপ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে গোড়ার দিকে প্রথম শ্রেণীতে পঠন, লিখন ও অঙ্কের 'খাঁটি' অনুশীলন অচল। একঘেয়েমিতে শিগগিরই ক্লান্তি এসে যায়। বাচ্চারা যখনই ক্লান্ত হয়ে আসত সেই মুহূর্তে আমি তার বদলে নতুন ধরনের কাজের উদ্যোগ নিতাম। শ্রমে বৈচিত্র্য সূচনার এক শক্তিশালী উপায় ছিল ছবি আঁকা। আমি দেখতে পাই বাচ্চারা পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, অমনি বলি: 'তোমাদের ড্রইং খাতা খোল, যে রূপকথা আমরা পড়ছি তার ছবি আঁকব।' ক্লান্তির প্রাথমিক লক্ষণ কেটে যায়, শিশুদের চোখে খুশির ঝলক খেলে, একঘেয়ে কাজকর্মের বদলে আসে সৃজনকর্ম। ...এই একই দৃশ্য দেখা যায় অঙ্কের ক্লাসে: দেখতে পাই নিজে নিজে কষার জন্য যে অঙ্ক শিশুদের দেওয়া হয়েছে তার শর্ত তাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে সৃজনী শ্রম—অঙ্কন। শিশুরা আরও একবার অঙ্কের প্রশ্নটা পড়ে দেখে ও আঁকে। যে ব্যাপার কিছুক্ষণ আগেও সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঠেকছিল তা বোধগম্য হয়ে উঠতে থাকে। দীর্ঘকাল শোনায়ও ক্লান্তি আসে। শিশুদের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে আসছে দেখে আমি আমার বক্তব্যের 'নিষ্পত্তি' টেনে দিই, আমরা আঁকতে শুরু করি।

শিক্ষাবর্ষ সূচনার তিন সপ্তাহ পরেই আমার শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি সম্পর্কে ছবির বই রচনা শুরু করে। ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা প্রতিটি শিশুর জন্য শক্ত মলাটে বাঁধাই একেকটা খাতা তৈরি করে দেয়, খাতায় ছিল ২০টি শক্ত কাগজ, আর মলাটের গায়ে আটকে দেওয়া হয় পেন্সিল। সপ্তাহে একবার আমরা ভাবনা ও শব্দের উৎসে যাত্রা করতাম, একটি করে ছবি আঁকতাম—সে ছবি হত পারিপার্শ্বিক জগতের বিবরণ।

আমাদের প্রথম 'পর্যটন'—ফলের বাগিচায়, আর আপেল বাগানে, যেখানে ফল দেরি করে পাকত। ছোটরা যে সব বিবরণ দিত তাতে তাদের উপলব্ধি ও ধারণার ব্যক্তিগত জগতের প্রকাশ ঘটত।

'আপেল মাটিতে ঝুঁকে পড়েছে', 'আপেল রোদ পোহাচ্ছে', 'সবুজ পাতার মাঝে লাল আপেল', 'সূর্য আদর করছে, আপেলকে ডাল দোলা দিচ্ছে', 'বসন্তে সাদা ফুল, শরতে সোনালি আপেল', 'আমরা আপেলের কাছে অতিথি হয়ে এলাম'—ছোটরা তাদের প্রকৃতিসংক্রান্ত ছবির বইয়ে লেখে। ছেলেমেয়েরা তাদের ছোট ছোট রচনাগুলি ক্লাসে পড়ে, তাতে ওরা বড় আনন্দ পেত। বাগানে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যটি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়। ছোট ছোট রচনা বানানো—ভবিষ্যতে শিশুদের অধ্যবসায়মূলক, কঠোর মানসিক শ্রমের প্রস্তুতির জন্য উৎকৃষ্ট উপায়স্বরূপ। প্রথম শ্রেণীতে, বিশেষত দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আমি চেষ্টা করতাম যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর যার যার পড়ার কাজ থাকে, আর সে-কাজ যেন সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। মানসিক শ্রমের শৃঙ্খলা শিক্ষার পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার প্রথম বছরে সবগুলি ছবির বই আঁকায় আর রচনায় ভর্তি হয়ে যায়। শিশুদের রচনার বিষয় ছিল টুকটুকে ফলের থোকা, ফসল তোলা, ঘুমন্ত সরোবর (ওরা সরোবরটাকে ঘুমন্ত আখ্যা দিয়েছিল সম্ভবত এই কারণে যে আমরা যখন পর্যটন করতাম তখন সবসময়ই তার জল দেখা যেত আয়নার কাচের মতো টলটলে, স্থির), স্কুলের বাগানে ছেলেমেয়েদের শ্রম, সূর্যাস্তকালের রক্তিম আকাশ, শরতের প্রথম হিম, শরতের মেঘবাদলার দিন, ১৯১৭ সনের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের বার্ষিকী, আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা, প্রথম তুষারপাত, জানুয়ারির তুষারঝঞ্ঝা, রূপকথার তুষার দাদু—যিনি নদী আর সরোবর জমিয়ে দেন, ফেব্রুয়ারির ঝিরঝিরে বরফ, বরফের ওপর মার্চের নীল ছায়া, প্রথম স্নো-ড্রপ ফুল, কোন এক ময়না পাখি, যে বেশ আগে থাকতেই গরম অঞ্চল থেকে ফিরে এসে আচমকা মার্চের তুষারঝঞ্ঝার মধ্যে পড়েছে, বসন্তকালের আনন্দোচ্ছল বাসাবদলকারী পাখির ঝাঁক, ডেইজী ফুলের কাছ থেকে শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে উড়ন্ত মৌমাছিদের বিদায়গ্রহণ।

প্রকৃতিসংক্রান্ত ছবির বইগুলি আমাদের দলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক সঙ্কলনগ্রন্থ হয়ে দাঁড়াল। সেখানে স্বদেশের প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণসুষমা, আকাশ ও পৃথিবীর সঙ্গীত, শব্দের সৌরভ প্রকাশ পায়। এগুলি ছিল শিশুদের কাছে এমন এক ধরনের আনন্দ, যাকে বাদ দিয়ে শিক্ষা মনোজীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে না।

ক্লাসে শিশু যে সময় কাটায়, পাঠের নিরিখে তার হিসাব করতে গেলে শিক্ষাবর্ষের প্রথম দুই মাস আমাদের প্রতিদিন ছিল একটি করে পাঠ, ৩-৪ মাস—২টি করে পাঠ, ৫-৬ মাস—আড়াইটি করে, আর ৭-৮ মাস—৩টি করে। একটি বিরতি থেকে আরেকটি বিরতির মাঝখানে পিরিয়ডের স্থায়িত্ব ছিল ০·৫ ঘণ্টা, পরে—৪৫ মিনিট। বিরতির আগে কাউকে বেরোতে হলে অনুমতি নিয়ে বেরোতে হত। ক্লাসে শিক্ষক যখন এমন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন যাতে বিঘ্ন ঘটানো উচিত নয়, তখন শিক্ষার্থী অনুমতি না চেয়ে বের হতে পারত: শিক্ষক দেখেন যে শিক্ষার্থীর বাইরে যাওয়া দরকার, তিনি তখন মাথা নেড়ে নীরবে অনুমতি দেন। কিন্তু

অধিকাংশ শিশু সহজে যে নিয়ম পালন করত, কোন কোন শিশুর পক্ষে তাতে অভ্যস্ত হওয়া কঠিন ছিল। তোলিয়া, কাতিয়া, কোস্তিয়া ও শুরা তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ত। তারা সম্ভবত হয়রান হয়ে পড়ত ক্লাসে বসে যে প্রয়াস নিয়োগ করতে হত সেকথা ভেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভব করে যে বিশেষ বিধিনিয়মের দ্বারা আগেকার কার্যকলাপের স্বাধীনতা এখন অনেক বেশি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। যে-কোন ইচ্ছা পূরণ করা অবশ্যই অনুচিত; সব শিক্ষার্থীকে অধ্যবসায়মূলক, গুরুত্বপূর্ণ শ্রমে অভ্যস্ত করে তোলা উচিত, তবে শিশুদের ইচ্ছা ও অভ্যাসকে অত্যন্ত কঠোর উপায়ে দমিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। কয়েক সপ্তাহ এই ছেলেমেয়েদের আমি পিরিয়ড চলার সময় বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিলাম, ধীরে ধীরে এক জায়গায় বসে কাজ করার ব্যাপারে তাদের অভ্যস্ত করে তুলতে লাগলাম। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ৩-৪ মাসের মধ্যেই সব ছেলেমেয়ে স্কুলের শ্রমজীবনের নিয়মকানুন মেনে চলতে লাগল।

শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনগুলিতে আমাদের পড়াশুনা চলত 'সবুজ ক্লাসঘরে'—লন্-এর ওপর, বড় বড় আপেল গাছের মাঝখানে। কয়েক বছর আগে ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সহায়তায় আমরা এখানে তার আর লোহালক্কড় দিয়ে ভাবী সবুজ ক্লাসঘরের কাঠামো বানাই, লতার চারা—বুনো আঙুরের চারা লাগাই। দু'বছর বাদে তৈরি হয়ে গেল সবুজ ঘর—লতাপাতায় ছাদ অবধি ঢেকে গেল। কয়েকটি 'জানলা' বানিয়ে স্বাভাবিক আলো প্রবেশের পথ করা হল। গরমের দিনে এই জায়গাটা হত স্নিগ্ধ, শরৎকালে হত ঈষদুষ্ণ আর আরামদায়ক। 'সবুজ ক্লাসঘরে' সর্বক্ষণ নীরবতার রাজত্ব। 'জানলাগুলি'

বুনো লতা আর আঙুর লতার ডালপালা দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া যেত, তখন ঘনিয়ে আসত শ্যামলবর্ণের আধা অন্ধকার, পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ত সূর্যের কিরণ, আলোছায়ার খেয়ালী খেলায় মাতামাতি করত। ছেলেমেয়েদের ভাষায় এর নাম হল 'রূপকথার জন্য জানলা বন্ধ করা'। সবুজ ক্লাসঘরে থাকত ছোট ছোট টেবিল আর টুল, এখানে ছেলেমেয়েরা লিখত, পড়ত, অংক কষত।

দ্বিতীয় 'সবুজ ক্লাসঘর' ছিল তিন দিক থেকে হিমসহ আঙুর লতায় ঘেরা লন্। আমাদের এখানে কী বসন্তে কী শরতে গরমের দিন দুর্লভ নয়। প্রচণ্ড গরমের সময়ও এই জায়গাটা ছিল স্নিগ্ধ।

আমাদের আরও একটি 'সবুজ ক্লাসঘর' আছে — খাতের লাগোয়া নির্জন উপবনের ভেতরে, সবুজ গাছপালার মাঝখানে ঘাসের ওপর। এখানে আমরা মাঝে মাঝে আসতাম আমাদের শেষ পিরিয়ডের সময়, যখন ক্লাসের পর আর স্কুলের দালানে ফিরে যাওয়ার দরকার হত না। এক বছর সময়ের মধ্যে যতগুলি পাঠ হয় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশই আমরা দালানের ভেতরে না করে করি 'সবুজ ক্লাসঘরে'। ক্লাসের বাকি ৬০ শতাংশের একটা বড় অংশ হয় 'সবুজ ল্যাবরেটরিতে' আর স্কুলের হট্ হাউস-এ। 'সবুজ ল্যাবরেটরি' হল চার দিক থেকে গাছপালা আর আঙুর লতার ঘেরা এক পৃথক দালান। এখানে ক্লাসের জন্য আলাদা ঘর আছে, তাতে আছে অসংখ্য উদ্ভিদ ও ফুলগাছ।

পাঠের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে প্রকৃতির মাঝখানে, খোলা হাওয়ায়, নীল আকাশের নীচে অনুষ্ঠিত হত এই ব্যাপারটি শিশুদের কাছে রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

পাঠ চলাকালে শিশুরা উৎফুল্ল ও উৎসাহিত বোধ করত, ভারাক্রান্ত মাথা নিয়ে তাদের কখনই বাড়ি ফিরতে হত না।

স্কুলে পড়াশুনার পর ছেলেমেয়েরা বাড়িতে বিশ্রাম করত। পাঠের সময় শ্রম যাতে শিশুকে অতিরিক্ত ক্লান্ত করে না ফেলে তার জন্য যত রকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন ক্লাসের পড়াশুনার পর সে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তাই তার বিশ্রাম দরকার হয়। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় আমার এই প্রত্যয় জন্মেছে যে স্কুলে শিক্ষার্থী যে প্রখর মানসিক শক্তি খাটিয়েছে, দিনের দ্বিতীয়ার্ধেও সেই রকম মানসিক শক্তি খাটানো তার মোটেই উচিত হবে না। পরন্তু বয়ঃকনিষ্ঠ শিশুর উপর অতিরিক্ত শ্রম চাপানো ত চলতেই পারে না। স্কুলে ৩-৪ ঘণ্টা মানসিক শ্রম করার পর শিশুকে যদি আবার বাড়িতেও ঐ পরিমাণ প্রখর শ্রম খাটাতে বাধ্য করা হয় তাহলে অচিরেই তার শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

আবার বাড়ির জন্য অনুশীলনী না দিলেও চলে না। শিশুকে মানসিক প্রয়াস একত্রীকরণের, গভীর মনোনিবেশের শিক্ষা দিতে হবে। কিন্তু এ শিক্ষা দিতে হবে সর্বোপরি পাঠের সময়, ধীরে ধীরে তার মধ্যে সঞ্চার করতে হবে মানসিক শ্রমের স্বাধীন প্রয়োগের অভ্যাস। সযত্নে ও মনোনিবেশ সহকারে শিশুকে কাজ করতে শেখানো সহজ নয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব খাটানোর বিশেষ কোন প্রণালীর সাহায্য না নিয়ে পাঠের বিষয়বস্তুর সাহায্যেই তাঁদের মুখের বিবরণ, ব্যাখ্যা ও কথনের প্রতি শিশুদের মনোযোগ 'বেঁধে রাখেন'। অল্পবয়সীদের মধ্যে মানসিক শ্রম সংগঠনের কৌশল এখানেই যে শিশু শিক্ষকের

কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে, মনে রাখবে, আর তা করতে গিয়ে প্রথম প্রথম শিশুর মনেই হবে না যে তাকে প্রয়াস ব্যয় করতে হচ্ছে, কষ্ট করে তাকে শিক্ষকের কথায় মনোযোগ দিতে হবে না, মনে রাখতে হবে না, ভাবতে হবে না।

শিক্ষক যদি এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন তাহলে যা যা শিশুর কৌতূহল জাগ্রত করবে, বিশেষত তার বিস্ময়ের উদ্রেক করবে তা-ই সে মনে করে রাখবে। আমার ছেলেমেয়েরা কেন এত সহজে অক্ষর মনে রাখতে পারল, লিখতে-পড়তে শিখল? তার কারণ এই যে আমরা এটাকে তাদের সামনে উদ্দেশ্য হিশেবে স্থাপন করি নি। কারণ এই যে প্রতিটি অক্ষর শিশুর কাছে ছিল পুলকের অনুভূতি উদ্রেককারী উজ্জ্বল রূপের প্রকাশ। আমি যদি প্রতিদিন প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের বয়ঃকনিষ্ঠদের 'ভাগে ভাগে জ্ঞান' দিতাম — তাদের যদি অক্ষর দেখিয়ে দিয়ে মনে করে রাখতে বলতাম তাহলে কোন ফলই পাওয়া যেত না। তার মানে অবশ্যই এমন নয় যে শিশুর কাছ থেকে উদ্দেশ্য গোপন করে রাখতে হবে। শেখানো উচিত এমন ভাবে যাতে শিশুরা উদ্দেশ্যের কথা না ভাবে — এতে মানসিক শ্রমের ভার লাঘব হয়। আপাতদৃষ্টিতে যেমন মনে হয় গোটা ব্যাপারটা মোটেই সে রকম সহজ নয়। কথা হচ্ছে শিশুর মানসিক বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায় নিয়ে — বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন মানুষের স্নায়ুব্যবস্থার শৈশব অবস্থা, সেই পর্ব সম্পর্কে। এই পর্বে — কনিষ্ঠ বয়ঃসীমার বিদ্যার্থীদের মধ্যে — বিশেষত শিক্ষার প্রথম বছরে শিশু মনোযোগ একেবারেই কেন্দ্রীভূত করতে পারে না। শিক্ষককে শিশুর মনোযোগের ওপর প্রভাব খাটাতে হবে, মনস্তত্ত্বে যাকে বলে অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ, তা জাগিয়ে তুলতে হবে।

ছোট শিশুর মনোযোগ—খামখেয়ালি ব্যাপার। আমার মনে হয় তা যেন একটা ভয়ার্ত পাখির মতো, যে পাখি তার বাসার দিকে কেউ ধেয়ে এলেই দূরে উড়ে পালায়। শেষ অবধি পাখিটাকে যদি ধরা যায় তাহলে তাকে রাখা যায় কেবল হাতে কিংবা খাঁচায়। পাখি যদি নিজেকে কয়েদি বলে মনে করে তাহলে তার কাছ থেকে গান আশা করা যায় না। ছোট শিশুর মনোযোগও সেই রকম: তাকে কয়েদির মতো করে ধরে রাখলে তার কাছ থেকে ভালো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা পাঠের সময় 'সর্বক্ষণ শিশুদের মানসিক শক্তি প্রয়োগের পরিবেশ' সৃষ্টি করে রাখার ক্ষমতার মধ্যে নিজেদের সাফল্য দেখতে পান। অনেক ক্ষেত্রেই এই সাফল্যলাভের উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলি বাহ্য শক্তি প্রযুক্ত হয় যা শিশুর মনোযোগ সংযত রাখার লাগাম হিশেবে কাজ করে। সেগুলি হল ঘনঘন মনে করিয়ে দেওয়া (মন দিয়ে শোন), এক ধরনের কাজ থেকে হঠাৎ আরেক ধরনের কাজে পরিবর্তন, বোঝানোর পরমুহূর্তেই জ্ঞান বাচাই করে দেখার সম্ভাবনা (আরও সঠিক ভাবে বলতে গেলে আমি যা বলছি তা না শুনলে খারাপ নম্বর বসিয়ে দেব—এই মর্মে হুমকি), কোন তত্ত্বমূলক নিয়ম ব্যাখ্যা করার পরই ব্যবহারিক কর্ম সম্পাদনের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা।

আপাত দৃষ্টিতে উপরি উক্ত সবগুলি প্রণালীই সক্রিয় মানসিক শ্রমের বাহ্যরূপ গড়ে তোলে: ক্যালিডোস্কোপের নক্সার মতো কাজের রূপ পালটাচ্ছে, শিশুরা একাগ্র চিত্তে শিক্ষকের মুখের প্রতিটি কথা শুনছে, ক্লাসঘরে অসাধারণ নিস্তব্ধতা। কিন্তু কী মূল্যে এসব অর্জিত হয়, এর পরিণামই বা কী? মনোযোগ রাখার জন্য এবং কিছু যাতে বাদ পড়ে

না যায় সেই উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ প্রচুর শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে— অথচ এই বয়সে শিক্ষার্থী চেষ্টা করেও অতটা মনোযোগী হতে পারে না—তাই তার স্নায়ুব্যবস্থা হয়রান হয়ে পড়ে, অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ক্ষয় পায়। পাঠের সময় একটি মিনিটও নষ্ট করা চলবে না, এক মুহূর্তও সক্রিয় মানসিক শ্রম থেকে বিরত থাকা নয়—মানুষকে শিক্ষাদানের মতো সূক্ষ্ম কাজের ক্ষেত্রে এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে? শিক্ষকের কাজে এ ধরনের উদ্দেশ্যমুখীনতার সরাসরি অর্থ হল শিশু যতটুকু দিতে পারে তার সবটা নিংড়ে বার করে নেওয়া। এই ধরনের 'কার্যকর' পাঠের পর শিশু বাড়ি ফেরে ক্লান্ত অবস্থায়। সে সহজেই বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এখন সে বিশ্রাম করতে পারলে বাঁচে, অথচ বাড়ির জন্য অনুশীলনীও তাকে দেওয়া হয়েছে, বইখাতা পোরা ব্যাগটার দিকে তাকালেই মেজাজ বিগড়ে যায়।

স্কুলে যে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের একাধিক ঘটনা ঘটে— শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষকের সঙ্গে, একে অন্যের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে, ভর্ৎসনার উদ্ধত জবাব দেয়, ফলত বহু বিরোধ সৃষ্টি হয় তা অহেতুক নয়, কেননা পাঠের সময় শিশুদের স্নায়বিক শক্তির ওপর চরম চাপ পড়ে; তাছাড়া শিক্ষকও ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র নয়—'উচ্চ ফলপ্রসূতাকে' লক্ষ্যরূপে সামনে রেখে ক্যালিডোস্কোপের মতো একের পর এক কাজের রকম পাল্‌টাতে পাঠের গোটা সময় জুড়ে ক্লাসের সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখা সহজ কাজ নয়। ছেলেমেয়েরাও তাই যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন তারা গম্ভীর, স্বল্পবাক, সবকিছুর প্রতি তাদের ঔদাসীন্য, কিংবা দেখা যায় তার উল্‌টোটা— কথায় কথায় তাদের নিদারুণ বিরক্তি।

না, এত বড় মূল্যে দিয়ে শিশুদের মনোযোগিতা, একাগ্রতা, মানসিক সক্রিয়তা অর্জন করা উচিত নয়। শিক্ষার্থীদের, বিশেষত বয়ঃকনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মানসিক শক্তি ও স্নায়বিক উদ্দীপনা — অতলস্পর্শী জলাশয় নয়, সেখান থেকে ইচ্ছামতো আহরণ করা যায় না। আহরণ করা উচিত বুদ্ধি বিবেচনা করে, আর সবচেয়ে বড় কথা — শিশুর স্নায়বিক উদ্দীপনার উৎসকে সর্বক্ষণ পরিপূরণ করা উচিত। এই পরিপূরণেরই উৎস — পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতির পরিবেশে জীবনযাত্রা, পঠন — তবে তা হতে হবে এমন যাতে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়ার ভয় না থাকে, যাতে কোন কিছু জানার আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়; আর হল সজীব ভাবনা ও শব্দের উৎস অভিমুখে 'পর্যটন'।

স্কুলের শিক্ষার্থিমণ্ডলীর জীবনে একটি দুর্বোধ্য জিনিস আছে — তার নাম দেওয়া যেতে পারে মানসিক ভারসাম্য। এটা বলতে আমি বুঝি জীবনের পূর্ণতা সম্পর্কে শিশুদের বোধ, ভাবনার স্বচ্ছতা, নিজের শক্তির প্রতি আস্থা, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করা যে সম্ভব সে সম্পর্কে বিশ্বাস। মানসিক ভারসাম্যের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল লক্ষ্যনিষ্ঠ শ্রমের শান্ত পরিবেশ, নির্বিঘ্ন, সৌহার্দমূলক পারস্পরিক সম্পর্ক, তিক্ততার অভাব। মানসিক ভারসাম্য ছাড়া স্বাভাবিক ভাবে কাজ করা অসম্ভব; এই ভারসাম্য যেখানে নষ্ট হয় সেখানে সমষ্টির জীবন পরিণত হয় নরককুণ্ডে: শিক্ষার্থীরা একে অন্যকে অপমান করে, একে অন্যের বিরক্তির কারণ হয়, স্কুলে বিরাজ করে স্নায়বিক উত্তেজনা। কী ভাবে সৃষ্টি করা যায় — আর যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল — টিকিয়ে রাখা যায় এই মানসিক ভারসাম্য? শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদদের অভিজ্ঞতা থেকে

আমার ধারণা হয় যে শিক্ষার এই অতি সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে প্রধানতম বিষয় হল অতিরিক্ত ক্লান্তি ছাড়া, অন্তরাত্মার শক্তিকে মোচড় না দিয়ে, তাড়া না দিয়ে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না করে সর্বদা মননক্রিয়া বজায় রাখা।

মানসিক ভারসাম্যের পক্ষে বৈশিষ্ট্যসূচক হল প্রতিটি শিক্ষার্থীর এবং তার সাধ্যমতো শ্রমের উপযোগী হিতাকাঙ্ক্ষা ও পারস্পরিক সহায়তার, মানসিক ক্ষমতা সুসমন্বয়ের পরিবেশ। যে-সমস্ত খাঁটি শিক্ষাবিদ প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে মানসিক ভারসাম্য সঞ্চারের শিক্ষাকৌশল প্রয়োগ করেছেন তাঁদের অনেকের তত্ত্ব আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করি। তাঁদের শিক্ষায় প্রতিটি শিশু নিজের পূর্ণ শক্তি নিয়ে পড়াশুনা করছে, এমন কোন শিশু নেই যে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়াশুনা করতে পারত, কিন্তু করছে মাঝারি ধরনের। আমার দৃষ্টিতে, পরম বিচক্ষণ, সেই সঙ্গে অতি স্বাভাবিক এই যে ব্যাপারটি, তারই 'রহস্যভেদের' চেষ্টা আমি করি। পড়াশুনায় যার ফল খারাপ হচ্ছে সে নিজের অকৃতকার্যের জন্য আহত হয় না, বন্ধুরাও তাকে করুণার পাত্র হিশেবে দেখে না।

ভালো নম্বরের পেছনে ছোটার যে মনোবিকার তা সর্বদাই আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করত—এই মনোবিকার পরিবারে জন্মায়, শিক্ষকের মনকেও অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদের শিশুমনের ওপর ভার হয়ে চেপে বসে, তাদের বিকৃত করে। শিশুর হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে পড়াশুনায় ভালো ফল করার মতো ক্ষমতা নেই, অথচ মা-বাবা তার কাছ থেকে কেবলই ভালো ফল দাবি করেন। এদিকে বেচারি স্কুল-শিক্ষার্থী খারাপ ফল করায় নিজেকে প্রায় দুষ্কৃতিকারী বলেই মনে করে। অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিন্তু

এমন মনোভাব দেখা যায় না। যারা ভালো ফল করে তারা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করে না, আবার খারাপ ফল যারা করে তারাও অপকৃষ্ট বলে নিজেদের মনে করে না। আমি এই সব খাঁটি শিক্ষাবিদের কাছ থেকে বিচক্ষণ, একাগ্র বুদ্ধিমার্গীয় শ্রম পরিচালনার প্রকৃত কৌশল আয়ত্ত করি। আমার দৃষ্টিতে, যাকে বলে শিক্ষাকলার অতি সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য—শিশুদের হৃদয়ে ও মননে জানার বুদ্ধিগ্রাহ্য আনন্দোপলব্ধি জাগিয়ে তোলার কৌশল—তা তাঁদের মধ্যে আমি লক্ষ্য করি। সত্য আবিষ্কার, তত্ত্বানুসন্ধান আর জানার ফলে মানসিক আনন্দের যে প্রস্ফুরণ ঘটে, এই শিক্ষকদের এমন একটি শিক্ষার্থীও ছিল না যার মধ্যে অতি সাধারণ সাফল্যেও তার প্রকাশ না ঘটত। শিক্ষাকর্মকুশলীদের অভিজ্ঞতার স্বর্ণকণিকাগুলি সাধারণীকরণের দ্বারা আমি চেষ্টা করি যাতে শিশু ভালো ভালো নম্বর পাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিশ্রম না করে বুদ্ধিবৃত্তিচালনার উত্তেজনাকর অনুভূতিলাভের ইচ্ছাবশত শ্রম নিয়োগ করে। আমার বড় আনন্দ হল এই দেখে যে আমাদের শিক্ষার্থিমণ্ডলীর মধ্যে ভালো নম্বর পাওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি রকমের ব্যগ্রতা নেই আবার কেউ খারাপ ফল করলে ঐ একই রকম ক্ষতিকারক যে পীড়াদায়ক প্রতিক্রিয়া সচরাচর লক্ষ্য করা যায় তা-ও নেই।

...প্রত্যেক সপ্তাহে আমাদের কয়েকটি পাঠের লক্ষ্য হত ভাবনা ও মাতৃভাষার শব্দভাণ্ডারের উৎস অভিমুখে—পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে 'পর্যটন'। এটা হত প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ মেলামেশা, আর এ মেলামেশা ছাড়া শিশুর মানসিক শক্তি ও স্নায়বিক উৎসাহ-উদ্দীপনার ভাণ্ডার দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। শরৎকালে, বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে,

আবহাওয়া গরম হলে আমরা ভোরের আলো ফোটার অনেক আগে থাকতেই পর্যটনে বেরিয়ে পড়তাম — গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা সকাল সকাল শয্যাত্যাগে অভ্যস্ত। প্রকৃতির বিবরণ, পারিপার্শ্বিক জগতের বিষয় ও ঘটনার বিবরণ ইতিমধ্যে শিশুদের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে, আমাকে তাই বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। তাদের কতকগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন: 'খুব ভোরে সূর্য লাল কেন, আর দুপুরে আগুনের মতো কেন? মেঘ কোথা থেকে আসে? ড্যান্‌ডেলিয়ন ফুল সকালে খোলে কেন, আর দুপুরে বন্ধ হয়ে যায় কেন? বিদ্যুৎ আর বাজ কী থেকে হয়? পশ্চিমের বাতাস বৃষ্টি আনে কেন, পুবের বাতাসে কেন খরা হয়? সূর্যমুখী সূর্যের দিকে ফুলের মুখ ঘোরায় কেন — সে কি মানুষের মতো দেখতে পায়? লোহায় কেন মরচে ধরে? পায়রা কেন গাছে কখনও বসে না? গরমকালে গাছে যখন পাতা থাকে তখন তাকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় বসানো যায় না কেন? আকাশ থেকে তারা খসে কোথায় পড়ে? তুষারকণাগুলো এত সুন্দর কেন? — দেখে মনে হয় যেন ওগুলোকে কেউ কেটেছে? পাখিদের ত অনেক দূর উড়ে পার হতে হয় — ওরা পথ চেনে কী করে? চাঁদের চারপাশে সাদা গোল কেন? বৃষ্টির আগে সূর্য ডোবার সময় আকাশ লাল কেন? মধু যোগাড় করার জন্য উড়তে যাওয়ার আগে মৌমাছি 'নাচে' কেন? বনে প্রতিধ্বনি শোনা যায় কেন? রামধনু কী? শীতকালে বজ্রবিদ্যুৎ নেই কেন? নোনা জল কেবল প্রচণ্ড হিমেই জমে কেন? দুধের কলসি গরমকালে ভিজে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে রাখলে বেশি গরমেও দুধ ঠাণ্ডা থাকে কেন? বৃষ্টির আগে আগে সোয়ালো পাখি মাটির কাছাকাছি ওড়ে কেন? ভারুই পাখি কেন খেতে বাসা করে,

ময়না আর নীলকণ্ঠ কেন গাছে করে? হাঁস সাঁতার কাটে, কিন্তু মুরগী সাঁতার কাটতে পারে না কেন? এরোপ্লেন যাওয়ার সময় আজকে তার পেছন পেছন এমন হাল্কা ধোঁয়ার রেখা গেল কেন, কিন্তু কাল তা দেখা যায় নি কেন? বাতাসে জলের ঘূর্ণির মতো ধুলো ওঠে কেন? উইলো 'কাঁদে' কেন? স্নোড্রপ ফুল কেবল বসন্তের শুরুতে ফোটে কেন? জোনাকি জ্বলে কেন? গোরুর একটা বাছুর, কিন্তু শুয়োরের একগাদা বাচ্চা কেন? গরমকালে সূর্য উঁচুতে থাকে, কিন্তু শীতকালে নীচে কেন? বরফজমা কাচের ওপর সুন্দর নক্সা হয় কেন? শরৎকালে গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় কেন?'

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আমি এমন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করতাম যাতে শিশুদের সামনে প্রাকৃতিক ঘটনার মর্ম ত উদ্‌ঘাটিত হয়ই, সেই সঙ্গে তাদের অনুসন্ধিৎসা ও জানার আগ্রহ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েদের প্রশ্নের উত্তর, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে আলোচনা—চিন্তাভাবনার প্রথম পাঠশালা। কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আমার জানা ছিল না। দেখা যেত, আপাত দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন যত সহজ, তার উত্তর তত কঠিন। শিশুদের 'দার্শনিক' প্রশ্নের উত্তর কী রকম হওয়া উচিত বিশেষ করে এই ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আমাদের, প্রাথমিক শিক্ষকদের জমায়েত হত। এমনও হত যে শিশুদের চিন্তার অতি জটিল গোলকধাঁধা নিয়ে সকলে মিলে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সারাটা সন্ধ্যা কেটে যেত। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে কর্মরত শিক্ষকেরা হলেন শিশুদের ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে আসি যে আপাত সরল ও প্রত্যক্ষগোচর বিষয়ের অন্তরালে প্রায়শই নিহিত থাকে বিরাট জটিলতা। আমার মতে,

শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এই যে নিসর্গজগৎ 'পর্যটনের' সময় শিশুরা যেন বস্তু ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক দেখতে পারে, নির্ভরতা দেখতে পারার শিক্ষা লাভ করে। যেদিন 'নিসর্গপর্যটন' আমাদের শেষ পিরিয়ড হত সেদিন আমরা পিরিয়ডের শেষে খেলাধুলো করতাম। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই দলবদ্ধ খেলাধুলো ভেবে বার করে। প্রকৃতির ঘটনার জগৎ রূপকথার সঙ্গে বিজড়িত হয়ে যায়। ছেলেমেয়েদের বিশেষ অনুরাগ দেখা যেত একটি খেলায়। খেলাটির নাম 'রহস্যদ্বীপের খোঁজ'। আমরা সকলে দুটো দলে ভাগ হয়ে যেতাম। একদল বনের কোন একটা নিবিড় জায়গায় থাকত। খেলার জায়গাটার চারধারে আমরা কতকগুলো নিশানা দিতাম—নিশানাগুলো কেবল আমাদেরই জানা। নিশানা বলতে থাকত দ্বীপের পাহাড় পর্বতসঙ্কুল এবং হিংস্র জন্তুজানোয়ার। রহস্যদ্বীপে যারা রয়ে গেছে তারা হল জাহাজডুবির কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া যাত্রী। কোন কোন জায়গায় তারা বেশ প্রতারণামূলক কিছু কিছু নিশানা ঠিক করে—সেগুলি হল দ্বীপে পেঁছুনোর একটা সঙ্কীর্ণ পথ (নিশানা সম্পর্কে দুটি দলই আগে থেকে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে ঠিক করে নেয়)। জাহাজডুবিতে বিপর্যস্ত যাত্রীদের বাঁচাতে হবে, ছেলেমেয়েরা বনের মধ্যে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে, পায়ে পায়ে তীরভূমির কয়েক কিলোমিটার অনুসন্ধান করতে করতে চলে, যে জায়গা দিয়ে দ্বীপে পেঁছুনো যায় তার খোঁজ করে। এখানে কেবল সন্ধানী চোখ আর সাহস থাকলেই চলবে না, প্রকৃতির বহু ঘটনা জানার, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতাও থাকা চাই। খেলা সততা এবং সত্যনিষ্ঠার শিক্ষাও দেয়। ছেলেমেয়েরা রহস্যদ্বীপ খুঁজে বার করে, যাত্রীদের

সাহায্য করে, পীড়িতদের হাসপাতালে পাঠায়; খেলার মধ্যে বৈমানিক আর চিকিৎসকদেরও আবির্ভাব ঘটে। খেলার পরিসমাপ্তিতে জাহাজডুবিতে বিপর্যস্ত যাত্রীরা আর সাহায্যকারীরা জাউ রান্না করে; আমরা ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসি, আমি রূপকথা বলি। এই সময় ছেলেমেয়েদের অনেকেই রূপকথার ছবি আঁকে—ছবিতে কাল্পনিক রূপ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা প্রকাশ করে।

'নিসর্গপর্যটনের' সময় পশুপাখিদের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয় এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ, বিস্ময়ের জগৎ। শরৎকালের শান্ত দিনগুলিতে আমরা আড়াল থেকে দেখি বাসা ছেড়ে জলপানের জায়গায় চলেছে শজারুদের গোটা একটি দঙ্গল, শজারু-মা ছানাপোনাদের আগলে নিয়ে যাচ্ছে। বসন্তের দিনে আমরা লক্ষ্য করতাম খরগোশদের। ছেলেমেয়েরা দেখতে পায় সদ্যোজাত, ছোট্ট খরগোশছানাকে ছেড়ে খরগোশ-মা চলে যায়, আর কখনও ফিরে আসে না, এদিকে ছানাটি অপেক্ষা করে থাকে, যতক্ষণ না দৈবাৎ কোন মাদী-খরগোশ এসে তাকে খাওয়ায়। জুলাই মাসে ছেলেমেয়েরা গেছো ব্যাঙের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করে। একদিন আমরা এক নির্জন জায়গায় শেয়ালের গর্ত দেখতে পাই। ছেলেমেয়েরা দেখে শেয়াল তার ছোট ছোট ছানাদের বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের দৌড়াতে শেখাচ্ছে, নিজে তাদের সঙ্গে খেলছে।

আমাদের পর্যটন ও পর্যবেক্ষণ ভাবনাচিন্তাকে সমৃদ্ধ করে তোলে, কল্পনাশক্তি ও ভাষার বিকাশ ঘটায়। পদযাত্রা ও প্রমোদভ্রমণের সময় শিশুদের যত বেশি প্রশ্ন মনে জাগে, ততই দেখা যায় ক্লাসে প্রাকৃতিক ঘটনা, শ্রম কিংবা দূর দূর দেশের

প্রসঙ্গ উঠলে আরও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে জানার আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। 'নিসর্গপর্যটনের' পর শিশুদের আবেগচাঞ্চল্য লক্ষ্য করতে গিয়ে প্রতিবারই আমি অনুভব করেছি প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ বাণীর সত্যতা: চিন্তার শুরু বিস্ময়বোধ থেকে।

আমি চেষ্টা করি প্রকৃতির রহস্যের সামনে এই বিস্ময়, উপলব্ধির এই আনন্দ যেন শিশুদের প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্থল হয়ে দেখা দেয়। আমাদের ক্লাসে এমন কিছু কিছু শিক্ষার্থী ছিল যারা (যেমন ভালিয়া, পেত্রিক, নিনা) সরল ধরনের সমস্যার মর্মোদ্ধার করতেও অনেক সময় লাগিয়ে দিত। ক্লাসে যা ব্যাখ্যা করা হত তার প্রতি ওদের ঔদাসীন্য ছিল।

ত্রুটিটা এই যে শিশুর পক্ষে কয়েকটি বস্তুর মধ্যে কিংবা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত কঠিন হয়ে পড়ে স্মৃতিতে সে সম্পর্ক ধরে রাখা। যেমন: আপেল, ঝুড়ি ও বালক-বালিকার অঙ্ক দেওয়া হল। শিশু আপেল ও ঝুড়ির কথা ভাবতে ভাবতে ভুলে গেল বালক-বালিকার কথা। বালক-বালিকার কথা মনে হতে ভুলে গেল আপেল আর ঝুড়ির কথা। শেষকালে পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনার মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক চিন্তার গভীর ক্ষমতা, ছোটখাটো আবিষ্কার, সত্যের সামনে বিস্ময়বোধ—এ সবই ভালিয়া, পেত্রিক ও নিনার মনে বিপুল আনন্দ জাগিয়ে তোলে। ওরা প্রবল মানসিক উদ্দীপনা লাভ করে। তাদের চোখে জ্বলে ওঠে উদ্দীপনার আগুন। ঔদাসীন্য কেটে গিয়ে দেখা দিল পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ। শিশুর চেতনায় যদি এমন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা যায় যাতে উজ্জ্বল আবেগধর্মী

বর্ণবৈচিত্র্য লক্ষণীয়, তাহলে সেই সময় শিশুর মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় তীব্র প্রক্রিয়া—ইতিপূর্বে যে শক্তি সুপ্ত ছিল, তা যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত শিশুর অবস্থা অতি জটিল ছিল তারা উত্তরোত্তর উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে: সাগ্রহে শিক্ষকের মুখের বিবরণ শুনছে, প্রশ্নের মর্ম আরও ভালো ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে। অবশ্য শ্রমসাধ্য শিক্ষাকর্ম পরিচালনার দরকার ছিল। আমি অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজের পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতাম। এই কাজটির নাম আমরা দিই **চেতনাশক্তির আবেগধর্মী জাগরণ।**

আমি বুঝতে চেষ্টা করি শিক্ষক যখন জ্ঞানের বিষয়ের প্রতি ভালিয়া, পেত্রিক ও নিনার মতো বাচ্চাদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন, তখন তাদের মনের ভিতরে কী ঘটে। জীববিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ, শিক্ষাবিদ ও স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের রচনা পাঠ করি। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)-এর রচনায় আমি মস্তিষ্কের বহিঃস্তরের কোষ ও অব্যবহিত নিম্নস্তরের কেন্দ্রের পারস্পরিক ক্রিয়া সম্পর্কে কৌতূহলজনক চিন্তার সন্ধান পেলাম। ফ্রয়েড্ মননক্রিয়ার ক্ষেত্রে বহিঃস্তরের অব্যবহিত নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলির চূড়ান্ত ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। বহু গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে উক্ত কেন্দ্রগুলি মানবমনের আবেগধর্মী প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। বিজ্ঞানী অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে তুলনা করেছেন ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে। তাঁর মতে পথ নির্ধারণ করে ঘোড়া (অর্থাৎ অনুভূতি—মস্তিষ্কের বহিঃস্তরের অব্যবহিত নিম্নস্তরের কেন্দ্রগুলি)। ঘোড়া তার ইচ্ছামতো সওয়ারকে বয়ে নিয়ে যায়,

কিন্তু কাজটা এমন চালাকি খাটিয়ে করে যে সওয়ারের মনে হয় বুঝি সে নিজেই ঘোড়াকে পরিচালনা করছে। সুতরাং ফ্রয়েড-এর মতে প্রধান ব্যাপার—মস্তিষ্কের বহিঃস্তর নয়, অন্তঃস্তর।

ফ্রয়েড-এর এতটা সুনির্দিষ্ট মতকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও মহান রুশ শারীরবিজ্ঞানী পাভ্‌লভ (১৮৪৯-১৯৩৬) অন্তঃস্তরের উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, বহিঃস্তরের কার্যকলাপের প্রধান প্রেরণা আসে অন্তঃস্তর থেকে। এই আবেজগুলিকে বাদ দিলে শক্তির প্রধান উৎস বন্ধ হয়ে যাবে। তবে মানুষের চিন্তা ও আচরণের প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পাভ্‌লভ দিয়েছেন মস্তিষ্কের বহিঃস্তরকে (ঘোড়সওয়ার ঘোড়াকে থামানোর এবং তাকে অন্য দিকে ফেরানোর ক্ষমতা রাখে)।

শিশুদের মানসিক শ্রম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমার উত্তরোত্তর এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে যে অন্তঃস্তর থেকে বহিঃস্তরে প্রবাহিত প্রেরণা (আনন্দের উত্তেজনা, বিহ্বলতা ও বিস্ময়ের অনুভূতি) যেন বহিঃস্তরের সুপ্ত কোষগুলিকে জাগিয়ে তোলে, তাদের সক্রিয় করে তোলে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ছোট শিশুদের মানসিক শিক্ষা সম্পাদিত হওয়া উচিত জ্ঞানের প্রতি—জানার আগ্রহের প্রতি, অনুসন্ধিৎসার প্রতি তাদের চাহিদা বিকাশের দ্বারা।

'নিসর্গপর্যটন' প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেমেয়েরা সবসময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত কখন তারা বনে, মাঠে, প্রকৃতির বুকে বেড়াতে যাবে, কী খেলা খেলবে তা আগে থাকতে ভেবে রাখত। তাদের প্রিয় খেলা ছিল বাধাবিপত্তি অতিক্রম সংশ্লিষ্ট খেলা, ছিল এমন সমস্ত খেলা যেখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত রূপকথার কিংবা বাস্তব

জগতের নায়কেরা। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমি ওদের রবিন্‌সন ক্রুসোর গল্প বলি। শুরু হয়ে যায় এক চিত্তাকর্ষক খেলা— কয়েক মাস ধরে সে খেলা চলে। স্পার্টাকাসের কাহিনী শোনার পর ছেলেমেয়েরা খাড়া পাড় ও গভীর গিরিখাতের পাশে, উঁচু পাহাড়ের ওপর বিদ্রোহী দাসদের এক কল্পিত শিবির বানায়। সুপ্রাচীন কালে আমাদের অঞ্চলে যে সব পশুপালক, পশুশিকারী ও মৎস্যশিকারী শক বাস করত তাদের কাহিনী ছেলেমেয়েদের এতদূর মুগ্ধ করে যে তারা খেলার মধ্য দিয়ে প্রাচীন মেহনতীদের শ্রম ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মূর্ত করে তোলে।

শিক্ষাকে হতে হবে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের বহুমুখী খেলার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কান্বিত, যাতে সেই খেলা উজ্জ্বল, উদ্দীপনাময় অনুভূতির জাগরণ ঘটায় আর পারিপার্শ্বিক জগৎ শিশুদের সামনে এমন এক আকর্ষণীয় গ্রন্থ হয়ে দেখা দেয় যা পড়তে মন চায়। 'নিসর্গপর্যটন' ও খেলাধুলা ছাড়া শারীরিক শ্রমের মধ্যেও মানসিক ও শারীরিক শক্তি বিকাশের ব্যাপক ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়। আনন্দোচ্ছল, উদ্দীপনাময় অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত শ্রমসংক্রান্ত কার্যকলাপ ব্যতিরেকে পূর্ণমূল্যের, সুখী শৈশব ধারণাই করা যায় না। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে ছোট শিশুর কাছে শারীরিক শ্রম— নির্দিষ্ট কোন বিদ্যা ও নৈপুণ্য আয়ত্তে আনা মাত্র নয়, নৈতিক শিক্ষামাত্র নয়, তা ভাবনাচিন্তার অসীম, আশ্চর্য সমৃদ্ধ জগৎও বটে। এই জগৎ নৈতিক, বুদ্ধিমার্গীয় ও নন্দনতাত্ত্বিক বোধ জাগ্রত করে, আর উক্ত বোধকে বাদ দিয়ে বিশ্ববীক্ষা অসম্ভব — অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষাও অসম্ভব। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে শারীরিক শ্রম, আমার ধারণায়, স্বপ্ন ও সৃজনের

জগতে শিশুর পরম আকর্ষণীয় পর্যটন। শারীরিক শ্রমের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে আমার শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিসংক্রান্ত পরম গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী: অনুসন্ধিৎসা, জানার আগ্রহ, ভাবনার নমনীয়তা, কল্পনার ঔজ্জ্বল্য।

পাঠের সময় মানসিক শ্রম সমাদৃত হয়, আকর্ষণীয় হয়, শিশুর মনকে বিকশিত করে, সমৃদ্ধ করে এই শর্তে যদি শিশুর জীবনে ভাবনায় অনুপ্রাণিত শারীরিক শ্রম দেখা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতেই সপ্তাহে একবার আমাদের প্রিয় শ্রমের একটি পিরিয়ড থাকত। শিশুরা ঐ সময় নিজ নিজ ভাবনা ও অনুভূতি অনুযায়ী কাজ করত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে সপ্তাহে দুটি ঐ রকম পিরিয়ড ছিল।

প্রিয় শ্রম। ...তার অর্থ এই নয় যে শিক্ষক নিষ্ক্রিয় হয়ে অপেক্ষা করে থাকবেন কখন শিশুর মনে আগ্রহ জেগে উঠবে। সমগ্র শিক্ষাকর্মের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শ্রমশিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছুই আসে না। শিশুদের চারপাশে গড়ে তুলতে হবে শ্রমের প্রতি অনুরাগের পরিবেশ। আমার শিক্ষার্থীদের চারপাশে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা, কিশোর-কিশোরীরা কাজ করত। স্কুলের সব ছেলেমেয়েই বহু আকর্ষণীয় কাজে ব্যস্ত থাকত। তারা গাছপালা ও ফসল বুনত, গাড়ি ও যন্ত্রপাতির মডেল তৈরি করত, জমির সার তৈরি করত, পশুপালের পরিচর্যা করত, নতুন হট্ হাউস কিংবা ওয়ার্কশপ নির্মাণ করত, জলের পাইপ সংযোজন করত।

গবেষণা, অনুসন্ধিৎসা ও জানার আগ্রহ—এগুলিই শ্রমের প্রতি শিশুদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। আমার মূলমন্ত্র সর্বদা এই ছিল যে শ্রম শেষ লক্ষ্য নয়, শ্রম হল শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার কতিপয় বহুমুখী লক্ষ্য অর্জনের—সামাজিক, আদর্শগত,

নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক, সৃজনী, নন্দনতাত্ত্বিক ও আবেগধর্মী লক্ষ্য অর্জনের উপায়স্বরূপ।

শিক্ষা শিশুদের কাছে আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে যদি তা ভাবনা, অনুভূতি, সৃজন, সৌন্দর্য ও খেলাধুলার উজ্জ্বল বর্ণে উদ্ভাসিত হয়। পড়াশুনায় সাফল্যের ব্যাপারে আমার যত্ন যে সব বিষয়ের তত্ত্বাবধান থেকে শুরু হয় তা হল শিশু কেমন আহার করে, তার ঘুম কেমন হয়, স্বাস্থ্য কেমন, সে কী ভাবে খেলাধুলা করে, দিনে কয় ঘণ্টা খোলা হাওয়ায় সে থাকে, কী বই সে পড়ে, কোন ধরনের রূপকথা শোনে, কী আঁকে, ছবিতে নিজের ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতি সে কী ভাবে প্রকাশ করে, প্রকৃতির সঙ্গীত এবং লোকগীতি ও সুরকারদের সঙ্গীতের সুর তার মনের ভিতরে কী ধরনের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, শিশুর প্রিয় শ্রম কী, মানুষের আনন্দ-বেদনার প্রতি সে কতটা সহবেদনশীল, অন্যদের জন্য সে কী সৃষ্টি করেছে, সেক্ষেত্রে কী রকম অনুভূতিই বা তার হয়েছে।

শিক্ষা তখনই শিশুদের মনোজীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ায় যখন জ্ঞান হয় সক্রিয় কার্যকলাপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। শিশু নামতা কিংবা বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্র সংক্রান্ত অঙ্কের নিয়মের প্রতি আপনা আপনিই অনুরাগী হয়ে পড়বে এমন হওয়া কঠিন। জ্ঞান যখন সৃজনধর্মী ও শ্রমধর্মী লক্ষ্য অর্জনের উপায়ে পরিণত হয় তখনই তা খুদে মানুষটির আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ হয়। আমি চেষ্টা করি যাতে ছোট বয়সেই শারীরিক শ্রম শিশুদের উদ্দীপিত করে, উপস্থিত বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। স্কুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল জ্ঞান কাজে লাগাতে শেখানো। নীচের ক্লাসগুলিতে, যখন চরিত্রগত ভাবে মানসিক শ্রম ক্রমাগত নতুন নতুন দক্ষতা

ও কৌশল অর্জনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট, ঠিক তখনই জ্ঞান নিষ্প্রাণ বস্তুপিণ্ডে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই দক্ষতা ও কৌশলগুলি যদি কেবল রপ্ত করাই হয়, যদি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হয়, তবে শিক্ষা ধীরে ধীরে শিশুর মনোজীবনের সীমানার বাইরে চলে যায়, তার আগ্রহ ও অনুরাগ থেকে অনেকটা যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য শিক্ষক সচেষ্ট হন। তিনি চেষ্টা করেন যাতে প্রতিটি শিশু তার দক্ষতা ও কৌশলের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটায়।

‘প্রকৃতি পাঠের’ তিনশ’ পৃষ্ঠা

বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ফ. ক্লাইন (১৮৪৯-১৯২৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রকে তুলনা করেছেন একটি কামানের সঙ্গে — দশ বছর ধরে তাতে জ্ঞান ঠাসা হয়, তারপর কামান থেকে ছোঁড়া হল গুলি; গুলিবর্ষণের পর তার ভেতরে আর কিছুই থাকে না। এই নিষ্ঠুর রসিকতাটি আমার মনে পড়ল যখন শিশুর মানসিক শ্রম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমি দেখতে পাই যে তাকে জোর করে এমন সব জিনিস মুখস্থ করানো হচ্ছে যা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি, যা তার চেতনায় স্পষ্ট ধারণা, রূপ ও অনুষঙ্গের উদ্রেক করে না। ভাবনার বদলে স্মৃতিশক্তিকে স্থান দেওয়া, ঘটনার মর্মবস্তু পর্যবেক্ষণের বদলে, সুস্পষ্ট উপলব্ধির বদলে মুখস্থবিদ্যাকে স্থান দেওয়া — বড় রকমের ত্রুটি; এতে শিশু নির্বোধ হয়ে পড়ে, শেষ পর্যন্ত শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ তিরোহিত হয়।

প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের ছেলেমেয়েদের প্রখর, প্রবল স্মৃতিশক্তি

আমাদের কাকেই বা বিস্মিত না করে? পাঁচ বছরের শিশু মা-বাবার সঙ্গে বনে কিংবা মাঠে ভ্রমণের পর হয়ত বাড়ি ফিরে এলো। উজ্জ্বল রূপ, দৃশ্য ও ঘটনা তাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করে। মাস যায়, বছরও যায়, মা-বাবা আবার বেড়াতে যাওয়ার আয়োজন করেন; ছেলে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতের, তার মনে পড়ে কবে যেন, কোন এক কালে মা-বাবার সঙ্গে সে বনে গিয়েছিল। শিশুর স্মৃতিতে এমন সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে দেখা দিল যে মা-বাবা অবাক: শিশুর মনে আছে দু'রকমের রঙিন পাপড়িওয়ালা আশ্চর্য ফুলের কথা। বাবা অবাক হয়ে ছেলের মুখ থেকে শুনতে থাকেন ভাই আর বোনের ফুল হয়ে যাওয়ার সেই অপূর্ব লোককাহিনী। এক বছর আগে বাবা বনের ধারে মা'কে বলেছিলেন এই লোককাহিনীটি। বাবা কী বলছিলেন বাচ্চা ছেলেটার যেন সেদিকে কোন মনোযোগই ছিল না, সে তখন প্রজাপতির পেছন পেছন ছুটছিল—অথচ কী আশ্চর্য, যাকে মনে হচ্ছিল পারিপার্শ্বিক জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, তা কিনা ওর স্মৃতিতে রয়ে গেল!

আসল ব্যাপারটাই ত এই যে শিশুরা রং, বর্ণিমা ও ধ্বনির খেলায় উজ্জ্বল, রোমাঞ্চকর রূপগুলি আশ্চর্য তীব্র ভাবে উপলব্ধি করে এবং স্মৃতির গভীরে তাদের সযত্নে রক্ষা করে। পারিপার্শ্বিক জগতের রূপ উপলব্ধির সময় শিশুর চেতনায় রীতিমতো অপ্রত্যাশিত যে-সমস্ত প্রশ্ন জাগে তাতে বয়স্কদের অবাক হয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই হল, আশ্চর্য ফুলের কথা মনে হতে ছেলে তার বাপকে জিজ্ঞেস করে: 'আচ্ছা, ভাই আর বোন কি একজন আরেকজনকে দেখতে পারে? তোমরা বলেছিলে যে গাছের প্রাণ আছে—তার মানে, ওরা শুনতে

পায়, দেখতে পায়? ওদের মধ্যে কথাবার্তা হয়? ঐ কথাবার্তা কি আমরাও শুনতে পারি?' ভাবনাচিন্তার বিপুল প্রবাহ, যার সামনে বাবা আশ্চর্য হয়ে থমকে যান: এক বছর আগে ছেলে একথা জিজ্ঞেস করে নি কেন? কেবল ফুলের উজ্জ্বল রূপ নয়, ঐ সব অবিস্মরণীয় মুহূর্তের আবেগধর্মী বর্ণসুষমাই বা এত দীর্ঘকাল স্মৃতিতে রয়ে গেল কী করে? বাবা দেখলেন যে বনের ধার, সেখানকার বিচিত্র বর্ণের ফুলের গালিচা, নীল আকাশ আর এরোপ্লেনের দূরাগত আওয়াজ—সবই বালকের বেশ মনে আছে।

এই ব্যাপার নিয়ে গভীর ভাবনাচিন্তা করতে করতে আমি মনে মনে প্রশ্ন করি: পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনা যে শিশুর মনে প্রখর আবেগধর্মী প্রতিক্রিয়া ঘটায়, যে শিশু উজ্জ্বল কল্পনাশক্তি ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী, সে কেন স্কুলে ২-৩ বছর পড়াশুনা করার পর কিছুতেই ব্যাকরণের নিয়ম মনে রাখতে পারে না, কেন অনেক কষ্ট করে তাকে মনে রাখতে হয় শব্দের সঠিক বানান আর গুণের নামতা? আমি যে সিদ্ধান্তে এলাম তা জার্মান বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তের চেয়ে কম বেদনাদায়ক নয়। আমার সিদ্ধান্তটি এই যে স্কুলপর্বে জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া প্রায়শই শিক্ষার্থীদের মনোজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শিশুদের স্মৃতিশক্তি ঠিক যে-কারণে প্রখর ও প্রবল তা হল এই যে উজ্জ্বল রূপ, দৃশ্য, উপলব্ধি ও ধারণার নির্মল ধারা সেখানে এসে মিলিত হয়। শিশুদের ভাবনাচিন্তার আরও যে দিকটা আমাদের বিস্মিত করে তা হল সূক্ষ্ম, অপ্রত্যাশিত 'দার্শনিক' প্রশ্ন, কেননা শিশুদের ভাবনাচিন্তা তার পুষ্টি সংগ্রহ করে এই ধারার সঞ্জীবনী উৎস থেকে। বিদ্যালয়ের দ্বার যাতে শিশুর

চেতনা থেকে পারিপার্শ্বিক জগতের অন্তরাল রচনা না করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রয়াস ছিল যাতে শৈশবের সমগ্র পর্বে পারিপার্শ্বিক জগৎ, প্রকৃতি সর্বক্ষণ শিক্ষার্থীদের চেতনায় উজ্জ্বল রূপ, দৃশ্য, উপলব্ধি ও ধারণা সঞ্চার করে, যাতে মননক্রিয়ার নিয়মকে শিশুরা অনুধাবন করতে পারে এমন এক সুগঠিত নির্মাণকর্মরূপে যার স্থাপত্য-প্রেরণাস্বরূপ অবস্থান করছে আরও সুগঠিত এক রূপ—প্রকৃতি। শিশু যাতে জ্ঞানের সংরক্ষণাগারে পরিণত না হয়, যাতে সে তথ্য, নিয়ম ও সূত্রের ভাণ্ডারে পরিণত না হয় তার জন্য তাকে শেখানো দরকার ভাবতে। শিশুচৈতন্য ও শিশুর স্মৃতিশক্তির যে প্রকৃতি তার নিজেরই দাবি হল উজ্জ্বল পারিপার্শ্বিক জগৎ, আর তার নিয়ম মুহূর্তের জন্যও যেন শিশুর দৃষ্টির অন্তরালে না থাকে। আমার বিশ্বাস, যে পরিবেশে শিশু ভাবতে শিখবে, মনে রাখতে ও বিচার করতে শিখবে, তা যদি পারিপার্শ্বিক জগৎ হয় তা হলে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মরণশক্তির প্রখরতা, ভাবনার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস ত পাবেই না, বরং আরও বৃদ্ধিই পাবে।

মানসিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকা বড় করে দেখা উচিত নয়। যে-সমস্ত শিক্ষক মনে করেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুদের অবস্থান—এই ঘটনাটির মধ্যেই নিহিত আছে মানসিক বিকাশের বিপুল প্রেরণা, তাঁরা বিরাট ভুল করে থাকেন। প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন যাদুকরী শক্তি নেই যা বুদ্ধিবৃত্তি, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রকৃতি শিক্ষার বিপুল উৎস হয় একমাত্র তখনই যখন মানুষ তাকে উপলব্ধি করে, চিন্তাশক্তির সাহায্যে কার্যকারণ সম্পর্কের মর্মভেদ করে। প্রত্যক্ষ ঘটনার

অতিমূল্যায়ন—এ হল শিশুমননের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের চরম রূপায়ণ, ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধিজাত কার্যকলাপের প্রমাণ। শিশুদের মননক্রিয়ার বিশেষত্বকে, বিশেষত শিশু যে রূপ, রং ও ধ্বনির সাহায্যে ভাবনাচিন্তা করে—এই বৈশিষ্ট্যকে মাত্রাতিরিক্ত বড় করে দেখা ঠিক নয়। এই বৈশিষ্ট্য এক বাস্তব সত্য। এর গুরুত্ব অত্যন্ত বিশ্বাসজনক ভাবে প্রমাণ করেছেন ক. দ. উশিন্‌স্কি। তবে শিশু যদি রূপ, রং ও ধ্বনির সাহায্যে ভাবনাচিন্তা করে, তার থেকে মোটেই এমন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে তাকে বিমূর্ত ভাবনার শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। মানসিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরাট ভূমিকার উপর, প্রত্যক্ষ ঘটনার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ এই করণশক্তিগুলির মধ্যে বিমূর্ত মননক্রিয়াবিকাশের ও লক্ষ্যনিষ্ঠ শিক্ষার উপায় দেখতে পেয়েছেন।

কোন্ কোন্ জিনিস আমার শিক্ষার্থীদের ভাবনার উৎসস্বরূপ হওয়া উচিত আমি তা দেখলাম, ৪ বছর ধরে প্রতিদিন শিশুদের কী কী পর্যবেক্ষণ করা উচিত, পারিপার্শ্বিক জগতের কোন্ কোন্ ঘটনা তাদের ভাবনার উৎসস্বরূপ হবে আমি তা নির্ধারণ করি। এই ভাবে গড়ে উঠল 'প্রকৃতি পাঠের' তিনশ' পৃষ্ঠা। এতে আছে শিশুচেতনায় ছাপ ফেলার উপযুক্ত তিনশ'টি নিরীক্ষণ, তিনশ'টি উজ্জ্বল চিত্র। সপ্তাহে দু'দিন আমরা প্রকৃতির বুকে ভ্রমণ করতে যেতাম—কী করে ভাবতে হয় শিখতে যেতাম। নিছক পর্যবেক্ষণ নয়, ভাবতে শেখা। বস্তুত এটা ছিল মননক্রিয়ার পাঠ। কিন্তু পাঠও যে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, অত্যন্ত কৌতূহলজনক হতে পারে—এই ব্যাপারটি শিশুদের মনোজগৎকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

আমার সামনে লক্ষ্য ছিল শিশুচেতনায় বাস্তবের উজ্জ্বল চিত্রের ছাপ ফেলা; আমি চেষ্টা করি যাতে শিশুদের মননপ্রক্রিয়ার ভিত্তি হয় জীবন্ত, বর্ণাঢ্য ধারণা, যাতে পারিপার্শ্বিক জগৎকে পর্যবেক্ষণের সময় শিশুরা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে, বস্তুসমূহের গুণ ও লক্ষণ তুলনা করে দেখতে পারে। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হল শিশুর মানসিক বিকাশের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম: বিমূর্ত সত্য, সাধারণীকরণ যত বেশি করে পাঠের সময় আয়ত্তে আনা দরকার, এই মানসিক শ্রম যত দুরূহ হয়ে পড়ে ততই ঘনঘন শিক্ষার্থীকে জ্ঞানের প্রাথমিক উৎসের—প্রকৃতির শরণাপন্ন হতে হবে, ততই উজ্জ্বল হয়ে পারিপার্শ্বিক জগতের রূপ ও চিত্র তার চেতনায় ছাপ ফেলবে। তবে শিশুর চৈতন্যে উজ্জ্বল রূপের যে ছাপ পড়ে তা ফিল্মের ছবির মতো নয়। ধারণা যত উজ্জ্বলই হোক না কেন তা আপনাতে আপনি সম্পন্ন নয়, শিক্ষার চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। মানসিক শিক্ষার সূচনা সেখানেই, যেখানে আছে তত্ত্বগত মননক্রিয়া, যেখানে সজীব অনুধাবন চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, তা উপায়মাত্র: শিক্ষকের কাছে পারিপার্শ্বিক জগতের উজ্জ্বল রূপ হল এক উৎস, যার বিভিন্ন রূপ, রং ও ধ্বনির অন্তরালে নিহিত আছে হাজার হাজার প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলির মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে শিক্ষক যেন 'প্রকৃতি পাঠের' পৃষ্ঠা উল্‌টে চলেন।

'প্রকৃতি পাঠের' প্রথম পৃষ্ঠা। এর নাম হল 'চেতন ও অচেতন'। শরৎকালের প্রথম দিকে, এক রৌদ্রোজ্জ্বল ঈষদুষ্ণ দুপুরে আমরা নদীর তীরে যাই, তৃণভূমিতে এসে উপস্থিত হই। আমাদের সামনে শরতের ফুলে ফুলে ঢাকা ঘাস, নদীর স্বচ্ছ জলের গভীরে মাছেরা সাঁতার কাটছে, বাতাসে ফড়ফড়

করে উড়ছে প্রজাপতির দল, নীল আকাশের বুকে উড়ছে সোয়ালো পাখিরা। আমরা চললাম উঁচু খাড়া পাড়ের দিকে— সেখানে বহু বছর হল জমির ফাটল হাঁ হয়ে বেরিয়ে আছে। মাটি আর বালির বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রং—হলুদ, লাল, কমলা, সাদা। ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে নিরীক্ষণ করে। সাদা মাটির পাতলা স্তর, তার নীচে সোনালি বালি, আরও নীচে— চৌকো আকারের সুন্দর সুন্দর দানা। ছেলেমেয়েরা মাটির গভীর স্তরের সঙ্গে উপরের স্তরের, কৃষ্ণমৃত্তিকার তুলনা করে।

'মাটির ওপরের স্তরে আমরা কী দেখতে পাই?'

'গাছপালার মূল,' ছেলেমেয়েরা উত্তর দেয়। 'ভেতরের স্তরে মূল নেই।'

'এবারে, খাড়া পাড়ের একেবারে কিনারায় যে সবুজ ঘাসের ঝোপ গজিয়েছে তার দিকে আর সোনালি বালুর এই জমিটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ঘাস আর বালুর মধ্যে তফাৎ কোথায়?'

'ঘাস গরমকালে জন্মায়, শরৎকালে মিইয়ে যায়, বসন্তকালে আবার তাজা হয়ে ওঠে', ছেলেমেয়েরা বলল। 'ঘাসের ছোট ছোট বীজ আছে, সেগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে, তা থেকে নতুন নতুন ঘাস জন্মায়।'

'আর বালি?' আমার ইচ্ছে, ছেলেমেয়েরা সকলেই যেন পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুগুলির মধ্যে তুলনা করে দেখে— বিশেষত যারা চিন্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রী তারা—পেত্রিক, ভালিয়া ও নিনা।

'দেখ, এই হল সোনালি বালি আর এই হল সবুজ ঘাস। আচ্ছা আরও ভালো করে বলি — ধর, সবুজ বালি আর সবুজ ঘাস। ওদের মধ্যে অমিল কোথায়, তফাৎটা কোনখানে?'

ছেলেমেয়েরা ভাবে, সবুজ তৃণভূমির দিকে আর ন্যাড়া খাড়া পাড়টার দিকে তাকায়। লুদ্যদার চোখে গভীর চিন্তার ছাপ, পেত্রিক ভুরু কোঁচকায়, ভালিয়া বালি হাতে নিয়ে চালাচালি করে।

'বালির ওপর ফুলগাছ নেই, কিন্তু ঘাসের ওপর আছে,' লুদ্যদা বলল।

'ঘাসের ওপর গোরুবাছুর চরে, কিন্তু বালুর ওপর চরানো যায় না,' পেত্রিক বলল।

'ঘাস বৃষ্টি পড়লে জন্মায়,' বেশ চিন্তাভাবনা করে মিশা বলল, 'কিন্তু বালু কি আর বৃষ্টিতে জন্মায়?'

'বালু থাকে মাটির অনেক নীচে, আর ঘাস হয় মাটির ওপরে,' ইউরা বলল।

কিন্তু সেরিওজার তাতে আপত্তি: 'নদীর পাড়ে কি বালু নেই? ঘাস সূর্যের দিকে শরীর বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু বালু সূর্যে কেবল তেতেই ওঠে...'

কে যেন একটা নুড়ি কুড়িয়ে এনেছিল। আমরা এরপর ঐ নুড়িটার সঙ্গে সবুজ মেপ্‌ল্‌পাতার তুলনা করলাম, তুলনা করলাম লাল কাচের ভাঙা টুকরো আর ডেইজী ফুলের, পুকুরে সাঁতরে-চলা মাছ আর হাঁসের পালকের, সেতুর ওপর লোহার রেলিং আর গাছের ওপর জড়িয়ে-ওঠা বুনো লতার। শিশুদের ভাবনা শতধারায় উৎসারিত হয়, প্রথম দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক চোখে পড়ে, ছেলেমেয়েরা তা লক্ষ্য করে, যে সম্পর্ক সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে না তাও উদ্‌ঘাটন করে। ধীরে ধীরে শিশুদের চেতনায় গড়ে ওঠে চেতন ও অচেতনের ধারণা। কোন্ কোন্ পদার্থ চেতন, আবার কোন্ কোন্ পদার্থ

অচেতন—অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে শিশুরা এটা দেখতে পায়। কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞেস করি: 'তা হলে অচেতনের সঙ্গে চেতনের তফাৎ কী?'—তখন তারা উত্তর দিতে পারে না। সিদ্ধান্ত গড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে, এক্ষেত্রে শিশুদের চিন্তা আবার ধাবিত হয় দৃশ্যগোচর বস্তুর প্রতি। সঠিক লক্ষণ তারা নির্ধারণ করে থাকলেও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভুলও করে বসে, আর সে ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধিত হয় সজীব পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে। কোস্তিয়া যখন বলে: 'চেতন পদার্থ নড়াচড়া করে, কিন্তু অচেতন পদার্থ নড়াচড়া করে না,' তখন প্রায় সকলেই তার কথা মেনে নেয়, কিন্তু তারপরই নেমে আসে নীরবতা, ছেলেমেয়েরা নিজেদের আশেপাশে তাকিয়ে দেখে, আপত্তি ওঠে:

'লাঠি নড়াচড়া করে, নদীতে ভাসে, লাঠির কি প্রাণ আছে?'

'ট্র্যাক্টর ত নড়ে, কিন্তু ট্র্যাক্টরের কি তাই বলে প্রাণ আছে?'

'মাকড়সার জাল বাতাসে ভাসে, ওর কি প্রাণ আছে?'

'পুরনো ছাদের ওপর জমা শেওলা নড়ে না, আচ্ছা, শেওলার কি প্রাণ আছে? নাকি প্রাণ নেই?'

'আচ্ছা, বালু—বালুও ত নড়াচড়া করে। আমরা নদীর খাতে নেমেছিলাম, দেখেছি স্রোতের ধাক্কায় বালুও সরে যায়।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে নড়াচড়াটা আসল ব্যাপার নয়। তাহলে চেতন-অচেতনের পার্থক্যটা কোথায়? ছেলেমেয়েরা বারবার পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুদের মধ্যে তুলনা করে। শুরা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল:

'যার প্রাণ আছে সে বাড়ে, যার প্রাণ নেই সে বাড়ে না।'

ছেলেমেয়েরা এই কথা নিয়ে ভাবতে থাকে। আবার তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুসমূহের উপর। ওরা

বিচার করে, মুখে মুখে বলে: ঘাসে প্রাণ আছে, ঘাস বাড়ে; গাছের প্রাণ আছে, গাছ বাড়ে; বনগোলাপের ঝাড়—তারও প্রাণ আছে, সেও বাড়ে; পাথরের প্রাণ নেই, পাথর বাড়ে না; বালুর প্রাণ নেই, বালু বাড়ে না। সত্যিই তাই—চেতন পদার্থ মাত্রেরই বৃদ্ধি আছে, অচেতন পদার্থের বৃদ্ধি নেই। ...এদিকে মিশা কী যেন ভাবছে, দূরের দিকে চেয়ে আছে। বন্ধুদের কথা ও শুনছে কি? ছেলেমেয়েরা যখন তাদের আশেপাশের সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের উল্লেখ করল তখন সে বলল:

'সূর্য ছাড়া প্রাণ হতে পারে না,' সঙ্গে সঙ্গে সে হাত দিয়ে বন, তৃণভূমি, মাঠ দেখিয়ে দেয়।

এই কথাগুলি থেকে আমাকে আরও একবার বিশ্বাস করতে হয় যে চিন্তার ক্ষেত্রে যারা দীর্ঘসূত্রী, তারা অনেক সময় তীক্ষ্ন দৃষ্টি, গভীর মনোযোগ ও পর্যবেক্ষণশক্তির অধিকারী। মিশার কথা শিশুদের চেতনাকে উদ্ভাসিত করে তোলে। 'আরে, একথা আগে মনে হয়নি কেন?' অনেক ছেলেমেয়েই মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করে। প্রবল ভাবনা যেন পুনর্বার পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তুগুলিকে অনুভব করে, ছেলেমেয়েরা আবার ভাবে, মুখে মুখে আওড়ায়: 'ঘাস, ফুল, গাছ, গম—কেউই সূর্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানুষও সূর্য ছাড়া বাঁচতে পারে না। ...নাকি মানুষ সূর্য ছাড়া বাঁচলেও বাঁচতে পারত? না মানুষ মাটির অনেক নীচে কোথাও আছে এ কি ভাবা যায় নাকি? আমরা বেশ জানি যে ডালপালাওয়ালা গাছের ছায়ায় ঘাস শুকিয়ে যায়। বাবা বলেন: 'বৃষ্টির পর সূর্য তাপ দিলে খেতের ফসল সবুজ হয়ে উঠবে, সূর্য ছাড়া ফসল খারাপ হবে...' কিন্তু পাথর একই রকম থেকে যায়। না, ঠিক এক রকম

নয়, মাটির নীচের কুঠরিতে থাকলে তাতে ছাতা ধরে। ...আচ্ছা ছাতার কি প্রাণ আছে, নাকি নেই? সূর্য কেবল উপকারই করে না, অনেক কাল বৃষ্টি না হলে সূর্য খেত পুড়িয়ে দিতে পারে। তার মানে প্রাণীমাত্রেই কেবল যে সূর্য ভালোবাসে তা নয়, জলও ভালোবাসে।

এই রকম ধারায় প্রবাহিত হয় শিশুদের ভাবনা, তারপর সে সব ভাবনা এসে মিলিত হয় এক একক প্রবাহে, শিশুদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রাণিজগতে এমন এমন ঘটনা ঘটে যা তাদের কাছে দুর্বোধ্য, আর সে-সমস্ত ঘটনা নির্ভর করে সূর্যের ওপর, জলের ওপর, প্রকৃতিতে যা কিছু আমাদের ঘিরে থাকে সে সবের ওপর। ...শিশুরা 'প্রকৃতি পাঠের' প্রথম পৃষ্ঠার প্রারম্ভিক ছত্রগুলি পাঠ করে। ওরা বুঝতে পারল যে জগৎ দুটি প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ে গঠিত—চেতন ও অচেতন। চেতন ও অচেতন পদার্থ সম্পর্কে প্রথম ধারণা অসংখ্য প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। যে সব জিনিস অভ্যস্ত বলে মনে হত, বাড়ি ফেরার পথে ছেলেমেয়েরা সেগুলি নিরীক্ষণ করে, আগে যা দেখে নি তা দেখতে পায়, যত তারা লক্ষ্য করে ততই বেশি করে জাগে প্রশ্ন: ওকের ফল থেকে যে ছোট্ট অংকুর বেরোয় তা কেন বিশাল ওক গাছ হয়ে দাঁড়ায়? কোথা থেকে আসে পাতা, ডালপালা, মোটা কান্ড? শরৎকালে গাছের পাতা কেন ঝরে যায়? শীতকালে গাছ বাড়ে নাকি বাড়ে না? এ সমস্ত প্রশ্নের সবগুলির উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায় না। আর সে চেষ্টা করাও ঠিক নয়। এটা ভালো লক্ষণ যে এ প্রশ্নগুলি শিশুদের মনে জাগে। ভালো লক্ষণ এই যে ভাবতে গিয়ে শিশু জ্ঞানের, ভাবনার প্রাথমিক উৎসের—পারিপার্শ্বিক জগতের শরণাপন্ন হতে শেখে। ভালো লক্ষণ এই যে শিশু তার ভাব প্রকাশের

উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পায়। ভাবনার স্পষ্টতা — মননক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই বৈশিষ্ট্য — অর্জিত হয় পারিপার্শ্বিক জগতের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশার মধ্য দিয়ে।

শিশু রূপ, রং ও ধ্বনির মাধ্যমে ভাবে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মূর্ত ভাবনার মধ্যে তাকে থেমে থাকতে হবে। রূপকেন্দ্রিক ভাবনা — ভাবকল্পনায় উত্তরণের অবশ্যপ্রয়োজনীয় এক পর্যায়। আমি চেষ্টা করি শিশুরা যাতে **ঘটনা, কারণ, পরিণাম, সংঘটন, শর্তাবদ্ধতা, নির্ভরশীলতা, পার্থক্য, মিল, ঐক্য, সামঞ্জস্য, সামঞ্জস্যহীনতা, সাধ্যতা, অসাধ্যতা** ইত্যাদি ধারণা ধীরে ধীরে কাজে লাগায়। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এই ধারণাগুলি বিমূর্ত ভাবনা গঠনে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। সজীব তথ্য ও ঘটনার বিশ্লেষণ ছাড়া, শিশু স্বচক্ষে যা দেখছে তার উপলব্ধি ছাড়া নির্দিষ্ট বস্তু, তথ্য ও ঘটনা থেকে ধীরে ধীরে বিমূর্ত সাধারণীকরণে উত্তরণ ছাড়া এই ধারণা আয়ত্তে আনা অসম্ভব। প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিশুদের মনে যে-সমস্ত প্রশ্ন জাগে সেগুলিই এই উত্তরণের সহায়ক হয়। আমি আমার শিক্ষার্থীদের প্রকৃতির নির্দিষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে শেখাই, কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে শেখাই। নির্দিষ্ট রূপের সঙ্গে মননক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কল্যাণে ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বিমূর্ত ধারণা কাজে লাগানোর অভ্যাস অর্জন করল। বলাই বাহুল্য, প্রক্রিয়াটি ছিল দীর্ঘকালীন; এর পেছনে বহু বছর ব্যয়িত হয়।

'প্রকৃতি পাঠ' অধ্যয়নে শিশুরা বড় আগ্রহ বোধ করে। কিন্তু এই আগ্রহই শেষ কথা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অকপট আগ্রহের ফলে অনেক সময় যে একদেশস্ফীতি দেখা যায়, সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্ব তার বিরোধিতা করে, শিশুদের

কার্যকলাপকে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য রূপে দেখারও বিরোধিতা করে। ক. দ. উশিন্স্কিও লিখেছেন: 'শিশুকে যা আকর্ষণ করে কেবল তা-ই নয়, যা তাকে আকর্ষণ না করে তাও করতে—পরিতৃপ্তির খাতিরে করতে, নিজের দায়িত্ব পালন করতে—শেখান। শিশুকে জীবনের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করুন, আর জীবনের সমস্ত কর্তব্যই যে চিত্তাকর্ষক এমন নয়!' শিক্ষার বিষয়, রূপ ও পদ্ধতিকে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত দাবি পূরণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার যে প্রবণতা বুর্জোয়া শিক্ষাবিদদের আছে, তা সোভিয়েত শিক্ষাবিজ্ঞানের একেবারেই বিরোধী।

সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বে শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ স্কুলের বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনের—বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি অর্জনের, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী মতবাদ গঠনের উপায়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। 'প্রকৃতি পাঠের' মধ্যে আমি যা দেখি তা আনন্দ করে সময় কাটানো নয়, কৌতুকপ্রদ খেলা নয়, তা ছিল বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের জগতে প্রবেশের পথ। পারিপার্শ্বিক জগতের যে-সমস্ত ঘটনায় প্রকৃতির নিয়মের সারমর্ম উদ্ঘাটিত হয় শিশুরা তা হৃদয়ঙ্গম করে। 'প্রকৃতি পাঠের' বিষয়বস্তু শিক্ষক প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ পূরণের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতেন না,—করতেন বিজ্ঞানসম্মত বিশ্ববীক্ষার দ্বন্দ্বতত্ত্বের ভিত্তিতে। কার্যকলাপ জ্ঞান দান করে—এই মর্মে প্রয়োগবাদীদের যে বিখ্যাত তত্ত্ব আছে তার সঙ্গে সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বে বর্ণিত বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর কার্যকলাপের লক্ষ্য এখানেই মূলগত ভাবে পৃথক।

সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বে কার্যকলাপ—নিয়মিত বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার স্থান নেয় না, এ হল বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষা সংক্রান্ত লক্ষ্য

অর্জনের উপায়। অবশ্য এটাও ঠিক যে জ্ঞানার্জনের সহায়ক কার্যকলাপ শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়া অর্থহীন। সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বে আগ্রহকে গণ্য করা হয় হৃদয়ঙ্গমের সময়, অনুসন্ধানকালে বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীর সৃজনমূলক আত্মশক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণরূপে। শিক্ষার্থী যে সত্য আয়ত্ত করছে তা তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়ন ও উপলব্ধির বিষয়ের প্রতি তার আগ্রহও গভীরতা প্রাপ্ত হয়। সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বে আদর্শগত শিক্ষা ও বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

আমরা একের পর এক 'প্রকৃতি পাঠের' পৃষ্ঠা পাঠ করতে থাকি, ভাবতে শিখি। এরপর যে পৃষ্ঠার সঙ্গে শিশুরা পরিচিত হল তার নাম 'চেতন পদার্থের সঙ্গে অচেতন পদার্থের সম্পর্ক'। হট্ হাউস-এ যাই, লক্ষ্য করি ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা কী ভাবে ছোট ছোট নুড়ি পাথরের ওপর মাটির অনেক নীচ থেকে খুঁড়ে বার করা ঐ একই সোনালি বালু ছড়িয়ে দিয়ে সেখানে শশা, টমেটো, যব, যই ফলাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দেখে ধাতুর আর কাঠের বাক্সে বালু ও নুড়ি ঢালা হচ্ছে, ঐ মিশ্রণের ওপর ঢালা হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থের দ্রব। শশা আর টমেটো গাছের শিকড়গুলি এই পরিমণ্ডল থেকে আহরণ করে বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় রস। জড় পাথর, জলে গোলা সাদা গুঁড়ো — মনে হয় জীবনের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় সবই বোধহয় এতে আছে। আবার চেপ্টা পাত্রগুলিতে যবের সবুজ ডাঁটা বেড়ে উঠছে বালু আর নুড়ি ছাড়াই — শিকড়গুলি পুষ্টি আহরণ করছে সাদা রঙের গুঁড়ো পদার্থ থেকে। কিন্তু প্রস্ফুটন ও ফলনের ব্যাপার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করার পর

ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারল যে অচেতন পদার্থ চেতন পদার্থের পরিমণ্ডল হয়ে দাঁড়ায় কেবল সেখানেই যেখানে সূর্য ও জল আছে। আলো, তাপ ও জল ছাড়া জীবন সম্ভব নয়। আজ মেঘলা আবহাওয়া, হট্ হাউস-এ তাই জ্বালানো হয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি। বাইরে ঠাণ্ডা সকাল, হট্ হাউস-এ তখন কেন্দ্রীয় তাপব্যবস্থায় বায়ু তাপিত হচ্ছে।

শিক্ষকমশাই বলেন: 'এখানে যা যা দেখছ মন দিয়ে লক্ষ্য কর, ভেবে দেখ অচেতন পদার্থ ছাড়া চেতন পদার্থ থাকতে পারে কিনা। এই ত তোমাদের সামনে আছে বড় বাক্স, সেই সঙ্গে অনেকগুলো ছোট ছোট বাক্স: এখানে আছে নানা ধরনের রাসায়নিক সার। দেখ, তোমাদের বড় বন্ধুরা কী ভাবে এ বাক্স থেকে সাদা, হলুদ, ছাইরঙা গুঁড়ো নিচ্ছে, মেশাচ্ছে, জলে গুলছে। আবার এই দেখ তৈরি হচ্ছে উর্বর জমি: মোটা দানার বালি মেশানো হচ্ছে কালো মাটির সঙ্গে। দেখতে পাচ্ছ এই মেশানো মাটির ওপর কেমন রসালো টমেটো ফলছে? গাছপালা কোথা থেকে তাদের পাতা, কাণ্ড আর ফল তৈরির উপাদান সংগ্রহ করে? অচেতন পদার্থ থেকে। অচেতন পদার্থ হল চেতন পদার্থের পরিমণ্ডল।' এই সত্য শিশুমনে প্রকৃতির রহস্যের সামনে বিস্ময়ের অনুভূতি জাগ্রত করে।

আবার মনে পড়ে যাচ্ছে অ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) নামে প্রচলিত প্রাচীন উক্তি: চিন্তার শুরু বিস্ময় থেকে। প্রকৃতির উদ্‌ঘাটিত রহস্যের সামনে অকপট বিস্ময়—চিন্তার দুরন্ত প্রবাহের প্রবল প্রেরণা। শিশুরা যখন দেখতে পেল রাসায়নিক পদার্থের দ্রবে ফলছে টমেটো ও শশার মতো বিভিন্ন ধরনের গাছগাছড়া তখন ওরা আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলল: 'এই চকচকে গোলা জলটা

কী ভাবে মোটা ডাঁটা হয়ে যায়, কী ভাবে হয়ে যায় এমন সব রঙচঙে ফুল যাদের ওপর উড়ে এসে বসে মৌমাছিরা, কী ভাবেই বা হয় রসালো ফল?' 'চেতন পদার্থ কোথা থেকে আসে? সূর্য ত আর গাছগাছড়ার জন্য সবুজের টুকরো বয়ে আনে না—সূর্য ত কেবল আলো দেয়, তাপ দেয়—তাই না?' 'ঐ একই গোলা জল থেকে সবুজ শশা হচ্ছে আবার লাল টমেটোও হাচ্ছে—এমন হয় কেন?' 'শশা সবুজ কেন, টমেটোই বা লাল কেন?—ওরা ত পাশাপাশিই ফলছে?' 'এই নানা রঙের গুঁড়োগুলোর ভেতরে কী আছে?' 'কালোমাটি জমিতে ফেললে তা থেকে গাছগাছড়া সবুজ হয় কেন?'

শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক বিকাশের পক্ষে অচেতন পদার্থের সঙ্গে চেতন পদার্থের সম্পর্কের প্রত্যক্ষ ধারণা কতই না গুরুত্বপূর্ণ! 'চেতন পদার্থ কোথা থেকে আসে?' 'সূর্য কী করে অচেতন থেকে চেতনকে বানায়?'—এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে শিশু জীবনের মহাগ্রন্থ পাঠের জন্য, জটিল প্রক্রিয়াসমূহের রহস্য জানার জন্য প্রস্তুত হয়।

'প্রকৃতি পাঠ' অধ্যয়নকে আমি মানসিক সক্রিয়তা শিক্ষার উপায়স্বরূপ বিবেচনা করি। ধারণা, দৃশ্য, রূপ—এ হল সক্রিয় মননক্রিয়ার সূচনামাত্র। ফ.-আ. ডিস্টারভেগের কথায়: 'যে-কোন পদ্ধতি তখনই খারাপ যখন তা শিক্ষার্থীকে সাধারণ উপলব্ধিতে অথবা নিষ্ক্রিয়তায় অভ্যস্ত করে তোলে, ভালো সেই পরিমাণে যে পরিমাণে তার মধ্যে স্বাধীন কর্মতৎপরতা জাগিয়ে তোলে।' আমি চেষ্টা করি 'প্রকৃতি পাঠ' যেন প্রকৃতির চিত্র ও রূপের সাধারণ উপলব্ধির আকার ধারণ না করে হয়ে ওঠে সক্রিয় চিন্তার, বিশ্বের তত্ত্বোপলব্ধির বনিয়াদ, জ্ঞানের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার ভিত্তি।

বিখ্যাত সোভিয়েত মনস্তত্ত্ববিদ গ. কোস্তিউক লেখেন: 'সবচেয়ে ভালো মর্মবস্তু শিক্ষার্থীদের চেতনায় তখনই পেঁছোয় যখন তা তাদের নিজস্ব কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত হয়।' কার্যকলাপের খাতিরে কার্যকলাপ নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিতৃপ্তির জন্যও নয়, বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মর্মোদ্‌ঘাটনের জন্য কার্যকলাপ—এই হল সোভিয়েত শিক্ষাতত্ত্বে সক্রিয়তা ও বৈজ্ঞানিকতার ঐক্যের মূলকথা।

'প্রকৃতিতে সব কিছুরই বদল হয়'—'প্রকৃতি পাঠের' পরবর্তী পৃষ্ঠা এই নামে অভিহিত। আমরা কয়েকবার ঘুরে ফিরে এ প্রসঙ্গে আসি। শরৎকালের মেঘমুক্ত মধ্যাহ্নে আমাদের ক্লাস চলে যায় ফলের বাগানে। ফলের ভারে আপেল ও নাশপাতি গাছের ডাল নুইয়ে পড়ে। শিক্ষক বলেন: 'তোমাদের মনে আছে কি শীতকালে আমাদের বাগান কী রকম ছিল?—গুঁড়ো গুঁড়ো বরফে ঢাকা খালি ডালপালা, তুষারে ঢাকা গুঁড়ি। ...আর এখন দেখ ডালপালা ঘন পাতায় ছেয়ে গেছে, আপেল আর নাশপাতি মাটি থেকে রস নিয়ে টসটসে হয়ে উঠেছে।'

দু'মাস পরে আমরা আবার বাগানে। এখন তার হাল কী হয়েছে? হলুদ পাতা মাটির ওপর নরম গালিচা বিছিয়ে দিয়েছে, ডালপালা অর্ধেক খালি। পাশেই পুরনো একটি আপেল গাছ আর আপেলের ছোট্ট একটি চারা। আপেল গাছটা বসিয়েছিলেন আমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা। তার অর্ধেক ডালপালা ইতিমধ্যেই শুকিয়ে মরে গেছে। মাত্র কয়েকটি সবুজ আছে, আর সেগুলিতে ঝুলছে বড় বড় রসালো আপেল। বুড়ো আপেল গাছ সূর্যের আলোর নীচে আর দু'-এক বছর টিকে থাকবে, তারপর ওটাকে কেটে ফেলতে হবে। এদিকে চারা

গাছটার সরু কাণ্ডে নরম কিশলয়ের সবুজ রং দেখা যাচ্ছে— স্কুলের ছেলেমেয়েরা বুড়ো আপেল গাছ থেকে কলম করে এই চারাটি বানিয়েছে। কয়েক বছর বাদে চারা গাছ বড় গাছে পরিণত হবে, তাতে ফুল ধরবে, সোনালি ফল পাকবে।

'তোমাদের চারদিকে মনোযোগ দিয়ে দেখ—এমন একটি গাছও আছে কি যে সবসময় এক রকম থাকে?'

শিশুদের জীবনের অভিজ্ঞতা এখনও তেমন বেশি নয়, তবে ছোটবেলা থেকেই তারা শ্রম ও প্রকৃতির পরিবেশে বাস করে আসছে, জানে যে গাছপালা জন্মায়, বড় হয়, ফল দেয়। ...ওরা বর্ণনা দেয় কী ভাবে মাটি ভেদ করে কোমল অংকুর দেখা দেয়, গাছের মোটা ডাঁটায় পরিণত হয়, কী ভাবে গাছের কোরক খুলে গিয়ে পাতা দেখা দেয়। ...লম্ফে লম্ফে, কত দ্রুতই না চেতন পদার্থের জগতে পরিবর্তন ঘটে! এতে শিশুরা বিস্মিত হয়। গতকাল আমরা পীচ্‌ফলের বাগানে গিয়েছিলাম, তখন দেখেছিলাম কালো কালো মুকুল, রিক্ত ডালপালা। আজ খুব ভোরে বাগানে আসতেই আমাদের দৃষ্টির সামনে খুলে যায় এক নতুন দৃশ্য: ডালপালা গোলাপী রঙের ছোট ছোট ফুলে ছেয়ে গেছে। ...'এত তাড়াতাড়ি, এক রাতের মধ্যে কিনা কুঁড়িগুলো ফুটে গেল, গাছে ফুল ধরল? গাছ কি রাতে ঘুমোয়, নাকি ঘুমোয় না? গাছ কি আদৌ ঘুমোয়? ডাল কাটলে গাছের কি ব্যথা লাগে? গাছ কেন বুড়ো হয়, মরে যায়?' এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ ভাবতে হয়। কিন্তু উত্তর উদ্রেক করল প্রশ্নের নতুন প্রবাহ।

আমরা পুকুরের পাড়ে, খাতে, ঘন ঝোপের ভেতরে, মাঠে—সর্বত্র 'প্রকৃতি পাঠের' এই পৃষ্ঠাটি পাঠ করি। পুকুরের অগভীর জলে সাঁতার কাটছে ব্যাঙাচিরা—ছেলেমেয়েরা জানে

যে ওরা পরিণত হবে ব্যাঙে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঘটে কী ভাবে? আচ্ছা, অ্যাকোয়ারিয়ামে একেবারে ছোট্ট মাছটাও মাছের মতনই দেখতে, কিন্তু ব্যাঙাচি মোটেই ব্যাঙের মতো দেখতে নয় কেন? আমরা লক্ষ্য করি যৌথখামারীরা রেশম কীটকে খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট করে তুলছে। পোস্তদানার সমান ছোট্ট একটা ডিম থেকে এমন রাক্ষুসে পোকাটা বের হয় কী করে? সে কেবল তুত গাছের পাতা খায়—কেন? ছোট পোকাটা বিরাট পোকায় পরিণত হয়, কয়েকবার সে খোলস ছাড়ায়—যেন পুরনো চামড়া থেকে বেরিয়ে আসে—কেন? দেখতে দেখতে সে নিজের শরীর ঘিরে রেশমী সুতোর জাল বুনবে, সোনালি বাসাটার ভেতরে, গুটির ভেতরে আত্মগোপন করবে—ব্যাপারটা কী? কয়েকটা গুটি নিয়ে জানলার ওপরে রাখি, কিছুকাল বাদে দেখা যায় বড় বড়, সুন্দর প্রজাপতি বেরিয়ে আসছে। প্রজাপতিরা ডিম পাড়ছে—আবার চলছে সেই একই ব্যাপার। আচ্ছা, পোকা এমন মিহি রেশমী সুতো বানায় কী করে? গুটি বোনার সময় যখন এগিয়ে আসে তখন সে অনেক তুত পাতা খায় কেন?

প্রকৃতিকে সক্রিয় ভাবে উপলব্ধিসংক্রান্ত কার্যকলাপ যত বেশি, ততই পারিপার্শ্বিক জগৎদর্শন গভীরতর, অর্থবহ হয়ে দাঁড়ায়। মাসের পর মাস কাটে, শিশুরা ক্রমেই নিজেদের চারধারে বেশি করে লক্ষ্য করে এমন সমস্ত ঘটনা যেগুলির দিকে তারা এর আগে মনোযোগ দিত না। এই ভাবে তারা দেখতে পায় জীবনের এমন সমস্ত রূপ যা তাদের জানা রূপের মতো আদৌ নয়: মাটির তলার অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ঘরে আলুর গায়ে সাদা সাদা সুতোর মতো কী যেন বেরোয়—শেকড়, নাকি ভাবী কান্ড? গাছের কান্ডের উত্তর দিকটাতে

যেখানে সূর্যের আলো পড়ে না সেখানে সবুজ রঙের শেওলা ধরেছে—সূর্যের কাছ থেকে সে লুকিয়ে থাকে কেন? শেওলার বীজ নেই কেন? তার বংশবৃদ্ধি হয় কী করে? সব গাছেরই ফলফুল ফোটে—কিন্তু শেওলার ফোটে না। এটা কী ধরনের উদ্ভিদ?

'প্রকৃতি পাঠের' কয়েকটি ছত্র থেকে শিশুরা নিশ্চিত জানতে পারে যে কেবল চেতন পদার্থেরই পরিবর্তন ঘটে না। আমরা তীরভূমি সংলগ্ন শিলার দিকে যাই। ছেলেমেয়েরা ছাইরঙা পাথরগুলো লক্ষ্য করে দেখে, দেখতে পায় তাতে সূক্ষ্ম ফাটল। হাত দিতে পাথর থেকে খসে পড়ল মিহি স্তর, ঝুরঝুর করে হাতে এসে পড়ল। তার মানে পাথরও চিরকাল পাথর থাকে না? ওদের মনে পড়ে গেল কয়েক মাস আগে ওরা বলেছিল: 'পাথর কি সূর্যের আলোয় কি মাটির নীচের ঘরে—সব জায়গায় সমান।' দিনের বেলায় পাথর তেতে ওঠে, রাতে ঠাণ্ডা হয়ে আসে, দেখা যায় ফাটল, সেখানে জল প্রবেশ করে। দেখা যাচ্ছে, পাথরও চিরস্থায়ী নয়।

'প্রকৃতিতে সবকিছু বদলায়'—মননক্রিয়ার এই শিক্ষা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমার মনে হয়েছে যে শিশু যত বেশি জানতে পারে, দৈনন্দিন জীবনে যে-সমস্ত নিয়ম নজরে পড়ে না সেগুলি সে যত বেশি আবিষ্কার করে, ততই গভীর হয় তার জানার ইচ্ছা, ততই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনার প্রতি তার ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতা, ততই সূক্ষ্ম হয় চিন্তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক। সোভিয়েত নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর ম. ফ. নেস্তুর্খের রচনায় এমন একটি উক্তি আছে যাকে শিশুর মানসিক বিকাশের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যানের চাবিকাঠি বলে আমার মনে হয়েছে। তাঁর মতে, শৈশব পর্বে নিত্য নতুন তথ্যের

অবিরাম প্রবাহের মধ্য দিয়ে চলতে হয় বলে মানুষ ঠিক এই বয়সেই **জ্ঞানের প্রতি ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা** অর্জন করে।

তথ্যের প্রবাহ—পূর্ণমাত্রায় মানসিক বিকাশের এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কিন্তু কোন কারণবশত এই প্রবাহ যদি ক্ষীণ হয়ে পড়ে আর তাকে যদি পরিপূর্ণ করে তোলা না হয়? শিশুর দেখাটাই কিন্তু তথ্যের প্রবাহ নয়। মানুষের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটাই এই যে বড়রা পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে নিজেদের জ্ঞান ছোটদের প্রদান করে, তারা নিজেদের চিন্তাশক্তি প্রয়োগে সর্বক্ষণ অব্যাহত রাখে তথ্যের প্রবাহ, যা শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

আমি জন্ম থেকে স্কুলে ভর্তি হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে—পরিবারে প্রতিটি শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থা মনোযোগ দিয়ে অনুসন্ধান করতে থাকি। আবিষ্কৃত হতে থাকে কৌতূহলজনক নিয়মবদ্ধতা। প্রাক্‌বিদ্যালয় বয়ঃসীমায় শিশুকে যদি নিজের মনে ছেড়ে দেওয়া হয়, স্বাভাবিক মানবিক পরিবেশ যা ছাড়া অর্থহীন, বয়স্করা যদি সেই তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি না করে তাহলে শিশুর মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যায়: তার অনুসন্ধিৎসা, জানার আগ্রহ নিভে যায়, তার ঔদাসীন্য বাড়তে থাকে। জ্ঞানের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহই কি চিন্তার অতি গুরুত্বপূর্ণ সেই শক্তি যা বহুল পরিমাণে শিশুর মানসিক বিকাশ নির্ধারণ করে? আমার মনে হয় যে ব্যাপারটা এই রকমই বটে।

পেত্রিককে ছেলেবেলায় তার নিজের মনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ভোরবেলায় মা আর দাদু কাজে যেতেন, ছেলে একা বাড়িতে থাকত। তাকে রেখে যাওয়া হত চালাঘরে কিংবা বেড়ায় ঘেরা লন্‌-এর ভেতরে। সময় সময় পড়শী মহিলা এসে

দেখে যেতেন ছেলেটার সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। এই ভাবে পেত্রিক দুই থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত 'শিক্ষা' পায়। এটা ছিল অনেকটা 'উদ্ভিদ লালন গোছের' শিক্ষা। পুষ্টিকর খাদ্যের কোন অভাব তার ছিল না, ভালো জামা-জুতোও তাকে পরতে দেওয়া হত, কিন্তু অভাব ছিল সবচেয়ে বড় জিনিসের— মানবিক পরিবেশের। পাঁচ বছর বয়স থেকে পেত্রিক বাচ্চাদের সঙ্গে, প্রধানত সমবয়সীদের সঙ্গে খেলত রাস্তায়। স্কুলে আসার পর দেখা গেল মাতৃভাষার নেহাৎই সাধারণ অনেক শব্দ তার অজানা। আশেপাশের বস্তুর ওপর সে উদাসীন দৃষ্টি বুলিয়ে যায় — আমার মনে হয় একটা ছোটখাটো বুড়ো মানুষের দৃষ্টি। তার মানে মস্তিষ্কের অর্ধগোলকের বহিঃস্তর, অর্থাৎ যে সজীব পদার্থ মননক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে, তা শিশুর কাছে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে, কেননা স্নায়ুব্যবস্থা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে— মগজের শৈশব অবস্থায় বালক পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে অজস্র ধারায় তথ্য পায় নি। এই কারণে শিশুর শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি পাঠের' একটা বড় ভূমিকা থাকা উচিত ছিল।

...আমরা খুলি পরের পৃষ্ঠা—'প্রাণের বীজ'। শরৎকালে ছেলেমেয়েরা চারা বানানোর জন্য আপেল, নাশপাতি ও অ্যাপ্রিকটের বীজ এনে জড় করে। ওরা এখন অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে বীজ থেকে গাছ জন্মায়। বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে যখন স্তেপে, বনে আর উপবনে জীবনের বিপুল সমারোহ দেখা যায় তখন গাছপালার বীজ পাকে, বংশধারা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। আমরা প্রমোদ ভ্রমণে যাই। বসন্তের মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহ পপলারের বীজপত্র আর ড্যান্ডেলিয়ন ফুলের সাদা সাদা রোঁয়া ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাচ্চারা হালকা রোঁয়ার মধ্যে ছোট ছোট বীজ পায়। ওরা অবাক হয়ে যায়:

এই গাছগুলোর বীজের প্রতি প্রকৃতি কী যত্নই না নিয়েছে! শুকনো মাটির ওপর এগুলো বেশিক্ষণ আটকে থাকে না, কিন্তু মাটিতে আর্দ্রতা পাওয়ামাত্রই লেগে যায়, 'নোঙ্গর' করে বসে—বীজ থেকে অংকুর বের হয়। ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে 'প্রকৃতি পাঠের' ছত্রের পর ছত্র পড়ে চলে, দেখতে পায় বহু গাছ তাদের বীজ দিয়ে 'গোলাবর্ষণ' করে, জীবনের বীজ উড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা বোনার জন্য বীজ সংগ্রহ করি। শিশুরা ভাবতে থাকে বীজ থেকে কী ভাবে বিরাট গাছ জন্মায়। বীজের কি প্রাণ আছে? এই পৃষ্ঠার কয়েকটি কৌতূহলজনক ছত্র শিশুরা পাঠ করে শীতকালে: কোন কোন গাছ তাদের বীজ ফেলে তুষারের ওপর, বীজগুলোকে কয়েক সপ্তাহ বরফের ভেতরে পড়ে থাকতে হবে, তবেই পরে তা থেকে অংকুর জন্মাবে।

জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, ততই বিপুল আগ্রহ নিয়ে শিশুরা কাজ করে, ততই শ্রমের গবেষণামূলক চরিত্রের গভীর অভিব্যক্তি ঘটে। হাত যখন ভাবতে সাহায্য করে, শিশু যখন শ্রমের মধ্যে তার ভাবোদ্দীপক প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের চেষ্টা করে, রহস্যভেদের চেষ্টা করে, যে বিষয়টি আপাতত অনুমান বলে মনে হচ্ছে তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার প্রয়াস পায় তখনই পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে আগত তথ্যের প্রবাহ জ্ঞানের বিশেষ শক্তিশালী প্রেরণা হয়ে দাঁড়ায়। যে শিশু চাপে পড়ে পরিশ্রমী না হয়ে আন্তরিক ইচ্ছাবশত পরিশ্রমী হয় সেই হয়ে দাঁড়ায় খাঁটি চিন্তাশীল। পরিশ্রমের জন্য শিশুর আকাঙ্ক্ষার উৎস হল সর্বোপরি **জানার আকাঙ্ক্ষা**। এই আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হলে শ্রমের প্রতি শিশুর আগ্রহ দৃঢ় হয়। শিক্ষকতার ব্যবহারিক কর্মে যাকে বলা হয় শ্রমের প্রতি

ভালোবাসা, তা হল শিশুর জানার আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও আত্মমর্যাদাবোধের সংমিশ্রণ।

'সূর্য—জীবনের উৎস'—'প্রকৃতি পাঠের' অন্যতম চাঞ্চল্যকর এই পৃষ্ঠা অধ্যয়নকে উপলক্ষ করে যে 'পর্যটন' তা শিশুদের চৈতন্যে ও ভাবপ্রবণ স্মৃতিতে গভীর ছাপ রেখে যায়। গ্রীষ্মকালের প্রচন্ড গরমে আমরা মাঠে, বাগানে, আঙুরখেতে যাই। আমাদের সামনে—গম আর সূর্যমুখীর মাঠ, আঙুরগুচ্ছ, হলদে রং ধরা নাশপাতি, পাকা টমেটো। উর্বরতার এই দানের মধ্যে শিশুরা দেখতে পায় সূর্যের আলো ও উত্তাপ। মানুষের যা কিছু দরকার, সূর্যের কল্যাণে জমি তা দান করে। অসংখ্য পর্যবেক্ষণ ও তুলনার সাহায্যে, কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে আসার পর শিশুরা বিস্মিত হয় আর বিস্ময় থেকে আসে ভাবনার নতুন প্রেরণা। ওরা পারিপার্শ্বিক জগৎকে খুঁটিয়ে দেখে, প্রতিটি জিনিসের উদ্ভব নিয়ে ভাবে। বিস্ময়ের ভার আরও গভীর হয় যখন তারা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে সূর্য হল জীবনের একমাত্র উৎস।

ফসল, আলু, সূর্যমুখী—কোনটাই সূর্য ছাড়া হতে পারত না। মাংস, দুধ, মাখনও হত না, কেননা সূর্যের আলো ও তাপের কল্যাণে পৃথিবীতে যা জন্মায় প্রাণী তা খেয়ে বেঁচে থাকে। শিশুরা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে: 'তা হলে সূর্য কী? সূর্য আমাদের ওপর যে তাপ ছড়ায় তা কোথা থেকে আসে? শীতকালে সূর্য কেন পৃথিবীকে এত অল্প গরম করে? সূর্য কি নিভে যাবে না? নিভে গেলে কী হবে?'

'প্রকৃতি পাঠ' পড়তে গিয়ে যে-সমস্ত প্রশ্ন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তা হল জ্ঞানের এমন এক শীর্ষ অভিমুখে ভাবনার দ্রুত

পক্ষসঞ্চালন, যেখান থেকে কয়েক বছর বাদে জীবন-রহস্যের জটিলতা উদ্ঘাটিত হবে। আমি চেষ্টা করি যাতে শিশুরা গভীর অনুসন্ধানকারী ও জগৎ-আবিষ্কারক হয়, যাতে সত্য তাদের সামনে শিক্ষকের দেওয়া কোন সিদ্ধান্ত না হয়ে তাদের নিজস্ব অনুভূতিলব্ধ পারিপার্শ্বিক জগতের চিত্ররূপে দেখা দেয়। আবিষ্কার যদি শিশুচিত্তে চাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাহলে সত্য পরিণত হয় ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে। মানুষ সারা জীবন সেই দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দিয়ে থাকে। বুদ্ধিমার্গীয় অনুভূতি, জ্ঞানের আনন্দোপলব্ধি, প্রকৃতির মহিমা ও তার নিয়মসৌষ্ঠবের সামনে বিস্ময়বোধ—এ হল প্রখর স্মৃতিশক্তির উৎস।

আমি বুদ্ধিমার্গীয় অনুভূতির মধ্যে কোন কোন শিশুর স্মৃতিশক্তির বিকাশ ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় লক্ষ্য করেছি। ভালিয়া কোন জিনিস ভালোমতো মনে রাখতে পারত না, সবই যেন তার মাথা থেকে বেরিয়ে যায়। এমন কিছু করার দরকার ছিল যাতে পারিপার্শ্বিক জগতের চিত্রের সামনে মেয়েটির মনে বিস্ময়ের শিহরণ জাগে। 'প্রকৃতি পাঠের' অন্তর্ভুক্ত 'সব প্রাণীই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়'—এই বিষয় অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে আমরা কয়েক দিন মাঠে, বনে, নদীর ধারে, বাগানে, মৌচাষের জায়গায় ঘুরি। আমি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললাম যে কোন কোন ফুল গরম আবহাওয়ার সময় তাদের পাপড়ি গুটিয়ে নেয়, আবার সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা পড়লে পাপড়ি খোলে; কী করে স্নো-ড্রপ ফুলের সরু ডাঁটা নেতিয়ে-পড়া পল্লবের পুরু স্তর ভেদ করে তীরের মতো বেরোয়। আমি ওদের দেখালাম মৌমাছিরা কী করে মৌচাক বানায়, মধুচক্র মধুতে পরিপূর্ণ করে, কী ভাবে আঙুরলতার শিকড় আর্দ্রতা আহরণের জন্য মাটির তিন মিটার গভীরে প্রবেশ করে, কী

ভাবে পুসি-উইলোর শাখা পলিমাটিতে পড়ে শেকড় নামায় এবং তা থেকে গাছ হয়। ...এই আবিষ্কারে মেয়েটির মন আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। শিশুর চোখে যে ঔদাসীন্যের অভিব্যক্তি ছিল তার জায়গায় এখন দেখা দিল সজীব আগ্রহ। স্বল্পবাক ভালিয়া মুখ খুলল, জিজ্ঞেস করল: 'আচ্ছা, মৌমাছি জানে কী করে কোন্ দিকে উড়লে বাসায় পৌঁছুবে? নিজের মৌচাক ও খুঁজে পায় কী করে? স্নো-ড্রপ ফুলগাছের ডালের ঠাণ্ডা লাগে না? —গাছের নীচে ত বরফ!' যেখানে প্রশ্ন আছে সেখানে ভাবনাও আছে আর যেখানে ভাবনা আছে সেখানে পারিপার্শ্বিক জগতের চিত্র, প্রকৃতির নিয়ম স্মৃতিপটে আঁকা হয়ে থাকে।

'প্রকৃতি পাঠ'-এর যে পৃষ্ঠাগুলি আমরা একে একে পাঠ করি তাদের নাম উল্লেখ করছি: 'উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণিজগৎ', 'জলবিন্দুর পর্যটন', 'মানুষের ব্যবহারে প্রাকৃতিক শক্তি', 'বসন্তে প্রকৃতির জাগরণ', 'গ্রীষ্মের দীর্ঘতম দিনগুলি', 'বনে, মাঠে ও তৃণভূমিতে বসন্তের ফুল', 'গ্রীষ্মকালের ফুল', 'লিলি ও ভায়োলেট ফুল', 'শরতের সন্তান—চন্দ্রমল্লিকা', 'পুকুরে জীবনযাত্রা', 'হেমন্তের শেষ দিনগুলি', 'শীতের প্রতীক্ষায় প্রকৃতি', 'শীতের প্রথম সকাল', 'শীতকালের বনে পাখিদের জীবনযাত্রা', 'গমের শিষ', 'মৌমাছি পরিবারের জীবনযাত্রা', 'সোয়ালো পাখিদের বাসা তৈরি', 'বজ্রবিদ্যুৎ ঘনিয়ে আসছে', 'শরতের আবহাওয়া-দুর্যোগ', 'শীতের মধ্যভাগে পুষ্পজগৎ', 'বনে জলীয় ভাগ বজায় থাকছে', 'সারসেরা উড়ে এলো', 'পাখিরা গরম দেশে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে', 'গরমকালের বৃষ্টির পর রোদ', 'নদীর ওপর রামধনু', 'শীতকালীন ও বসন্তকালীন শস্য', 'সূর্যমুখী ফুল ফুটছে', 'আকাশে তারা',

'জমির জীবন', 'সূর্যের ভাণ্ডার — সবুজ পাতা', 'ব্যাঙের ছাতা ও শেওলা', 'ওকফল থেকে ওক গাছের জন্ম' ইত্যাদি।

'খারাপ শিক্ষক সত্যকে হাতে তুলে দেন, ভালো শিক্ষক সত্যকে খুঁজতে শেখান,' লেখেন ফ.-আ. ডিস্টারভেগ। আমাদের কালে পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনার প্রতি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বেশ বড় রকমের গুরুত্ব অর্জন করছে। যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা এই যে শিক্ষার্থীদের চিন্তার প্রণালীকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে গবেষণার উপর, অনুসন্ধানের উপর, বিজ্ঞানের সত্য উপলব্ধির আগে দেখা দিতে হবে তথ্যের সঞ্চয়ন, বিশ্লেষণ, প্রতিতুলনা ও তুলনা। প্রকৃতির ঘটনা ও চিত্র পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে শিশু চিন্তার রূপ ও প্রক্রিয়া আয়ত্তে আনে, ধারণা তাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে, তার প্রতিটি ধারণা গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কার্যকারণ সম্পর্কের প্রকৃত অর্থে পরিপূরিত হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হল যে 'প্রকৃতি পাঠের' সঙ্গে পরিচিত ছেলেমেয়েদের মননক্রিয়া অপূর্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ: বিমূর্ত ধারণা কাজে লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনে মনে এমন সমস্ত ধারণা, রূপ ও চিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে যাদের ভিত্তিতে উক্ত ধারণাগুলি গড়ে উঠেছে।

আমার শিক্ষার্থীরা, যারা শিশুকালে 'প্রকৃতি পাঠের' সঙ্গে পরিচিত হয়েছে—তারা যখন বড় হল, কৈশোরে পড়ল তখন সাধারণ মানসিক বিকাশে, মানসিক শ্রমের চরিত্রে ও রীতিতে, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক আগ্রহের বহুমুখীরূপে পারিপার্শ্বিক জগৎ উপলব্ধির প্রভাব যে কী রকম হয় তা জানতে আমার বিশেষ কৌতূহল হল। আমার এই বিশ্বাস জন্মাল যে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিমার্গীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়েছে প্রবল অনুসন্ধিৎসা। সবকিছুতেই তাদের আগ্রহ, পারিপার্শ্বিক জগতের যাবতীয়

বস্তু তাদের অনুভূতি ও ভাবনাকে স্পর্শ করে। কৈশোর ও কৈশোরের প্রথম পর্বে আমার শিক্ষার্থীদের মানসিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ঘটনা ও বস্তুসমূহকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দেখার ক্ষমতা। যা হত অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য তা তারা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করত গ্রন্থে। গ্রন্থ হয়ে দাঁড়ায় তাদের জ্ঞানের উৎস ও আত্মিক চাহিদা।

বস্তুজগৎ থেকে সমাজে। কোথা থেকে কিসের আগমন?

প্রকৃতি—মানুষের শিক্ষার হিতকর উৎসস্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতিকে জানা দিয়ে যা শুরু হয় তা হল বুদ্ধি, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত গড়ে ওঠা মাত্র। মানুষ বাস করে সমাজে এবং মূলত তার সমগ্র জীবন—অন্য লোকজনের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিচায়ক। আমি চেষ্টা করি যাতে প্রাথমিক শ্রেণীতে চার বছর শিক্ষার আগাগোড়া পর্বের মধ্যে শিশুরা ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য: মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা এই কারণেই সম্ভব হয় যে তার বৈষয়িক ও আত্মিক চাহিদা মেটায় অন্যান্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ; হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ সৃষ্টি না করলে সমাজে বাস করা সম্ভব নয়। শ্রমের মধ্য দিয়ে, সমাজে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের নৈতিক রূপ, তার মানসসংস্কৃতি, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্ববীক্ষা। শিক্ষকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক কর্তব্য হল শিশুদের হৃদয় দিয়ে বুঝতে ও

অনুভব করতে শেখানো: বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক, নাগরিকের সামাজিক চেহারা প্রকাশ পায়।

অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে ছোট শিশু সামাজিক সম্পর্কের ধারণায় উপনীত হয় বস্তুসংক্রান্ত ধারণা থেকে, বিশেষত কোথা থেকে কিসের আগমন—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ভাবনা ও উদ্‌ঘাটন থেকে।

আমরা স্কুলের ক্যাণ্টিনে দুপুরের খাওয়া সারলাম, বাসন ধুলাম। আমি ছেলেমেয়েদের ক্যাণ্টিন থেকে না বেরিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বললাম, বললাম, আরও আধঘণ্টাখানেক টেবিলের ধারে বসা যাক। আমরা এখন ভেবে দেখব যে যে জিনিস আমরা আজ এখানে, ক্যাণ্টিনে ব্যবহার করলাম সেগুলো কোথা থেকে এলো। বাচ্চারা হিসাব করতে থাকে তারা যা যা জিনিস খেয়েছে সে সব: রুটি, মাংস, আলু, দুধ, মাখন, ডিম... খাবার রান্না হয়েছে উনুনে। উনুন তৈরির কারিগররা হালে নতুন ইট দিয়ে উনুনটা বানিয়েছে। উনুন গরম হয় কয়লার আঁচে, কয়লা আনা হয়েছে খনি থেকে। আমরা টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে আছি। এই টেবিল আর চেয়ার তৈরি হয়েছে ধাতু ও প্লাস্টিক থেকে।

‘এ-ই সব ত?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম।

‘সব,’ বাচ্চারা উত্তর দিল।

‘ভালো করে দেখ, কিছু কিছু জিনিস নজর এড়িয়ে গেছে...’ কোনায় আছে রেফ্রিজারেটর, রেফ্রিজারেটর বিদ্যুৎশক্তি ছাড়া কাজ করতে পারে না। দেয়ালের গায়ে ঝুলছে বৈদ্যুতিক বাতি। ছেলেমেয়েরা এই জিনিসগুলো লক্ষ্য করবে কি?

ওরা লক্ষ্য করল। অবাক হয়ে গেল যখন এই সত্য আবিষ্কার

করল যে বিদ্যুৎ না থাকলে বাড়িতে থাকা বড় কঠিন হত, স্কুলে লেখাপড়া করাও কঠিন হত।

যে সব জিনিস ছাড়া আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না সেগুলো এলো কোথা থেকে?

এই প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয় সামাজিক উৎপাদনের জগতে, পারস্পরিক শ্রমসম্পর্কের জটিল জগতে আমাদের 'পর্যটন'। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ—নতুন নতুন আবিষ্কার। এই ভাবে শিশুদের মনে মেহনতী মানুষদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক হল, যখন তারা আবিষ্কার করল এক পরম সত্য: আমাদের টেবিলে যাতে রুটি আসে তার জন্য ওদের প্রায় সকলেরই মা-বাবাকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু এটাই সব নয়। যে সব শ্রমিক ট্র্যাক্টর বানিয়েছে, হাল, কম্বাইন বানিয়েছে তাদের শ্রমও না হলে নয়—যন্ত্র ছাড়া ফসল ফলানো যায় না। খনিমজুরের শ্রমও দরকার—যন্ত্র নির্মাণ করতে গেলে ধাতু গলাতে হয়, কয়লা ছাড়া সে কাজ সম্ভব নয়।

অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি যে আবিষ্কারের সম্ভাবনা আমাদের সামনে উপস্থিত করছে তাও কম বিস্ময়কর নয়। ভূগর্ভ থেকে কয়লা যাতে আমাদের স্কুলের রান্নাঘরে এসে হাজির হতে পারে তার জন্য আমাদের জন্মভূমির দূরের ও কাছের গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন পেশাধারী শত শত লোককে কাজ করতে হচ্ছে। ধাতু গলিয়ে তা থেকে আমাদের টেবিল বানানোর জন্য, বালু ও মাটি দিয়ে ইট বানানোর জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে শত শত লোককে।

পরে আমরা এই একই উপায়ে সামাজিক উৎপাদনের জগতে, পারস্পরিক শ্রমসম্পর্কের জগতে প্রথম পদক্ষেপ শুরু করি—কোথা থেকে আমাদের পোশাক এলো, কাগজের উৎপত্তি কোথা

থেকে, কে আমাদের বই বানিয়েছে, বানিয়েছে চলচ্চিত্র, কে রচনা করেছে সঙ্গীত—ইত্যাদির পরিচয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস ধরে আমরা সামাজিক সম্পর্কের জটিল গ্রন্থি উপলব্ধি করতে লাগলাম। আমরা মানুষকে উপলব্ধি করলাম বস্তুজগতের মাধ্যমে। বস্তু, বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ আমাদের সাহায্য করল মানুষকে দেখতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে। রুটিওয়ালা স্তেপান মাক্সিমভিচের সঙ্গে আমাদের দেখা হত তার কাজের জায়গায়। সে মানুষটা এখন ছেলেমেয়েদের চোখে নিজের রুজিরোজগারের জন্য পরিশ্রমরত একজন মানুষমাত্র নয়, সে হল জীবনস্রষ্টা, তাকে ছাড়া শত শত, হাজার হাজার মানুষের বাঁচাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। কম্বাইনচালক, ট্র্যাক্টরচালক, ফিটার মিস্ত্রী, টার্নার—যারা শত শত হাজার হাজার মানুষের জন্য বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ উৎপাদন করছে—এমন সব মেহনতীদের সঙ্গে আমরা প্রতি সপ্তাহে দেখা করতাম।

বসন্তকালে তৃতীয় শ্রেণী শেষ হওয়ার পর একদিন আমরা ক্রেমেনচুগ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র দেখতে গেলাম, দেখলাম কী করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়, শক্তিবিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমরা দেখা করলাম।

যে-সমস্ত লোকজনের সঙ্গে শিশুদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নিজেদের শ্রমের প্রতি তাদের মনোভাব শিশুদের নৈতিক রূপ গঠনের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদের জন্য যারা রুটি, মাংস, দুধ, চিনি ইত্যাদির মতো আপাতদৃষ্টিতে অতিসাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে থাকে তারা যে নিজেদের শ্রমের জন্য গর্ব বোধ করে, শ্রমকে সমাজসেবা হিশেবে দেখে — এই ঘটনা শিশুমনে গভীর প্রভাব ফেলে। শ্রম

যে মানুষকে মহিমান্বিত করে, মানুষকে পরিপূর্ণ সুখ দান করে—এই সত্য শিশুদের কাছে কোন বিমূর্ত ধারণা নয়, এ হল জীবনের মর্মকথা। শৈশবের পর্বেই মানুষ এই দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করল যে তার শক্তি ও সৃজনী ক্ষমতা উদ্‌ঘাটনের প্রশস্ত ক্ষেত্র হল সমাজকল্যাণমূলক শ্রম।

সজীব প্রশ্নমালা — হাজার প্রশ্ন

স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য—মানুষকে অনুসন্ধিৎসু, সন্ধানী ভাবনায় দীক্ষিত করে তোলা। আমার ধারণায়, শিশুকাল—মননক্রিয়ার পাঠশালা, আর শিক্ষক—এমন এক ব্যক্তি, যিনি সযত্নে তাঁর শিক্ষার্থীদের দেহব্যবস্থা ও মনোজগৎ গঠন করেন। শিশুমস্তিষ্কের বিকাশ ও দৃঢ়তাসাধনের যত্ন, দর্পণের মতো যেখানে জগতের প্রতিফলন ঘটে, যাতে সর্বদা সংবেদনশীল ও গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন হয়, সেই মস্তিষ্কের জন্য যত্ন—শিক্ষাব্রতীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

শারীরিক ব্যায়ামের ফলে, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে যেমন পেশী বিকশিত হয়, দৃঢ়তা লাভ করে, তেমনি মস্তিষ্কের গঠন ও বিকাশের জন্যও শ্রম ও প্রয়াস অবশ্যপ্রয়োজনীয়।

পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনার মধ্যে বহুমুখী সম্পর্ক স্থাপনের মুহূর্তে—কার্যকারণ, সাময়িক, ক্রিয়ামূলক সম্পর্ক স্থাপনের মুহূর্তে—কোষকলাসমূহের শক্তি উদ্দীপনের যে জটিল অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তার কল্যাণে শিশুর মস্তিষ্ক বিকশিত ও শক্তসমর্থ হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থী যখন

ভাবে, অনুসন্ধান করে, তার কাছে এখনও যে-সমস্ত সম্পর্ক দুর্বোধ্য সেগুলির মূলকথা যখন সে উপলব্ধি করতে প্রবৃত্ত হয় তখন তার মস্তিষ্কের বহিঃস্তরের কোষকলায় এমন সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেশী সবল হয়ে ওঠে যাদের শক্তিই পরিণত হয় বুদ্ধিবৃত্তিতে। আমি আমার কর্তব্য বলতে যা বুঝতাম তা হল পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনাবলীর মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে শিশুদের সাহায্য করা, যাতে প্রবল শক্তি প্রয়োগরত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পেশীগুলির মধ্যে প্রতিবার নতুন নতুন শক্তির খেলা চলে। এই জটিল ব্যাপারটিই হল মস্তিষ্ক, আর তার পরম গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী — অনুসন্ধানপ্রবণ, তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণক্ষমতাসম্পন্ন বুদ্ধি গড়ে ওঠার, দৃঢ়তা ও বিকাশলাভের প্রক্রিয়া।

মানবমস্তিষ্কের কাজ চলে থেকে থেকে। পারিপার্শ্বিক জগৎ থেকে তথ্যের প্রবাহ জনিত প্রেরণা একেক সময় মগজের বহিঃস্তরের একেক শ্রেণীর কোষকলায় সঞ্চারিত হয়। ভাবনা মুহূর্তের মধ্যে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে স্থান বদল করে। এই স্থানবদল — মননক্রিয়ার পরম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। দ্রুত ভাবনা স্থানান্তরণের ক্ষমতাকে সম্ভব করে তোলে এক শ্রেণীর কোষকলা থেকে অপর শ্রেণীতে প্রেরণার অতিক্রমণ। আর এটাই হল ভালো রকম মানসিক ক্ষমতার প্রধান পূর্বশর্ত। শিশু ভাবতে জানে — তার অর্থ হল এই যে সময়ের কোন একটা ভগ্নাংশের মধ্যে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক সেকেণ্ডের মধ্যে) ভাবনা বহুবার মুহূর্তে মুহূর্তে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে স্থান বদল করে — এত দ্রুত, যে যে-ব্যক্তি ভাবছে সে নিজেও স্থানান্তরণের এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করে না, তার মনে হয় যে চৌবাচ্চার প্রসঙ্গ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় যে নল্ থেকে একেক সময় একেক

পরিমাণ জল পড়ছে তাদের প্রসঙ্গও সে একই সময় ভাবছে। অন্য কথায় বলতে গেলে, শিক্ষার্থী মনে মনে একই সঙ্গে বহু ধরনের বিষয়কে, ঘটনাকে হৃদয়ঙ্গম করে, তাদের বিশ্লেষণ করে, তুলনা করে। আমাদের কর্তব্য হল মস্তিষ্কের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা যাতে প্রত্যেক শিশুর মধ্যে বিকাশ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ শক্তি জাগিয়ে তোলার, 'মস্তিষ্কের পেশীশক্তির' খেলায় প্রেরণা সঞ্চারের অনুশীলন হল উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে সমস্যার সমাধান। পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু, বিষয় ও ঘটনার মধ্যেই নিহিত আছে এই সব সমস্যা। আমি কোন একটি ঘটনার প্রতি শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করি, যাতে শিশুর কাছে যে-সমস্ত সম্পর্ক আপাতত রহস্যাবৃত ও দুর্বোধ্য, সে তা দেখতে পারে, যাতে ঐ সব সম্পর্কের মর্মোদ্ধারের, সত্য উপলব্ধির প্রয়াস তার মধ্যে দেখা দেয়। সমস্যাসমাধানের চাবিকাঠি সর্বদাই হল মানুষের সক্রিয় কার্যকলাপ, তার শ্রম। মানসিক শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা, বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে শিশু নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করে।

পারিপার্শ্বিক জগতে হাজার হাজার সমস্যা ছড়িয়ে আছে। সেগুলিকে জনগণ ভেবে বার করেছে, লোকসৃষ্টিতে সেগুলি বেঁচে আছে কৌতূহলোদ্দীপক হেঁয়ালি রূপে। বিশ্রামের সময় শিশুরা প্রথম প্রথম যে সব সমস্যা পূরণ করে তাদের একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

'নদীর এক তীর থেকে অপর তীরে নিয়ে যেতে হবে নেকড়ে, ছাগল আর বাঁধাকপি। একই সঙ্গে তীরে নেকড়ে ও ছাগলকে,

ছাগল আর বাঁধাকপিকে একত্রে রেখে যাওয়া চলবে না আবার বয়েও নিয়ে যাওয়া চলবে না। কেবল পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি 'যাত্রীকে' বয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। যতবার খুশি এপার-ওপার করা যেতে পারে। নেকড়ে, ছাগল ও বাঁধাকপিকে কী ভাবে ওপারে নিয়ে যাওয়া যায়, যাতে ওদের কারও কোন ক্ষতি না হয়?'

লোকশিক্ষাবিজ্ঞানে এ রকম শত শত হেঁয়ালি অংক আছে। এ ধরনের সমস্যার প্রতি ছোটদের প্রচুর আগ্রহ। তাই ছেলেমেয়েরা সকলেই ভাবতে থাকে: কী ভাবে 'যাত্রীদের' ওপারে নিয়ে যাওয়া যায় যাতে নেকড়ে ছাগলকে না খেতে পারে, ছাগল বাঁধাকপি না খেতে পারে? আমরা পুকুরের ধারে বসে ছিলাম। বাচ্চারা বালির ওপর নদীর ছবি আঁকে, ছোট ছোট পাথর এনে সাজায়। সমস্যার সমাধান যে সবাই করতে পারবে এমন নয়, কিন্তু ওরা যে গভীর ভাবে ভাবছে এটাই মানসিক শক্তি বিকাশের চমৎকার উপায়।

এ ধরনের হেঁয়ালির সমাধান দাবা খেলার সময় যে মানসিক শ্রম প্রযুক্ত হয় তার সঙ্গে তুলনীয়। দাবা খেলার মতো এখানেও এক সঙ্গে পরিকল্পিত কয়েকটি চাল মনে রাখতে হয়। প্রথম শ্রেণীর পাঠ শুরু হওয়ার কিছু দিন বাদেই সাত বছরের ছেলেমেয়েদের আমি এই সমস্যাটি পূরণ করতে দিই। মিনিটদশেক বাদে শুরা, সেরিওজা ও ইউরা—এই তিনজনে সমাধান করে ফেলল। প্রখর, প্রবল স্মৃতিশক্তির সঙ্গে এদের সম্মুখগামী ভাবনার দ্রুত প্রবাহের সমন্বয় ঘটে। পনেরো মিনিট বাদে প্রায় সব ছেলেমেয়েই সঠিক উত্তর বার করে ফেলল। কিন্তু ভালিয়া, নিনা, পেত্রিক ও স্লাভা এবারেও কিছু বার করতে পারল না। আমি লক্ষ্য করলাম যে ওদের চেতনায়

চিন্তাসূত্র যেন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ওরা সমস্যাটার অর্থ বুঝতে পারছিল, যে সব বিষয় ও ঘটনা উত্থাপিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারছিল, কিন্তু প্রথম অনুমান মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে ধারণা এতক্ষণ এত স্পষ্ট ছিল তা যেন ঝাপ্‌সা হয়ে গেল, অন্য কথায় বলতে গেলে, শিশু এই মাত্র যা মনে করে রেখেছিল, তা বিস্মৃত হল।

লোকশিক্ষার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে আমি ক্রমেই নতুন নতুন সমস্যা সংগ্রহ করতে লাগলাম, আমার সর্বোপরি আশা ছিল যে চিন্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রী আমার এই ছেলেমেয়েদের হেঁয়ালির বিষয়ের প্রতি, মর্মবস্তুর প্রতি আগ্রহ জাগ্রত হবে। কয়েক দিন বাদে আমি এ রকম একটা লৌকিক হেঁয়ালি ওদের সামনে রাখলাম: 'একটা ছোটখাটো সেনাবাহিনী চলতে চলতে নদীর ধারে এসে উপস্থিত, নদী পার হতে হবে। সেতু ভাঙা, এদিকে নদীও গভীর। কী করা যায়? এমন সময় অফিসার দেখতে পেলেন নদীর ধারে একটা ডিঙিতে দুটো ছেলে খেলা করছে। কিন্তু ডিঙিটা এতই ছোট যে তাতে চেপে পার হতে পারে কেবল একজন সৈন্য বা কেবল দুটো ছেলে—এর বেশি নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব সৈন্য ঐ ডিঙিতে চেপেই নদী পার হল। কী ভাবে?'

আবার লক্ষ্য করি ছেলেমেয়েদের ভাবনার গতিবিধি। আবার ওরা বালুর ওপর আঁকে, স্মৃতিতে ধরে রাখার চেষ্টা করে 'দাবার কয়েকটি চাল'। এবারেও দেখি নিনা, স্লাভা ও পেত্রিকের উদ্যমহীন ভাব। ভালিয়ার চোখজোড়া আনন্দে চকচক করে উঠল: সে এর সমাধান বার করল।

চিন্তার ব্যাপারে যারা দীর্ঘসূত্রী তাদের নিয়ে পৃথক ভাবে কাজ শুরু করি। ওদের আরও সাধারণ ধরনের প্রশ্ন সমাধান

করতে দিই। সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল স্বাভাবিক সংখ্যামালা গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করানো এবং সংখ্যাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের পাঁচটি হেঁয়ালির উল্লেখ করা গেল।

১। 'বাজপাখি ও ওক গাছ': বাজপাখি উড়ে এসে ওক গাছে বসল। একটি একটি করে যদি একেকটি ওক গাছে বসে তাহলে থেকে যায় একটি বাজপাখি, যদি দুটি করে বসে, তাহলে থাকবে একটি ওক গাছ। সব সমেত কটা বাজপাখি, আর কটা ওক গাছ?

২। 'চারণভূমিতে': দুটি ছেলে ভেড়া চরাচ্ছিল। প্রথম ছেলেটি যদি দ্বিতীয় ছেলেটিকে একটা ভেড়া দিয়ে দেয় তাহলে তাদের থাকবে একই সংখ্যক ভেড়া, কিন্তু যদি দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে দেয় একটা ভেড়া তাহলে প্রথম জনের থাকবে দ্বিতীয় জনের দ্বিগুণ ভেড়া। প্রথম ও দ্বিতীয় রাখালের কটা ভেড়া ছিল?

৩। 'কটা হাঁস?': হাঁসের ঝাঁক উড়ছে, একটা হাঁস তাদের মুখোমুখি এসে দেখা দিল। 'নমস্কার, একশ' জন হাঁস,' সে বলল।

'না, আমরা একশ' জন নই,' হাঁসেরা জবাব দিল। 'আমরা যত জন আছি যদি তত জন আরও তত জন, সেই তত জনের অর্ধেক, সেই অর্ধেকের চার ভাগের একভাগ আর তুমিও থাক একমাত্র তা হলেই হবে একশ'।' মোট কয়টা হাঁস উড়ছিল?

৪। 'মাথা ও পা': উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরগীরা আর লাফালাফি করছে খরগোশেরা, মোট ১০টা মাথা আর ২৪টা পা। মোট কয়টা খরগোশ আর কয়টা মুরগী?

৫। 'কয়টি গোলক?': থলিতে — ১০টি হলুদ গোলক, ১০টি লাল, ৫টি সবুজ ও ৫টি কালো। চোখ বন্ধ করে সব

চেয়ে কমসংখ্যক গোলক বার করে নাও, কিন্তু খেয়াল রাখবে যেন ৭টা গোলক একই রঙের হয়।

এই হেঁয়ালিগুলি—বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার অপরিহার্য উপায়স্বরূপ। এগুলির যে কোনটির সমাধান করতে গেলে আগেকার এবং পরেকার ২টি থেকে ৪টি পর্যন্ত 'দাবার চাল' মনে রাখতে হয়। এ কাজ শুরু করার ছয় মাস বাদে ভালিয়া ও স্লাভা এ ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারত, কিন্তু পেত্রিক ও নিনা তখনও কিছু পারত না। যে বিষয় মনে করে রাখতে না পারলে 'দাবার পর্যায়ক্রমিক চাল' দেওয়া সম্ভব নয় তারা তা স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারত না।

এর কারণ কী? মনে হয়, কারণ এই যে কোন কোন শিশু তখনও মুহূর্তের মধ্যে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভাবনা পরিচালনার ক্ষমতা আয়ত্তে আনতে সক্ষম নয়, অর্থাৎ বিষয়ীগত ভাবে বলতে গেলে যে যে উপাদান নিয়ে অংক গঠিত তার সবগুলি মনে রাখার ক্ষমতা, মনে মনে কতকগুলি 'চাল' ভাবার ক্ষমতা তাদের নেই। মস্তিষ্কের কোষের এই ক্ষমতা গড়ে উঠল না কেন—সে আরেক প্রশ্ন। সবসময়ই যে তা জন্মগত বৈশিষ্ট্য, এমন নয় তবে এই কারণটিকেও একেবারে বাতিল করে দেওয়া যায় না। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে, ভাবনার সূত্র যদি মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে যায়, শিশুর এখন যে ধারণা হল এবং কয়েক মুহূর্ত আগে তার যে ধারণা হয়েছিল তা যদি সে মনে মনে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে তাহলে চিন্তা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কয়েকটি বিষয় ও ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

ভালিয়া, পেত্রিক ও নিনার মতো যারা চিন্তার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রী, আমি বিশেষত তাদের মননক্রিয়া নিয়ে অনুসন্ধান

করি। এর উদ্দেশ্য কোন তাত্ত্বিক গবেষণা নয়, আমার কাজের উদ্দেশ্য ছিল তাদের মানসিক শ্রমের ভার লাঘব করা, কী ভাবে শিখতে হয় তা শেখানো। পর্যবেক্ষণে প্রমাণিত হল সর্বোপরি শিশুদের শেখানো উচিত মনে মনে অনেকগুলি বস্তু, বিষয় ও ঘটনা উপলব্ধি করার এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার বিদ্যা। একটি বিষয়ের মর্মবস্তু ও অভ্যন্তরীণ নিয়মের প্রতি সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিশুকে ধীরে ধীরে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিতে হবে, যা হবে অনেকটা দূর থেকে, তফাৎ থেকে। চিন্তার ব্যাপারে যারা শ্লথ প্রকৃতির তাদের মননক্রিয়া অনুসন্ধান করতে গিয়ে উত্তরোত্তর আমার এই বিশ্বাসই গভীর হয় যে অংক বা ঐ রকম কোন জিনিস হৃদয়ঙ্গম করতে না পারা—বিমূর্তায়নে অক্ষমতার, নির্দিট বস্তু থেকে বিমূর্ত ভাবনা গঠনে অক্ষমতারই পরিণাম। শিশুদের বিমূর্ত ধারণার সাহায্যে ভাবতে শেখাতে হবে। ভালিয়ার উচিত হবে নিজের কল্পনায় নেকড়ের নির্দিষ্ট রূপ না আঁকা, বাঁধাকপির প্রতি ছাগলের আকর্ষণের মধ্যেই তার ভাবনা সীমিত করে না রাখা। সবগুলি রূপই যেন শিশুর কাছে হয়ে ওঠে বিমূর্ত ধারণা। কিন্তু বিমূর্ত ধারণার পথ গেছে নির্দিষ্ট বস্তুরই মধ্য দিয়ে। ভেবে দেখা দরকার, শিশু যখন ভাবে তখন তার মস্তিষ্কে কী ধরনের ক্রিয়া সংঘটিত হয়। কী করে ভাবতে হয় তা শেখানো দরকার, নয়ত শিশুর স্মৃতিশক্তির ওপর প্রবল চাপ পড়বে, তাতে আলোড়ন সঞ্চারিত হবে, ফলে ভাবনা হয়ে পড়বে আরও ভোঁতা। আমার শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে কী ঘটছে আমি তা মনে মনে ধারণা করতে সচেষ্ট হই। আমার এই ধারণা হয়ত খসড়া পরিকল্পনাধর্মী, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তাতে অন্তত

কিছু পরিমাণে মননক্রিয়ার সঠিক চিত্রের পরিচয় মেলে। শিশু যখন মনে মনে এক ধারণা থেকে অন্য ধারণায় উপনীত হতে থাকে তখন মস্তিষ্কের নতুন এক বর্গের কোষকলায় উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। উদ্দীপনার নতুন ক্ষেত্র এবং পূর্ববর্তী ধারণার (রূপ, উপলব্ধি) প্রভাবে গড়ে ওঠা ক্ষেত্রের মধ্যে যখন সংবাদ বা সঙ্কেতের যে-কোন দিকে গমনের সূত্র ছিন্ন না হয় একমাত্র তখনই ভাবনা ক্রমাগত সম্মুখবর্তী হতে থাকবে: নতুন ধারণা যেন ইতিপূর্বে লব্ধ, প্রতিষ্ঠিত ধারণার কাছে নিজের সম্পর্কে জানান দেয়, আর পূর্বলব্ধ ধারণা তার নিজের কথা মনে করিয়ে দেয়; এক মুহূর্তের মধ্যে অসংখ্যবার এই দ্রুত চালাচালি চলে; আমরা যে বলি, শিশু ভাবছে, চিন্তা করছে—এটাই হল সেই প্রক্রিয়া। উদ্দীপনার ক্ষেত্রগুলির অন্তর্বর্তী সূত্র যত দৃঢ়, চিন্তাও তত গভীর, বিষয় ও ঘটনার পরিধিও ততই ব্যাপক এবং শিশুরা তাদের বুদ্ধি দিয়ে সেগুলি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

সূত্রের দৃঢ়তার উৎস সম্ভবত নিহিত আছে মস্তিষ্কের সজীব পদার্থের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে, কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সংঘটিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং যে পারিপার্শ্বিকের উপর স্নায়ুব্যবস্থার শৈশব পর্বে মানসিক ক্ষমতার গঠনপ্রক্রিয়া চূড়ান্ত পরিমাণে নির্ভর করে, তার চরিত্রের অভ্যন্তরে—অন্তত প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের শিশুদের উপর অনুসন্ধান চালিয়ে এটাই দেখা গেছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে বিচ্ছিন্ন ভাবনার সজীব দ্বীপগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী সূত্রের দৃঢ়তার উৎসস্বরূপ যে স্নায়বিক শক্তি থাকে, ভালিয়া, নিনা ও পেত্রিকের মস্তিষ্কের কোষকলায় তার যথেষ্ট বিকাশ ঘটে নি। সূত্রগুলি দুর্বল, উদ্দীপনার

ক্ষেত্রগুলির মধ্যকার যোগসূত্র দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যায়, শিশু মনে মনে একই কালে কয়েকটি রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। পেত্রিক যখন আপ্রাণ মনে করার চেষ্টা করে, কিন্তু এইমাত্র, কয়েক মুহূর্ত আগে যা পরিষ্কার ছিল তা যখন আর মনে করতে পারে না, তখন আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন শিশুর মননক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যের কারণ বিভিন্ন। সম্ভবত, প্রধান কারণ এই যে শৈশবের প্রারম্ভে, উপলব্ধির ধারা যখন বিশেষ বর্ণাঢ্য ও বৈচিত্র্যময়, তখন শিশু পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনার মধ্যবর্তী যোগসূত্র নিয়ে তেমন একটা ভাবে না, শিশুর মস্তিষ্কে চিন্তার সজীব দ্বীপগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক তথ্যের প্রবাহ দিয়ে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না— এ সবই হল শিশুর মননক্রিয়া চর্চার প্রতি বড়দের মনোযোগের অভাব, ঔদাসীন্য। একবার হয়ত শিশু গুরুজনের কাছে জিজ্ঞেস করল: ‘কেন?’—কোন উত্তর পেল না, দ্বিতীয় বারও প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। বড়দের ঔপাসীন্য (কোন কোন সময়, জ্বালাস নে ত বাপু। মাথাটা খেয়ে ফেললে!—এই ধরনের রূঢ় চিৎকার-চেঁচামেচি) চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রগুলিকে দুর্বল করে দেয়, অথচ ঠিক এই বয়সেই সেগুলি উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়ে ওঠার কথা।

মননক্রিয়ার এই নেতিবাচক বিশেষত্বের অন্যতম কারণ—পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনায় শিশুদের আবেগধর্মী প্রতিক্রিয়ার দৈন্যও বটে। পরিণামে মগজের অন্তঃস্তরের আবেগধর্মী প্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়ে।

ক্লাসের পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে যত মাসের পর মাস কাটতে থাকে ততই আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে ওঠে যে প্রাক্‌বিদ্যালয়

পর্বের শিশুদের মা-বাবাদের শিক্ষাবিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞান থাকা খুবই দরকার। ঠিক এই পর্বেই, শিশু যখন স্কুলে পড়াশুনা শুরু করে নি, সেই সময় শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার সঙ্গে অনেক কথা বলা প্রয়োজন। ভাবী স্কুল-শিক্ষার্থীদের কথা ভেবে আমরা মা-বাবাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করলাম, সেখানে ২ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমার শিশুদের মা-বাবাদের আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করলাম। শিশুর শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক, মানসিক, নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের প্রশ্ন, ভাবী বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে মা-বাবাদের চিন্তাভাবনা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বিদ্যালয়টি বর্তমানে স্থায়ী ভাবে কাজ করছে।

মা ও বাবা যখন তাঁদের শিশুর প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে তার একমাত্র শিক্ষাদাতা হয় তখন তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বসংক্রান্ত জ্ঞান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমায় শিশুদের মানসিক বিকাশ, মনোজীবন চূড়ান্ত পরিমাণে নির্ভর করে মা ও বাবার এই মৌলিক চর্চার উপর, যার অভিব্যক্তি ঘটে বিকাশমান মানুষের মনের জটিলতম গতিবিধির বিচক্ষণ উপলব্ধির মধ্যে। আমরা মা-বাবাদের নির্দিষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সুসজ্জিত করে তোলার প্রয়াস পাই। মা-বাবাদের বিদ্যালয়ে পাঠের সময় বিশেষ করে যে প্রশ্নটার প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় তা হল শিশুকে কী করে ভাবতে শেখানো যায়, কোন্ উপায়ে বিকশিত করে তোলা যায় তার মানসিক ক্ষমতা। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে এক হাজার প্রশ্ন রেখেছিলাম — এই প্রশ্নগুলি ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তাদের মা-বাবাদের করত। আমরা মা-বাবাদের বোঝাতাম, শিশু যখন জিজ্ঞেস করে তখন

কী ভাবে উত্তর দেওয়া উচিত, কী ভাবে বিকশিত করা উচিত শিশুদের অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহল। মা-বাবাদের সঙ্গে মিলে আমরা প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের শিশুদের প্রকৃতি ভ্রমণের কর্মসূচি তৈরি করি, কোন্ কোন্ বিষয় পর্যবেক্ষণ করা উচিত তা ঠিক করি। প্রতিটি পরিবারে, যেখানে প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের শিশু আছে, সেখানেই যাতে গ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবেশ বিরাজ করে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে বংশগত কারণবশতও মানসিক শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। মা-বাবার মদ্যাসক্তি—শিশুর সমগ্র দেহব্যবস্থার মারাত্মক শত্রু, বিশেষত এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে শিশুর মস্তিকের ওপর।

প্রতিবারই যখন মস্তিষ্কের অনুশীলনস্বরূপ সমস্যা সমাধানের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে উঠত তখন যে-সমস্ত শিশু ধীরে ধীরে ভাবে, অতি কষ্টে মনে রাখে, তাদের আমি নিজের কাছে কাছে রাখতাম। আমাকে ভেবে ভেবে বার করতে হত নানা রকম হেঁয়ালির অঙ্ক, মজার মজার অঙ্ক, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত নিনার সজীব দ্বীপগুলির মাঝখানে পারিপার্শ্বিক জগতের ধারণা ও রূপের প্রথম সংযোগ সূত্র দেখা দিল।

মনে আছে, শীতকালের এক দিনে আমরা অ্যাকোয়ারিয়ামের পাশে বসে ছিলাম। ছেলেমেয়েরা মাছ গুনছিল, একজনের গোনায় বেশি হচ্ছিল, অন্য জনের হচ্ছিল কিছু কম। আমি একটা মজার অঙ্ক দিলাম: 'ভাই অ্যাকোয়ারিয়ামে দেখল দুটো বড় আর চারটে ছোট মাছ, বোন দেখল দুটো বড় আর তিনটে ছোট মাছ, মা দেখলেন তিনটে বড় আর পাঁচটা ছোট মাছ। মা অ্যাকোয়ারিয়ামের সবগুলো মাছ দেখতে পান।

অ্যাকোয়ারিয়ামে তাহলে কতগ্নলো মাছ ছিল?' অনেক ছেলেমেয়ের কাছেই সমস্যাটা কঠিন ঠেকল না, কিন্তু নিনা ভাবতে লাগল। শেষকালে সে আনন্দে দ্ন'হাত ছ্নঁড়ে বলে উঠল: 'আরে ভাই আর বোন যে সবগ্নলো মাছ দেখতে পায় নি, কিন্তু মা'র চোখে পড়েছে সব মাছ। অ্যাকোয়ারিয়ামে তিনটে বড় আর পাঁচটা ছোট মাছ। ওরা ল্নকিয়ে থাকে ঘাসের ভেতরে—তাই দেখা যায় না। ...কিন্তু মা'র চোখে পড়ে যায়...' এই ধরনের, এমন কি এর চেয়ে সামান্য কঠিন ধরনের সমস্যাও ভালিয়া ও পেত্রিক সমাধান করতে লাগল।

ধীরে ধীরে আমি ছেলেমেয়েদের আরও কঠিন কঠিন সমস্যা দিয়ে অর্জিত সাফল্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলাম। শিক্ষার তৃতীয় বছরে আমরা যখন যৌথখামারের বাগিচায় গাছ থেকে আপেল সংগ্রহ করি তখন নিনা একটা হেঁয়ালির অংক সমাধান করল: 'তিন ভাই মাঠে বিচালি কাটছিল। দ্নপ্নরে তারা এক গাছের নীচে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শ্নয়ে পড়ল, শেষকালে ঘ্নমিয়ে পড়ল। বোন ওদের জন্য নিয়ে এলো দ্নপ্নরের খাবার: স্নপ, র্নটি আর ওদের প্রত্যেকের জন্য কয়েকটি করে আপেল। বোন ওদের আর জাগাল না, খাবারের পোঁটলাটা রেখে বাড়ি চলে গেল। বড় ভাই ঘ্নম ভাঙতে আপেল দেখতে পেল। আপেলগ্নলোকে তিন ভাগ করল, কিন্তু নিজের ভাগ থেকে সবগ্নলো না খেয়ে একটা রেখে দিল আদরের ছোট ভাইটির জন্য। শ্নয়ে পড়ল, আবার ঘ্নমে ঢলে পড়ল। মেজো ভাইয়ের ঘ্নম ভাঙল, সে জানত না যে বড় ভাই এর মধ্যে কয়েকটা আপেল খেয়ে ফেলেছে। সে আপেলগ্নলোকে তিন ভাগ করল, কিন্তু সেও নিজের ভাগ থেকে সব আপেল না খেয়ে একটা রেখে দিল ছোট ভাইয়ের জন্য—ছোট ভাই

ছিল পেটুক। ...শুয়ে পড়ল, আবার ঘুমিয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত ছোট ভাইয়েরও ঘুম ভাঙল। দেখতে পেল পোঁটলায় সাতটা আপেল। ভাবল সাতটাকে তিন ভাগ করবে কী করে? অনেকক্ষণ ভাবে আর ভাবে, ভেবে কিছুতেই কিছু বার করতে পারে না, শেষকালে ভাইরা জেগে উঠতে সব ব্যাপার পরিষ্কার জানা পেল। ভাইদের জন্য বোন কটা আপেল এনেছিল?'

আমাদের প্রশ্নমালায় শিশুদের সুপরিচিত শ্রম সম্পর্কে বহু সমস্যা স্থান পায়। এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে গিয়ে শিশুরা বারবার লক্ষ্য করে কী ভাবে বড়রা জমি চাষ করে, বীজের খোসা ছাড়ায়, গাছ লাগায়, জমিতে সার দেয়, ফসল কাটে, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করে, বাড়ি তৈরি করে, রাস্তাঘাট মেরামত করে। জীবনে এই সম্পর্কগুলি স্থাপনের মধ্য দিয়ে ধারণাসমূহের মধ্যকার যোগসূত্র দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ভাবনা ও স্মৃতি এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্যে বিকাশ লাভ করে। অধিকাংশ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে শিশুরা ছবির আশ্রয় নিত, কিংবা বর্ণিত বিষয়ের খসড়া রূপ তৈরি করত। হেঁয়ালি অঙ্ক, মজার অঙ্ক, ধাঁধা ছেলেমেয়েরা দেয়ালপত্রিকায় তুলে দিত। তৃতীয় শ্রেণীর মাঝামাঝি সময় থেকেই দেয়ালপত্রিকা বেরোতে থাকে। সমস্যার সমাধান—দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক প্রতিযোগিতার আকার ধারণ করে। তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা প্রথম ক্লাসে অঙ্কের অলিম্পিক আয়োজন করলাম। ছেলেমেয়েদের নানা ধরনের কঠিন কঠিন সমস্যা দেওয়া হয় এমন হিসাব করে যাতে প্রতিটি শিশুই সাফল্য অর্জন করতে পারে। অঙ্কের অলিম্পিক ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রাথমিক শ্রেণীরও মনোযোগ আকর্ষণ করে, বিদ্যালয়ের সাধারণ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়।

'পারিপার্শ্বিক জগতের প্রশ্নমালা' থেকে গৃহীত সমস্যার সমাধান শিশুকালে ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করে, ভাবতে শেখায়। গণিতে কিংবা অন্যান্য বিষয়ে ভালো জ্ঞানের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না যদি না শিশুরা ভাবতে শেখে, যদি না মননক্রিয়া মস্তিষ্ককে মজবুত করে তোলে।

লেভ তলস্তয় উপদেশ দেন: 'অঙ্কের যাবতীয় সংজ্ঞা ও নিয়ম পরিহার করুন, যত দূর সম্ভব সক্রিয় হতে দিন, সংশোধন করুন, নিয়ম অনুযায়ী নয়, যা করা হয়েছে তা অর্থহীন বলে।' এই পরামর্শ প্রথম দৃষ্টিতে পাঠকের কাছে তাত্ত্বিক সাধারণীকরণের—সংজ্ঞা ও নিয়মের অস্বীকৃতি বলে মনে হলেও আদৌ তা নয়। বরং তার বিপরীত, পরামর্শটির উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থী যাতে সংজ্ঞা ও নিয়মের মূল তাৎপর্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারে, নিয়মের মধ্যে বাইরে থেকে আরোপিত কোন দুর্বোধ্য সত্যকে না দেখে যাতে সে দেখতে পায় বস্তুসমূহের নিজেদের প্রকৃতি থেকে নির্গত নিয়ম। সত্যের প্রতি শিক্ষকের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যখন থাকে তখন শিশু নিজেই যেন সংজ্ঞা 'আবিষ্কার' করে। এই আবিষ্কারের আনন্দ—বিপুল আবেগধর্মী প্রেরণা এবং তা মননক্রিয়া বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। একথাও ভুলে গেলে চলবে না যে লেভ তলস্তয় উক্তিটি করেছেন কেবল ছোট শিশুদের প্রসঙ্গে।

'পারিপার্শ্বিক জগতের প্রশ্নমালা' থেকে সমস্যার সমাধান অঙ্কের ক্ষেত্রে উন্নতির একমাত্র উপায় রূপে গণ্য নয়। মননক্রিয়া বিকাশে সহায়তাদানের ফলে তার ভূমিকা সহায়ক ভূমিকাই ছিল এবং ক্লাসে ছিল বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার চাহিদাবশবর্তী। এই উপায়টি কার্যকর হতে পারে

একমাত্র শ্রমশিক্ষা, মানসিক, নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রণালীর সাধারণ সমাহারের মধ্যে। আলঙ্কারিক ভাষায় বলতে গেলে, আমি এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য অর্জনের—শিশুদের সুদৃঢ় জ্ঞান ও ব্যবহারিক কর্মক্ষমতার সাধারণ পরিধি ভালোভাবে গড়ে তোলার এক যোগসূত্র দেখতে পাই। গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে দাবি ও লক্ষ্যের স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্ট রূপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে ঠিক কোন্ কোন্ জিনিস শিক্ষার্থীদের গভীর ভাবে মনে রাখতে হবে, স্মৃতিতে সযত্নে রাখতে হবে আমি তা নির্ধারণ করি। গণিতবিষয়ক জ্ঞানের যে ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎ গণিত শিক্ষার দৃঢ়তা নির্ভর করছে তা হল সংখ্যার স্বাভাবিক পর্যায় গঠনের মূলনীতি। প্রথম শ্রেণী থেকেই আমি চেষ্টা করি যাতে ১০০'র মধ্যে সীমিত সংখ্যা সংশ্লিষ্ট যোগ-বিয়োগের যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন শিক্ষার্থীকেই বিন্দুমাত্র বেগ পেতে না হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংখ্যার সংবিন্যাস বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়। গুণের নামতা সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান ছাড়া না প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে না ভবিষ্যতে — শিক্ষার্থীদের সৃজনী কর্ম ছিল আমার ধারণার বাইরে। অবশ্যপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের পরিধি স্মৃতিতে ধরে রাখা — সৃজনী ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

যে শিশুর স্মৃতিশক্তি দুর্বল তার পক্ষে ভাবা, কল্পনা করা কঠিন। যে প্রশ্নটি আমাকে বহুকাল ধরে পীড়িত করত তা হল কী করে শিশুদের স্মৃতিশক্তি দৃঢ় করে তোলা যায়, বিকশিত করা যায়, এমন এমন ধারণা, সত্য ও সাধারণীকরণের সাহায্যে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা যায় যা

চিরকাল মননক্রিয়ার হাতিয়ার হিশেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। স্মৃতিশক্তি বিকাশের এমন এক উপায় হয়ে দাঁড়ায় 'অঙ্কের পেটরা'। এটা হল এক চাক্ষুষ শিক্ষা-সহায়ক — এর সাহায্যে শিশুরা তাদের অঙ্কের জ্ঞান যাচাই করত। যাচাইয়ের রূপটি ছিল আকর্ষণীয়: কাঠের একেকটি ব্লকের চারটি দিকে থাকত বিভিন্ন অঙ্ক যোগফলস্বরূপ কিন্তু প্রতিটি চৌকো ব্লাকের চারপাশে থাকত একই রকম সংখ্যা। গুণের নামতা অভ্যাসের জন্য বিশেষ ধরনের অঙ্ক দিয়ে এই পেটরাটি তৈরি।

স্মৃতিশক্তির বিকাশ ও দৃঢ়তা অর্জনের চমৎকার উপায়স্বরূপ ছিল বৈদ্যুতিক অঙ্কযন্ত্র। বৈদ্যুতিক চেন ব্যবহারের ভিত্তিতে যন্ত্রটি চলত। প্রতিটি শিক্ষার্থী এই যন্ত্রে গুণের নামতা আর সংখ্যার স্বাভাবিক পর্যায়বিন্যাস অভ্যাস করত। তৃতীয় শ্রেণীতেই আমরা নিজস্ব বৈদ্যুতিক গণিতযন্ত্র বানাতে শুরু করি, চতুর্থ শ্রেণী শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত এ রকম ৪টি যন্ত্র আমাদের ছিল। শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের পক্ষে মননক্রিয়া ও হাতের কাজের সমন্বয় যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই কাজের মধ্য দিয়ে আরও একবার আমি তা টের পাই। চাক্ষুষ শিক্ষা-সহায়ক তৈরির কাজে অংশগ্রহণের কল্যাণে (বলাই বাহুল্য, মননক্রিয়ার উপর প্রভাবের অন্যান্য উপায়ের সঙ্গে সমন্বয়ে এতে নির্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়) অস্থির স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের স্মৃতিশক্তি দৃঢ় হতে থাকে।

চিন্তাচর্চা শিক্ষার ব্যাপারে বড় রকমের স্থান দেওয়া হয় দাবার। 'আনন্দ নিকেতনে' থাকতেই বহু ছেলেমেয়ে দাবা খেলতে শেখে। ছেলেরা আর মেয়েরা প্রায়ই দাবার ছকের পাশে ধৈর্য ধরে বসে থাকত। দাবা খেলা মননক্রিয়াকে সুশৃঙ্খল

করে, একাগ্রতার শিক্ষা দেয়। তবে এখানে সবচেয়ে বড় কথা হল স্মৃতিশক্তির বিকাশ। খুদে দাবা খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে আমি দেখেছি তারা মনে মনে আগেকার পরিস্থিতি পুনর্গঠন করতে পারে, পরে যে পরিস্থিতি হবে তাও ধারণা করতে পারে। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল ভালিয়া, নিনা এবং পেত্রিকও যেন দাবা খেলে। আমি ওদের খেলা শেখাই, ওরা একসঙ্গে পর পর কয়েকটি চাল ভাবতে পারত। দাবার ছক আমাকে ল্যুবা ও পাভেলের গাণিতিক চিন্তার ক্ষমতা আবিষ্কারে সাহায্য করে। দাবা খেলার আগে পর্যন্ত (এরা খেলতে শুরু করে তৃতীয় শ্রেণীতে) আমি ওদের চিন্তার তীব্রতা ও প্রবল শক্তি লক্ষ্য করি নি।

দাবা ছাড়া মানসিক ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তির পূর্ণমাত্রায় শিক্ষা ধারণাই করা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুদ্ধিচর্চার অন্যতম উপাদানরূপে দাবা খেলার স্থান হওয়া উচিত। কথাটা হচ্ছে ঠিক প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়েই, যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত শিক্ষা এক বিশেষ স্থান অধিকার করে এবং তার জন্য আবশ্যক হয় কাজের বিশেষ বিশেষ রূপ ও পদ্ধতি।

আমাদের বিশ্ব 'পর্যটন'

প্রাথমিক শ্রেণীতে শিক্ষাদানরত শিক্ষকের কর্তব্য হওয়া উচিত শিশুর দৃষ্টির পরিধি যাতে ধীরে ধীরে জন্মস্থানের মাঠ ও বন থেকে আমাদের মাতৃভূমির, তথা সারা দুনিয়ার প্রকৃতি ও জীবনের চিত্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

প্রথম শ্রেণীতেই আমার ছেলেমেয়েরা ভালোমতো জানত যে পৃথিবী হল এক বিরাট গোলক, সে সূর্যের চারধারে ঘোরে এবং একই সময় পৃথিবীর কোন প্রান্তে হয় প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল, কোন প্রান্তে বা ভয়ংকর শীতকাল, কোথাও দিন, কোথাও বা রাত। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে শুরু হল আমাদের বিশ্ব 'পর্যটন'। ছেলেমেয়েরা 'সবুজ ক্লাসঘরে' বসে, তাদের সামনে — বিরাট ভূগোলক — কৃত্রিম 'সূর্যের' আলোয় আলোকিত; 'পৃথিবী' 'সূর্যের' চারদিকে ঘুরছে, 'চাঁদ' ঘুরছে 'পৃথিবীর' চারদিকে। আমি ছেলেমেয়েদের বলি: 'এই দেখ, আমাদের মাতৃভূমির এলাকা। আমরা এর পশ্চিম সীমান্তের কাছাকাছি বাস করি, এসো, যাওয়া যাক পূবে, ঘোরা যাক শহরে আর গ্রামে, দেখি লোকজন কী ভাবে থাকে।' তারপর আমাদের যাত্রাপথে যে সব প্রান্তর, নদী ও জনবসতি পড়ে সেগুলির বিবরণ আমি দিই। ছবি আর স্লাইড দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বিবরণ চলে।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে আসে, 'পর্যটনে' দু'ঘণ্টা কেটে গেল অথচ আমরা ১০০ কিলোমিটারও পেরোলাম না। ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আবার কবে তারা 'পর্যটনে' যাবে।

...আবার শহর ও গ্রাম, বন ও নদী, দালান কোঠা ও প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন, কিন্তু 'পর্যটন' একঘেয়ে লাগে না, কেননা আমাদের মাতৃভূমির প্রতিটি প্রান্তে শিশুরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক, নতুন কোন না কোন জিনিস দেখে। 'পর্যটনের' আরও কয়েক দিন কেটে যায়, আমরা এবারে চলে আসি ভলগার কাছাকাছি, দেখতে পাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র, ভলগা তীরবর্তী বিস্তীর্ণ স্তেপভূমিতে পশুচারণকারীদের সাক্ষাৎ পাই। ছেলেমেয়েরা

রুদ্ধশ্বাসে শোনে স্তালিনগ্রাদের মহাসংগ্রামের কাহিনী* — এই লড়াইয়ের ওপরই নির্ভর করছিল মানবজাতির ভাগ্য। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বীর যদি এখানে মরণপণ লড়াইয়ে না নামতেন, যদি নৃশংস ও শক্তিশালী শত্রুর প্রবল আক্রমণ প্রতিহত না করতে পারতেন, তার শিরদাঁড়া না ভাঙতে পারতেন তাহলে আজ আর আমাদের পক্ষে এই আরামের ক্লাসঘরে বসে থাকা সম্ভব হত না। শিশুদের অল্প বয়স থেকেই মানবজাতির ভাগ্য, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের বৃহৎ জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। শিশু অনুভব করুক যে আজও পৃথিবীতে এমন সব শক্তি আছে যারা নতুন করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসূচনার জন্য প্রস্তুত। শিশুদের হৃদয়ে শান্তির শত্রুদের প্রতি গভীর ঘৃণাবোধ থাকুক, বৃদ্ধি পাক, নিজেদের পিতৃপিতামহের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকাণ্ডের মধ্য থেকে শিশুরা এই দৃঢ় বিশ্বাস আহরণ করুক যে মানুষ ভাগ্যের ঘূর্ণিবাতে ধূলিকণা নয়, মানুষ হল এক প্রচণ্ড শক্তি।

ছেলেমেয়েরা এগিয়ে চলে মাতৃভূমির গহন থেকে গহনতম প্রদেশে, তাদের সামনে উন্মুক্ত হয় নতুন নতুন চিত্র: সমৃদ্ধ উরাল ও তার অফুরান খনিজ সম্পদ, রহস্যময়ী তাইগা, সাইবেরিয়ার বিশাল বিশাল নদী। ...কয়েক দিন আমরা ভ্রমণ করি উরালের অপূর্ব মণিমাণিক্যের দেশে, ভ্রমণ করি প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানকারী ভূতত্ত্ববিদদের সঙ্গে। স্টীমারে চেপে

---

* ১৯৪২-১৯৪৩ সনে স্তালিনগ্রাদে (ভলগোগ্রাদে) সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর জয় ফাশিস্ত দখলকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের, তথা সমগ্র বিশ্বযুদ্ধের এক পরম সন্ধিক্ষণে পরিণত হয়।

বসি, বৈকাল হ্রদের ওপর দিয়ে যাত্রা করি, মুগ্ধ হই পাহাড় আর বন দেখে, ক্যাম্পফায়ারের সামনে রাত্রের আস্তানা গাড়ি। ...এগিয়ে চলি আরও দূরে — ছেলেমেয়েদের সামনে উন্মুক্ত হয় দূর প্রাচ্যের সম্পদ, তারপরই — সমুদ্র। জাহাজে চেপে বসি, যাত্রা করি সাখালিনের দিকে, তারপর গিয়ে উঠি কুরিল দ্বীপপুঞ্জে — এখানে আমাদের মাতৃভূমির দিন শুরু হয়। প্রায় তিন মাস ধরে আমাদের 'পর্যটনপর্ব' চলে, প্রতিদিন আমরা গড়ে ১০০ কিলোমিটার করে পার হতাম, চল্লিশটিরও বেশি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ পাই, পরিচিত হই অপূর্ব লোকজনের সঙ্গে — চাষী, নির্মাণকর্মী, খনিমজুর, জেলে আর ভূতত্ত্ববিদদের সঙ্গে। তারা সকলেই কাজ করে, যাতে আমরা ভালো ভাবে জীবনযাপন করতে পারি। শিশুরা মনে মনে অনুভব করে গর্ব: আমাদের দেশ কী বিরাট, ঐশ্বর্যশালী, কী মিলমিশই না সেখানকার লোকজনের মধ্যে।

আমরা মাতৃভূমিতে একের পর এক আরও কয়েকটি 'পর্যটন' সারি। উত্তরে যাই — আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয় ভয়াল ও সুন্দর তুন্দ্রা, গরিমাময় মেরুসাগর; আমরা দেখা পাই দুঃসাহসী মেরু-অভিযাত্রীদের, হরিণপালনকারী আর কাঠুরেদের। পাহাড়ী চারণভূমির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হই। দক্ষিণে ককেশাসের পাহাড় আর মধ্য এশিয়ার সমতলভূমি 'পর্যটন করি'।

সারাটা বছর আমরা পথে পথে। 'মাতৃভূমি' শব্দটি শিশুচেতনায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল চিত্রে, জাগিয়ে তোলে সোভিয়েত জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ শ্রমের জন্য গর্বের অনুভূতি। আমাদের দৃষ্টান্তে অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষকেরাও মাতৃভূমি 'পর্যটন' শুরু করলেন। প্রভূত মূল্য দিয়ে যা অর্জিত

হয়েছে, যা সোভিয়েত জনগণের কাছে পরম মূল্যবান, 'মাতৃভূমি' বলতে শিশুরা যাতে সে-সম্পর্কে ধারণা করতে পারে তা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।

শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রগুলিতে আমাদের 'পর্যটন'। এই 'পর্যটন' শুরু হয় নীপার নদীপথে যাত্রা দিয়ে। নীপার নদী হল আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম তিন জাতির — রুশ, বেলোরুশ ও ইউক্রেনীয় জনগণের নদী। এই মহানদী ধরে যেতে যেতে ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিসমূহের গ্রাম ও শহরের সঙ্গে, তাদের বীরত্বপূর্ণ অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। স্মলেন্স্ক ও লয়েভ্, কিয়েভ ও কানেভ্, চের্কাসি ও ক্রেমেনচুগ, জাপরোজিয়ে ও কাখোভ্কা — প্রতিটি শহরই শিশুদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহান ভ্রাতৃত্বকে যা দৃঢ়তা লাভ করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে — দাসত্ববন্ধনকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, শোষণকারীদের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য, গৃহযুদ্ধ ও পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের পর্বে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে রক্তপাতের মধ্য দিয়ে। নীপার 'পর্যটনের' সময় ছেলেমেয়েরা শোনে ইউক্রেনীয়, রুশী ও বেলোরুশীয় গান, যেখানে গীত হয়েছে জন্মভূমির নদীর সৌন্দর্য ও গরিমা, জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর কথা। সোভিয়েত শাসনের আমলে আমাদের প্রজাতন্ত্রে যা যা নির্মিত হয়েছে তার বিবরণ শুনে সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমির জন্য শিশুরা গর্ব অনুভব করে।

কয়েক দিন কাটল মৈত্রীর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি 'পর্যটনে।'। আমরা সে 'পর্যটন' শুরু করলাম পেরেয়াস্লাভ্ল-খ্মেল্নিৎস্কিতে, যেখানে ইউক্রেনের জনগণ রুশ জাতির

সঙ্গে তাদের চিরস্থায়ী ঐক্যবন্ধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। মনে মনে আমরা অতিক্রম করি শত শত শহর, যাদের ভাগ্য মাতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য, গৃহযুদ্ধ* ও ফাশিস্ত দখলকারীদের কবলে বিধ্বস্ত কলকারখানা পুনরুদ্ধারের জন্য ইউক্রেনীয় ও রুশ জাতির সাধারণ সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

শিশুদের মনে অবিস্মরণীয় ছাপ ফেলল রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে দীর্ঘ দিনব্যাপী 'পর্যটন'। আমাদের সামনে প্রকাশিত হল জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর মহিমা — রাশিয়ার মাটিতে একশ'টিরও বেশি জাতিসত্তার বাস। শিশুরা ভলগা অঞ্চল, উত্তর ককেশাস, উরাল, সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য ও প্রত্যন্ত উত্তরাঞ্চলের জাতিসত্তাসমূহের জীবনযাত্রা ও শ্রমের পরিচয় লাভ করে।

আমাদের মাতৃভূমির মানচিত্রে আমরা লেনিনের স্মৃতিবিজড়িত কিছু কিছু জায়গায়ও 'পর্যটন' সারি। উলিয়ানভ্স্ক, কুইবিশেভ, কাজান, লেনিনগ্রাদ, মস্কো, শুশেন্স্কোয়ে — ভৌগোলিক মানচিত্রে এই বিন্দুগুলির প্রতিটিই শিশুচিত্তে জাগ্রত করে উজ্জ্বল চিত্র: আমি কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের স্রষ্টা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের শৈশব, কৈশোর ও পরিণত বয়সের কাহিনী ওদের বলি।

বেলোরুশিয়া ও মোল্দাভিয়া, মধ্য এশিয়ার ভ্রাতৃপ্রতিম প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং বল্টিক তীরবর্তী ও ট্রান্স-ককেশীয়

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহযুদ্ধ (১৯১৮-১৯২০) — সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অর্জিত সাফল্য রক্ষার জন্য বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ায় শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের যুদ্ধ।

প্রজাতন্ত্রগুলিতে 'পর্যটনের' ফলে শিশুদের সামনে জাতিতে জাতিতে মহামৈত্রীর নতুন নতুন চিত্র ক্রমেই উন্মুক্ত হতে থাকে। আমাদের মানসভ্রমণ আরও উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক হয়ে দাঁড়ায় এই কারণে যে তখনই আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বেলোরুশিয়া ও রাশিয়ার স্কুলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পত্রালাপ চালাচ্ছিল।

আমরা আমাদের দেশের সীমানা ছাড়িয়েও 'পর্যটন' করতাম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ও সৌন্দর্য দেখানো, বিশ্বের নানা জাতির জীবনে ও শ্রমে যা যা ভালো আছে তার বিবরণ দেওয়া, বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকজনের সংস্কৃতি, শিল্প, বর্তমান ও অতীতের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, সমগ্র বিশ্বে শুভ ও অশুভের যে সংগ্রাম চলছে তার স্বরূপ তুলে ধরা — এ-ই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এই সব 'পর্যটনের' ক্ষেত্রে মাতৃভূমিতে 'পর্যটনের' তুলনায় চাক্ষুষ উপকরণের ভূমিকা আরও বেশি ছিল: এখানে প্রয়োজন ছিল আমাদের দেশে যা দেখার উপায় নেই সেই দূর দূর দেশের, সেখানকার প্রকৃতির ধারণা গড়ে তোলা।

প্রথমে আমরা সফর করলাম গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে। দিনের পর দিন ছেলেমেয়েরা পরিচিত হতে লাগল মিশর, ভারত, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃতি, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, শ্রম ও সংস্কৃতির সঙ্গে — ওরা বিবরণ শুনত, ঐ সব দেশ সম্পর্কে চলচ্চিত্র দেখত। ছেলেমেয়েরা যেন কল্পনায় চলে যেত ছিমছাম তালতমালের ছায়ায়, অনুভব করত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সূর্যের দাবদাহ, প্রবল বর্ষণের শীতলতা, লক্ষ্য করত মেহনতীদের জীবনযাত্রা। পিরামিডের দেশ মিশর 'পর্যটন' হৃদয়গ্রাহী হয়।

তারপর আমরা 'পর্যটন' করি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে —

ভ্রমণ করি বল্টিক তীরবর্তী দেশগুলিতে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়, মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে, তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তানে, জাপানে। এই ভাবেই আমরা 'পর্যটন' করি আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল।

শিশুদের মনে বিরাট ছাপ ফেলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষের চিত্র। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, তার বর্ণ যাই হোক না কেন, যে ভাষায়ই সে কথা বলুক না কেন — সর্বত্রই সে পরিশ্রম করে, শিশুদের মানুষ করে, তাদের সুখের স্বপ্ন দেখে। আমি চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব উজ্জ্বল ভাবে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলির — সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির জনগণের শ্রম ও জীবনযাত্রার পরিচয় শিশুদের দিতে, তাদের মনে মেহনতীদের প্রতি মৈত্রীর অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে। আমি তাদের জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে বলি।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিশুদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করে যে ফ্যাসিবাদ ও জার্মান জনগণ — এক নয়, জার্মানির শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানরা হিটলারী প্রতিক্রিয়ার তামসিক দিনগুলিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে — যে শত্রুর বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ লড়াই করেছে তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন করেছেন।

পৃথিবী 'পর্যটনের' সময় ছেলেমেয়েরা লক্ষ্য করে যে সব মানুষই যে সুখেশান্তিতে বসবাস করছে এমন নয় — দুনিয়ায় এমন সব দেশ আছে যেখানে মানুষ মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে, যেখানে বিরাজ করছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। শিশুচেতনায় এই অকল্যাণের কারণ সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠতে

থাকে — শিশুরা ধারণা করতে পারে যে এর কারণ হল অনুচিত সমাজব্যবস্থা। শিশুদের মনে ধীরে ধীরে এই বিশ্বাস জন্মায় যে দুনিয়ায় শোষক আর শোষিতদের মধ্যে তীব্র, আপসহীন সংগ্রাম চলছে। যে সব মেহনতী মানুষ এখনও দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাদের দুঃখ, যে-সমস্ত জাতি আজও পরাধীন রয়ে গেছে তাদের দুঃখ আমার শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চার করে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। শিশুমন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। শিশুরা অন্য দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের মাতৃভূমির নাগরিকদের স্বাধীন শ্রমকে, তারা অনুভব করে যে মাতৃভূমির কল্যাণে নিয়োজিত শ্রম, নিজেদের পরিবার ও জাতির স্বার্থে নিয়োজিত শ্রম — পরম সুখকর।

যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ায় মানুষের উপর মানুষের শোষণ আছে, ততক্ষণ সমগ্র মানবজাতির প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, কেননা বিমূর্ত মানবজাতি বলে কিছু নেই, আছে শ্রেণী-সহোদর — শোষিত মানুষ আর তার আপসহীন শত্রু — শোষকশ্রেণী। বিপ্লবী, কমিউনিস্ট ভাব বলতে কী বোঝায় প্রতিটি শিশু যাতে অল্প বয়সেই তা ধারণা করতে পারে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ওদের বেড়াতে নিয়ে যাই আমাদের মাতৃভূমির অদূর অতীতে, মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তার জনগণের সংগ্রামের বিবরণ দিই, উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখাই কী ভাবে একালে ঔপনিবেশিক ও পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মেহনতীরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে; এরই মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শিশুদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করি যে ভাবাদর্শের খাতিরে মানুষ মৃত্যু বরণ করে, ভাবাদর্শের সংগ্রামে সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় শ্রেণী-বিরোধিতার মর্মবস্তু।

যে-সমস্ত মানুষ উন্নত, মহান আদর্শের স্বার্থে প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদের আদর্শে পরিণত হন সেদিকে লক্ষ্য রাখা একান্তই প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের ধারণা থেকে আমি ধীরে ধীরে শিশুদের উপনীত করলাম কমিউনিস্ট পার্টিসংক্রান্ত ধারণায়। মাতৃভূমির অতীতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের নিঃস্বার্থ সংগ্রামের কথা বলি, মানুষে মানুষে শোষণ যাতে না থাকে, মেহনতীরা যাতে সুখেশান্তিতে বসবাস করতে পারে, যারা সম্পদ সৃষ্টি করছে তারা যাতে সম্পদের মালিক হতে পারে তার জন্য তাদের সংগ্রামের পরিচয় দিই। আলাপ আলোচনার সময় আমি বর্ণাঢ্য ভাষায় ছেলেমেয়েদের কাছে বর্ণনা দিই কী ভাবে লেনিন ও কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায় স্বৈরাচার উচ্ছেদে ও সোভিয়েত শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হয়। মহান লেনিনের সহযোদ্ধা, কমিউনিস্টদের নিঃস্বার্থ সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমি দেখাই কী কঠিন ও তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয় মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যা আমাদের মাতৃভূমির জাতিসমূহের মুক্তি ও সুখের আলোকিত পথ নির্মাণ করেছে, দেখিয়েছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ বহু জাতির কোটি কোটি মানুষের মুক্তির পথ।

সোভিয়েত শাসনপর্বে আমাদের দেশের যে কী অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটেছে, দেশজুড়ে কী ধরনের বিশাল বিশাল কলকারখানা গড়ে উঠেছে, কী রকম আশ্চর্য সমস্ত যৌথখামার দেশের মাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে, সোভিয়েত জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মান যে কত উন্নত হয়েছে,

মাতৃভূমি 'পর্যটনের' সময় আমি শিশুদের কাছে তার বিবরণ দিই। আলাপ আলোচনার সময় আমি বেশি করে মনোযোগ আকর্ষণ করি আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রার প্রতি। তাদের সুখের শৈশব রক্ষা করছে আমাদের সমগ্র জাতি।

সোভিয়েত দেশের সমৃদ্ধ জীবনের বিপরীত হল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মানুষের কঠিন জীবনযাত্রা।

জাপান 'পর্যটনের' সময় শিশুরা জানতে পারল ১৯৪৫ সনে হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমাবর্ষণের ফলে হাজার হাজার নির্বিরোধী মানুষের বিকিরণজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার কথা, জানতে পারল গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়িনী বালিকা সাদাকো সাসাকির কথা। ছেলেমেয়েরা তাদেরই সমবয়স্কা, দূর দেশের এক মেয়ের দুঃখে গভীর মর্মপীড়া অনুভব করে। তারা অসুস্থ মেয়েটিকে সাহায্য করতে চায়, কিন্তু কী ভাবে সাহায্য করা যায় তা বুঝতে পারে না। জাপান 'পর্যটনের' কয়েক সপ্তাহ বাদে আমি ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনালাম সংবাদপত্রের ছোট একটি খবর, তাতে জানানো হয়েছে যে সাদাকো সাসাকির এখন লক্ষ্য হল কাগজ কেটে এক হাজার সারসের বাচ্চা তৈরি করা (জাপানী লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী, যে নিজের হাতে এক হাজার সারসের বাচ্চা বানিয়েছে সে সুখী হবে)। আমাদের জাতির অনেকটা এই রকম একটা বিশ্বাস আছে: স্নেহময়ী জননী অসুস্থ শিশুসন্তানের জন্য কাগজ কেটে রুপোলি ভারুই পাখি বানান — ভারুই পাখি স্বাস্থ্যের বাহক। ছেলেমেয়েরা তাই সারসের বাচ্চা তৈরি করে, সেগুলিকে দূর সূর্যোদয়ের দেশে পাঠায়। ...বছরের পর বছর কেটে গেল, আমার শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে কৈশোরে পদার্পণ করেছে, সাদাকো সাসাকির স্বাস্থ্য

সম্পর্কে প্রতিটি সংবাদে গভীর বেদনায় তাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। দূরের বান্ধবীর মৃত্যুর দুঃখজনক সংবাদ কিশোর-কিশোরীরা নিদারুণ ব্যক্তিগত ক্ষতিস্বরূপ বিবেচনা করে।

যে দুনিয়ার দিগন্ত শিশুর চোখের সামনে ধীরে ধীরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে তা কেবল সাগর-মহাসাগর নয়, মহাদেশ ও দ্বীপমালা নয়, অদেখা উদ্ভিদজগৎ ও জীবজগৎ নয়, উত্তর মেরুপ্রদেশের মেরুজ্যোতি আর গ্রীষ্মমণ্ডলের চিরগ্রীষ্ম নয়— তা হল সর্বোপরি মানুষ, তার শ্রম, সুখী ভবিষ্যতের জন্য তার সংগ্রাম, যে-সমস্ত দেশে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের অবসান ঘটেছে তাদের আদর্শে মানবজাতির সুখ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চিরন্তন স্বপ্ন। শিশুদের এ জগতে প্রবেশ করতে হবে — কোথায় কী ঘটছে সে-সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, নির্লিপ্ত পর্যবেক্ষক হলে তাদের চলবে না, তাদের হতে হবে মানবজাতির ভাগ্যের জন্য উদ্বেগে আকুল মানুষ।

আমাদের মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির বাইরের দেশগুলি 'পর্যটনের' সময় একটি বিপদের কথা ভুলে গেলে চলবে না— জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার 'গুরুভোজনে' শিশুদের ভারাক্রান্ত করার বিপদ। 'পৃথিবীর ওজন কত, সূর্যের ওজন কত, কোন্ কোন্ পদার্থ দিয়ে সূর্য গঠিত, কী ভাবে গাছের ও মানুষের জন্ম হয়, মানুষ কী রকম অসাধারণ সব যন্ত্র বার করেছে — এ ধরনের অসামান্য যে-সমস্ত ফলাফল বিজ্ঞান লাভ করেছে সেই সব অতি প্রিয় (বিশেষত স্কুলপাঠ্য বিদেশী গ্রন্থগুলিতে) সংবাদ প্রদান থেকে বিরত থাকুন,' ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষকের প্রতি লেভ তলস্তয়ের এই উপদেশ। নির্ভেজাল ফলাফল শিক্ষার্থীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে কথার ওপর বিশ্বাস করতে শেখায় — মহান লেখক ও

শিক্ষাব্রতী তাঁর উপদেশের তাৎপর্য এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কথাগুলি যখন লেখা হয় তারপর থেকে বহু বছর কেটে গেছে, দুনিয়াকে এখন আর চেনাই যায় না, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েদের দৃষ্টিক্ষমতাও এখন অন্য রকম। কিন্তু লেভ তলস্তয়ের উপদেশ আজও তার মূল্য হারায় নি। শিশুদের কাছে তথ্যভারাক্রান্ত বিবরণ রাখা উচিত নয়, তাতে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

শিশুর চাই মানসিক শ্রমের আনন্দ, বিদ্যায় সাফল্যের আনন্দ

শিক্ষার্থীর মানসিক শ্রম, বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য ও অসাফল্য— এ হল তার অন্তর্জীবন, তার অভ্যন্তরীণ জগৎ, তাকে অবজ্ঞা করার পরিণাম শোচনীয় হতে পারে। শিশু যে কেবল কোন জিনিস জানে, কোন বিষয় আয়ত্তে আনে তা-ই নয়, সে নিজস্ব শ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে, সাফল্য ও অসাফল্যের প্রতি সে তার গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশ করে।

ছোট শিশুর কাছে শিক্ষক হলেন ন্যায়পরায়ণতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। অসন্তোষজনক নম্বর পাওয়ার পর স্কুলের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মনোভাব কেমন হয় তা একবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন। ...শিশু যে কেবল নিজেকে অসুখী ভাবে তাই নয়, শিক্ষকের প্রতি সে পোষণ করে বিরূপ মনোভাব, কখনও কখনও শত্রুতাপূর্ণ মনোভাবও বটে। আসলে শিশু কোন একটা ব্যাপার বুঝতে না পারায় শিক্ষক তাকে খারাপ নম্বর দিয়েছেন, কিন্তু এর জন্য শিশুর কাছে তিনি হয়ে গেলেন পক্ষপাতদুষ্ট লোক।

একটা স্কুলে এ রকম এক ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থী কিছুতেই বুঝতে পারছিল না উদ্ভিদ কী করে আহার সংগ্রহ করে, নিশ্বাসপ্রশ্বাস নেয়, কী ভাবে কলি থেকে পাতা গজায়, ফুল থেকে ফল হয় ইত্যাদি। শিক্ষক ছেলেটিকে বেশ কয়েকবার তলব করলেন, প্রতিবারই বলেন: 'এই সাধারণ ব্যাপারটাও বুঝতে পারিস না, মোটকথা তুই কোন জিনিসটা বুঝতে পারিস, শুনি?' একদিন পাঠ চলার সময় তিনি বললেন: 'কয়েক দিন বাদে বাদাম গাছের কলি থেকে পাতা গজাবে, আমরা ক্লাসসুদ্ধ সকলে বাদামবীথীতে যাব। তোমাদের প্রত্যেকের কাছে যে ব্যাপার স্পষ্ট, ওখানে গিয়েও যদি আলিওশা তা আমাদের না বলতে পারে তাহলে আর কোন আশা নেই।' শিক্ষক ফল থেকে তার নিজের হাতে গড়া ছোট ছোট বাদাম গাছের বীথীকে বড় ভালোবাসতেন। পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে তিনি কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে আরও একবার প্রতিটি ছোট ছোট গাছের মাথায় কলির শোভা দেখে চোখ জুড়ানোর জন্য বীথীর দিকে গেলেন। আর পরদিন যখন পাঠের সময় গোটা ক্লাস বাদামবীথীতে এলো তখন শিক্ষক ত হতবাক: গাছের সমস্ত কলি মুড়ানো। শিশুরা বিষণ্ণ। শিক্ষক লক্ষ্য করলেন, আলিওশার চোখে জ্বলছে হিংস্র উল্লাসের আগুন।

এই আচরণের পশ্চাতে আছে শিশুর আন্তর শক্তির বিক্ষোভ, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, হৃদয়ের গভীর যন্ত্রণা। বালক তার শক্তির প্রতি অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল। কিন্তু শিক্ষকতার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অনেক সময়ই ছেলেমেয়েরা খারাপ নম্বর পেয়ে পেয়ে শেষ পর্যন্ত যেন নিজের ভাগ্যের সঙ্গে আপস করে নেয়, তাদের কাছে তখন সবই

সমান। কখনও কখনও নিজের পাওয়া নম্বরের প্রতি শিশুর ঔদাসীন্য বন্ধুবান্ধবদের হাসিঠাট্টার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, ধীরে ধীরে ছেলেমেয়েরা সকলে ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তারা মেনেই নেয় যে ভানিয়া কিংবা পেতিয়া এর চেয়ে ভালো নম্বর পেতে পারে না। ব্যক্তিত্ব গঠনের মুখে মনোজীবনের পক্ষে এর চেয়ে ভয়াবহ আর কিছু ধারণাই করা যায় না। ছোটবেলায়ই যে মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ ভোঁতা হয়ে গেছে তার কাছ থেকে কীই বা আশা করা যেতে পারে?

শিক্ষকতার পরম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলির একটি হল জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিটি শিশুর মনে মানবিক মর্যাদাবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্চার করা। শিক্ষক কেবল শিক্ষার্থীর সামনে জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটনই করেন না, তিনি শিশুকে নিজের সাফল্যে গঠিত সক্রিয় স্রষ্টারূপে, সৃজনকারীরূপে পারিপার্শ্বিক জগতে প্রতিষ্ঠিত করেন। লেখাপড়া চলে সমষ্টির মধ্যে, কিন্তু উপলব্ধির পথে শিশুদের প্রতিটি পদক্ষেপ হয় স্বাধীন; মানসিক শ্রম হল গভীর ভাবে ব্যক্তিনির্ভর প্রক্রিয়া, তা নির্ভর করে কেবল শিশুর ক্ষমতার উপরই নয়, তার চরিত্রের উপরও বটে এবং এমন আরও বহু পরিস্থিতির উপর যেগুলি প্রায়ই অলক্ষিত থেকে যায়।

শিশুরা খোলা মন নিয়ে, ভালোমতো পড়াশুনা করার বাসনা নিয়ে স্কুলে আসে। শিশু এমন কথা ভেবে পর্যন্ত ভয় পায় যে লোকে তাকে নিষ্কর্মা কিংবা হতভাগা মনে করতে পারে। ভালোমতো পড়াশুনা করার বাসনা — সুন্দর মানবিক বাসনা — আমার মতে, সেই উজ্জ্বল অগ্নিকণা যার দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শিশুজীবনের গোটা তাৎপর্য, শিশুদের আনন্দজগৎ। ক্ষীণ ও অরক্ষিত এই অগ্নিকণা শিশু আপনার

কাছে, শিক্ষকের কাছে বয়ে আনে আপনার উপর অপরিসীম আস্থা নিয়ে, আপনি যদি শিশুর আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য না করতে পারেন তার মানে হল নিজের শিক্ষার্থীদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যে দায়িত্ববোধ আপনাকে উদ্দীপিত করে তোলা উচিত ছিল তা আপনার অনধিগম্য। শিশুহৃদয়কে অসতর্ক ভাবে স্পর্শ করলে — কটু কথায় মনে আঘাত দিলে কিংবা শিশুর প্রতি ঔদাসীন্য দেখালে এই অগ্নিকণা সহজেই নিভে যেতে পারে। একমাত্র বিদ্যাশিক্ষায় শিশুর সাফল্য, আমি যে সামনের দিকে পদক্ষেপ করছি, জ্ঞানের দুরারোহ পথ বয়ে উপরে উঠছি — একমাত্র এই গর্বমিশ্রিত চেতনা ও উপলব্ধিই জ্ঞানতৃষ্ণার ক্ষীণ অগ্নিকণার পক্ষে সঞ্জীবনী বায়ুপ্রবাহস্বরূপ।

ব্যর্থ, নিষ্ফল শ্রম বয়স্কদের কাছে পর্যন্ত বিতৃষ্ণাজনক, হতবুদ্ধিকারী, অর্থহীন হয়ে দেখা দেয়, আর আমাদের কাজ ত শিশুদের নিয়ে। শিশু যদি তার শ্রমে সাফল্য না দেখতে পায় তাহলে জ্ঞানতৃষ্ণার অগ্নিকণা নিভে যায়, শিশুহৃদয়ে গড়ে ওঠে বরফের চাঁই, আর যতক্ষণ না অগ্নিকণা আবার জ্বলে উঠবে (দ্বিতীয় বার তা জ্বালিয়ে তোলা বড়ই কষ্টকর!) ততক্ষণ শত চেষ্টাতেও সে বরফ গলানো যাবে না; শিশু তার নিজের শক্তির উপর আস্থা হারায়, সে সতর্ক হয়ে পড়ে, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেয়, শিক্ষকের উপদেশ ও ভর্ৎসনার উত্তরে ঔদ্ধত্য দেখায়। কিংবা আরও খারাপ হয়: তার আত্মমর্যাদাবোধ ভোঁতা হয়ে যায়, তার যে কোন মুরোদই নেই এই ভাবনায় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মনটা ক্ষোভে-দুঃখে ভরে ওঠে যখন চোখের সামনে দেখা যায় এমন উদাসীন, গোবেচারা কোন শিশুকে, যে ধৈর্য ধরে ঝাড়া এক ঘণ্টাও শিক্ষকের

উপদেশ শুনতে রাজি, যার কাছে কোন অর্থই বহন করে না বন্ধুবান্ধবের কথা: তুই পিছিয়ে পড়া ছাত্র, তোকে আরও এক বছর এ ক্লাসে পড়ে থাকতে হবে। ...মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ দমন করার চেয়ে গর্হিত কাজ আর কীই বা হতে পারে!

শৈশবে ও কৈশোরে শিক্ষার্থী নিজের সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করে, শ্রমের জগতে নিজেকে সে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে তারই উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করছে তার নৈতিক চরিত্র। ক. উশিন্স্কি লেখেন যে প্রকৃতিগতভাবে মানসিক আলস্য শিশুর থাকে না, সে আত্মনির্ভর কার্যকলাপ পছন্দ করে, সব কাজ নিজে করতে চায়। শিশুদের পরিশ্রম করতে শেখানো উচিত, মানসিক শ্রম কাকে বলে, ভালো পরিশ্রম করার অর্থ কী তা ভাবতে, লক্ষ্য করতে, বুঝতে শেখানো উচিত। একমাত্র তখনই সাফল্যের জন্য নম্বর বসানো যেতে পারে। যে শিশু বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে কদাচ শ্রমের আনন্দ উপলব্ধি করে নি, বাধাবিপত্তি অতিক্রমের ফলে যে গর্ববোধ জাগে তা যে অনুভব করে নি সে হতভাগ্য। হতভাগ্য মানুষ আমাদের সমাজের পক্ষে বিরাট দুর্ভাগ্যজনক, হতভাগ্য শিশু — আরও একশ' গুণ বেশি দুর্ভাগ্যজনক। আমি মোটেই শৈশবের প্রতি করুণা দেখাতে বলছি না; শৈশবেই মানুষ যে অনেক সময় অলস হয়ে পড়ে, শ্রমকে ঘৃণা করে, নিজের পূর্ণ শক্তিতে পরিশ্রম করার চিন্তাকে পর্যন্ত তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, এতে আমি অশান্তি বোধ করি। কিন্তু শিশু কেন নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে? কারণ এই যে সে **শ্রমের আনন্দ** জানে না। শিশুকে এই সুখ দিন, সুখের মূল্য দিতে শেখান — তাহলেই সে আত্মসম্মানের মূল্য দিতে শিখবে, সে শ্রমকে ভালোবাসবে।

শিশুকে শ্রমের আনন্দ দেওয়া, বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্যের আনন্দ দেওয়া, তার হৃদয়ে গর্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা — এ হল শিক্ষার প্রথম অনুশাসন। আমাদের স্কুলগুলিতে হতভাগ্য শিশু থাকা উচিত নয় — থাকা উচিত নয় এমন কোন শিশু যে মনে মনে নিজেকে অক্ষম ভেবে মর্মপীড়া অনুভব করে। বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্য — শিশুর অভ্যন্তরীণ শক্তির একমাত্র উৎস, সে শক্তি বাধাবিপত্তি অতিক্রমের প্রেরণা শেখার ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে।

শিশুর যদি শিক্ষাগ্রহণের বাসনা না থাকে তাহলে আমাদের যাবতীয় সংকল্প, অনুসন্ধান, পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, নিষ্প্রাণ মমিতে পরিণত হয়। শিশুর শিক্ষাগ্রহণের বাসনা দেখা দেয় একমাত্র বিদ্যাশিক্ষায় তার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপারটা দাঁড়ায় যেন বিরোধাভাসের মতো: শিশু যাতে পেরে ওঠে তার জন্য দেখতে হবে সে যেন পিছিয়ে না পড়ে। কিন্তু এটা বিরোধাভাস নয়, এ হল মানসিক শ্রমপ্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বমূলক ঐক্য। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ একমাত্র তখনই দেখা যায় যখন থাকে জ্ঞানার্জনে সাফল্যজনিত প্রেরণা; প্রেরণা ছাড়া বিদ্যাশিক্ষা শিশুর কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আমার মতে, সাফল্যলাভের প্রতি শিশুর দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত যে প্রেরণা, তারই নাম অধ্যবসায়।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের মূল্যায়নের মতো আপাতসরল ব্যাপারটি হল প্রতিটি শিশু সম্পর্কে শিক্ষকের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতা, শিশুমনে জ্ঞানতৃষ্ণা লালনের ক্ষমতা। প্রাথমিক শ্রেণীতে ৪ বছর ধরে শিশুদের শিক্ষাদানের সময় আমি একবারও অসন্তোষজনক নম্বর দিই নি — না লিখিত উত্তরের জন্য, না মৌখিক উত্তরের জন্য। ছেলেমেয়েরা লিখতে

পড়তে শেখে, অঙ্ক কষতে শেখে। কোন বাচ্চা হয়ত তার মানসিক শ্রমের ক্ষেত্রে ভালো ফল অর্জন করছে, অন্যজন হয়ত এখনও সে পর্যায়ে পেঁছিুতে পারে নি। কেউ হয়ত শিক্ষক যা বোঝাতে চাইছেন তা চট্ করে ধরে ফেলছে, আবার কেউ হয়ত আপাতত তা ধরতে পারছে না; কিন্তু তার মানে এই নয় যে অন্য জনের শেখার কোন ইচ্ছে নেই। আমি মানসিক শ্রমের মূল্যায়নসূচক নম্বর দিই একমাত্র তখনই যখন তা শিশুর পক্ষে ভালো ফল সূচনা করে। শ্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যে ফলাফল লাভের চেষ্টা করছে তা যতক্ষণ সে অর্জন না করছে ততক্ষণ আমি তাকে কোন নম্বর দিই না। শিশুকে ভেবে দেখতে হবে, গুছিয়ে ভাবতে হবে, কাজটা আবার করতে হবে।

প্রথম শ্রেণীতে আমি প্রথম নম্বর দিলাম শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার ৪ মাস পরে। এখানে সর্বোপরি দেখা দরকার শিশু যেন বুঝতে পারে অধ্যবসায়মূলক, কঠোর শ্রম কাকে বলে। শিশুর ভালো ভাবে কাজ না করতে পারার কারণ এই নয় যে সে কাজ করতে চায় না, কারণ এই যে সে বুঝতে পারে না কোন্‌টা ভালো কোন্‌টাই বা মন্দ — কিসের জন্যই বা তাকে নম্বর দেওয়া হচ্ছে। আমি চেষ্টা করি শিশু যাতে একই কাজ কয়েকবার করার পর নিজের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে যে গোড়ায় যে ভাবে কাজটা সে করেছিল তার চেয়ে অনেক ভালো ভাবে সে তা করতে পারে। এর একটা বিরাট শিক্ষামূলক তাৎপর্য আছে: শিক্ষার্থী যেন নিজের মধ্যে সৃজনী শক্তির সন্ধান পায়; সে নিজের সাফল্য দেখে আনন্দ পায়, আরও ভালো করার চেষ্টা করে। নিজের উৎকৃষ্ট কাজকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কাজের সঙ্গে তুলনা করে শিশু অনুপ্রাণিত হয়।

প্রথম শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে শিশুরা একই ধারায় ভাবে না, নিজেদের শ্রমের বিভিন্ন রকম মূল্যায়ন তারা করে থাকে। ওরা 'বোলতা' শব্দটি লিখল। সেরিওজা, কাতিয়া, সানিয়া ও পাভেলের লেখা অক্ষরগুলো সুন্দর, গোটা গোটা। ইউরার লেখা লাইন থেকে বেরিয়ে গেছে, একপাশে বেঁকে গেছে; কোলিয়া আর তোলিয়া লিখছে না, তারা আঁকছে, তাদের অক্ষরগুলো যেখানে তারা প্রকৃতি সম্পর্কে নিজেদের প্রথম রচনা লেখে সেই ছবির বইয়ে আঁকা অক্ষরের মতো। পেত্রিকের খাতায় যেন কতকগুলো আঁকশি। আমি তখনও পরের অনুশীলন ধরি না। বাচ্চারা আরও কয়েকবার ঐ একই শব্দ লেখে। একই কাজ বারবার নতুন নতুন ভাবে আবৃত্তি করা যেন শিশুর উপরে ওঠার একেকটি নতুন সোপান — যারা ভালো লিখেছে তাদের যেমন, তেমনি যারা খারাপ লিখেছে তাদেরও বটে। শিশু আনন্দিত, সুখী এই ভেবে যে গোড়ায় যেমন চলছিল এখন তার চেয়ে ভালো কাজ চলছে।

এই আনন্দের মধ্যেই জন্মলাভ করে গর্ববোধ, আত্মমর্যাদাবোধ। শিশু বহুবার এই অনুভূতিলাভের পর এখন আর সহজ পথের সন্ধান করে না, অপরের শ্রমের ফলাফল কাজে লাগায় না। ছেলেমেয়েরা যখন কাজ বারবার সংশোধন করতে শিখেছে, যখন তারা এর মধ্যে আনন্দের অনুভূতি, আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে একমাত্র তখন আমি তাদের নম্বর দিতে শুরু করি — বলাই বাহুল্য, শুধু ভালো ফলের জন্য। কোন কোন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়াশুনা শুরু হওয়ার ৪ মাস বাদে নম্বর পেতে লাগল, কেউ কেউ পেতে লাগল ৬ মাস বাদে। পেত্রিক ও মিশা প্রথমে নম্বর পেল কেবল দ্বিতীয়

শিক্ষাবর্ষের শুরুতে। তাদের সঙ্গে আমাকে অতিরিক্ত কাজ করতে হত, আমি চেষ্টা করি শিশুরা যেন গতকালের চেয়ে আজ অন্তত খানিকটা ভালো কাজের পরিচয় দেয়, তারা যেন নিজেদের শক্তির উপর আস্থা না হারায়।

শিক্ষার অর্থ এই নয় যে শিক্ষক যান্ত্রিক ভাবে শিক্ষার্থীকে জ্ঞান অর্পণ করেন, শিক্ষা হল সর্বোপরি মানবিক সম্পর্ক। জ্ঞানের প্রতি, শিক্ষার প্রতি শিশুর সম্পর্ক বহুল পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকের সঙ্গে তার আচরণের উপর। শিক্ষার্থী যদি অনুভব করে যে শিক্ষকের আচরণ অন্যায় তাহলে সে আঘাত পায়। আর অসন্তোষজনক নম্বর দেওয়াটাকে ছোট ছেলেমেয়েরা সবসময়ই অন্যায় বলে মনে করে, এতে তারা গভীর বেদনা অনুভব করে, কেননা শিশু লেখাপড়া শিখতে অনিচ্ছুক এমন প্রায় কখনই ঘটে না। সে শিখতে চায়, কিন্তু পারে না, যেহেতু তার এখনও মনঃসংযোগের ক্ষমতা নেই, নিজেকে জোর করে কাজে লাগানোর ক্ষমতা নেই।

একদিন, দু'দিন এমনি করে যদি সারা বছর ধরে শিশু অন্যায় আচরণ অনুভব করে তাহলে তার স্নায়ুব্যবস্থা গোড়ায় উত্তেজিত হয়, পরে হয় তার গতিরোধ — দেখা দেয় বিষণ্ণতা, অবসাদ, অনীহা। উত্তেজনা ও গতিরোধ — এই আকস্মিক উল্লম্ফনের ফলে শিশু পীড়িত হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত এই পীড়ার নাম — স্কুল-নিউরসিস অথবা ডিডাক্‌টোজেনিয়া। ডিডাক্‌টোজেনিয়ার আপাত স্ববিরোধিতা এখানেই যে এ রোগ হয় একমাত্র স্কুলে — সেই পবিত্র স্থানে যেখানে মনুষ্যত্ব হওয়া উচিত শিশু ও শিক্ষকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নির্ধারক, পরম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব।

ডিডাক্টোজেনিয়ার উদ্ভব — অন্যায় আচরণ থেকে। শিশুর প্রতি মা-বাবার কিংবা শিক্ষকের অন্যায় আচরণের অনেক রকমফের আছে। সর্বোপরি উল্লেখ করতে হয় ঔদাসীন্যের। শিশুর নৈতিক শক্তি ও ইচ্ছাশক্তি গড়ে ওঠার পক্ষে তার উন্নতির প্রতি শিক্ষকের উদাসীনতার চেয়ে বিপজ্জনক আর কিছুই নেই। তারপর আছে চিৎকার-চেঁচামেচি, হুম্‌কি, বিরক্তি; আর শিক্ষাতত্ত্বের জ্ঞান যাদের নেই তাদের মধ্যে অনেক সময় প্রকাশ পায় হিংস্র উল্লাস: তুই কিছুই জানিস না, খাতাটা এদিকে নিয়ে আয় দেখি, গোল্লা বসিয়ে দিই, মা-বাবা দেখে মুগ্ধ হোন তাঁদের ছেলে কেমন...

আমি কয়েক বছর ধরে স্কুল-নিউরসিসের উপর অনুসন্ধান চালাই। শিক্ষকের অন্যায় আচরণের দরুন কোন কোন শিশুর স্নায়ুব্যবস্থার উপর পীড়াজনক প্রতিক্রিয়া উত্তেজনার আকার ধারণ করে, কারও কারও ক্ষেত্রে অন্যায় আঘাত ও নির্যাতনভোগের বাতিকে পরিণত হয়, কারও কারও মধ্যে প্রকাশ পায় তিক্ততা, কেউ কেউ হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক রকম ভাবনাচিন্তাহীন, কেউ কেউ হয়ে পড়ে নিরাসক্ত, অত্যন্ত মনমরা, কেউ শাস্তির ভয় পায়, শিক্ষকের সামনে, স্কুলের নামে ভয় পায়, কেউ কেউ ভেঙচানো ও ভাঁড়ামির আশ্রয় নেয়, কারও কারও মধ্যে দেখা দেয় নিষ্ঠুরতা, যা অনেক সময় (কদাচিৎ হলেও অবজ্ঞা করা যায় না) বিকারের রূপ ধারণ করে। ডিডাক্টোজেনিয়ার নিবারণ নির্ভর করে শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে মা-বাবা ও শিক্ষকের জ্ঞানের উপর। শিক্ষাতত্ত্বসংক্রান্ত জ্ঞানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত প্রতিটি শিশুর মনোজগৎ **উপলব্ধির** ক্ষমতা, শিশু যাতে অনুভব করতে পারে যে তার কথা কেউ ভুলে যাচ্ছে না, অন্যেরা তার দুঃখ, মনোবেদনা ও

কষ্টের ভাগ নিচ্ছে সেজন্য প্রত্যেকের প্রতি যতটা আবশ্যক মনোযোগ ও অন্তরের শক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা।

শিশুর কাছে, শিক্ষকের দিক থেকে সবচেয়ে বড় অন্যায় আচরণ এই যে শিশুর দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী, শিক্ষকমশাই তাকে অন্যায় ভাবে খারাপ নম্বর ত দেনই তারপর আবার এমন চেষ্টারও কসুর করেন না যাতে এই নম্বরের জন্য মা-বাবা তাকে শাস্তি দেন। শিশু যদি দেখতে পায় যে শিক্ষক গোল্লা পাওয়ার সংবাদ ওর মা-বাবাকে অবশ্যই জানাতে আগ্রহী তখন শিক্ষক ও বিদ্যালয় — দুয়ের উপরই তার ক্রোধ এসে পড়ে। মানসিক শ্রম তার কাছে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য লোকের সঙ্গে, সর্বোপরি মা-বাবার সঙ্গে আচরণে প্রকাশ পায় তার রুঢ়তা।

শিশুর প্রতি অন্যায় আচরণের ফলে যে অনুভূতিহীনতার উদ্ভব ঘটে, শিশুহৃদয়ের তার চেয়ে বড় বিকৃতি ধারণায় আনা কঠিন। শিশু তার প্রতি আচরণে ঔদাসীন্য অনুভব করে ভালো-মন্দের প্রতি সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। সে বুঝে উঠতে পারে না তার আশেপাশের কোন লোক ভালো, কেউ বা মন্দ। তার মনের মধ্যে লোকজন সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস বাসা বাঁধে, আর এটা হল নির্দয়তার প্রধানতম উৎস।

শিক্ষকতায় প্রধানতম উৎসাহদান ও সবচেয়ে বড় শাস্তি (কিন্তু তা সবসময় কাজে দেয় না) — নম্বর দেওয়া। এটা খুবই ধারাল অস্ত্র, এ অস্ত্র প্রয়োগের জন্য বড় রকমের দক্ষতা ও মার্জিত রুচির দরকার।

এই অস্ত্র প্রয়োগের অধিকারী হতে গেলে সর্বোপরি ভালোবাসতে হয় শিশুকে। সে ভালোবাসার কথা তাকে বলার দরকার নেই, ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয় তার প্রতি যত্নের

মধ্য দিয়ে। 'শিক্ষকের যদি কেবল কাজের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে তিনি ভালো শিক্ষক হবেন। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের যদি কেবল মা'র মতো, বাবার মতো ভালোবাসা থাকে তাহলে যে শিক্ষক সমস্ত বই পাঠ করা সত্ত্বেও না ভালোবাসেন কাজকে, না শিক্ষার্থীদের, তার চেয়ে ভালো শিক্ষক তিনি হবেন — হবেন নিখুঁত শিক্ষক,' একথা লেখেন লেভ তলস্তয়।

হৃদয়ের সংবেদনশীলতা — এ হল এমন এক গুণ যা কেবল বিদ্যানুশীলনের দ্বারা অর্জন করা অসম্ভব। শিক্ষাব্রতীর মানবিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিস্বরূপ আছে বুদ্ধিবৃত্তি, নীতি, নন্দনতত্ত্ব ও আবেগ-অনুভূতি চর্চার সুসমঞ্জস সাধারণ ঐক্য, আর এই ঐক্য অর্জিত হয় সমষ্টিতে নৈতিক সম্পর্ক চর্চার মধ্যে যেমন, তেমনি সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যেও বটে। শিক্ষককে জানতে হবে, অনুভব করতে হবে যে তারই বিবেকবুদ্ধির উপর নির্ভর করছে প্রতিটি শিশুর ভাগ্য, তারই মানস-সংস্কৃতি ও ভাবসম্পদের উপর নির্ভর করছে বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবিবেচনা, স্বাস্থ্য, সুখ।

...দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণের পাঠ। নিয়মশিক্ষা আর অনুশীলনী অনুধাবনের পর ছেলেমেয়েরা নিজে নিজে কাজ করে, তার উদ্দেশ্য — জ্ঞানের গভীরতা সাধন, সেই সঙ্গে যাচাই করে দেখা। কাজের ফলাফল বিচার করে নম্বর দেওয়া হয়। খাতা পরীক্ষা করার পর আমি দেখতে পাই যে মিশা ও পেত্রিকের উত্তর খারাপ হয়েছে। আমি যদি খারাপ নম্বর দিই তাহলে যারা মনেপ্রাণে ভালো মতো পড়াশুনা করতে চায় তারা এটাকে গ্রহণ করবে বিচারের রায় বলে, অর্থাৎ 'তোমাদের বন্ধুরা এক পা এগিয়ে গেল কিন্তু তোমরা যেখানকার

সেখানেই রয়ে গেলে।' ভুল সংশোধনের পর আমি মিশা ও পেত্রিককে সুন্দর লেখার নমুনা দেখিয়ে দিলাম, কিন্তু ওদের কোন নম্বর দিলাম না। খাতা বিতরণ করার সময় ছেলেমেয়েদের বললাম:

'মিশা আর পেত্রিক এখনও নম্বর আয় করতে পারে নি। তোমাদের ভালো করে খাটতে হবে। নিজে নিজে অন্য অনুশীলনী কর। নম্বর আয় করার চেষ্টা কর।'

অসন্তোষজনক কাজের জন্য যে নম্বর নেই ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের চেতনায় ধীরে ধীরে এই দৃঢ় বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে তাদের দেওয়া উত্তর কোন অতিক্রান্ত পর্যায় নয়, যার সমাপ্তি ঘটে শিক্ষকের চূড়ান্ত 'রায়দানে'। শিশুর সামনে সাফল্যের দ্বার অবরুদ্ধ থাকে না: সে যা করতে পারে নি তা ভবিষ্যতে করবে, এমন কি কাল, হয়ত বা আজই করবে। শিশু যেমন অসন্তোষজনক নম্বর পাওয়ার পর নিজেকে বন্ধুবান্ধব থেকে পশ্চাৎপদ বলে মনে করে, মিশা ও পেত্রিক কিন্তু নিজেদের সে ধরনের দণ্ডিত ভাবে না। এখানে, পাঠের সময়ই ওরা বলে, 'আমাদের কাজ দিন।' আমি দিই। স্কুলের কর্মদিনের মধ্যে ওরা অনুশীলনীর উত্তর দেওয়ার সময় করে নেয় (আমাদের স্কুলে কাজের ঘণ্টা এমন ভাবে ঠিক করা যে অগ্রগণ্য অনুশীলনী তৈরি করার মতো আধঘণ্টা সময় প্রত্যহ প্রতিটি শিক্ষার্থীরই হাতে থাকে)। ছেলে দুটি সর্বশক্তি নিয়োগ করে নম্বর আয় করার পেছনে, প্রমাণ করতে চায় যে ওরা অন্যদের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। ওদের কাজ পরীক্ষা করে দেখি — এমন ক্ষেত্রে প্রায়শই যা হয়ে থাকে — ভালো নম্বর পাওয়ার উপযোগী কাজ হয়েছে।

পাঠ্যবিষয়ের উপর প্রশ্নের উত্তর যেখানে সৃজনশীল বুদ্ধি,

ভাবনাচিন্তা ও অনুসন্ধানকর্মের দাবি নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে শ্রমের প্রেরণাদাতা হিশেবে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারও কারও মননক্রিয়ার গতি তীব্র, প্রখর, কারও বা — মন্থর, কিন্তু তার মানে এই নয় যে একজন আরেকজনের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, কিংবা অন্য জনের চেয়ে বেশি খাটে। শিশুকে মানসিক শ্রমজনিত সাফল্যের আনন্দদান, তার গর্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন — এই মর্মে শিক্ষার যে প্রাথমিক অনুশাসন আছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অঙ্কের ক্লাস, অংক কষা হল তার কষ্টিপাথর। দেখতে হবে গোড়ার অসুবিধাগুলি যেন শিশুর পথের কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়। শিশু যতক্ষণ না নিজে নিজে ভাবতে শিখছে, প্রশ্নের পরিস্থিতিগুলি বুঝতে, সমস্যা পূরণের পথ সন্ধান করতে শিখছে — অর্থাৎ, যতক্ষণ না এই শ্রমে সাফল্যের আনন্দ অনুভব করতে পারছে, ততক্ষণ অনুশীলনীর উত্তর দেওয়ার জন্য আমি কোন নম্বর দিতাম না। এখানে আরও একটি গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ভাবে পরিহার করতে হবে: একজন এক মাসে অঙ্কে তিন বার নম্বর পেতে পারে, আরেকজন হয়ত একবারও পেল না; তার মানে কিন্তু এই নয় যে দ্বিতীয় শিক্ষার্থীটি কোন কাজই করছে না, তার কোন উন্নতি হচ্ছে না। সে আসলে প্রশ্ন বুঝতে শিখছে, আর অপেক্ষাকৃত জটিল যে অংকটি শিক্ষার্থী নিজে কষল তা শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সোপান।

যে-সমস্ত শিক্ষার্থী গণিতে পেরে ওঠে না বহু বছর যাবৎ মনোযোগ দিয়ে তাদের লক্ষ্য করার পর আমার এই ধারণা হয়েছে যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীগুলিতে পিছিয়ে-পড়া ছেলেমেয়েরা কখনও একটি অংকও নিজে কষে না। তারা যেন

স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, তাদের বন্ধুরা ইতিমধ্যে যে জায়গায় পা ফেলেছে সেখানেই পদক্ষেপ করে: ব্ল্যাকবোর্ড থেকে কিংবা পাশের কারও কাছ থেকে তৈরি উত্তর টুকে নেয়, কিন্তু আসলে নিজে নিজে উত্তর বার করা কাকে বলে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই তাদের নেই।

শিক্ষাতত্ত্বমূলক কৌশল উৎকর্ষসাধনের কোন প্রণালী অনুসন্ধানের সাহায্যে এই ক্ষতি দূর করা যায় না। গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নকালে মানসিক শ্রম — মননক্রিয়ার কষ্টিপাথরস্বরূপ। ক্ষতির কারণ এই যে শিশু ভাবতে শেখে নি; পারিপার্শ্বিক জগৎ, তার বস্তু ও ঘটনা, নির্ভরতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক শিশুর কাছে চিন্তার উৎস হয়ে দেখা দেয় নি। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অতি শৈশবেই 'নিসর্গপর্যটন' যদি মানসিক শ্রমের প্রকৃত পাঠশালা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে গণিতের ক্লাসে পেরে না ওঠার মতো একজনও থাকবে না। বস্তু শিশুকে ভাবতে শেখাবে — সমস্ত স্বাভাবিক শিশুই যাতে বুদ্ধিমান, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন, অনুসন্ধিৎসু, কৌতূহলপ্রবণ হয় এটা তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমি শিক্ষকদের পরামর্শ দিই: শিক্ষার্থী যদি কোন জিনিস বুঝতে না পারে, যদি তার চিন্তা খাঁচার পাখির মতো অসহায় ভাবে ছটফট করতে থাকে তাহলে মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ লক্ষ্য করে দেখুন; আপনার শিক্ষার্থীর চেতনা কি চিন্তার অনন্ত ও প্রাণদায়ক প্রাথমিক উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন — প্রকৃতির বস্তুজগৎ ও ঘটনাজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক শুকনো, ছোট সরোবর হয়ে পড়ে নি? প্রকৃতি ও বস্তুর, পারিপার্শ্বিক জগতের মহাসাগরের সঙ্গে এই ছোট সরোবরটির সংযোগ ঘটান, তাহলেই দেখতে পাবেন প্রাণোচ্ছল চিন্তার উচ্ছ্বাস।

কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগৎ নিজেই শিশুকে ভাবতে শেখাবে— এমন মনে করা ঠিক হবে না। তত্ত্বধর্মী মননক্রিয়া না থাকলে নিবিড় প্রাচীর বস্তুকে শিশুদের চোখ থেকে আড়াল করে রাখবে। প্রকৃতি মানসিক শ্রমের পাঠশালা হয় একমাত্র তখনই যখন শিশু তার পারিপার্শ্বিক বস্তুপুঞ্জ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়, বিমূর্ত কল্পনা করে। শিশু যাতে পারস্পরিক ক্রিয়াকে পারিপার্শ্বিক জগতের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হিশেবে উপলব্ধি করতে শেখে তার জন্য বাস্তবের সুস্পষ্ট রূপ অবশ্যপ্রয়োজনীয়। পারস্পরিক ক্রিয়া যে বিদ্যমান সব কিছুর চূড়ান্ত কারণ (causa finalis), হেগেলের এই মত সমর্থন করে এঙ্গেলস লিখেছেন: 'আমরা এই পারস্পরিক ক্রিয়া জানার চেয়ে আর দূরে এগোতে পারি না, ঠিক এই কারণেই যে তার পেছনে জানার আর কিছুই নেই।' বিমূর্ত মননক্রিয়ার সরাসরি প্রস্তুতিস্বরূপ পারস্পরিক ক্রিয়ার উপলব্ধি — গাণিতিক মননক্রিয়া বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। শিশুরা বস্তুপুঞ্জের, ঘটনাসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া দেখতে শিখেছে কিনা তার উপর নির্ভর করছে সমস্যা সমাধানে তাদের সাফল্য।

অনুশীলনী সমাধানকালে স্বাধীন মানসিক শ্রম তখনও ফলদায়ক হয় যখন শিশুর স্মৃতিতে সাধারণীকরণ (নামতা, সংখ্যার স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস) স্থায়ী ও দৃঢ়বদ্ধ হয়।

পেত্রিক দীর্ঘদিন অঙ্কের প্রশ্নের অর্থ ধরতে পারত না। আমি ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করলাম না। বড় কথা হল সে যেন নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে বস্তু ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কের মর্ম উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু তত্ত্বধর্মী মননক্রিয়ার জন্য শিশুর যদি প্রস্তুতি না থাকে, তার যদি তুলনা করার, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে প্রাণোচ্ছল

চিন্তা উচ্ছ্বসিত হতে পারে না। আমি ওদের প্রকৃতির বুকে নিয়ে গেলাম, লক্ষ্য করতে, বিভিন্ন বস্তু, গুণ ও ঘটনার মধ্যে তুলনা করতে বারবার শেখালাম — পারস্পরিক ক্রিয়া দেখতে শেখালাম। পারিপার্শ্বিক জগতের যে-সমস্ত ঘটনা বস্তুসমূহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণরূপে শিশুচৈতন্যে আয়তন ও সংখ্যার ধারণা গড়ে তোলে আমি সেগুলির দিকে পেত্রিকের মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। চেষ্টা করলাম যাতে শিশু সংখ্যার তাৎপর্য বুঝতে পারে, যাতে তার প্রত্যয় হয় যে সংখ্যা কারও কল্পিত ব্যাপার নয়, সংখ্যার বাস্তব অস্তিত্ব আছে। শিশু সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা দিয়ে হিসাব করতে শিখল কি শিখল না এখানে তা বড় কথা নয় — সব চেয়ে বড় কথা হল সংখ্যানির্ভরতার সারমর্ম যেন সে অনুধাবন করতে পারে।

আমরা তরমুজখেতে কুটিরে বসে বসে লক্ষ্য করি কী ভাবে কম্বাইন গম সংগ্রহ করছে। থেকে থেকে কম্বাইন থেকে শস্যবোঝাই গাড়িটা দূরে সরে যাচ্ছে। কম্বাইনের বাঙ্কার কত মিনিটে ভর্তি হচ্ছে? শিশুরা আগ্রহ ভরে ঘড়ির দিকে তাকায়, দেখা যাচ্ছে — ১৭ মিনিটে। লোকে তাদের কাজ কিনা এমনই সময়মাফিক করছে যে কম্বাইনকে থামতেই হচ্ছে না! বাঙ্কার ভর্তি হতে বাকি আছে ৫ মিনিট, ৪ মিনিট, ৩ মিনিট — শিশুরা উদ্‌গ্রীব: কম্বাইনকে হয়ত শেষ পর্যন্ত থামতেই হবে। ২ মিনিট বাকি, সঙ্গে সঙ্গে বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে গাড়ি। মজুতের জায়গায় যেতে গাড়ির লাগে পুরো এক ঘণ্টা। তার মানে, লোকে দূরত্ব ও সময়ের মধ্যে নির্ভরতা হিসাব করে দেখেছে। শস্য নিয়ে যাওয়ার জন্য ঠিক ততগুলি গাড়ি রেখেছে যতগুলি দরকার কম্বাইনের নিরন্তর কাজ করার জন্য। মজুতের জায়গায় যেতে গাড়ির যদি এক ঘণ্টা সময়

না লেগে লাগত দু'ঘণ্টা তাহলে শস্য বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশি গাড়ি লাগত, না কম গাড়ি লাগত?

'বেশিই ত লাগত,' পেত্রিক বলল, তার চোখজোড়া সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'এখন ত রাস্তায় সবসময় চলছে তিনটে গাড়ি, একটা ভর্তি হচ্ছে, আরেকটা মজুতের জায়গায় খালি হচ্ছে। পথ যদি আরও দূরের হত তাহলে আরও বেশি গাড়ি পথে চলত।'

শিশু প্রবল মানসিক প্রয়াস প্রয়োগ করছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে সে ইতিমধ্যে ভাবতে বসেছে পথ দ্বিগুণ বড় হলে কটা গাড়ি দরকার। কিন্তু এটা এখন বড় কথা নয়। বড় কথা হল এই যে সে যেন বুঝতে পারে সমস্যা জিনিসটি নিষ্কর্মা লোকজনের মনগড়া নয়। সমস্যা নিহিত থাকে পারিপার্শ্বিক জগতের মধ্যে, যেহেতু গতি, জীবন, মানবশ্রমের অস্তিত্ব আছে।

পেত্রিক ইতিমধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেছে, কিন্তু অংক এখনও সে কষতে পারে না। এখনও সে নিজে — বন্ধুবান্ধব কিংবা শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া একটা অংকও কষতে পারে নি। আমি এতে উদ্বেগ বোধ করি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ও ভাবতে শিখবে। অংকের সমস্যার বনিয়াদ হল মনে মনে ঘটনার বিশ্লেষণ। আমি কেবল সেই পথেই যে তাকে বিমূর্ত ভাবনার তালিম দিই তা নয়। যে চিন্তা করে কিন্তু গুণতে পারে না, তার পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। যে দিকে দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল পেত্রিকের স্মৃতিতে যেন এমন কতকগুলি প্রাথমিক বস্তুর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটে যেগুলি ছাড়া মননক্রিয়া অসম্ভব। বালক 'অংকের পেটরা' নিয়ে বসে থাকে, তালিম নেয়, নিজের জ্ঞান যাচাই করে। আমি মন দিয়ে লক্ষ্য করি যাতে সে ১২–৮, ১৯+১৩, ৪১–১৯ কত হয় এই নিয়ে

মাথা না ঘামায় (তৃতীয় শ্রেণীতে শিক্ষার্থী যদি এই নিয়ে মাথা ঘামায় তাহলে অঙ্ক সে বুঝতে পারবে না)।

জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে প্রায়ই শিক্ষার্থী বীজগণিতের সামনে অসহায় হয়ে পড়ে কেবল এই কারণে যে সংখ্যার স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস সে এমন পর্যায়ে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি যাতে প্রাথমিক বস্তু নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে নিজের সমস্ত বুদ্ধিবল বিমূর্ত চিন্তার উদ্দেশে পরিচালনা করতে পারে। যে-সমস্ত সিলেব্‌ল নিয়ে শব্দ গঠিত শিশু যদি হাজার হাজার বার তা না পড়ে থাকে তাহলে পাঠ যেমন আধা-স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া হতে পারে না, তেমনি বিমূর্ত গণিতচিন্তাও শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে থেকে যায় যদি সে হাজার হাজার এমন সমস্ত উদাহরণ মনে না রাখতে পারে যেগুলি নিয়ে লোকে প্রাত্যহিক জীবনে কখনই ভাবনায় পড়ে না, কেননা তাদের জবাব চিরকালের মতো মনে গাঁথা হয়ে আছে। আমি চেষ্টা করি যাতে ভাবনার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রীরা, সর্বোপরি পৈত্রিক যত বেশি পরিমাণ সম্ভব গণিতধর্মী চিন্তার অতি সরল উপকরণ — যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের দৃষ্টান্ত আয়ত্তে আনতে পারে।

আমরা প্রকৃতির বুকে ভ্রমণ করতে যাই, আমি বালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এমন সব সমস্যার প্রতি যেগুলি লোকে শ্রমের সময় সমাধান করে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সত্য প্রমাণিত হল, অবশেষে পৈত্রিক কারও সাহায্য ছাড়াই নিজে নিজে অঙ্ক কষে ফেলল। ওর চোখে খুশির ঝলক দেখা দিল, ও অঙ্কের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্যাখ্যা করতে লাগল, ব্যাখ্যা গোলমেলে ধরনের, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম যে এতদিন যা শিশুর কাছে অন্ধকারে ঢাকা ছিল শেষ পর্যন্ত সে জিনিস তার সামনে

উদ্ঘাটিত হয়েছে। পেত্রিক খুশি। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম: শেষকালে হল তা হলে। পাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত ছেলেটা আর অপেক্ষা করতে পারে না, আনন্দের ভাগ মাকে দেওয়ার জন্য বাড়িতে ছুটে গেল। মা বাড়িতে ছিলেন না। 'আমি নিজে অঙ্ক কষেছি,' আনন্দে সে দাদুকে বলল। পেত্রিক তার সাফল্যের জন্য গর্বিত, আর খাঁটি নৈতিক গর্ব — মানবিক মর্যাদাবোধের উৎস। নিজের শ্রমের জন্য গর্ব ছাড়া খাঁটি মানুষের অস্তিত্ব নেই।

এই ঘটনাটি আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে গভীর ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। যে সব ছেলেমেয়ে পড়াশুনা সহজে আয়ত্তে আনতে পারে না তাদের আমরা অন্য আলোকে দেখলাম। বাচ্চাটার কিছুই হবে না, এটাই ওর ভাগ্য — চটপট এমন চূড়ান্ত ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করে বসা কখনই উচিত নয়। এক বছর, দু'বছর, এমন কি তিন বছর হয়ত কোন ফলই সে দেখাতে পারছে না, কিন্তু এমন এক সময় আসবে যখন পারবে। চিন্তা যেন ফুলের মতো তিলে তিলে প্রাণরস সঞ্চয় করে। গাছের মূলকে এই রস দিতে হবে, ফুলের সামনে প্রকাশ করতে হবে সূর্যের আলো, তবেই ফুল ফুটবে। শিশুকে ভাবতে শেখাতে হবে, তার সামনে খুলে ধরতে হবে ভাবনার প্রাথমিক উৎস — পারিপার্শ্বিক জগৎ। তাকে দিতে হবে পরম মানবিক সুখ — উপলব্ধির আনন্দ।

বস্তুর, বিষয়ের সুনির্দিষ্ট গণনা থেকে, ঘটনাসমূহের অন্তর্বর্তী প্রত্যক্ষ, সরাসরি নির্ভরতা থেকে বিমূর্ত সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে — নিয়ম ও সূত্রের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কী করে উপনীত করা যায় — শিক্ষার এই তীব্র ও কঠিন সমস্যা নিয়ে বিশেষ করে ভাবার উদ্দেশে আমরা, প্রাথমিক

শ্রেণীগুলিতে যারা পড়াই সেই সব শিক্ষক বহু দিন সন্ধ্যায় সমবেত হই। আমরা কৌতূহলজনক ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রমাণ করি যে সব শিশুর ক্ষেত্রেই এই উত্তরণ পর্বটি স্বচ্ছন্দ ও মধুর নয়। এমন এমন শিক্ষার্থী আছে যারা হিসাবে পাকা হলেও অঙ্কের প্রশ্নের বিষয়বস্তু সহজে ধরতে পারে না। কোন কোন শিশু সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট, প্রত্যক্ষ বর্গের সাহায্যে চিন্তা করে বলে তাদের বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হয় যেসব নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে অঙ্কের প্রশ্নটা গড়ে উঠেছে তা থেকে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন করার। যেমন, কোন কোন ছেলেমেয়ে অঙ্কের প্রশ্ন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে উত্তর খুঁজতে: শুরু করে হিসাব করতে, অথচ বোঝার চেষ্টা করে না কিসের হিসাব করছে, কেনই বা করছে।

এ রকম ছেলেমেয়ে আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি। আমরা পরামর্শ করতাম কোন্ পথে মূর্ত চিন্তা থেকে বিমূর্ত চিন্তায় তাদের নিয়ে যাওয়া যায়। আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে অঙ্কের প্রশ্নের উপরই ধাপে ধাপে অনেকগুলি কাজ করা অত্যাবশ্যক — প্রশ্নের শর্তগুলি বিবেচনা করা উচিত, সংখ্যা ছাড়া, আঙ্কিক ক্রিয়া ছাড়া সমস্যার সমাধান করা উচিত। শিশুরা কী ভাবে অঙ্কের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে, বিনা গণনায় সমস্যার সমাধান করে তা দেখানোর বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা অঙ্কের খোলাখুলি পাঠ চালাতে লাগলাম। একে অন্যের ক্লাস দেখার মধ্য দিয়ে আমরা বিশেষ বিশেষ ছেলেমেয়ের মানসিক বিকাশের পথ খুঁজতাম।

মনে রাখতে হবে নম্বর যেন শিশুর কাছে বেড়ি হয়ে দেখা না দেয়, তার চিন্তাকে বেড়ি দিয়ে না রাখে। সবচেয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীকে, চিন্তার ক্ষেত্রে যাকে নৈরাশ্যজনক দীর্ঘসূত্রী বলে

মনে হয় তেমন শিক্ষার্থীকে আমি সবসময়ই সুযোগ দিতাম যাতে আপাতত যে ব্যাপারে তার ফলোদয় হচ্ছে না, তা নিয়ে সে ভাবতে পারে। পড়াশুনার প্রতি ছেলেমেয়েদের আগ্রহ কখনও কমতে দেখি নি। গর্ববোধ, আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন ঘটিয়ে আমি চেষ্টা করি যাতে শিশু নিজে কাজ করতে আগ্রহী হয়।

শিশুকে ভাবতে দেওয়া... — আপাতদৃষ্টিতে কাজটা সহজ বলে মনে হলেও মোটেই তেমন নয়। প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মানসিক শ্রম ভালোমতো লক্ষ্য করে দেখুন— দেখতে পাবেন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই (বলা যায়, প্রায় সবসময়ই) শিশু আপনার প্রশ্নের উত্তর দিল না (কিংবা অনুশীলনী পূরণ করল না) স্রেফ এই কারণে যে সে ভাবার অবকাশ পায় নি, মনঃসংযোগের অবকাশ পায় নি (আবার কখনও কখনও এমনও হয় যে প্রশ্নটা হয় আচম্‌কা, শিশুকে যেন বিহ্বল করে দেয়)। শিশুকে কী করে ভাবার অবকাশ দেওয়া যায় এ সম্পর্কে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে আমরা, প্রাথমিক শ্রেণীগুলির শিক্ষকেরা বিশেষ করে সমবেত হতাম। আমরা সিদ্ধান্তে এলাম যে শিশু জানে কি জানে না এই ব্যাপারে চট করে কোন সিদ্ধান্ত করে বসা ঠিক নয়। প্রায়ই এমন হয় যে শিক্ষক হয়ত শিশুকে বললেন: ‘বসে পড়, জানিস না!’ শিশু হয়ত বসে পড়ল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার মাথায় সব ব্যাপারটা ‘পরিষ্কার হয়ে উঠল’ — দেখা গেল সে সবই জানে। ...শিক্ষকের ওপর তার বড় রাগ হল। এমন কেন ঘটে? আমরা সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নের উত্তর বার করতে পারলাম না। অসংখ্য বার অনুসন্ধান করে দেখার দরকার ছিল, দরকার ছিল অসংখ্য ঘটনা বিশ্লেষণ করার।

যে শিশু প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়ে লক্ষ্য অর্জন করেছে, খেই ধরে উত্তর দেওয়া, নকল করা ও টোকাটুকির প্রতি তার বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। আমার এবং আমার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বদা পারস্পরিক বিশ্বাস ও হিতাকাঙ্ক্ষার মনোভাব ছিল। বহু মাথা ঘামিয়েও কোন অনুশীলনীর উত্তর দিতে না পারলে শিক্ষার্থী সেকথা আমাকে বলতে ভয় পেত না। শিশুরা তাদের সমস্ত সন্দেহ, আনন্দ ও বেদনা শিক্ষকের গোচরীভূত করত। শিশুর কাছে আমি কখনই শোকের বার্তাবহ ছিলাম না, কেননা অসন্তোষজনক নম্বরই তার কাছে নিদারুণ দুঃখজনক। শিক্ষক যদি প্রায় প্রতিদিনই শিশুকে বলেন: 'তুই গোল্লা পেয়েছিস,' তখন শিশুমনে কী বিতৃষ্ণাই না জন্মায়! শিশু সামান্যতম আঘাতেই দুঃখ পায়। ট্র্যাজেডি জটিল আকার ধারণ করে তখনই যখন খুদে মানুষটি নিজের দুঃখে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে উঠতে শেষকালে আশেপাশের সবকিছুর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে, তার হৃদয় কঠিন হতে থাকে। আর কঠিন হৃদয় — নিষ্ঠুরতার অনুকূল জমি। ক্লাসে যদি হতভাগ্য ছেলেমেয়ে থাকে এবং বন্ধুবান্ধব যদি তাদের দুর্ভাগ্যের ভার লাঘব করতে সচেষ্ট না হয় তাহলে কখনও সৌহার্দপূর্ণ, হিতাকাঙ্ক্ষী ছেলেমেয়েদের ভালো পরিমণ্ডলী গড়ে উঠবে না।

কিন্তু নম্বর দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাথায় তোলাও ঠিক নয়, অথচ এই ব্যাপারটি স্কুলগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়। শিশু হয়ত একটা শব্দ বলল — সঙ্গে সঙ্গে ভালো নম্বর। অনেক সময় এমনও হয় যে একই প্রশ্ন হয়ত কয়েক জন শিক্ষার্থীকে করা হল, আর ওদের প্রত্যেককেই এর জন্য নম্বর দেওয়া হল। ফলে পড়াশুনার প্রতি শিশুদের হাল্‌কা মনোভাব গড়ে ওঠে। শিশুর উপলব্ধিতে নম্বর হবে মানসিক প্রয়াস খাটানোর ফল।

শিক্ষার্থীর মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে মানসিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ হল এমন শ্রম যেখানে চাই বিপুল প্রয়াস, ইচ্ছাশক্তির একাগ্রতা, বহু আমোদ-আহ্লাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার ক্ষমতা। শ্রমের পরিবেশেই গড়ে ওঠে দৃঢ়তা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি। যে শিশু সমালোচকের দৃষ্টিতে অর্জিত সাফল্যের ফলাফলকে বিচার করতে শিখেছে, যে নিজের কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও ভালো করার প্রয়াস পায়, সে কখনও অলস হতে পারে না।

মানসিক শ্রমে সাফল্য কী ভাবে অর্জিত হয় নিজস্ব অভিজ্ঞতায় তা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা আত্মসংযম রপ্ত করে। কঠোর পরিশ্রমের অভ্যাস, ভালো ফলাফল অর্জনের অভ্যাস — অযত্নে সম্পাদিত কাজের প্রতি, আলস্য ও শৈথিল্যের প্রতি অসহনীয় মনোভাবের শিক্ষায় শিশুকে শিক্ষিত করে তোলে।

শ্রমের আনন্দ বিদ্যাশিক্ষায় সাফল্যের আনন্দ যখন শিশুদের কাছে শিক্ষার প্রেরণা হয় তখন ক্লাসে নিষ্কর্মা বলতে কেউ থাকে না। যাঁরা প্রকৃত শিক্ষাকুশলী তাঁরা পৃথক পৃথক এক‌েকটি নিষ্কর্মার বিরুদ্ধে ক্বচিৎ সংগ্রাম করেন, চিন্তাশক্তির জড়তার পরিণামস্বরূপ যে আলস্য তার বিরুদ্ধেই তাঁদের সংগ্রাম।

চিন্তাশক্তি খাটিয়ে যারা ভালো ফল করছে কেবল তাদেরই নম্বর দেওয়ার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা তা ধীরে ধীরে প্রাথমিক শ্রেণী, মাধ্যমিক শ্রেণী ও উচ্চ শ্রেণীতে শিক্ষাদানরত সব শিক্ষকের কাজে প্রচলিত হল। পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে: শিক্ষার্থীর যদি কোন বিষয়েই কোন নম্বর না থাকে তাহলে কোয়ার্টার্লির শেষে ও শিক্ষাবর্ষের শেষে কী হবে?

আসল ব্যাপারটা ত এখানেই যে নম্বর না পাওয়া শিশুর কাছে খারাপ নম্বর পাওয়ার চেয়েও বড় দুঃখের। শিক্ষার্থীর চেতনায় এই ভাবনা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় যে আমি যেহেতু এখনও নম্বর পাওয়ার উপযুক্ত হই নি, তার মানে যেমন খাটা উচিত ততটা এখনও খাটি নি। এই কারণে শিক্ষাবর্ষের শেষেও শিক্ষার্থী নম্বর পায় নি — এমন ঘটনা আমাদের স্কুলে ঘটে নি বললেই চলে। ৪ বছরের মধ্যে ৬ বার আমি কোয়ার্টার্লির শেষে ছেলেমেয়েদের নম্বর দিতে পারি নি। মা-বাবার জানেন ছেলে বা মেয়ের খাতায় যদি কোন নম্বর না থাকে তার মানে গতিক ভালো নয়। তাঁরা একথাও জানেন যে নম্বর না পাওয়ায় শিশুর কোন অপরাধ নেই, এটা তার দুর্ভাগ্য। আর দুর্ভাগ্যের সময় সাহায্য করা দরকার। আমরা যৌথ ভাবে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করি। আমি মা-বাবাদের বুঝিয়ে বলি ওঁরা যেন কখনও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বেশি নম্বর দাবি না করেন, অসন্তোষজনক নম্বরকে কখনও আলস্য ও শৈথিল্যরূপে, অধ্যবসায়ের অভাব বলে বিবেচনা না করেন।

নম্বর জিনিসটি হল শিক্ষার এক সূক্ষ্ম হাতিয়ার। কোন কোন শিক্ষক বিশেষ কোন ভাবনাচিন্তা না করেই এই হাতিয়ারটি ব্যবহার করে থাকেন। বহু স্কুলে কোন রকমে পাস নম্বর পাওয়ার প্রতি একটা ধিক্কারজনক মনোভাব গড়ে উঠেছে। 'ভালো নম্বর পেয়ে পড়াশুনা করব!' — এই স্লোগান যে কেবল পাইওনিয়র জমায়েতগুলিতেই ধ্বনিত হয় তা নয়। শিশুদের পত্রপত্রিকায়ও দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষায় সন্তোষজনক সাফল্যের প্রতি এবংবিধ মনোভাবের উৎসাহ দিয়ে শিক্ষক বস্তুত যে ডালে বসে থাকেন সেই ডালই কাটেন: শিশুদের উপরিচালাকি ও চাপল্যের শিক্ষা দেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে, শিক্ষাবর্ষ সূচনার কয়েক সপ্তাহ পরে ছেলেমেয়েরা নোটবই রাখতে শুরু করল — তাতে ক্লাসে ওরা যা যা নম্বর পেত তা লেখা হত। এমন একটি ঘটনাও ঘটে নি যেখানে শিশু মা-বাবার কাছ থেকে নম্বর গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে। নম্বর যেখানে সাফল্যের আনন্দ প্রকাশ করে সেখানে এর অন্যথা হতে পারে না। নোটবইয়ে শিক্ষকের কোন স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই — এর দরকার হত সেকেলে স্কুল ব্যবস্থায়, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরাজ করে অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশ। ক্লাসে যদি পারস্পরিক বিশ্বাস না থাকে, শিশু যদি শিক্ষককে প্রতারণা করার চেষ্টায় থাকে, নম্বর যদি বয়োজ্যেষ্ঠদের হাতে শিশুকে তাড়না করার চাবুকে পরিণত হয় তাহলে সঠিক শিক্ষাদানের ভিত্তিই ধসে যায়।

অন্যায় ভাবে খারাপ নম্বর বসানো থেকে শুরু হয় স্কুলের সবচেয়ে বড় ক্ষতিগুলির একটি — শিশুর মিথ্যাবাদিতা, শিক্ষক ও মা-বাবাকে প্রতারণা। মা-বাবার কাছ থেকে স্কুলে নিজেদের অকৃতকার্যতা আর শিক্ষকের কাছ থেকে অমনোযোগিতা গোপন রাখার জন্য ছেলেমেয়েরা কত রকম ফন্দিফিকিরেরই না আশ্রয় নেয়। শিক্ষার্থীর প্রতি অবিশ্বাস যত বেশি ততই বেশি করে সে প্রতারণার নানা রকম কৌশল উদ্ভাবন করে, ততই অনুকূল হয় আলস্য ও শৈথিল্যের জমি। আলস্য হল অবিশ্বাসেরই পরিণাম। যাকে আমি শিক্ষা দিচ্ছি সে-সর্বোপরি জীবন্ত মানুষ, শিশু, পরে — শিক্ষার্থী। তাকে যে নম্বর আমি দিচ্ছি তা তার জ্ঞানের মাপকাঠি মাত্র নয়, সর্বোপরি তা হল তার প্রতি আমার মানবিক সম্পর্ক।

সকল শিক্ষাজীবীর প্রতি আমার পরামর্শ: শিশুর

অনুসন্ধিৎসা ও কৌতূহলপ্রবণতার অগ্নিকণার, তার জ্ঞানতৃষ্ণার যত্ন নিন। এই অগ্নিকণাকে জ্বালিয়ে রাখার একমাত্র উৎস হল শ্রমে সাফল্যের আনন্দ, মেহনতীর গর্ববোধ। প্রতিটি সাফল্যের, প্রতিটি বাধাবিপত্তি অতিক্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক দিন — নম্বর দিন, কিন্তু নম্বরের অপব্যবহার যেন না হয়। ভুলে যাবেন না, যে জমির উপর আপনার শিক্ষকতার নৈপুণ্য গড়ে উঠছে তা হল শিশু নিজে, জ্ঞানের প্রতি, আপনার প্রতি — শিক্ষকের প্রতি তার সম্পর্ক। তা হল শেখার ইচ্ছে, বাধাবিপত্তি অতিক্রমের মানসিক প্রস্তুতি, প্রেরণা। এই জমিকে সযত্নে উর্বর করে তুলুন, এছাড়া বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই।

‘রূপকথার ঘর’

রূপকথা, খেলা, কল্পনা — শিশুর মননক্রিয়ার, মহৎ অনুভূতি ও প্রয়াসের সঞ্জীবনী উৎস। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে রূপকথার চিত্র ও চরিত্রের প্রভাবে শিশুচিত্তে যে নন্দনতাত্ত্বিক, নৈতিক ও বুদ্ধিমার্গীয় অনুভূতির জন্ম হয় তা ভাবনার এমন এক প্রবাহকে সক্রিয় করে তোলে যা মস্তিষ্কের সক্রিয় কার্যকলাপের উদ্বোধন ঘটায়, ভাবনার সজীব দ্বীপগুলির মধ্যে প্রাণোচ্ছল যোগসূত্র স্থাপন করে। রূপকথার কল্পমূর্তিগুলির মাধ্যমে শিশুর চৈতন্যে শব্দ ও তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা প্রবেশ করে; শব্দ হয়ে দাঁড়ায় শিশুর মনোজীবনের ক্ষেত্র, ভাবনা ও অনুভূতির বাহন — মননের জীবন্ত বাস্তব রূপ। রূপকথার কল্পমূর্তি শিশুর মনে যে সব অনুভূতি জাগিয়ে তোলে তাদের প্রভাবে শিশু শব্দের সাহায্যে ভাবতে শেখে। সজীব, উজ্জ্বল রূপকথা যতক্ষণ শিশুর

চেতনা ও অনুভূতিকে অধিকার না করছে ততক্ষণ মানবিক মননক্রিয়া ও বাচনক্রিয়ার নির্দিষ্ট পর্যায় রূপে শিশুর মননক্রিয়া ও বাচনক্রিয়াকে কল্পনা করা অসম্ভব।

শিশুরা এই ভেবে গভীর তৃপ্তি পায় যে রূপকথার ভাবমূর্তির জগতে তাদের ভাবনা অধিষ্ঠান করছে। শিশু একই রূপকথা পাঁচ বার, দশ বার — অসংখ্য বার আওড়াতে পারে এবং প্রতিবারই তার মধ্যে কিছু না কিছু নতুনের সন্ধান পায়। রূপকথার ভাবমূর্তির মধ্যে আছে স্পষ্ট, সজীব, সুনির্দিষ্ট রূপ থেকে বিমূর্ত ধারণায় প্রথম পদক্ষেপ। আমার শিক্ষার্থীরা বিমূর্ত ভাবনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারত না যদি না রূপকথা তাদের মনোজীবনের গোটা একটি পর্ব জুড়ে থাকত। শিশু ভালো ভাবেই জানে যে জগতে ডাইনী বুড়ি বাবা-ইয়াগা নেই, ব্যাঙ রাজকুমারী নেই, পিশাচ বলে কেউ নেই, কিন্তু এই সব কল্পমূর্তির মধ্যে সে ভালো ও মন্দের রূপ দেখতে পায় এবং প্রতিবার একই রূপকথা বলার সময় ভালো-মন্দের প্রতি তার ব্যক্তিগত মনোভাব প্রকাশ করে।

সৌন্দর্য থেকে রূপকথাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, রূপকথা নন্দনতাত্ত্বিক অনুভূতি বিকাশে সহায়তা করে, আর এই অনুভূতি ছাড়া চিত্তের উদারতা, মানুষের দুর্ভাগ্য, শোক ও দুঃখের প্রতি হৃদয়ের সংবেদনশীলতার কথা ভাবা যায় না। রূপকথার কল্যাণে শিশু কেবল বুদ্ধি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েও জগৎকে উপলব্ধি করে। আর কেবল যে উপলব্ধি করে তা-ই নয়, পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনা ও বস্তুর আহ্বানে সাড়া দেয়, ভালো ও মন্দের প্রতি নিজের মনোভাব প্রকাশ করে। রূপকথা থেকে শিশু আহরণ করে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে তার প্রাথমিক ধারণা। ভাবাদর্শগত শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ও সংঘটিত হয়

রূপকথার সাহায্যে। শিশুরা ভাবাদর্শকে একমাত্র তখনই মনে রাখতে পারে যখন তা উজ্জ্বল রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে।

রূপকথা — স্বদেশপ্রেম শিক্ষার হিতকর উৎস, অন্য কোন জিনিস এর স্থান নিতে পারে না। রূপকথার দেশপ্রেমমূলক ভাবধারা নিহিত থাকে তার বিষয়বস্তুর গভীরে; লোকসমাজ রূপকথার যে-সমস্ত কল্পমূর্তি সৃষ্টি করেছে সেগুলি হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকে, শিশুর হৃদয়ে ও বুদ্ধির অধিগম্য করে তোলে মেহনতী জনসমাজের প্রবল সৃজনী মনোবল, জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা। রূপকথা স্বদেশপ্রেমের শিক্ষা দেয় এই কারণেই যে তা হল জনগণের সৃষ্টি। রূপকথা — লোকসংস্কৃতির আন্তর সম্পদ, তাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে শিশু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে তার নিজের জাতিকে।

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয় শুরু হওয়ার ৩ মাস বাদে আমরা 'রূপকথার ঘর' সাজিয়ে ফেললাম। ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাহায্যে আমরা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করলাম যাতে শিশুরা রূপকথার কল্পমূর্তিদের জগতে আছে বলে মনে মনে ভাবতে পারে। আশেপাশের সবকিছু যাতে খুব ছোটবেলায় মা'র মুখ থেকে শোনা রূপকথার স্মৃতি, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার আর চুল্লির স্নিগ্ধ অগ্নিকণার স্মৃতি শিশুর মনে জাগিয়ে তোলে তার জন্য অনেক খাটতে হল। এই হল পাজী ডাইনী বুড়ি বাবা-ইয়াগার আস্তানা — বিশাল বিশাল গাছ আর গাছের গুঁড়িতে ঘেরা কুটির — রূপকথায় যাকে বলা হয়েছে কুঁকড়োর-ঠ্যাঙে-খাড়া কুটির। কুটিরের পাশেই রূপকথার বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি: ধূর্ত শেয়াল, ছাইরঙা নেকড়ে, বুদ্ধিমান পেঁচা। আরেক কোনায় — দাদু-দিদিমার

কুঁড়ে ঘর, আকাশে রাজহাঁসেরা তাদের ডানায় বয়ে নিয়ে চলেছে ছোট একটা ছেলেকে — ইউক্রেনের লৌকিক রূপকথার নায়ক ইভাসিক-তেলেসিককে। এক কোনায় — নীল সাগর, তার তীরে ভালো মানুষ বুড়ো ও দুষ্ট বুড়ির ভাঙ্গাচোরা বাড়ি, দোরগোড়ায় পুরনো বারকোষ, রোয়াকে বসে আছে বুড়ো আর বুড়ি, সমুদ্রে ভাসছে সোনালি মাছ। কোথাও শীতের বন, বরফের পাহাড়, তার ভেতর দিয়ে ডুবু ডুবু হয়ে এগিয়ে চলেছে একটা ছোট্ট মেয়ে — সৎমা এই শীতের মধ্যে তাকে ফল আনতে পাঠিয়েছে। ...কুটিরের জানলা থেকে উঁকি মারছে ছাগলছানা। আর এই হল বিরাট দস্তানা যার ভেতরে বাস করে ইঁদুর, তার কাছে এসেছে অনাহূত অতিথিরা। প্লাই-উড কেটে তৈরি হল বিরাট গুঁড়ি, তার ওপরে পুতুল — বাচ্চা মেয়ে, ছাইরঙা খরগোশ, ভালুক, নেকড়ে, ছাগল... এমনি কত কি।

আমরা নিজেরাই ধীরে ধীরে এ সব তৈরি করি। আমি কাটি, আঁকি, আঠা দিয়ে জুড়ি, ছেলেমেয়েরা আমাকে সাহায্য করে। শিশুরা যে পরিবেশে রূপকথা শুনতে তার নন্দনতাত্ত্বিক প্রকৃতির উপর আমি বেশ বড় গুরুত্ব আরোপ করি। প্রতিটি ছবি, প্রতিটি চাক্ষুষ রূপ শিল্পমণ্ডিত শব্দ উপলব্ধির ক্ষমতা তীব্র করে তোলে, রূপকথার ভাববস্তুর গভীরতর অভিব্যক্তি ঘটায়। এমন কি 'রূপকথার ঘর' আলোকিতকরণের উপায়ও বেশ বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। ব্যাঙ রাজকুমারীর রূপকথা বলার সময় বনের ভেতরের ফাঁকা জায়গাটায় ছোট ছোট বাতি জ্বলে উঠত, ঘরের মধ্যে বিরাজ করে সবজে রঙের আবছায়া যাতে ঘটনার পরিবেশ ভালো ভাবে সঞ্চারিত হতে পারে।

'রূপকথার ঘরে' ছেলেমেয়েদের আমি তেমন ঘনঘন নিয়ে

যাই না — সপ্তাহে একবার, কখনও কখনও দু'সপ্তাহে একবার। নন্দনতাত্ত্বিক চাহিদা এমন বেশি পরিমাণে মেটাতে উচিত নয় যাতে অরুচি ধরে যায়। যেখানে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি রকমের সেখানে শুরু হয় অবজ্ঞার ভাব, কূপমণ্ডূকসুলভ মোহভঙ্গ, একঘেয়েমির ক্লান্তি, অবসর সময় 'নষ্ট করার' উপায় সন্ধান। ...আমরা এখানে আসি শরৎকাল ও শীতকালের সন্ধ্যায়। এই সময় রূপকথা শিশুদের কাছে একটা বিশেষ মাধুর্য নিয়ে আসে, পরিষ্কার রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে যেমন শোনায় তার চেয়ে একেবারে অন্য রকম শুনতে লাগে। বাইরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, আমরা আলো জ্বালি না, সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার উপভোগ করি। এমন সময় রূপকথার কুটিরের জানলায় আলো জ্বলে উঠল, আকাশে দেখা দিল তারা, বনের ওপার থেকে উঠল চাঁদ। ঘর মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু কোনায় কোনায় জমে থাকে আরও বেশি আঁধার। আমি ছেলেমেয়েদের ডাইনী বুড়ি বাবা-ইয়াগা সম্পর্কে লৌকিক রূপকথা বলি। আমার কথার মধ্যে হয়ত ছোটদের পক্ষে নতুন কিছুই ছিল না, কিন্তু ওদের চোখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েরা রূপকথার চরিত্রগুলির ভাগ্যের কথা ভেবে মর্মপীড়া অনুভব করে, মন্দকে ঘৃণা করে, ভালোর প্রতি অনুভব করে সহানুভূতি। পাজী ডাইনী বুড়ি, সরলমতি মেয়ে আলিওন্‌কা ও উদারমতি রাজহাঁসদের মূর্তি শিশুদের ধারণায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, পরিণত হয় বুদ্ধিসম্পন্ন ও অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণীতে। ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে রূপকথা — কাল্পনিক ঘটনার বিবরণমাত্র নয়; এ হল গোটা এক জগৎ, যেখানে শিশু বাস করে, সংগ্রাম করে, নিজের শুভবুদ্ধির সঙ্গে হিংসার প্রতিতুলনা করে। শব্দ রূপকথার মধ্যে শিশুর অন্তরের শক্তি

প্রকাশের যথার্থ রূপ খুঁজে পায়, যেমন খেলার মধ্যে সে রূপ প্রকাশ করে গতি, সঙ্গীতে — সুর। শিশু কেবল যে রূপকথা শুনতে চায় তা নয়, সে নিজে রূপকথা বলতে চায়, যেমন সে কেবল সঙ্গীত শুনেই ক্ষান্ত নয়, নিজে গান গাইতেও চায়, কেবল খেলা দেখাতেই তার পরিতৃপ্তি নয়, সে নিজে খেলায় যোগ দিতেও চায়।

কয়েক দিন কাটার পর ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে: 'আমরা কবে 'রূপকথার ঘরে' যাব?' ওরা সেই আনন্দের মুহূর্তের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। আমরা আবার সন্ধ্যায় আবছা আঁধারে মিলিত হই, আবার আমি রূপকথা বলি, তারপর ছেলেমেয়েরা সেই রূপকথাটাকে বলে। যারা সবচেয়ে মুখচোরা তারাও এই সময় হয়ে পড়ে সাহসী ও দৃঢ়সংকল্প। অন্যান্য পরিস্থিতিতে ভাষা হয় অস্পষ্ট ও আনাড়ি ধরনের, কিন্তু এখানে ভাষা হয়ে ওঠে স্বচ্ছন্দ, ব্যঞ্জনাধর্মী, সুরেলা। নিনা, পেত্রিক, লিউদা, স্লাভা ও ভালিয়া রূপকথা বলে। অথচ ওদের ভাষা ও মননক্রিয়ার বিকাশে প্রতিবন্ধকতা ছিল।

আমরা যখন 'রূপকথার ঘরে' আসি তখনই ছেলেমেয়েরা খেলতে চায়। কী ছেলে কী মেয়ে — সকলের জন্যই মনের মতন পুতুল কিংবা খেলনা আছে। খেলা সৃজনের আকার ধারণ করে: বাচ্চারা রূপকথার চরিত্র হয়, আর ওদের হাতের পুতুলগুলো ভাবনা ও অনুভূতির সুচারু প্রকাশে সাহায্য করে। ওদের একজন হাতে নিল খড়ের এঁড়ে বাছুর (ইউক্রেনের বিখ্যাত রূপকথার চরিত্র), অন্য জন নিল দিদিমা-পুতুল, আরেকজন — দাদু-পুতুল। শিশুরা এখন বাস করে রূপকথার জগতে। ওরা কেবল রূপকথার বিভিন্ন চরিত্রের মুখের কথা আওড়ায় না, সেগুলিকে সৃষ্টি করে, রূপকথা-রূপকথা

খেলায় নিজস্ব কল্পনা আরোপ করে। কোন কোন মেয়ের পুতুল নিয়ে স্রেফ একটু খেলতে মন চায়। শিশু পুতুলকে ছোট্ট সোফার ওপর বসায়, সুরেলা গলায় তাকে স্নেহ ও দরদে মাখা কথা বলে। আরেকটি মেয়ের বাচ্চা-পুতুল অসুস্থ হয়ে পড়েছে, মেয়েটি তাকে চিকিৎসা করছে।

মেয়ে আর ছেলেরা যদি কয়েক বছর পুতুল নিয়ে খেলে তাতে আমি খারাপ কিছু দেখি না। কখনও কখনও কোন কোন শিক্ষক ব্যাপারটিকে বড় 'ছেলেমানুষি' বলে মনে করেন, কিন্তু আসলে এর মধ্যে সে রকম কিছু নেই, এ হল সেই একই রূপকথা, জীবন্ত সত্তার সেই একই প্রেরণা যা রূপকথা বানানোর ও শোনার প্রক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করে। ফরাসী লেখক আ. সাঁ-এক্‌জিউপেরির (১৯০০-১৯৪৪) ভাষায়, পুতুলের মধ্যে আছে শিশু যাকে **পোষ মানাতে** চায় তারই মূর্ত রূপ। প্রত্যেক শিশুই চায় তার যেন পরম প্রিয়, আপন কিছু থাকে। আমি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি শিশু আর তার প্রিয় পুতুলের মধ্যে অন্তরের কী রকম সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছেলেরা যে অনেকক্ষণ ধরে পুতুল নিয়ে থাকত তাতে আমি আনন্দ পেতাম। কোস্তিয়ার পুতুলটা নেহাৎই সাধারণ ধরনের— ছিপ হাতে বুড়ো জেলে। পুতুলটার কয়েকবার পা ভেঙ্গে যায়, কোস্তিয়া শেষ পর্যন্ত কাঠের পা কেটে আর একটা ডালপালাওয়ালা লাঠি বুড়োর হাতে ধরিয়ে দেয়, তাতে ভর দিয়ে সে নদীর ধারে যায়। বালক তার বুড়ো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে: জলের কোন্‌ জায়গায় কী মাছ পাওয়া যায় তাকে বলে। ...লারিসার প্রিয় পুতুল হল দিদিমা ও নাতনি। মেয়েটি দিদিমার চোখে চশমা পরিয়েছে, তার পায়ের নীচে বিছিয়ে দিয়েছে গরম গালিচা, কাঁধে দিয়েছে শাল।

ভালিয়ারও দুটো পুতুল — বেড়ালছানা ও ইঁদুরছানা। মেয়েটি প্রতি সপ্তাহে বেড়ালছানার গলায় নতুন নতুন ফিতে বাঁধে আর ইঁদুরছানার জন্য কেন যেন সবুজ আসন নিয়ে আসে।

...'রূপকথার ঘরে' শিশুদের কল্পনার আর শেষ নেই। শিশু নতুন কোন জিনিস দেখল কি না দেখল অমনি শিশু চেতনায় অন্য একটি জিনিসের সঙ্গে তার সম্পর্ক রচিত হয়ে গেল, জন্ম নেয় কাল্পনিক ধারণা, শিশুকল্পনার খেলা চলে, ভাবনায় শিহরণ ধরে, চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, ভাষা প্রবাহিত হয় স্বচ্ছন্দ ধারায়। এই কথা মনে রেখে আমি চেষ্টা করি যাতে শিশুদের চোখের সামনে, 'রূপকথার ঘরের' বিভিন্ন কোনায় নানা ধরনের এমন সব জিনিস থাকে যাদের মধ্যে কোন বাস্তব অথবা কাল্পনিক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতে পারে। আমি ভাবি ছেলেমেয়েরা কখন কল্পনার পরিচয় দেবে, নতুন নতুন রূপকথা সৃষ্টি করবে। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে বক, তার পাশে ভয়ে জড়সর ছোট্ট বেড়ালছানা — শিশুকল্পনা সৃষ্টি করল কয়েকটি কৌতূহলজনক রূপকথা, যেগুলির চরিত্র হল বক আর বেড়ালছানা। আর এই হল দাঁড়ওয়ালা ছোট নৌকো, তার পাশে ব্যাঙ — পরিস্থিতি নিজেই রূপকথা হয়ে ওঠার জন্য উন্মুখ। গুহা থেকে মুখ বারিয়ে আছে ভালুকছানা, মশা ও মাছি — ভালুকের ছানার তুলনায় আকারে অস্বাভাবিক বড় (রূপকথায় অবশ্য এটা চলে), ছোট শুয়োরছানা আর সাবান সমেত মুখ ধোয়ার বেসিন — এ সবই শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে ত তোলেই কল্পনাও জাগিয়ে তোলে।

যে শিশুর মননক্রিয়া বিকাশে গুরুতর অসুবিধা দেখা যায়, আমি যদি দেখতে পারি যে সে রূপকথা ভেবে বার করেছে, নিজের কল্পনায় পারিপার্শ্বিক জগতের কয়েকটি জিনিসকে

একসঙ্গে বাঁধতে পেরেছে — তার মানে জোর দিয়ে বলা যায় যে শিশু ভাবতে শিখেছে। ভালিয়ার চিন্তাকে উদ্দীপিত করা ও তার স্মৃতিশক্তিকে দৃঢ় করে তোলা যে কত কঠিন কাজ ছিল সেকথা আমি আগেই বলেছি: তার চিন্তাকে উদ্দীপিত করার অন্যতম উপায় ছিল পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনার মধ্যে হঠাৎ সম্পর্ক দেখতে পাওয়ার দরুন বিস্ময়বোধ। আরও একটি উপায়ও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তা হল রূপকথা। ভালিয়া বহুকাল কোন রূপকথা বানাতে পারত না। তাতে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। কেবল শিক্ষার তৃতীয় বছরে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ, নৌকো ও মাছ সম্পর্কে রূপকথা রচনা করল। বিষয়বস্তুটা এই রকম: 'ব্যাঙ নদীর ধারে নৌকো দেখতে পেল। জেলে-দাদু নৌকোটা রেখে গাঁয়ে গিয়েছিলেন রুটির খোঁজে। ব্যাঙের ইচ্ছে হল নৌকোয় চেপে ঘোরে। সে লাফিয়ে নৌকোয় উঠে বসল, দাঁড় ধরল। এমন সময় একটা মাছ সাঁতরে তার কাছে এগিয়ে এসে বলল: 'তুই কী ভেবেছিস বল দেখি? সাঁতার কাটিস ত ডোবায়, কিন্তু নৌকোর দরকার গভীর জল।' মাছের উপদেশে ব্যাঙ কান দিল না, সে নৌকোকে চালিয়ে নিয়ে গেল নিজের ডোবার দিকে। নৌকো ভেসে চলতে চলতে বলে: 'ব্যাঙ ভায়া, ব্যাঙ ভায়া, কোথায় আমাকে টেনে নিয়ে চললে শুনি?' ব্যাঙ বলল: 'আমার নিজের ডোবায়, আমাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সব্বাই দেখুক, আমি কেমন নৌকো চালাই।' নৌকো হাসল, মনে মনে ভাবল: 'দাদু আসুক না, নৌকো চালানো কাকে বলে তোকে শেখাবে এখন।' ব্যাঙ কোন রকমে নৌকো ডোবায় টেনে নিয়ে এলো। নৌকো কাদায় আটকে গেল, আর এগোয় না। ব্যাঙ কঁকিয়ে-কুঁতিয়েও নৌকো নড়াতে পারে না। ইতিমধ্যে ব্যাঙের

জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সব্বাই ডোবা থেকে বেরিয়ে এসেছে, সকলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, ব্যাঙ ডোবার সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়েছিল: 'দেখ, দেখ আমি কী সুন্দর নৌকো চালাই।' ব্যাঙের লজ্জা হল, যেই লাফিয়ে ডোবায় পড়ে অমনি চারদিকে চাপ চাপ কাদা ছিটে পড়ে। আর ব্যাঙের জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সকলে হো হো করে হাসে। এমন সময় জেলে-দাদু এলো, নৌকোটা ডোবা থেকে টেনে বার করল। ব্যাঙেরা ভয় পেয়ে গেল, ওরা সবুজ পাঁকের ভেতরে লুকিয়ে পড়ল। সন্ধ্যাবেলায় সাহসে ভর করে বেরিয়ে এলো — আর যা হাসি হাসল! এরপর থেকে রোজই রাতে ওরা হাসে — সন্ধ্যা থেকে সকাল অবধি জলায় শোনা যায় ব্যাঙেদের গ্যাঙর গ্যাং। ওরা হামবড়া ব্যাঙকে দেখে হাসে।'

রূপকথা বানানো — শিশুদের যতগুলি কৌতূহলজনক কাব্যধর্মী রচনা হতে পারে তাদের একটি। সেই সঙ্গে তা হল চিন্তাশক্তি বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। যদি চান যে শিশুরা শিল্পসম্মত রূপ গঠন করুক, সৃষ্টি করুক তাহলে নিজের সৃষ্টির অগ্নিকণা থেকে অন্তত একটি স্ফুলিঙ্গও শিশুচৈতন্যে সঞ্চার করুন। নিজে যদি সৃষ্টি করতে না পারেন কিংবা আপনার যদি মনে হয় যে শিশুর কৌতূহলের জগতে নেমে আসা একটা অসার তামাসামাত্র তাহলে কোন লাভই হবে না।

'রূপকথার ঘরে' তিনার ছিল নিজের প্রিয় পুতুল — ধাতুশ্রমিকের মূর্তি, তার মুখটা গলানো ধাতুর আলোয় ঝলমল করছে। মেয়েটির মনে পড়ে যায় ঢালাই কর্মশালায় একসময় যে ধাতুশ্রমিককে দেখেছিল তার কথা। এখন তিন বছর কেটে যাওয়ার পর সে আগুনের নদী নিয়ে এক কৌতূহলজনক রূপকথা বানায়।

'বিশাল এক চুল্লির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মহাবীর। সে লোহা গলায়। লোহা টগবগ করে ফোটে। মহাবীর চুল্লির দিকে এগিয়ে গিয়ে চুল্লির ঢাকনা খুলে দিতেই বয়ে চলে আগুনের নদী। বয়ে চলে আর বলে: 'ওগো মানুষেরা, গুন্‌গুনে লোহা নিতে ভুলো না, তোমাদের যা যা দরকার বানিয়ে নাও।' জ্ঞানীকারিগরেরা আগুনের নদীর কাছে যায়, নদী থেকে তুলে নেয় গলানো লোহা, বালির মধ্যে ঢালে, লোহা দিয়ে মানুষের যা যা দরকার বানিয়ে নেয়।'

শিশুচেতনায় জন্ম নেয় একালের মহারথীদের রূপ — সোভিয়েত মাতৃভূমির রক্ষকদের রূপ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ বিজয় আমাদের দেশের মানুষের স্মৃতিতে ও মনোজীবন জুড়ে অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে। যে-সমস্ত বীর মাতৃভূমি রক্ষা করেছেন, শিশুদের কল্পনায় তারা হলেন রূপকথার মহারথী। তাঁদের নিয়ে শিশুরা উজ্জ্বল, উদ্দীপনাময় রূপকথা রচনা করে। আমাদের জাতির মহারথীদের সম্পর্কে শিশুরা যে-সমস্ত রূপকথা সৃষ্টি করে তাদের সবগুলির মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পায় সোভিয়েত মানুষের পৌরুষ, অপরাজেয়তা ও মহত্ত্বের ধারণা। দাঙ্কোর বানানো রূপকথার উল্লেখ করা যেতে পারে।

'ছেলে ফৌজে চাকরী করতে যাচ্ছে। বিদায়ের সময় মা তাকে বললেন: 'জন্মভূমির এক মুঠো মাটি নিয়ে যা বাছা। মনে রাখিস, তুই হলি দেশের রক্ষাকর্তা।' ছেলে জন্মভূমির মাটি মুঠো করে তুলে নিয়ে লাল রেশমী থলেতে পুরে রাখল, সবসময় সে মাটি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। শত্রুরা আমাদের জন্মভূমির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল। ছেলে সীমান্তে

শত্রুসৈন্যদের মুখোমুখি হল, ওদের ওপর গুলি ছুঁড়ল, শত্রুরা নদীতে পড়তে লাগল। ছেলে এক পাও পিছাল না। কিন্তু শেষকালে শত্রুর গুলি তার মাথায় এসে লাগল, রক্তে চোখ ভেসে গেল, হাত দুটো এলিয়ে পড়ল। শত্রুরা এগিয়ে আসে, ভাবে এখনই আমরা ওকে বন্দী করে নিয়ে যাব। ছেলের মনে পড়ে গেল জন্মভূমির সেই এক মুঠো মাটির কথা। লাল থলেটা হাত দিয়ে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতে দারুণ জোর এসে গেল। আবার সেই খুদে মহাবীর গুলি ছুঁড়তে লাগল, শত্রুরা তাড়া খেয়ে নদীতে গিয়ে পড়ল, ইতিমধ্যে এসে গেল সাহায্য — চটপটে এরোপ্লেন আর বিশাল বিশাল ট্যাঙ্ক।'

ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে যে-সমস্ত রূপকথা রচনা করে আমার কাছে সেগুলি লেখা আছে। শিশুদের মনে ভাবনার যে উজ্জ্বল অগ্নিকণা আমি জ্বালাতে পেরেছি সেই হিশেবে এই রূপকথাগুলি আমার কাছে মূল্যবান। সৃজনকর্ম ছাড়া, রূপকথা রচনা ছাড়া বহু ছেলেমেয়েরই ভাষাভঙ্গি হত এলোমেলো, গোলমেলে আর মননক্রিয়া হত বিশৃঙখল ধরনের। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে শিশুদের সৌন্দর্যবোধ ও ভাষার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে সরাসরি যোগ আছে। সৌন্দর্যবোধ শব্দকে আবেগধর্মী বর্ণিমা দান করে। রূপকথা যতই কৌতূহলজনক, শিশুরা যে পরিবেশে থাকে তা যতই অসাধারণ হয়, শিশুকল্পনার খেলা ততই তীব্র আকার ধারণ করে, ততই চমকপ্রদ হয় শিশুদের সৃষ্ট রূপ। গোধূলিবেলায় আমার ছেলেমেয়েরা অনেক রূপকথা রচনা করে — সেগুলিকে আমি সংগ্রহ করে রাখি হাতে লেখা এক সঙ্কলনে, তার নাম দিই 'গোধূলিবেলার রূপকথা'।

'গোধূলিবেলার রূপকথা' সংকলনের মধ্যে পশুপাখি এবং গাছপালা ও ফুল সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিছু রূপকথা আছে। বিশেষ করে ফুল সম্পর্কে রচিত রূপকথা যেমন ছোটদের তেমনি আমাকেও প্রভূত আনন্দ দেয়। আমি ছেলেমেয়েদের মানুষের ভাবজীবন সম্পর্কে বলি, ফুল সম্পর্কিত গানে ও উপকথায় অনুভূতির রূপায়ণ সম্পর্কে বলি। রূপকথার সূত্র ধরিয়ে দিলাম — সঙ্গে সঙ্গে শিশুকল্পনায় সৃষ্ট হতে থাকে উজ্জ্বল রূপমূর্তি।

দু'-তিন মাসে একবার আমরা 'রূপকথার ঘরের' প্রতিটি কোণের সজ্জা অদলবদল করতাম — প্লাইউড কেটে নতুন নতুন মূর্তি, গাছপালা, ঝোপঝাড় বানাতাম, কেল্লা তৈরি করতাম, বানাতাম রূপকথার প্রাসাদ, জেলেদের কুটির আর মাটির ঘর। বাচ্চারা কাগজের মণ্ড দিয়ে রূপকথার চরিত্রের মূর্তি বানাতে শিখল — এর ফলে রূপকথার জগৎ সমৃদ্ধ হল। এই ভাবে আমরা 'চিত্রিত করি' 'ইভাসিক-তেলেসিক' (ইউক্রেনের লৌকিক রূপকথা), রুশ লেখক ভাসিলি জুকোভ্স্কির 'ঘুমন্ত রানী', সের্গেই আক্সাকভের 'আলতা জবা', ভ্লাদিমির দাল-এর 'দাঁতাল ইঁদুর আর বড়লোক চড়াই-এর কথা', ভ্সেভলদ গারশিনের 'ব্যাঙের বিশ্বদর্শন' — এই রকম বহু রূপকথা; তা ছাড়া ছিল ডেনিশ রূপকথা লেখক হান্স ক্রিস্টান এণ্ডারসনের 'তুষাররানী', গ্রিম-ভাইদের 'ব্রেমেনের রাস্তার বাদক', শার্ল পেরোর 'ঘুমন্ত সুন্দরী', রুশ লৌকিক রূপকথা 'মারিয়া-সুন্দরী ও ভানিউশ্কা', 'রুশ জাতীয় বীর চাপায়েভ-সংক্রান্ত রূপকথা', জাপানী লৌকিক রূপকথা 'কুঁজো চড়াইছানা'। এই রূপকথাগুলি শিশুদের অন্তর্লোকে স্থান পায়, যেমন আমাদের চেতনায় চিরকালের জন্য স্থান পায়

আমাদের সুখের বার্তাবহ প্রিয় মানুষের ভাবমূর্তি। ছেলেমেয়েরা চিরজীবনের জন্য অক্ষরে অক্ষরে মনে রাখে শোনা রূপকথা, যদিও মনে রাখার জন্য তাদের কেউ কখনও চাপ দিত না। শব্দের অনুপম সৌন্দর্য যখন শিশুমনকে আলোড়িত করে তখন তা চিরতরে মনে গাঁথা হয়ে যায়। এই রকম মনে রাখার ফলে স্মৃতিশক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ ত পড়েই না বরং স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

নতুন রূপকথা যখন প্রথম বলা হয় তখন তা শিশুদের জীবনে এক বিরাট ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। কী উদ্দীপনা নিয়ে যে আমরা এন্ডারসনের 'তুষাররানী' রূপকথার পরিবেশ গড়ে তুলেছিলাম তা কখনও ভুলব না। ঘটনাটা ঘটে শিক্ষার দ্বিতীয় বছরে। শীতকালে বেলা যেতে না যেতে ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার আঁধার, ছেলেমেয়েরা এসেছিল 'রূপকথার ঘরে'। ঘটনার পরিবেশ — কোনাচে ছাদে ঢাকা ছোট ছোট বাড়ি, উঁচু উঁচু শৈলচূড়ার মাঝখানে রূপকথার প্রাসাদ, দৌড়বাজ হরিণ, বরফের স্তূপ — সবই ছেলেমেয়েদের নিজেদের হাতে তৈরি। কিন্তু রূপকথা এখনও সকলের শোনা হয় নি। বাড়িগুলোর জানলায় জানলায় জ্বলে ওঠে আলো, আকাশ থেকে ঝরতে থাকে মিহি তুষারকণা, আমাদের ঘিরে ধরে সন্ধ্যার আলো-আঁধারি। শিশুরা রুদ্ধশ্বাসে শিক্ষকের মুখের কথা শোনে।

...রূপকথা শেষ হল, কিন্তু ছেলেমেয়েরা আরও একবার শুনতে চায়। শব্দের এই মোহ আমার কাছে ছিল পরম মূল্যবান। ছেলেমেয়েরা যতবার শুনতে চাইত আমি ততবারই রূপকথা পুনরাবৃত্তি করতাম। ওরা যে তুষাররানীর রূপকথা বারবার শুনতে চায় তার কারণ এই নয় যে শব্দ মুখস্থ রাখা তাদের

দরকার ছিল, কারণ এই যে রূপকথাটির মধ্যে তারা আশ্চর্য সঙ্গীতের অনুরণন শুনতে পায়।

শিক্ষক সর্বক্ষণ ভাবেন ছেলেমেয়েরা যাতে মাতৃভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করে, যাতে মাতৃভাষার শব্দ তাদের মনোজীবনে স্থান পায়, একাধারে লক্ষ্যভেদী ধারাল ছেদনযন্ত্র, বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণভান্ডার আর সত্য উপলব্ধির সূক্ষ্ম উপায় হয়ে দাঁড়ায়। ভাষা হল ভাবনার বস্তুগত প্রকাশ। শিশু একমাত্র তখনই তা জানতে পারবে যখন অর্থের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার শব্দের উজ্জ্বল ভাবব্যঞ্জনা, সঙ্গীতের সজীব শিহরণ হৃদয়ঙ্গম করে। শব্দের সৌন্দয অনুভব ব্যতিরেকে শিশুর বুদ্ধি তার নিহিতার্থ অনুধাবন করতে পারে না। আর সৌন্দর্যের অনুভূতি — কল্পনা ব্যতিরেকে অচিন্তনীয়, যাকে বলা হয় রূপকথা, সেই সৃজনকর্মে শিশুদের অংশগ্রহণ ছাড়া অচিন্তনীয়। রূপকথা হল এমন এক সক্রিয় নন্দনতাত্ত্বিক সৃজনকর্ম যা শিশুর বুদ্ধি, অনুভূতি, কল্পনা ও ইচ্ছাশক্তিকে — এককথায়, তার মনোজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে অধিকার করে থাকে। গল্প বলা থেকেই তার সূত্রপাত, আর তার সর্বোচ্চ পর্যায় — নাটকীয় রূপদান।

আমাদের এই 'রূপকথার ঘরে' জন্ম নিল পুতুল থিয়েটার ও নাট্যচক্র। এখানে ছেলেমেয়েরা প্রথম নাট্যরূপ দান করল ইউক্রেনের 'দস্তানা' রূপকথার। অতঃপর বিপুল আগ্রহ নিয়ে তারা 'ব্যাঙ-রাজকুমারী' রূপকথা ও জাপানের 'কুঁজো চড়াই' রূপকথার নাট্য-রূপায়ণে নামল। শিক্ষার চতুর্থ বছরে তারা সকলে মিলে 'বাজিয়ে ফড়িং' রূপকথা রচনা করল এবং নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করল।

'রূপকথার ঘরে' আমি ছেলেমেয়েদের প্রথম পড়ে শোনালাম

রবিন্‌সন ক্রুসোর কাহিনী, 'মিউনহাউজেনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার', 'গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত', 'জার সালতানের রূপকথা', 'বাজিয়ে ইয়াঙ্কোর' কাহিনী। জানলার বাইরে বরফের ঘূর্ণিঝড়, এদিকে ছেলেমেয়েরা জাহাজ ডুবির কবলগ্রস্ত রবিন্‌সন ক্রুসোর সঙ্গে সঙ্গে জনমানবহীন দ্বীপে এসে উঠছে, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের কষ্ট ভোগ করছে। শীতকালের সন্ধ্যার এই আকর্ষণীয় মুহূর্তগুলি শিশুচিত্তে চিরকাল জাগরূক থাকে। 'রূপকথার ঘরে' আমরা এণ্ডারসন, তলস্তয়, উশিন্‌স্কি ও গ্রিম-ভাইদের এবং সোভিয়েত শিশুসাহিত্যিক চুকোভ্‌স্কি ও মার্শাকের সবগুলি রূপকথা পড়ে ফেলি। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমার বিশ্বাস হল যে ভালো ও মন্দ, সত্য ও অসত্য, সম্মান ও অসম্মান সম্পর্কে যে-সমস্ত নৈতিক ভাব রচনাগুলিতে নিহিত আছে তা মানুষের সম্পদে পরিণত হয় একমাত্র তখনই, যখন রচনাগুলি পড়া হয় শিশুবয়সে। রূপকথা লেখা হয়েছে শিশুদেরই জন্য।

আমাদের পাঠ ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ: উল্লিখিত রূপকথা ও গল্পগুলি ছিল আমার কণ্ঠস্থ। বই আমি হাতে নিতাম একমাত্র ছোটদের ছবি দেখানোর উদ্দেশ্যে। রূপকথা বলার মতো পাঠও ছিল কল্যাণজনক মানবিক অনুভূতি ও জ্ঞানবুদ্ধি শিক্ষাদানের এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

কোন রকম অতিশয়োক্তি না করে বলা যায় যে শৈশবে পঠন — সর্বোপরি, মনোগঠনের শিক্ষা, শিশুচিত্তের অন্তরতম প্রদেশে মানবিক ঔদার্যের স্পর্শলাভ। শব্দ যখন মহৎ ভাবধারার উদ্‌ঘাটন ঘটায় তখন তা চিরকালের জন্য শিশুহৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করে আর সে বীজ থেকেই সৃষ্ট হয় বিবেক।

রূপকথার ধারানুসরণ — আমাদের 'আশ্চর্য দ্বীপ'

শিশুদের আকর্ষণ করে অসাধারণ ঘটনা — ভ্রমণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রোমান্স, প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আমি যখন ছেলেমেয়েদের প্রথম রবিন্‌সন ক্রুসোর গল্প বলি তখন তাদের ইচ্ছে হল ভ্রমণকারী সেজে খেলে, সাগরের ঢেউয়ের আওয়াজ আর জলপ্রপাতের গর্জন শোনে। ওরা ঠিক করল নিজস্ব একটা 'আশ্চর্য দ্বীপ' বানাবে — সেটা হবে এক রহস্যময় নিভৃত কোণ, যেখানে খেলার জগতে বাস করা যেতে পারে। দ্বীপটা আমরা গড়লাম কাঁটাঝোপ আর বাবলার ঝাড়ের মধ্যে: সেখানে আমরা রবিন্‌সনের কুটির তৈরি করলাম, কুটিরের চারধারে বন্য জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বেড়া দেওয়া হল; বাসস্থানটি ছিল আমাদের কাহিনীর নায়কের চুল্লি সমেত বাসস্থানেরই মতো। ছোট একটি জানলা করা হল — সেখান থেকে দেখা যেত কূলকিনারাহীন বিশাল 'সমুদ্র'। ছেলেমেয়েরা সামান্য খানিকটা জমি খুঁড়ে সেখানে কয়েক দানা গম আর যব বুনে দিল। কোলিয়া বাড়ি থেকে এখানে ছাগলছানা পর্যন্ত নিয়ে আসত, কেননা রবিন্‌সনের গেরস্থালিতে ছাগলও ছিল। ওরা পুরনো পিপে, দড়িদড়া, ইট নিয়ে এলো। পিপের চারধারের লোহার পাত দিয়ে ওরা ছুরি তৈরি করল, ওরা মাছ ধরার জালও বানাল। আদিম শিকারীদের মতো দু'খণ্ড শুকনো কাঠে কাঠে ঘষাঘষি করে আগুন জ্বালাত — এমনও ত হতে পারত যে রবিন্‌সনের কাছে আগুন জ্বালানোর আর কোন উপকরণ ছিল না!

যে গর্তটা থেকে আমরা কুটির তৈরির জন্য মাটি তুলতাম, বৃষ্টির সময় সেখানে জল জমে একটা ছোটখাটো পুকুর সৃষ্টি

হল। ছেলেমেয়েরা জলের মধ্যে দাপাদাপি করল, ওদের কল্পনায় সেটা হয়ে দাঁড়াল এক বিশাল সমুদ্র। আর সমুদ্র থাকলে জাহাজও থাকতে হবে। বাচ্চারা পুসি-উইলোর কাঠ পেয়ে নৌকো বানাতে লেগে গেল। কাজটা সোজা ছিল না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা সফল হল। নৌকোয় পাল খাটানো হল, নৌকো এখন যাত্রা করল।

শিশুকল্পনায় ছোট টিলাটা হয়ে দাঁড়াল বিরাট একটা পাহাড়। তার ওপারে আমরা গড়লাম লিলিপুটদের দেশ। প্লাইউড আর নলখাগড়া দিয়ে আমরা তৈরি করলাম শহর — লিলিপুটদের রাজধানী, মাটি দিয়ে বানালাম ঘোড়া, গোরু ও ভেড়ার মূর্তি, বানালাম লোককথার নায়ক ইলিয়া মুরোমেৎস ও তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মূর্তি। মূর্তিগুলো ঝোপের ভেতরে রাখলাম। ঝোপটা হল প্রাচীন রুশদেশের গহন অরণ্য। এখানে আমরা গ্রীষ্মকালের শান্ত সন্ধ্যায় আসতাম, প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হত সাহসী, বীরোচিত মহাবীর সম্পর্কে রূপকথা বলে।

দুর্ভেদ্য ঝোপের গভীরে প্রবেশ করে আমরা খাড়া পাড়ের ঢালে একটা গর্ত দেখতে পেলাম — এ হল দুষ্ট পিশাচের গুহা, ওখানে, রহস্যময় গহন প্রদেশে কোথায় যেন কষ্ট ভোগ করছে সুন্দরী রাজকুমারী।

বেশি দূরে ভ্রমণ করা সম্ভব না হলে ঈষদুষ্ণ আবহাওয়ার দিনে অবসর সময় আমরা কাটাতাম 'আশ্চর্য দ্বীপে'। রবিন্‌সনের বাসগৃহের পাশে আমরা একটা কুটির বানিয়েছিলাম। এটা ছিল আমাদের প্রিয় স্থান, যেখান থেকে কল্পনার ডানায় ভর করে আমরা উড়ে যেতাম রূপকথার জগতে। রূপকথার চরিত্ররা আমাদের পাশে পাশে থাকত, আর

যখন ধরণীর বুকে রাত নেমে আসত তখন আমরা যেন শুনতে পেতাম দুষ্ট পিশাচের কোঁ কোঁ গোঙানি আর জুতো পায়ে হুলোর সাবধানী পদক্ষেপ। এখানে বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলত শিশুকল্পনার অগ্নিকণা। ইউরা, গালিয়া, তিনা ও ভিতিয়া এই নিভৃত কোণটিতে অপরূপ সমস্ত রূপকথা রচনা করে। পরিবেশ নিজেই কল্পনার খেলায় উৎসাহ সঞ্চার করে। ভাবনার স্বচ্ছন্দ ও অপ্রতিরোধ্য প্রবাহ চলে, শিশুরা তাদের অনুভূতি প্রকাশের সুস্পষ্ট ভাষা খুঁজে পায়। সোনালি রামধনু সম্পর্কে সেরিওজা যে রূপকথাটি রচনা করে তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

'একবার সন্ধেবেলায় দৈত্য-কামারেরা সূয্যির কাছে এসে বলল: 'সূয্যি, ও সূয্যি, আমাদের লোহার হাতুড়িগুলো ভেঙ্গে গেছে, এখন হাতুড়ি পিটিয়ে রুপোলি সুতো যে বানাব সে উপায় আর থাকছে না। আমাদের নেহাইও পুরনো। আমাদের পৃথিবীতে যেতে দাও, আমরা লোহা নিয়ে আসি।' সূয্যি ওদের পৃথিবীতে যেতে দিল। দৈত্য-কামারেরা মানুষের কাছে যাবে বলে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় মেঘ এসে তাদের পথ আটকে দিল। ওরা মেঘের ভেতর দিয়ে পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখল — পৃথিবী থেকে ওরা অনেক উঁচুতে, এখন কী করে নীচে নামা যায়? সূয্যির কাছে ফিরে এসে ওরা বলল: 'সূয্যি, ও সূয্যি, আমরা পৃথিবীতে নামি কী করে বল তা? কোন একটা সাঁকো-টাকো বানিয়ে দাও।' সূয্যি কালো মেঘের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল তার কিরণ, আকাশে ঝলমল করে উঠল সূয্যির সাঁকো। আর পৃথিবী থেকে লোকে দেখতে পেল সোনালি রামধনু। কামারেরা পৃথিবীতে নেমে লোকের কাছ থেকে লোহা নিল, সূয্যির সেতু বয়ে আবার সূয্যির

কাছে ফিরে এলো। ওদের সাদা দাড়ি দেখামাত্রই সুয্যি সোনালি রামধনু উঠিয়ে নিল, রামধনু মিলিয়ে গেল। এরপর থেকে আকাশে কালো মেঘ দেখা দিলেই সুয্যি লোহা আনার জন্যে দত্যি-কামারদের পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু শীতকালে সোনালি রামধনু দেখতে পাওয়া যায় না, কেননা দিন খুব ছোট আর দত্যি-কামারেরা হাতুড়িও তেমন একটা ঠোকে না।'

আমি খুব খুশি হলাম এই দেখে যে প্রতিটি শিশুই এখানে নিজস্ব রূপকথা রচনা করে। গ্রীষ্মকালের শান্ত সন্ধ্যা চিরকালের জন্য মনে গাঁথা হয়ে থাকে; সূর্যাস্তের পর আকাশে ছাইরঙের আভা ধরে। এই রকম সন্ধ্যা বছরে কয়েক দিন হয়, যখন গ্রীষ্ম চলে তুঙ্গে। মনে হয় আকাশ নিজেই বুঝি মৃদু প্রভা বিচ্ছুরণ করে, এই সব সন্ধ্যায় গোধূলি সাধারণ গোধূলির তুলনায় দীর্ঘ হয়, আকাশে তারা জ্বলতে অনেক সময় লাগে। ...শিশুরা প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্যে নির্বাক। এই সব মুহূর্তে বিশেষ করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কল্পনার অগ্নিকণা। আমরা নিনার মুখে শুনতে পাই রূপকথা:

'সুয্যি মায়াকাননে চলে গেল বিশ্রাম করতে। বিশ্রাম করার জন্যে শুয়ে পড়ল, কিন্তু চোখ বন্ধ করতে ভুলে গেল। এদিকে দত্যি-কামারেরা ভাবল এখনও বোধ হয় দিন আছে। তারা রুপোলি সুতোয় হাতুড়ির ঘা মারছে ত মারছেই। সুতো গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেল। আকাশে রুপোলি ধুলো উড়তে লাগল, সে ধুলো ঝিকিমিকি জ্বলে...'

এই অপূর্ব রূপকথা শুনে আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের যাদুকরী আকর্ষণ, রূপকথার কল্পমূর্তি — এ সবই শিশুচেতনায় ভাবনার উৎসমুখ খুলে দেয়। এতে আনন্দিত না হয়ে কী আর উপায় আছে? কেন

জানি না, জুনের দীর্ঘ সন্ধ্যার সময়, ছাই ছাই রঙের আকাশ যখন একটা রহস্যময় চাদর বলে মনে হয়, ঠিক তখনই বিশেষ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শিশুকল্পনা।

তৃতীয় শ্রেণী শেষ করার পর ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে হল 'আশ্চর্য দ্বীপে' 'গেরিলা বাহিনীর সদর দপ্তর' স্থাপন করে। যেমন হওয়া উচিত — 'সদর দপ্তরের' স্থান হল মাটির নীচে অর্ধেক-পোঁতা বাড়িতে। মাটি কুপিয়ে সে বাড়ি বানাতে সাহায্য করল ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা। শুরু হল এক আকর্ষণীয় খেলা, সে খেলা চলল কয়েক মাস ধরে। ওদের রাতে খেলার ইচ্ছে হত, তা থেকে নিবৃত্ত করা কঠিন হয়ে পড়ত। ওরা গোপন অনুসন্ধানে যেত, কম্পাস ব্যবহার করতে শিখে ফেলল। ওরা কাঠের 'বন্দুক' আর 'মেশিনগান' তৈরি করে, সামরিক অপারেশনের আগে আগে হুকুম দিত।

শিক্ষার শেষ বছরে রুশ রূপকথা লেখক পাভেল্ বাজভের 'মালাকাইটের ঝাঁপি' শিক্ষার্থীদের মুগ্ধ করে। আমি যখন উরালের আশ্চর্য মণিরত্নের কথা বলি, বলি তামা পাহাড়ের ঠাকরুনের অগণিত ধনরত্ন যেখানে লুকানো আছে সেই গুহার আশ্চর্য সৌন্দর্যের কথা, মালাকাইট খনির কথা তখন বাচ্চাদের চোখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে ওঠে। ওদের ইচ্ছে হল ঐ সময় ওরা সুন্দর, রহস্যজনক, রোমাণ্টিক কিছু একটা করে। কার যেন মাথায় খেলল পান্নার পাতালপুরী বানানোর চিন্তা। আমরা সবুজ, নীল, আসমানী, কমলা, লাল ও বেগনি রঙের কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে লাগলাম, তাই দিয়ে আমাদের গুহার দেয়াল তুললাম। গুহায় ছোট্ট ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প জ্বলে উঠতে দেয়ালে যখন রামধনুর আভা খেলে গেল তখন ছেলেমেয়েরা যে হর্ষাবেশ অনুভব করল তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

এখানে নতুন নতুন রূপকথার জন্ম হল। মানসিক শক্তির শিক্ষা, বিকাশ ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যবোধের শক্তি যে কী বিরাট এখানে আমি সে বিষয়ে আরও নিশ্চিত হলাম। আমার চোখের সামনে ভালিয়া, পেত্রিক ও নিনার ভাবনায় নতুন উচ্ছ্বাস খেলে গেল: ওরা যে রূপকথা রচনা করল তার কল্পনার ঐশ্বর্যে আমি মুগ্ধ হই। লিউদাও এখানে রূপকথা রচনায় যোগ দিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে এই মেয়ের স্বল্পভাষিতার কারণ মানসিক বিকাশের মন্থরতা নয়, কারণ হল তার স্বপ্নচারিতা, ভাবপ্রবণতা।

গীতের আলোকে জাগতিক সৌন্দর্য

'আনন্দ নিকেতনে' জীবনযাত্রার সময় যেমন, তেমনি প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে বিদ্যাশিক্ষার সময়ও আমরা প্রকৃতির সঙ্গীত শুনতাম। এই সঙ্গীত হল শব্দের ভাবব্যঞ্জনার পরম গুরুত্বপূর্ণ উৎস, সুরের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও উপভোগের উৎস। প্রকৃতির সঙ্গীত শুনতে শুনতে শিশুরা মানসিক ভাবে কোরাস গানের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। আমরা যে গান গাইব প্রকৃতিতে তারই সমধর্মী সঙ্গীত যাতে ওরা ধরতে পারে আমি সে চেষ্টা করি।

স্কুলের অনতিদূরেই আছে এক নিভৃত কোণ। এখানে কাচের মতো মসৃণ পুকুরের বুকে এসে পড়ে সন্ধ্যার আকাশের ছায়া, তৃণভূমি থেকে ভেসে আসে পাখিদের কলতান; ফড়িংয়ের দল গুনগুন সুর তুলে স্নিগ্ধ সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা জানায়। ইউক্রেনের সুরকার ইয়া. স্তেপোভোইয়ের 'আমার গোধূলি' গানটি শেখার আগে আমরা এখানে কয়েক বার প্রকৃতির

সঙ্গীত শুনি। এই গানে গোধূলির সৌন্দর্যের অপূর্ব উপলব্ধি সঞ্চারিত হয়েছে। গানটির সুরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা ধরতে পারে সেই সঙ্গীত যা গ্রীষ্মের শান্ত সন্ধ্যায় তাদের মুগ্ধ করে। এই জায়গায়ই আমরা গানটি রপ্ত করলাম। ওদের গান করার ইচ্ছে হচ্ছিল। অতঃপর কয়েক সপ্তাহ বাদে গানবাজনা ও খেলাধুলার ঘরে লোকবাদ্যযন্ত্র সহযোগে ওরা গানটি গাইল। এই গান শিশুদের মনে জাগ্রত করে তুলল গোধূলির সৌন্দর্যের স্মৃতি, তাদের মুখচোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বনের মধ্যে আমরা শুনতাম **রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নের সঙ্গীত।** উঁচু উঁচু গাছপালার পাতায় মৃদু মর্মরধ্বনি ওঠে, কাঠঠোক্রা ঠকঠক আওয়াজ করছে, কোথায় যেন বনকপোত একটানা ডেকে চলেছে, কোকিল কুহু কুহু ডাকছে। এই সঙ্গীত যে অনুভূতি সঞ্চার করে তার ফলে ছেলেমেয়েদের সামনে রুশ সুরকার আন্তন আরেন্স্কির 'কোকিল' গানটির সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে জমায়েত হয়ে গান করার আগ্রহ দেখা দিল। গান তাদের মনোজীবনে স্থান করে নিতে লাগল, গানের অর্থ তাদের মনে উজ্জ্বল ভাবব্যঞ্জনা সঞ্চার করত, মাতৃভূমির প্রতি, পারিপার্শ্বিক জগতের প্রতি তাদের প্রেম জাগ্রত করত।

ভাবাবেগ, সূক্ষ্ম বোধ — এই নামে মানবিক গুণের অস্তিত্ব আছে। তার মূলকথা এই যে পারিপার্শ্বিক জগৎ অনুভবক্ষমতাকে তীব্র করে তোলে। যে মানুষের সূক্ষ্ম বোধ ও ভাবাবেগ আছে সে অপরের দুঃখকষ্ট ও দুর্ভাগ্যকে ভুলতে পারে না। বিবেকের তাড়নায় সে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। গানবাজনা এই গুণের বিকাশ ঘটায়।

নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধে দীক্ষিত মানুষের সহজাত গুণ, অর্থাৎ এই ভাবাবেগের অভিব্যক্তি ভালো কথা, শিক্ষা, উপদেশ ও শুভকামনা গ্রহণের ক্ষমতায়। যদি চান, কথা **বাঁচতে শেখাক**, যদি চান যে আপনাদের ছেলেমেয়েরা ভালো হওয়ার চেষ্টা করুক, তাহলে ছোটবেলায়ই তাদের মনের মধ্যে ভাবসংবেদনা সঞ্চার করুন। শিশুমনে অসংখ্য যে-সমস্ত উপকরণ প্রভাব বিস্তার করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী — সঙ্গীত। **সঙ্গীত ও নীতিজ্ঞান** — এ হল এমনই সমস্যা যার জন্য গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

গীত — কবিসুলভ বিশ্বদৃষ্টি প্রতিষ্ঠা করে। আমার মনে আছে, একদিন গভীর লৌকিক অনুভূতিতে সমৃদ্ধ গান করার পর আমরা স্তেপে গেলাম। আমাদের সামনে উন্মুক্ত হল কূলকিনারাহীন সাগরের মতো গমের খেত, দিগন্তে দেখা যাচ্ছে নীল নীল প্রাচীন টিলা, হলুদ শস্যখেতের মাঝখান দিয়ে সরু ফিতের মতো চলে গেছে পথ, নীল আকাশে ভারুই পাখি গান গাইছে। ছেলেমেয়েরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারা যেন তাদের নিজেদের দেশের মাটির এই জায়গাটাকে আজ প্রথম দেখতে পেল। আমি অনুভব করছিলাম: এই মুহূর্তে প্রতিটি শিশুর মনের ভেতরে বাজছে দেশী গানের শব্দ। গান যেন জন্মভূমির সৌন্দর্যকে চোখ খুলে দেখতে শেখায়, আর এই সৌন্দর্য হয়ে ওঠে আরও আপন, আরও প্রিয়।

দেশী গান শিশুদের সামনে জনগণের অমূল্য আন্তর সম্পদরূপে মাতৃভাষার শব্দের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে। গীতের কল্যাণে শিশুরা শব্দের ধ্বনিগত সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

রুশ লেখক তলস্তয়, চেখভ, গোর্কি, করলেঙ্কো, গাইদার, চুকোভ্স্কি, পুশ্কিন ও শেভ্চেঙ্কোর কবিতা ও আমেরিকান লেখক জ্যাক লণ্ডনের গল্প এবং এণ্ডারসন ও গ্রিম-ভাইদের রূপকথা — এগুলি পাঠ করার মতোই এমন কিছু কিছু সঙ্গীতসৃষ্টি শোনা আমার কাছে অত্যাবশ্যক বলে মনে হচ্ছিল যেগুলির রেকর্ড গোড়ার দিকে আমাদের কাছে বড়ই কম ছিল। গানবাজনা শোনাকে বাদ দিয়ে শিক্ষা, শৈশবেই কোন সুরের প্রতি অনুরাগ ছাড়া মানুষের শিক্ষাদীক্ষা আমার ধারণায় আসত না। আমাদের 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের কাজের শুরুতে শিক্ষকমণ্ডলী কয়েকটি টেপ করা ও রেকর্ড করা রচনা সংগ্রহ করেন। আমরা এটাকে বড় রত্নভাণ্ডার রূপে গণ্য করি। এহেন রত্নভাণ্ডার শিশুদের কাছে মানবজাতির আন্তর সম্পদের পরিপূর্ণ ধারণা সৃষ্টি করতে পারছে না, এই ভেবে আমরা অত্যন্ত দুঃখ পেতাম। আমার শিক্ষার্থীদের প্রথম শিক্ষাবর্ষের শেষ দিকেই আমরা ৭টি গান ও ২০টি বাজনার একটি সংগ্রহ করে ফেলি। আমরা বিশেষ করে সঙ্গীত শোনার উদ্দেশ্যে সপ্তাহে দুবার করে গানবাজনার ঘরে আসতাম। কতকগুলি সুর ও গান ছেলেমেয়েদের পরিচিত হয়ে যায়, 'আনন্দ নিকেতনে' থাকতেই সেগুলি তাদের মনোজীবনে প্রবেশ করে।

বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করার সময় চার বছরের মধ্যে এই সংগ্রহ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাটা বেশি নয়, কিন্তু আমি সংখ্যার দিকে তেমন নজর দিই না; আমি সর্বোপরি চেষ্টা করি যাতে মানবজাতির (বিশেষত ইউক্রেনীয় ও রুশ জনগণের) সঙ্গীত ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী শিশুদের মনোজীবনে স্থান পায়, যাতে একই রচনা বারবার শোনার

ফলে ছোটদের সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা গড়ে ওঠে, তাদের মননক্রিয়া ও ভাবজীবনের উপর ছাপ পড়ে।

এক মাসে শিশু না হয় একটা নতুন সুরই শুনুক, কিন্তু এই সুরটিই তার কাছে সারা জীবনের জন্য হয়ে দাঁড়াবে অন্তরের পরিতৃপ্তি। নিত্যনতুন সঙ্গীত চিত্তবিনোদন করে মাত্র, হৃদয়ে কোন ছাপ রাখে না। তাই এ ধরনের ভুরিভোজনের প্রশ্রয় আমি দিই না।

আমার ছেলেমেয়েরা চার বছর ধরে শোনে: মিখাইল গ্লিন্কার 'রুস্লান্ ও ল্যুদ্মিলা' অপেরা থেকে 'চের্নোমোর-এর মার্চ-সঙ্গীত', শার্ল গুনোর 'ফাউস্ট' অপেরার মার্চ-সঙ্গীত, এডওয়ার্ড গ্রিগের 'নরওয়ের নৃত্য' ও 'কোবোল্দ', পিওত্র চাইকোভ্স্কির 'নাট ক্র্যাকার' ব্যালে থেকে 'ঘাসে লাগে সবুজের ছোঁয়া', 'রাখাল-বালকদের নৃত্য' ও 'দ্রাজে পরীর নৃত্য', 'কাঠের সৈন্যদের মার্চ', 'প্রাচীন ফরাসী গান', 'শিশুগীতি', 'কামারিন্স্কায়া', 'মরাল সরোবর' ব্যালে থেকে 'খুদে মরালদের নৃত্য', নিকোলাই রিম্স্কি-কর্সাকভের 'জার সাল্তানের রূপকথা' অপেরা থেকে 'ভ্রমরের ওড়া', 'তিনটি আশ্চর্য' নামে খণ্ডিতাংশ, রবার্ট শুমানের 'আমুদে চাষী', এডওয়ার্ড গ্রিগের 'বামন-ভূতদের নাচ', ইসাক দুনায়েভ্স্কির 'স্টার্লিং পাখিরা উড়ে এলো', কিরিল স্তেৎসেন্কোর 'শেয়াল, বেড়াল আর মোরগ' অপেরার খণ্ডিতাংশ, নিকোলাই লিসেঙ্কোর 'শীত ও বসন্ত' নামে অপেরার খণ্ডিতাংশ, ল্যুডভিগ-ভান বীঠোভেনের 'বাবাক', সুইস গান 'কোকিল', পোল গান 'পাখিদের কলতান', ইউক্রেনীয় লোকসঙ্গীত, হাঙ্গেরীয় লোকসঙ্গীত 'নাইটিঙ্গেল', রুশ লোকসঙ্গীত 'মাঠে ছিল বার্চ গাছ দাঁড়িয়ে', দ্মিত্রি

কাবালেভ্স্কির 'পাইওনিয়র দল', আর্কাদি অস্ত্রোভ্স্কির 'পাইওনিয়র', ভানো মুরাদেলির 'পাইওনিয়র ক্যাম্পফায়ার', 'কমরেড ওগো সবে সাহসে বাড়াও পা' (পুরনো বিপ্লবী গানের গ্রিগোরি লবাচিওভ কৃত মার্জিত রূপ), 'নিদারুণ বন্দীদশা করিছে পীড়ন' (লেনিনের প্রিয় গান)।

সঙ্গীতের ভাবমূর্তিতে যে বাস্তব বিষয় কিংবা কাল্পনিক দৃশ্যের প্রকাশ ঘটেছে সঙ্গীত শোনার আগে আমি সে-সম্পর্কে বলতাম। বিবরণের তাৎপর্য বিরাট ছিল: বিবরণ যেন শিশুদের রচনা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তুলত। যেমন, 'দ্রাজে পরীর নৃত্য' শোনার আগে আমি ছেলেমেয়েদের শোনালাম হফ্‌ম্যানের প্রাচীন রূপকথা, যার ভিত্তিতে সুরকার সৃষ্টি করেছেন তাঁর ব্যালে। উজ্জ্বল, ব্যঞ্জনাময় ভাষায় আমি শিশুদের মনে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি মধুর স্বভাবের, হালকা, ফুরফুরে, লাবণ্যময়ী এই পরীটির রূপ। আমি ওদের বলি: 'তোমরা স্ফটিকের ছোট ছোট ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পাবে। এই বাজনা তৈরি করছে অপূর্ব পরীর আশেপাশের পরিবেশ। আমি অলৌকিক পুরীর উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হাল্‌কা, ছিমছাম থামগুলোর কথা মনে মনে ভাবছি।' ছেলেমেয়েরা বাজনা শোনে, তারপর পরীর প্রাসাদ সম্পর্কে কার কী ধারণা তা বলে। কল্পনায় আঁকা হয় পুকুর, ফোয়ারা, ছায়াঘন উপবন আর রহস্যজনক গুহা। কল্পমূর্তিগুলি আরও একবার বাজনা শোনার আগ্রহ জাগায়।

বিশেষত যে-সমস্ত সঙ্গীতসৃষ্টি শিশুদের কাছে পরিচিত নয় সেগুলির ভাষ্য দিতে গেলে বেশ কৌশল আর শিক্ষাকর্মে উঁচুদরের দক্ষতা থাকা চাই। কখনই বিস্মৃত হলে চলবে না যে সঙ্গীতের ভাষা হল অনুভূতির ভাষা। লোকসঙ্গীতে শব্দের

কোন কৌশল থাকে না, সময় সময় শব্দ একেবারেই সাদামাঠা; কিন্তু সে জিনিসও শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে একমাত্র সুরের গুণে। সঙ্গীতের শিল্পরূপের মূলকথা বিশ্লেষণ করতে গেলে সুরকারের শিল্পরূপায়ণের উপায়ে যে বিশেষত্ব আছে তা শিক্ষককে বুঝতে হবে। ব্যাখ্যাকে হতে হবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক পূর্ণাঙ্গ শৈল্পিক বিবরণ, শিশুরা শিক্ষকের মুখ থেকে সে বিবরণ শুনবে। এই বিবরণকে এমন হতে হবে যে তা অনুভূতি জাগ্রহ করবে, সহমর্মিতা উদ্রেক করবে, কল্পনায় উজ্জ্বল চিত্র সৃষ্টি করবে।

আমার গভীর বিশ্বাস এই যে সঙ্গীতের সৌন্দর্য — ভাবনার বিপুল উৎস। সঙ্গীতের সুরের প্রভাবে শিশুর কল্পনায় যে সব উজ্জ্বল রূপ গড়ে ওঠে সেগুলি যেন ভাবনাকে সঞ্জীবিত করে, তার অসংখ্য ধারাকে এক খাতে প্রবাহিত করে। শিশুরা কল্পনায় যা গড়েছে, যা অনুভব করেছে তা কথায় আঁকতে চেষ্টা করে। যে-সমস্ত শিশুর মানসিক বিকাশের গতি মন্থর তাদের কাছে সঙ্গীত শোনা ছিল ভাবনার এক যথার্থ শক্তিশালী উৎস। আমি চেষ্টা করি যাতে গানবাজনা শোনার পর ছেলেমেয়েরা অবশ্য যার যার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে।

গানবাজনার ঘরে আমরা বাঁশি বাজাতাম, যে সব সুর আমাদের ভালো লাগত সেগুলি শিখতাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাদের শখের শিল্পীদের চক্রে বাঁশি বাজানোয় যোগ দেয় আমার ৯ জন শিক্ষার্থী, আর অন্যান্য ক্লাস থেকে আরও ৪ জন। ছেলেমেয়েরা নিজেরাই বাদ্যযন্ত্র তৈরি করত। বাঁশি তৈরিতে সত্যিকারের ওস্তাদ ছিল সেরিওজা, ইউরা, তিনা ও লিদা। ওরা কুঞ্জবনে গিয়ে উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করত, কাটা ডাল ছায়ার মধ্যে কোথাও রেখে দিত, যন্ত্রের আওয়াজ

পরখ করে দেখত, স্পষ্ট ও সুরেলা আওয়াজ বার করত। তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের দুটি অ্যাকর্ডিয়ান ও তিনটি বেহালা এলো। ইউরা, সেরিওজা, ফেদিয়া, লিদা, তিনা, লারিসা, সানিয়া, শুরা অ্যাকর্ডিয়ান ও বেহালা বাজাতে শিখল। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার শেষে ১৯ জন ছেলেমেয়ের বাড়িতে অ্যাকর্ডিয়ান ও বেহালা ছিল। তাই বলে বাঁশির কথা ওরা ভুলে গেল না। কোন কোন ছেলেমেয়ের সঙ্গীতপ্রবণতাও দেখা দিল। কিন্তু আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পৃথক পৃথক প্রতিভাকে শিক্ষিত করে তোলা নয়, আমার উদ্দেশ্য ছিল সব শিক্ষার্থীই যেন সঙ্গীত ভালোবাসে, যেন সকলের কাছেই তা হয় মনের চাহিদা।

ছেলেবেলায় যা একবার হাতছাড়া হয়ে গেছে কৈশোরে, এবং পরিণত বয়সে ত বটেই, সে ক্ষতি আর কখনও পূরণ হওয়ার নয়। শিশুর মনোজীবনের সর্বক্ষেত্রে, বিশেষত নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। শিশুকালে সৌন্দর্য গ্রহণের, উপলব্ধির ক্ষমতা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী পর্বের তুলনায় অনেক গভীর। সুন্দরের প্রতি চাহিদা শিশুর মনোজীবনের সমগ্র গঠনপ্রকৃতি, সমষ্টির মধ্যে তার পারস্পরিক সম্পর্ক বহুলাংশে নির্ধারণ করে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য হল শিশুকে এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে তার মনে সুন্দরের প্রতি আগ্রহ জাগ্রহ হয়। সুন্দরের প্রতি চাহিদা নৈতিক সৌন্দর্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটায়, ইতর ও কুৎসিত যাবতীয় বস্তুর প্রতি আপসহীন ও অসহনীয় মনোভাবের জন্ম দেয়।

'যে মানুষের হাতে বেহালা আছে সে মন্দ কাজ করতে পারে না,' ইউক্রেনের প্রাচীন জ্ঞানী, চিন্তাবিদ গ্রিগোরি

স্কভরোদা (১৭২২-১৭৯৪)-র নামে এই উক্তিটি প্রচলিত আছে। অনিষ্টকারিতা ও যথার্থ সৌন্দর্য পরস্পরবিরোধী। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলতে গেলে, শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল প্রতিটি শিশুর হাতে বেহালা তুলে দেওয়া, যাতে প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে কী ভাবে সঙ্গীতের জন্ম হয়। একালে গানবাজনা রেকর্ডিং ও প্রচারের কারিগরি উপায় যখন এতটা সর্বজনীন চরিত্র অর্জন করেছে তখন শিক্ষার এই কর্তব্যটি বিশেষ অর্থবহ। দেখতে হবে, নবীন প্রজন্ম যেন কেবল সৌন্দর্যের গ্রাহকই না হয়—এটা কেবল নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার নয়, নৈতিক শিক্ষারও সমস্যা বটে।

শিশুর মনোজীবনে গ্রন্থ

শিশুর মনোজীবনে গ্রন্থের ভূমিকা বিরাট—তবে কেবল তখনই যখন সে ভালোমতো পড়তে শেখে। 'ভালোমতো পড়তে শেখার' অর্থ কী? অর্থ হল সর্বোপরি, প্রাথমিক দক্ষতা—পড়ার কৌশল আয়ত্তে আনা। আমি চেষ্টা করি যাতে ব্যক্তিগত ভাবে পাঠের অভ্যাস শিশুর অন্তরের তাগিদ হয়ে দেখা দেয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রত্যেক সপ্তাহে ও দু'সপ্তাহে একবার করে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগার থেকে বই নিয়ে উচ্চারণ করে করে পড়ত। এছাড়া স্বচ্ছন্দ পাঠের ও পঠিত বিষয়োপলব্ধির সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় ক্ষমতা গড়ে উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকতেই প্রতিটি শিশুর হল একটি করে নোটবুক—'শব্দের ঝাঁপি'। যে-সমস্ত শব্দ ছেলেমেয়েদের মনে ধরত কিংবা দুর্বোধ্য ঠেকত (পরে আমি ওদের সেই শব্দের অর্থ কিংবা ভাবব্যঞ্জনা ব্যাখ্যা করে বলতাম) সেগুলি তারা

নোটবুকে টুকে রাখত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পৃথক পৃথক শব্দ ছাড়াও যে-সমস্ত বাক্যরীতি, বাক্যাংশ ও বাক্য ওদের মনে ধরত সেগুলি ওরা 'শব্দের ঝাঁপিতে' লিখত।

অন্তরের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির উৎস হিশেবে পাঠ—পড়তে জানার মধ্যেই শেষ হয় না, এখানে তার শুরু মাত্র। শিশু হয়ত কোন রকম ভুল না করে স্বচ্ছন্দে পড়তে পারে, কিন্তু প্রায়ই এমন হয় যে গ্রন্থ তার কাছে মানসিক, নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের শিখরে আরোহণের পথ হল না। পড়তে জানার অর্থ হল শব্দের অর্থ ও সৌন্দর্যের প্রতি, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। কেবল সেই শিক্ষার্থীই 'পাঠ করে', যার চেতনায় শব্দ খেলা করে, শিহরণ জাগায়, পারিপার্শ্বিক জগতের বর্ণে ও সুরে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। পাঠ হল এমন এক বাতায়ন যার মধ্য দিয়ে শিশু জগৎকে এবং নিজেকেও দেখতে পায় ও উপলব্ধি করে। এই বাতায়ন শিশুর সামনে উন্মুক্ত হয় একমাত্র তখনই যখন পাঠের সঙ্গে সঙ্গে একই তালে, এমন কি বই প্রথম খোলার আগেই শুরু হয় শব্দের উপর শ্রমসাধ্য কাজ। শ্রম, খেলাধুলা, প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা, সঙ্গীত, সৃজনকর্ম—শিশুদের সক্রিয় কার্যকলাপের, মনোজীবনের সকল কেন্দ্র এই কাজের অন্তর্ভুক্ত। সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী সৃজনী শ্রম ব্যতিরেকে, রূপকথা ও কল্পনা, খেলাধুলো ও সঙ্গীত ব্যতিরেকে শিশুর মনোজীবনের অন্যতম ক্ষেত্ররূপে পঠনকর্মকে কল্পনা করা যায় না। বাচনভঙ্গি ও মননক্রিয়া বিকাশের বনিয়াদ—একাধারে ভাবনার সজীব উৎসমুখে 'পর্যটন' এবং শব্দের ভাবমূলক ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা। ভাষার সৌন্দর্য এবং গ্রন্থে রূপায়িত শৈল্পিক ঐশ্বর্য উপলব্ধির ক্ষমতাবলে উক্ত ব্যঞ্জনা বোধগম্য হতে থাকে।

প্রথম শব্দ পাঠ করার আগে শিশুকে শুনতে হবে শিক্ষক ও মা-বাবার পাঠ, অনুভব করতে হবে শিল্পরূপের সৌন্দর্য। 'নিসর্গপর্যটনকে' গ্রন্থ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। শিশু যদি গ্রন্থে পঠিত শব্দের সৌন্দর্য অনুভব করতে না পারে তাহলে সে পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য দেখতে পাবে না। শিশুর হৃদয় ও চেতনার অভিমুখী পথ গেছে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী দুটি দিক থেকে: গ্রন্থ থেকে, পঠিত শব্দ থেকে মুখের ভাষার দিকে এবং ইতিপূর্বেই শিশুর মনোজীবনে যে জীবন্ত শব্দ প্রবেশ করেছে সেখান থেকে গ্রন্থের দিকে, পাঠের দিকে, লিখিত বিষয়ের দিকে। শিশু যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে নম্বর পাওয়ার জন্য নয়, পঠন ও লিখন যে মনোজীবনের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়—শিখতে ও পড়তে না শিখলে যে সে বহু আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে এই কারণবশতই লেখাপড়া শেখে, তার জন্য পঠন ও লিখনের ভাবগত ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্তুতি পরম গুরুত্বপূর্ণ।

আমার ছেলেমেয়েরা 'আনন্দ নিকেতনে' থাকতেই আঁকা ছবিতে এবং চিত্রপরিচয়স্বরূপ ভাবগর্ভ রচনায় পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য বিষয়ে অনুভূতি ও ভাব প্রকাশ করে। এই ঘটনাটিই পঠন ও লিখনের ভাবগত ও নন্দনতাত্ত্বিক প্রস্তুতির ফল বলা যেতে পারে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় 'নিসর্গপর্যটন' আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ নয়, তা হল শব্দের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশের উপায়। শব্দ, মানসিক শিক্ষা, শিক্ষাসংক্রান্ত পরম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস—শিশুকে ভাবতে শেখানো, বস্তু, বিষয় ও ঘটনার পারস্পরিক ক্রিয়া লক্ষ্য করতে, প্রকৃতি থেকে, প্রত্যক্ষ রূপ ও ধারণা থেকে বিমূর্ত

ধারণা গড়ে তুলতে, সাধারণীকরণ করতে শেখানো—এ সব যদি না থাকত তাহলে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি, রং ও ধ্বনির খেলার প্রতি, জীবনের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের প্রতি শিশুরা উদাসীন থাকত।

আমি চেষ্টা করি যাতে প্রথম শ্রেণীতেই পঠন ব্যাপারটি অন্তরের তাগিদে পরিণত হয়, যাতে তা শব্দকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণের ও উচ্চারণের কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যমূলক অনুশীলনীতে পর্যবসিত না হয়। যে জিনিস শিশুর বিকাশস্তরের উপযোগী — তার মানসিক, ভাবগত ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের উপযোগী—সেই সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ বিকাশের সহায়ক, একমাত্র সেই জিনিসই তার অন্তর্লোকে স্থান পেতে পারে। কী পড়া উচিত তা ঠিকমতো বাছাই করা—শিক্ষকের পরম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। দুঃখের বিষয়, পঠনের জন্য নির্দিষ্ট বইগুলিতে এমন বহু শিল্পসম্মত মূল্যবান বস্তু বাদ থাকে যা শিশুদের বোধের অধিগম্য। শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার তিন মাস বাদে আমরা পঠনের জন্য নির্দিষ্ট বইয়ের বাইরে আকর্ষণীয় রূপকথা ও গল্প পড়া ধরলাম।

আমি ছেলেমেয়েদের 'ইউক্রেনীয় ও রুশ রূপকথা' পড়তে দিই। ওদের ইউক্রেনীয় লৌকিক রূপকথা 'খড়ের বাছুর' পড়ার জন্য তালিম দিই—রূপকথার বিষয়বস্তু বলতে গিয়ে বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের সাহায্য নিই। বাচ্চারা বই খোলে। একজনের পর একজন রূপকথা পড়ে। একই জিনিস যতবারই পড়া হোক না কেন, ছেলেমেয়েদের কাছে রীতিমতো আকর্ষণীয়—ওদের একঘেয়ে লাগে না, কেননা প্রত্যেকের কাছেই পাঠ—অনুশীলনীর পুনরাবৃত্তি নয়, তা হল সুস্পষ্ট উজ্জ্বল রূপ সম্পর্কে গভীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি; প্রতিটি শিশু

শব্দে আরোপ করে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বোধ। শিশুরা যখন সকলে পর পর গেয়ে চলে একই কোন গান, যার কথা ও সুর তাদের প্রবল উদ্দীপিত করে, তখন তাদের যেমন মনোযোগ দেখা যায়, একই পাঠ বারবার শোনার ক্ষেত্রেও তেমনি। একেক জনে একেক ভাবে গায়, প্রত্যেকের কাছে কথা অর্জন করে নিজস্ব ব্যঞ্জনা, অনুভূতি, উপলব্ধি ও ধারণার নিজস্ব সূক্ষ্মতা। এ ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে শব্দ শুনতে হয় সঙ্গীতের মতো, সুরের মতো।

আবেগপ্রবণ সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত পাঠের তালিম দেওয়ার ব্যাপারে যেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে শিশু যেন বহুবার ভাবনার উৎসমুখে উপনীত হয়, যেন শব্দের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। যেমন, শিক্ষার্থী পড়ল এই বাক্যটি: 'বাছুর চলল অন্ধকার বনে, সেখানে তার সামনাসামনি এগিয়ে এলো এক ছাইরঙা নেকড়ে।' 'অন্ধকার বন' শব্দগুলির সঙ্গে শিশুচেতনায় সম্পর্কিত হয়ে আছে অবিস্মরণীয় চিত্র: বনের মধ্যে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার, রাতের রহস্যময় মর্মর ধ্বনি, বজ্রপাতের পূর্বমুহূর্তে গাছের পাতার অস্থির আওয়াজ। তার কানে যখন 'অন্ধকার বন' কথাগুলি পৌঁছুল তখন এ সবই স্থান পেল তার মনোজীবনে, চলতে থাকে উজ্জ্বল রঙের খেলা, বয়ে চলে নিসর্গ সঙ্গীতের ধ্বনিতরঙ্গ। কী ভাবে পড়া উচিত, উচ্চারণ করা উচিত, কোথায় কী রকম ঝোঁক দেওয়া উচিত — শিক্ষকের এ সব কোন ব্যাখ্যাই তাকে ভাবাবেগের ঐশ্বর্যমণ্ডিত পঠনরীতি শেখাতে পারে না, যদি সে জীবন্ত শব্দ ও ভাবনার উৎসমুখে যাওয়ার পথ না জানে।

স্কুলে কাজ করার প্রথম দিন থেকেই আমি সতর্ক থাকি যাতে শিশুদের হাতে একটাও খারাপ বই না পড়ে, যাতে তারা

বাস করতে পারে এমন সমস্ত আকর্ষণীয় রচনার জগতে, যেগুলি কোন জাতির, তথা সমগ্র মানবজাতির সংস্কৃতিভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে। কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ: মানুষ সারা জীবনে ২০০০-এর বেশি বই পড়তে পারে না—অতএব শৈশবে এবং কৈশোরের প্রথম পর্বেই গভীর ভাবনাচিন্তা করে পাঠের বিষয় বাছাই করা উচিত। শিশু না হয় অল্পই পড়ল, কিন্তু দেখতে হবে প্রতিটি গ্রন্থই যেন তার হৃদয়ে ও চেতনায় গভীর ছাপ রেখে যায়, মানুষ যেন বারবার তার দ্বারস্থ হয় আর প্রতিবারই আবিষ্কার করে অন্তরের নব নব ঐশ্বর্য। এখানে যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে শিশু যেন ভাবব্যঞ্জক পাঠ থেকে সন্তোষ ও তৃপ্তি বোধ করে। শব্দের অনুরণনের মধ্যে নিহিত আছে তার শক্তি ও সৌন্দর্য, তাই শব্দের ভাবব্যঞ্জনা উপলব্ধি যাতে শ্রুতিতে গ্রহণ থেকে—ভাবব্যঞ্জক পাঠ থেকে আসে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম শ্রেণীতেই আমাদের শিশু গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। এতে ছিল ৪টি বিভাগ। প্রথম বিভাগে ছিল এমন সমস্ত গল্পের সংগ্রহ যেগুলি আমার দৃষ্টিতে, শিশুদের নৈতিক, মানসিক ও নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষার পরম মূল্যবান উপকরণস্বরূপ। (প্রতিটি বই আমরা ১৫টি করে কপি কিনি, যাতে ক্লাসে পড়ার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে একটি করে বই থাকে)। এই বিভাগটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪ বছর শিক্ষাকালের পরিকল্পনামাফিক গঠিত। যে সব গল্পগ্রন্থে শিশুর পক্ষে বোধগম্য, গভীর মানবিক ভাবাদর্শের উজ্জ্বল শিল্পমণ্ডিত রূপায়ণ ঘটেছে সেগুলি এখানে স্থান পায়। এখানে সেগুলির নাম উল্লেখ করা গেল: লেভ তলস্তয়ের 'হাঙ্গর', 'লাফ', 'ককেশাসের বন্দী'; পিওত্‌র ইয়ের্শোভ—'কুঁজো ঘোড়া';

ভাসিলি জুকোভ্স্কি — 'ঘুমন্ত রাজকুমারী', 'সাইক্লোপদের গুহায় ওডেসিউস'; দ্মিত্রি মামিন-সিবিরিয়াক — 'শিকারী ইয়েমেলিয়া', 'কনকনে ঠান্ডায় শীতের কুটির', 'ধনী ও ইয়েরিওম্কা', 'পালিত সন্তান'; হান্স ক্রিস্টান এন্ডারসনের 'বুড়ো আংলা', 'কুৎসিত হাঁসের বাচ্চা', 'রাজার নতুন সাজ'; ভিক্তর হিউগোর 'লে মিজারেবল' থেকে 'কোজেতা', 'গাভ্রোশ'; গ্রিম-ভাইদের — 'হেন্কেল ও গ্রেটেল', 'কুঁড়ে হান্স', 'তিন ভাগ্যবান'; আলেক্সান্দর পুশকিন — 'জার সাল্তানের রূপকথা', 'মৃত রাজকুমারীর রূপকথা', 'স্টেশন মাস্টার', 'আন্চার', 'কয়েদী', 'দাইমা', 'পাখি', 'শীতের সন্ধ্যা'; ইয়ানুশ কর্চাক — 'আবার যখন ছোট হব'; ভ্লাদিমির করলেঙ্কো — 'ভূগর্ভের শিশুরা'; নিকোলাই নেক্রাসভ — 'কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়ে', 'ইয়াকভ খুড়ো', 'মাজাই দাদু আর খরগোশ'; ইভান তুর্গেনেভ — 'কোয়েল'; দ্মিত্রি গ্রিগরোভিচ — 'সার্কাসের ছেলে'; ভ্সেভলদ গারশিন — 'সিগন্যাল'; আলেক্সান্দর কুপ্রিন — 'স্টার্লিং পাখি'; কন্স্তান্তিন স্তান্যুকোভিচ — 'মাক্সিমকা', 'দাইমা', 'পলায়ন'; আন্তন চেখভ — 'কাশ্তান্কা', 'সাদা কপালে', 'ভান্কা', 'পলাতক', 'ছেলেরা', 'বহুরূপী'; হেন্রিখ সেন্কেভিচ — 'বাজিয়ে ইয়াঙ্কো'; জ্যাক লন্ডন — 'কিশের কিংবদন্তী'; মার্ক টোয়াইন — 'টম সইয়ারের অ্যাড্ভেঞ্চার'; মাক্সিম গোর্কি — 'পেপে', 'পার্মার শিশুরা', 'ইয়েভ্সেইকার যা ঘটেছিল', 'ইলিয়ার ছেলেবেলা', 'সকাল'; আর্কাদি গাইদার — 'চুক আর গেক', 'দূর দূর দেশ', 'তিমুর ও তার দলবল'; ভ্লাদিমির বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ — 'লেনিন ও শিশুরা'; আর্খিপ তেসলেন্কো — 'স্কুলের ছাত্র', পানাস মির্নি — 'মরোজেঙ্কো'; ইভান

ফ্রাঙ্কো — 'গ্রিৎসের স্কুলে শিক্ষা', 'পেন্সিল'; আলেক্সান্দর কনোনভ — 'লেনিনের কথা'; ল্যুবোভ কস্‌মোদেমিয়ান্‌স্কায়া — 'জোইয়া ও শুরার কাহিনী'; 'পাইওনিয়র নায়কদের কাহিনী'; দ্‌মিত্রি বেদ্‌জিক — 'ওলেগ কশেভয়ের ছোটবেলা'; ভালেন্‌তিন কাতায়েভ — 'রেজিমেণ্টের ছেলে'; আন্দ্রেই গলোভ্‌কো — 'পিলিপ্‌কো', 'লাল রুমাল'।

এ ধরনের রচনাপাঠ শিশুদের পক্ষে কেবল বিশ্ব-উপলব্ধি নয়, কেবল স্থায়ী অভ্যাস ও দক্ষতা আয়ত্তের সহায়ক অনুশীলনীই নয়, আবেগধর্ম ও নীতি শিক্ষার পাঠশালাও বটে। প্রতিটি গ্রন্থ শিশুমনে গভীর ছাপ রেখে যায়। মামিন-সিবিরিয়াকের অপূর্ব কাহিনী 'কনকনে ঠাণ্ডায় শীতের কুটির' শিশুমনে বিরাট ছাপ ফেলে। সকলের কাছে পরিত্যক্ত এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ নির্জন তাইগায় কুটির বেঁধে দিন যাপন করছে — তাকে নিয়ে এই কাহিনী। এ ধরনের রচনা পাঠের পর পারিপার্শ্বিক জগতের ঘটনার প্রতি ছেলেমেয়েদের সংবেদনশীলতা যে কত তীব্র হয়ে ওঠে তা আমি দেখেছি।

গল্প আমরা যেমন ক্লাসে পড়তাম, তেমনি ক্লাসের বাইরেও পড়তাম। সমষ্টিগত ভাবে শোনার জন্য আমরা যে সঙ্গীতসংগ্রহ গড়ে তুলেছিলাম এই গ্রন্থাগারটি তারই সঙ্গে তুলনীয়।

আমাদের ক্লাসের গ্রন্থাগারের দ্বিতীয় বিভাগে ছিল আমাদের বর্তমানকাল সম্পর্কে, সোভিয়েত জনসাধারণের শ্রম সম্পর্কে, শান্তির জন্য সংগ্রাম, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে বীরদের কীর্তি আর খুদে বীরদের সম্পর্কে আধুনিক রুশ ও ইউক্রেনীয় লেখকদের রচনা।

আমার শিক্ষার্থীরা প্রবল আগ্রহের সঙ্গে সোভিয়েত

সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ করে—সেগেই মিখালকভ ও সামুইল মার্শাকের কবিতা, আর্কাদি গাইদার, লেভ কাসিল, নিকোলাই নোসভ, মারিয়া প্রিলেজায়েভা, বরিস জিত্‌কোভ ও অন্যান্যদের লেখা গল্প তারা পাঠ করে।

তৃতীয় বিভাগে ছিল রূপকথা, কবিতা ও নীতিগল্প। এই বইগুলি পড়া হত কেবল ক্লাসের বাইরে। প্রত্যেকে যার যার পছন্দসই বই বেছে নিত (এ ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের আগ্রহ জাগিয়ে তুলত বইয়ের ভালো ভালো ছবি আর শিক্ষক কিংবা বন্ধুর মুখ থেকে শোনা বিবরণ)।

চতুর্থ বিভাগ—প্রাচীন গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনী। শিশুবোধ্য রীতিতে লেখা এই বইগুলি সংগ্রহ করতে অনেক বেগ পেতে হয়। প্রাচীন জগতের পৌরাণিক কাহিনী শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধের শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পৌরাণিক কাহিনী শিশুদের সামনে যে কেবল মানবসংস্কৃতির বিস্ময়কর পৃষ্ঠাই খুলে ধরে তা নয়, কল্পনাশক্তি জাগ্রত করে, বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটায়, দূর অতীতের প্রতি আগ্রহী হতে শেখায়।

প্রথম শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময় থেকে আমরা সমষ্টিগত পাঠ ধরলাম। আমি কোন একটা বইয়ের সবগুলি কপি ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করি, যাতে ওরা সে বই বাড়িতে পড়তে পারে। এটা ছিল সমষ্টিগত পাঠের প্রস্তুতি। প্রশ্ন হতে পারে যে গল্পের বিষয়বস্তু ইতিমধ্যেই সুপরিচিত, তা পড়ার জন্য কিনা 'রূপকথার ঘরে' যাওয়া? এমন ইচ্ছে ছেলেমেয়েদের কোথা থেকে আসে? আর এটা করাই বা কেন? বরং নতুন কিছু পড়া ভালো নয় কি?

হ্যাঁ, নতুন জিনিস, অপরিচিত জিনিসও পড়া উচিত, আমরা

নতুন নতুন বইও পড়তাম। কিন্তু রচনা অন্তর্লোকে প্রবেশ করে একমাত্র তখনই যখন শিশুর হৃদয়কে যা আলোড়িত করেছে তা সে বন্ধুকে পড়ে শোনাতে চায়, কথার মধ্য দিয়ে নিজের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে চায়। আমাদের গ্রন্থাগারের প্রথম বিভাগের প্রতিটি বই আমরা অন্তত দশ বার উচ্চারণ করে পড়ি, কিন্তু বারবার পড়ায় তার প্রতি আগ্রহ কমত না। কোন বই হয়ত ২-৩ সপ্তাহ আগে পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু ছেলেমেয়েরা তার কথা ভোলে না, তারা আরও একবার বইটা পড়তে চায়, আর বিশেষ করে সেই উদ্দেশ্যে স্কুলে আসে। ৩-৪ মাস কেটে যাওয়ার পর ওদের আবার পড়তে ইচ্ছে হয় ভালো-লাগা বইটি— আবার একসঙ্গে পড়তে বসে।

কিন্তু রচনার সৌন্দর্য ও শক্তি হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপিত করে একমাত্র তখনই যখন পড়তে শেখারও আগে শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা অনুভব করে। ভাবনার সজীব উৎস অভিমুখে 'পর্যটনের' সময় শব্দের মাধুর্য যার কাছে উদ্ঘাটিত হয় নি সে কখনও তার জানা জিনিস একাধিকবার শুনতে চাইবে না।

প্রিয় গল্প পাঠের উপরও আমাদের আলাদা ক্লাস হত। ছেলেমেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে পাঠের জন্য প্রস্তুত হত। প্রত্যেকেই যার যা সবচেয়ে ভালো লাগত, মনে উদ্দীপনা সঞ্চার করত তাই পড়ত।

আমাদের পাঠে বিশেষ স্থান অধিকার করে কবিতা। আমি মন থেকে ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি করে শোনাতাম বিশ্বসংস্কৃতিভাণ্ডারের যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কাব্যসৃষ্টি। পুশ্কিন, লেরমন্তভ, জুকোভ্স্কি, নেক্রাসভ, আফানাসি ফেত্, তারাস শেভ্চেঙ্কো, লেসিয়া উক্রাইন্কা, ফ্রিডরিখ শিলার, আদাম

মিৎস্‌কেভিচ, হেন্‌রিখ হাইনে, পিয়ের-জাঁ বেরান্‌জে এবং অন্যান্য কবিদের কবিতা। যে সব কবিতা ছেলেমেয়েদের মনে ধরে সেগুলি মুখস্থ করার ইচ্ছে তাদের হয়। ৪ বছরে শিক্ষার্থীরা বহু কবিতা মুখস্থ করে ফেলে। কিন্তু কাব্যিক শব্দের অনুরণন অনুভব না করা পর্যন্ত তারা কখনই শিখতে যেত না।

ভালো কবিতায় থাকে শব্দ, রূপ আর গীতধ্বনির সৌন্দর্যের সমন্বয়। ছেলেমেয়েরা যাতে খুব ছোটবেলাতেই সৌন্দর্যসম্পদের এই ঐক্য অনুভব করতে পারে আমি তার ওপর জোর দিই: ওদের রুশ ও ইউক্রেনীয় কবিদের কবিতা পড়ে শোনাই। বহুবার আমরা পুশকিনের 'দিব্যবক্তা ওলেগ প্রসঙ্গে গাথা' কবিতা এবং শেভ্‌চেঙ্কোর 'নাইমিচ্‌কা' কবিতা-কাহিনী পড়ি। ছেলেমেয়েরা প্রায় সকলেই এই রচনাগুলি মুখস্থ করে ফেলে (যদিও সবসময় যে বিশেষ ভাবে মুখস্থ করানো হত এমন নয়)। ওরা নিসর্গবর্ণনামূলক অনেক গীতিকবিতাও মুখস্থ করে। ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ প্রিয় ছিল ধারাবাহিক পাঠ। 'স্বপ্নপুরীতে' আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে 'টম সইয়ারের অ্যাড্‌ভেঞ্চার' পড়ি। শিশুদের পরিবেশ তাদের মনে রচনার ছাপ প্রকট করে তোলে। গোর্কির 'ছেলেবেলা', কাতায়েভের 'সাদা পাল একা ঝলকায়' ও বাঝোভের 'মালাকাইটের ঝাঁপি'ও আমরা এই ভাবে পাঠ করি।

অবশেষে আমরা প্রভাতী উৎসব ও সান্ধ্য উৎসব শুরু করলাম ভাবগর্ভ আবৃত্তি দিয়ে। যারা এতে যোগ দিতে চাইত তাদের প্রত্যেককে নিজের প্রিয় গল্প বা কবিতা পাঠের জন্য প্রস্তুত হতে হত। উৎসবে অন্যান্য ক্লাসের বহু ছেলেমেয়ে

এসে জুটত। দেখতে দেখতে এ ধরনের পাঠ সারা স্কুল জুড়ে চলতে লাগল।

বছরে দু'বার — শিক্ষাবর্ষের মধ্য পর্বে ও শেষে — আমরা মাতৃভাষার উৎসব উদ্‌যাপন করতাম। এই উৎসবের কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ঐতিহ্যমূলক হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেমেয়েরা গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের আমন্ত্রণ জানাত, তাঁরাই ঠিক করতেন গল্প বা কবিতা কে সবচেয়ে ভালো আবৃত্তি করেছে। এটা ছিল এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক সৃজনী প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় যে বিজয়ী হত সে বই পুরস্কার পেত। পুরস্কার বিতরণ করতেন বয়োজ্যেষ্ঠ যৌথখামারীরা — তাঁরা মাতৃভাষার মূল্য ও মর্যাদা দিতেন। তাঁরাও রূপকথা বলতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন। এমনও হত যে শিক্ষার্থী ও বয়োজ্যেষ্ঠ যৌথখামারী — দুজনের মুখ থেকেই একই জিনিস শোনা যেত। শিক্ষার চতুর্থ বছরে মাতৃভাষার বসন্তোৎসব দু'দিন ধরে চলে — গল্প, কবিতা ও নীতিগল্প শোনানোর এই প্রতিযোগিতায় যোগদানেচ্ছুর সংখ্যা ছিল এতই বেশি।

গুরুজনদের সঙ্গে — মা, বাবা, ঠাকুমা-দিদিমা ও দাদুদের সঙ্গে — সবসময় মেলামেশার ফলে আরও একটি কৌতূহলজনক ঐতিহ্য দেখা দিল — আমাদের সেরা আবৃত্তিকারেরা বাড়িতে তাদের মা-বাবাকে গল্প-কবিতা পড়ে শোনাতে থাকে, বয়োজ্যেষ্ঠরা ছোটদের পাঠ শোনার জন্য স্কুলে আসতে থাকেন। মাতৃভাষার ভক্ত ও প্রেমিকদের কয়েকটি চক্র গড়ে ওঠে (বয়স্ক এবং পরম শ্রদ্ধের ব্যক্তিবর্গ এই সব চক্রে থাকতেন)। ছোটরা যে এই চক্রগুলির অনেকটা সংগঠক ধরনের এমন চিন্তার ফলে গ্রন্থ ও পাঠের প্রতি আগ্রহ তীব্রতর হয়।

বিদ্যালয়ের সাধারণ গ্রন্থোৎসবও ঐতিহ্যমূলক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম দিনের ক্লাস শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, ৩১ আগস্ট স্কুলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে মা-বাবারাও আসতেন। ঐ দিন সকলে বই উপহার দিত। ছেলেমেয়েরা উপহার দিত একে অন্যকে, মা-বাবারা দিতেন—ছেলেমেয়েদের। এটাও নিয়ম হয়ে দাঁড়াল যে মাতৃভাষার ভক্ত ও প্রেমিকদের চক্রের যারা সেরা পরিচালক, যৌথখামারের পরিচালন দপ্তর ঐ একই দিনে তাদেরও বই উপহার দেবে।

আমি চেষ্টা করি যাতে প্রতিটি শিশু ধীরে ধীরে নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তোলে, যাতে গ্রন্থপাঠ শিশুদের অন্তরের পরম গুরুত্বপূর্ণ তাগিদ হয়ে দেখা দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষার প্রথম দু'বছরের মধ্যেই আমার চেষ্টায় প্রতিটি পরিবারে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। কোন কোন পরিবারের গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা হয়ত ৫০০-র বেশি, কোথাও বা কম, কিন্তু প্রতিটি বাড়িতেই মাসের পর মাস গ্রন্থসম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে চলে। কোন পারিবারিক গ্রন্থাগারে যদি দেখা যেত যে এক মাসে একটি বইও বাড়ে নি তাহলে ঘটনাটা আমার কাছে উদ্বেগজনক মনে হত।

বই থেকে শুরু হয় স্বশিক্ষা, ব্যক্তিগত মনোজীবন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এমন মুহূর্ত আসে যখন এতকাল সবসময় শিক্ষার্থীকে সযত্নে হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর শিক্ষক মনে করেন এবারে হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি বলতে পারেন: 'এবারে নিজে চল, বাঁচতে শেখ।' এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসতে গেলে শিক্ষাতত্ত্বের অগাধ জ্ঞান থাকা দরকার। মানুষকে মানসিক ভাবে আত্মনির্ভর জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে গেলে তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হয় গ্রন্থজগতের সঙ্গে। গ্রন্থকে হতে হবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বন্ধু, গুরু ও প্রাজ্ঞ শিক্ষাদাতা।

আমার মতে, শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কর্তব্য এই যে প্রতিটি ছেলে, প্রতিটি মেয়ে যেন প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করার সময় বই নিয়ে একান্তে কাটানোর—গভীর ভাবনাচিন্তার আগ্রহ অনুভব করে। একান্তে — তার মানে কিন্তু নিঃসঙ্গ নয়। এ হল ভাবনাচিন্তা, অনুভূতি, মত ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বশিক্ষিত করে তোলার সূত্রপাত। আর তা সম্ভব একমাত্র তখনই যখন খুদে মানুষটির জীবনে গ্রন্থ অধিষ্ঠিত হয় অন্তরের তাগিদ রূপে। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমি জেনে নিতাম কোন্ ধরনের বইয়ে ছেলে বা মেয়ের আগ্রহ, কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তর সে বইয়ের ভেতরে খোঁজে—বিচক্ষণ পরামর্শ দেওয়ার জন্য, ছেলেমেয়েরা যাতে যার যার নিজের বই পেতে পারে সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করার জন্য আমাকে এ সব জানতে হত।

স্কুল সংস্কৃতির যথার্থ লালনাগার হয় একমাত্র তখনই যখন তাতে বিরাজ করে চারটি বিষয়ের প্রতি গভীর ভক্তি— মাতৃভূমি, মানুষ, গ্রন্থ আর মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি।

আমার শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ শুরু করার অনেক আগে থাকতেই কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন কাজ সে কথা আমি অনেক শুনেছি। লোকে আমাকে বলেছে: 'ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে সহজ। কিন্তু ছোট বাচ্চা যখন কৈশোরে পেঁছায় তখন তার এমন পরিবর্তন হয় যে তাকে চেনার জো নেই। উদারতা, অনুভূতিপ্রবণা, লাজুক স্বভাব 'নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দেখা দেয় রূঢ়তা, রুক্ষতা, ঔদাসীন্য।' পরবর্তীকালে আমি দেখতে পেলাম এই কথাগুলি কতই না ভুল। কিশোর বা কিশোরীর ভেতরে যা সদ্‌গুণ তা 'নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়' সেই ক্ষেত্রে যখন তা আদৌ গড়ে ওঠে

নি, যখন শিক্ষাদাতা মনে করেন যে সদ্‌গুণ শিশুর সহজাত। শিশুকাল থেকে যদি গ্রন্থের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা শিশু না পায়, যদি পাঠ সারা জীবনের জন্য তার অন্তরের তাগিদ না হয়ে দাঁড়ায় তাহলে কৈশোরে তার হৃদয় হয়ে থাকবে ফাঁকা, আর কোথা থেকে যেন সেখানে এসে জুড়ে বসবে যত রাজ্যের মন্দ জিনিস।

মাতৃভাষা

আমাদের ইউক্রেনবাসীদের মাতৃভাষা হল ইউক্রেনীয় ভাষা। বর্তমানে ৩ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু আমাদের জাতির ঐতিহাসিক ভাগ্য এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে ভ্রাতৃপ্রতিম রুশ জাতির ভাষাও আমাদের একান্ত আপন ও প্রিয়। দুই সমগোত্রীয় ভাষা বহু সূত্রের সাহায্যে পরস্পর বিজড়িত। এর ফলে যেমন মাতৃভাষা তেমনি রুশ ভাষাও আয়ত্তে আনা একাধারে সহজসাধ্য আবার কষ্টসাধ্যও বটে। এমন শত শত শব্দ আছে যেগুলি শুনতে দুই ভাষাতেই এক, অথচ অর্থে ভিন্ন। এমন শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যেখানে একই শব্দ ইউক্রেনীয় ভাষায় এক রকমের ভাবব্যঞ্জনা বহন করে, আবার রুশ ভাষায় — আরেক রকমের। যে শব্দ এক ভাষায় করুণরস উদ্রেক করে অন্য ভাষায় কখনও কখনও তা বহন করে বিদ্রূপাত্মক অর্থ। উভয় ভাষায় শব্দের ভাবগত ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যের, বর্ণিমার এই যে খেলা তা আমাদের অর্থাৎ ইউক্রেনীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্রতীদের কাছে আন্তর সম্পদের উৎস হয়ে দেখা দিয়েছে, আর আমাদের

কর্তব্য হল সে সম্পদকে নবপ্রজন্মের হাতে তুলে দেওয়া।

ভাষা হল জাতির আন্তর সম্পদ। 'আমি তত বেশি পরিমাণে মানুষ, যত বেশি ভাষা আমি জানি,'—এই মর্মে একটি প্রবচন আছে। কিন্তু অন্যান্য জাতির ভাষার রত্নভাণ্ডারে যে সম্পদ আছে তা মানুষের অনধিগম্য থেকে যায় যদি সে মাতৃভাষা না জানে, মাতৃভাষার সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে না পারে। মানুষ যত গভীর ভাবে মাতৃভাষার সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করে ততই সূক্ষ্মতর হয় মাতৃভাষার শব্দের ব্যঞ্জনা গ্রহণের ক্ষমতা, ততই বেশি করে তার বুদ্ধি অন্যান্য জাতির ভাষা আয়ত্তের উপযোগী হয়ে ওঠে, হৃদয় ততই সক্রিয় ভাবে গ্রহণ করে শব্দের সৌন্দর্য।

আমি চেষ্টা করি যাতে এই সঞ্জীবনী উৎস—মাতৃভাষার সম্পদ—শিশুদের বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম পদক্ষেপ থেকে তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়। ভাব ও ভাষার জীবন্ত উৎস অভিমুখে 'পর্যটনের' সময় আমার শিক্ষার্থীরা একই কালে মাতৃভাষা ও রুশ ভাষার ভাবগত, নন্দনতাত্ত্বিক ও অর্থগত ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করে। তারা যাতে ভাষার সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে, শব্দ ব্যবহারে যত্নপর হয়, শব্দের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে আমি সেদিকে দৃষ্টি রাখি।

মানুষের ভাষার পরিচ্ছন্নতা — তার মানসসংস্কৃতির দর্পণস্বরূপ। শিশুর উপর প্রভাব বিস্তারের, তার অনুভূতি, হৃদয়, ভাবনা ও উপলব্ধিকে মহিমান্বিত করার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপকরণ হল মাতৃভাষার সৌন্দর্য ও মহিমা, শক্তি ও ভাবগর্ভতা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, যেখানে পারিপার্শ্বিক জগতের নতুন ঘটনার সঙ্গে প্রতিটি পরিচয় শিশুহৃদয়ে বিস্ময়ের অনুভূতি উদ্রেক করে, সেখানে এই উপকরণের ভূমিকা যে কতখানি তা বলে শেষ করা যায় না।

আমরা প্রকৃতির বুকে বিচরণ করি—বনে, বাগানে, মাঠে, তৃণভূমিতে, নদীতীরে যাই—আমার হাতে পড়ে শব্দ হয় হাতিয়ার, যার সাহায্যে পারিপার্শ্বিক জগতের ঐশ্বর্য সম্পর্কে আমি ওদের সচেতন করে তুলি। দেখা ও শোনা জিনিসের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা শব্দের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মর্ম গ্রহণ করে আর শব্দের মারফতে সৌন্দর্য তাদের মনে প্রবেশ করে। 'নিসর্গপর্যটন' ছিল সৃষ্টির প্রথম প্রেরণা। নিজেদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের, সৌন্দর্যের বিবরণদানের বাসনা শিশুদের মনে জাগে। ওরা প্রকৃতি সম্পর্কে ছোট ছোট রচনা করে, পরে ক্লাসে সেগুলি লেখে। এই রকম কতকগুলি ছোট রচনার দৃষ্টান্ত দেব। প্রথম শিক্ষাবর্ষে শিশুরা এগুলি মুখে মুখে রচনা করে, পরে 'আমাদের মাতৃভাষা' খাতায় কিংবা নিজস্ব খাতায় লেখে।

ভারুই পাখির গান (লারিসা)

নীল আকাশে একটা ছাইরঙা ডেলা কাঁপছে। এ হল ভারুই পাখি। আমি ওর আশ্চর্য গান শুনি — শুনে শুনে আর আশ মেটে না। ও যেন খুব সরু সরু রুপোর তারে বাজনা বাজাচ্ছে। সোনালি গম থেকে সূয্যিব দিকে তার টেনে ধরে। গমের শীষ কান পেতে ওর গান শোনে।

সূয্যি পাটে গেল (সেরিওজা)

সূয্যি পাটে গেল। মাঠ আঁধার হয়ে এলো। খাত থেকে মাঠ আর ঘাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসে সাঁঝের আঁধার। গড়াতে থাকে নদীর ধারার মতো। এদিকে পপ্লার গাছের মাথায় ঝকমকিয়ে ওঠে ফুলকি। তার মানে সূয্যি তার শেষ নমস্কার জানাচ্ছে। ফুলকি জ্বলেই নিভে গেল। আজকের মতন বিদায়, সূয্যিমামা!

মৌমাছি জল পান করে (গালিয়া)

আমি মৌমাছিদের জল পান করা দেখেছি। সরু নলখাগড়ার গা বয়ে ফোঁটা জল এসে পড়ে পুসি-উইলোর মোলায়েম গুঁড়ির ওপর। গুঁড়িটা ভিজে। মৌমাছিরা গুঁড়ির গন্ধ ভালোবাসে। ওরা গুঁড়িতে উড়ে এসে বসে, জল পান করে। সোনালি পাখনা ঝাড়ে। একটুখানি জিরোও গো মৌমাছিরা, তোমাদের ত আবার অনেক দূর যেতে হবে।

বাক্‌ হুইট গাছে শীষ ধরছে (ভারিয়া)

বাক্‌ হুইট গাছে শীষ ধরছে। খেত যেন সাদা গ্যালিচায় ঢাকা। কিন্তু এই গালিচাটা জ্যান্ত, কী চমৎকার তার গন্ধ! প্রতিটি ফুলের ওপর — মৌমাছি। গালিচাটা গুন্‌গুন্‌ করছে — আসলে গুন্‌গুন্‌ করছে মৌমাছিরা। বিরাট একটা ঝোপড়া ভোমরা এসে বসল একটা ফুলের ওপর। গাছের ডাঁটা কেঁপে উঠল, নুইয়ে পড়ল। ভোমরা আর বসে থাকতে পারল না, পড়ে গিয়ে রাগে গোঁগোঁ করতে লাগল।

কম্বাইন-ড্রাইভার (ইউরা)

আমার কাকা কম্বাইন-ড্রাইভার। উনি বিরাট গাড়ি চালান। তাঁর সামনে — গম। ধারাল ফলাগুলো গম গাছের গোড়া কাটে, গম মাড়াই-মেশিনে চালান করে। মাড়াই-মেশিনে গম মাড়াই হয়। গমের দানা সরু ধারায় বাঙ্কারে গিয়ে পড়ে। গাড়ি এসে শস্য নিয়ে যায় মাড়াইয়ের জায়গায়। অনেক সাদা রুটি হবে।

আমাদের মাড়াই-মেশিন (ভানিয়া)

আমাদের ইশ্‌কুলে একটা ছোট্ট, এইটুকুন মাড়াই-মেশিন আছে। ছেলেমেয়েরা ইশ্‌কুলের জমিতে গমের ফসল তোলে। পাঁচটা আঁটি বাঁধে। ছোট্ট মাড়াই-মেশিন গোঁগোঁ আওয়াজ তুলল। গম মাড়াই হয়ে গেল। গম থলিতে পোরা হল। এই গম আমরা বুনব।

আপেল গাছে ফুল ধরেছে (পাভ্‌লো)

ওঃ, আপেল গাছে যখন ফুল ধরে তখন বাগান কী সুন্দরই না দেখায়! সাদা সাদা ফুল পাপড়ি মেলে ধরেছে সূর্যের সামনে। একটু একটু বাতাস ফুলগুলোকে নাড়া দিতে ওরা ঝমঝম আওয়াজ তুলেছে। যেন রুপোলি ঘণ্টা। গোটা বাগানে ঝমঝম আওয়জ উঠছে, বাগান সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর বাতাস যখন শান্ত হয়ে আসে তখন শোনা যায় মৌমাছিদের গুনগুনানি। ওরা গাছগুলোর ওপর ওড়ে। খুঁজে বার করে সবচেয়ে গলাবাজ ঘণ্টাগুলোকে। বাগান গান গেয়ে ওঠে, যেন বেজে ওঠে শয়ে শয়ে বাজনার তার। মৌমাছি ঘণ্টার ওপর বসে, পা নাড়ায়, পাখা ঝাড়ে। ঘণ্টার ওপর মেঘের মতো উড়তে থাকে সোনালি পরাগ।

দাশা মাসীর খামারে (কোলিয়া)

আমরা দাশা মাসীর খামারে গিয়েছিলাম। মাসী তিরিশটা গোরু দোয়ায়। বিরাট কেঁড়ে ভর্তি দুধ। দুধ যায় মাখন তৈরির কারখানায়। সেখানে দুধ থেকে তৈরি হয় মাখন।

সাঁঝের বেলায় সারসেরা ডাকে (তিনা)

সূর্য পাহাড়ের আড়ালে ডুবে গেল। নীল আকাশে উড়ছে সারসেরা। ওরা ডাকছে, বলছে: 'পেন্নাম হই গো সবুজ মাঠ, আমরা এসেছি গরম সাগর থেকে।' গাছের ডালপালা নড়েচড়ে উঠল, সবুজ ঘাস সরসর করে উঠল। কলকল করে উঠল পুকুর: 'পেন্নাম, সারসভায়ারা, গরম সাগরে কী দেখলে বল।'

সাঁঝ-আঁধারি মিষ্টি দাদু (সানিয়া)

আকাশে তারারা জ্বলে উঠল। খাত থেকে বেরিয়ে এলেন সাঁঝ-আঁধারি মিষ্টি দাদু। থুত্থুরে বুড়ো, ঝুপসি-লোমশ। হাতে লাঠি। চলেছেন গাঁয়ের পানে। এসে ঢোকেন ঘরে। গরম, তুলতুলে তালুতে বাচ্চাদের ধরেন। বাচ্চাদের ঘুম পায়। ওরা ভালো ভালো স্বপ্ন দেখে।

(এ হল সেই সানিয়া, যে 'আনন্দ নিকেতনে' থাকতেই সন্ধ্যার 'আধা-অন্ধকার' নিয়ে রূপকথা বানিয়েছিল। এখন সেই রূপকথা শিশুর স্মৃতিতে আবার সজীব হয়ে উঠেছে)।

কুজমা খুড়ো (ফেদিয়া)

আমরা কুজমা খুড়োর কাছে গিয়েছিলাম। উনি ঘরবাড়ি বানান। ইট দিয়ে বাড়ির দেয়াল গড়েন। এখন বানাচ্ছেন দোকানঘর। কুজমা খুড়ো ইতিমধ্যে পঞ্চাশটা দালানকোঠা বানিয়েছেন। সেগুলোতে বহু লোকজন বাস করে। তিনি বলেন: 'আমার ঘরবাড়ি দুশ' বছর বাঁচবে। বহু লোক মনে করে বলবে, কী কারিগরই না আমাদের কুজমা খুড়ো!'

স্নোড্রপ ফুল (কাতিয়া)

সূর্যি বনকে জাগিয়ে দিল, গলিয়ে দিল দেবদারু গাছের মাথায় তুষারকণা। গরম ফোঁটা বরফের ওপর গিয়ে পড়ল। বরফের স্তূপ আর শুকনো পাতার ভেতর দিয়ে চলে গেল। যেখানে ফোঁটা পড়ল সেখানে দেখা দিল সবুজ ডাঁটা। তাতে ফুটল নীল রঙের ঘণ্টাফুল। বরফের দিকে তাকায় আর অবাক হয়ে যায়: 'ঘুমটা কি বড় সকাল সকাল ভেঙ্গে গেল না?' 'না সকাল সকাল নয়, সময় হয়ে গেছে,' পাখিরা গান গেয়ে বলল। বসন্ত শুরু হল।

সূর্যি আর মেঘ (তোলিয়া)

সোনালি খেত। প্রত্যেকটা শীষে খেলা করছে সূর্যি। মাঠ, মাঠ, তুমি কী সুন্দর! কিন্তু এই দেখ, মেঘ ভেসে এলো তোমার দিকে। সূর্যি ঢেকে দিল। শীষের ওপরে সোনালি ফুলকিগুলো নিভে গেল। মাঠ হয়ে গেল ছাইঢালা। কেউ যেন ছাইরঙা কম্বল দিয়ে মাঠ ঢেকে দিল। শিগ্‌গির মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো সূর্যিমামা। শীষেরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরাও তোমার পথ চেয়ে আছি সূর্যিমামা!

আকাশ থেকে তারা খসে (লন্‌বা)

আগস্ট মাসে আকাশ থেকে তারা খসে। আঁধার বনের ভেতরে আছে বিরাট একটা ফাঁকা জমি। তারা আকাশ থেকে গিয়ে পড়ল সেইখানে। ফুটে উঠল লাল টুকটুকে ফুল।

আমাদের ক্লাসঘরে আরামের গরম (সাশা)

আমাদের ক্লাসঘরে ভারি আরামের গরম। গরম ব্যাটারি আছে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে চলে জল। মাটির নীচের ঘরে — বয়লার। বিরাট এক চুলোয় জ্বলছে কয়লা। মাটির নীচ থেকে এই কয়লা খুঁড়ে এনেছে খনিমজুরেরা। রেলপথে ওরা কয়লা আমাদের কাছে নিয়ে আসে। মাটিতে ফেলে। তারপর তোলা হয় ট্রাকে, ট্রাকে করে কয়লা নিয়ে আসা হয়েছে আমাদের ইশ্‌কুলে। আমরা আরামের গরম পাচ্ছি, কেননা খনিমজুর আর রেলের লোকজন কাজ করছে।

শীতের ময়না (মিশা)

গত শীতে ময়নারা আর গরম জায়গায় গেল না। ওরা কী করে জানল যে তেমন হিম পড়বে না? আমি দেখলাম, সন্ধেবেলায় পাখিরা বড় বড় ঝাঁকে জড় হয়ে এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে বেড়ায়। ওরা খোঁজে কোথায় একটু গরম পাওয়া যায়। ওরা ভয়ে চিঁচিঁ করে। বরফঝড় যখন উঠল তখন ময়নারা উড়ে এলো আমাদের চালাঘরের ভেতরে। এখানে-ওখানে সব জায়গায় বসল, এমন কি গোরুর পিঠের ওপরও। আর হিমের দিনে যে দিন রোদ ওঠে সে দিন ওরা বরফের ভেতরে স্নান করে। ময়না ঢেলার মতো পড়ে নরম বরফের স্তূপের ভেতরে, বরফে ডুবে যায়। তারপর বরফের স্তূপ থেকে বেরিয়ে আসে, ফুর্তিতে কিচিরমিচির করে।

ফার গাছ (দাঙেকা)

আমি আর মা মিলে টেবিলের ওপর ফার গাছ বসালাম। গাছটাকে খেলনা দিয়ে সাজালাম। নীচে দাঁড় করিয়ে দিলাম তুষার দাদুকে। রাত

হল। বাইরে ফটফটে চাঁদের আলো। আমার দেখতে সাধ হল তুষার দাদু কী করে। দাদু লাঠিটা হাতে তুলে নিল, ফার গাছ থেকে সরে দাঁড়াল, তারপর টেবিলের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটে আর ককায়। এদিকে ডালপালার ওপর সাদা সাদা তুষারকণারা কী নিয়ে যেন ফিসফিস করে। ছাইরঙা খরগোশছানা ডালের ওপর ঘাপটি মেরে বসে ছিল। ফার গাছ থেকে যেই না লাফ মারা, অমনি গিয়ে পড়ল তুষার দাদুর থলির ভেতরে। নতুন বছরের উপহারটা যা হবে!

ইউহিম দাদু (ল্যুদা)

আমার দাদু ইউহিম বন লাগানোর কাজ করেন। আজ পঁচিশ বছর হল তিনি যৌথখামারে কাজ করছেন। গাঁয়ের ওপারে ওক বন। এই ওকগুলো ওঁর, উনি ওগুলো লাগান। দাদু বলেন: ওঁর ওক তিনশ' বছর বাঁচবে। আমিও আমার ওকচারা লাগাব।

পাজী মাকড়সা (কোস্তিয়া)

ভাণ্ডার ঘরের এক অন্ধকার কোণে জাল পেতে রেখেছে মাকড়সা। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ও কী করে। মাকড়সা দেয়ালে ঘাপটি মেরে রয়েছে, একটু একটু দাঁড়াগুলো নাড়ে। যেন জালটায় দোলা দিচ্ছে। একটা মাছি উড়ে এলো, গুনগুন আওয়াজ করতে করতে। মাকড়সা মুখ ঘুরিয়ে কান পেতে শোনে। মাছি মাকড়সার জালের সঙ্গে ধাক্কা খেল, জালে জড়িয়ে গেল। তার গুনগুন আওয়াজ পিনপিনে আর করুণ হয়ে উঠল। মাকড়সা সঙ্গে সঙ্গে মাছির দিকে ছুটে আসে। না, মাছিটাকে মারবি বলে তুই যে ভেবেছিস পাজী মাকড়সা, তা আর পারবি না। আমি মাকড়সার জাল ছিঁড়ে মাছিকে ছাড়িয়ে দিই। যা, উড়ে যা, আর হ্যাঁ, দেখিস কখনও যেন পাজী মাকড়সার জালে পড়িস নে।

টমেটো (স্লাভা)

সবুজ ঝোপে লাল টমেটো। সকাল বেলায় টমেটোগুলো ফোঁটা ফোঁটা শিশিরে ঢাকা। প্রতিটি ফোঁটায় খেলা করে সোনালি সূর্য। একটা

সাদা প্রজাপতি এসে লাল টমেটোর ওপর বসল। মৌমাছি গুনগুন করে। মৌমাছি ভাবে ওটা বুঝি একটা বিরাট লাল ফুল। মৌমাছি টমেটোর ওপর পাক খেয়ে উড়ে চলে গেল।

ছেলেমেয়েদের এই রচনাগুলি—বড় রকমের কাজের ফল। বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া দরকার ভাব ও ভাষার জীবন্ত উৎসমুখে; পারিপার্শ্বিক জগতের বস্তু ও ঘটনা সম্পর্কে ধারণা যাতে ভাষার মাধ্যমে কেবল তাদের চেতনায় নয়, হৃদয়ে এবং অন্তরেও পেঁছায় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। শব্দের ভাবগত ও নন্দনতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণিমা—এরই মধ্যে নিহিত আছে শিশুদের সৃজনকর্মের সঞ্জীবনী উৎস। শিশুর চেতনায় শব্দ অধিষ্ঠান করে উজ্জ্বল রূপ নিয়ে, এই কারণে ক্লাসে নিজেদের রচনা লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বর্ণনার পরিপূরক হিশেবে আঁকে ছবি।

পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্যের প্রভাবে শিশু তৎক্ষণাৎ প্রবন্ধ রচনা করবে এমন আশা করা অন্যায়। সৃজনকর্ম কোন সহজাত প্রেরণার পথে শিশুদের কাছে আসে না। সৃজনকর্ম শেখাতে হয়। শিশু একমাত্র তখনই রচনা করবে যখন সে শিক্ষকের কাছ থেকে প্রকৃতির বর্ণনা শুনতে পাবে। প্রথম যে রচনা আমি ছেলেমেয়েদের পড়ে শোনাই সেটা রচিত হয় এক শান্ত সন্ধ্যায়, পুকুরের ধারে। প্রত্যক্ষ রূপকে কী ভাবে ভাষার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা যায় শিশুরা যাতে তা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে আমি সে ব্যাপারে যত্ন নিই। প্রথম প্রথম ওরা আমার নিজের রচনাটা আওড়ায়, পরে প্রকৃতির যে-সমস্ত দৃশ্য তাদের উদ্দীপিত করে, তারা স্বাধীন ভাবে সেগুলির বর্ণনা দিতে থাকে—এই ভাবে শুরু হয় শিশুদের

ব্যক্তিগত সৃজনকর্ম। এই কাজে যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হল শব্দের ভাবগত নন্দনতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা অনুভব করার ক্ষমতা। শিশু কেবল তখনই রচনা করতে শিখবে যখন তার সামনে প্রতিটি শব্দ—একেকটি তৈরি ইটের মতো, আর সেই ইটের জন্য স্থানও আগে থেকে প্রস্তুত। ছেলেমেয়েরাও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যে ইটটি দরকার ঠিক সেটিই নির্বাচন করে। তারা প্রথম যে শব্দটি হাতের সামনে পেল সে শব্দই ব্যবহার করে না। তাদের ভাবগত ও নন্দনতাত্ত্বিক সংবেদনশীলতার ফলে তা সম্ভব নয়।

প্রবন্ধ রচনা ব্যাপারটি আমার শিক্ষার্থীদের প্রিয় কাজ হয়ে দাঁড়াল। তারা যা কিছু দেখে, অনুভব করে, সেগুলির বর্ণনা দিতে চায়। শিশুদের কাছে শব্দ পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্যের প্রতি তাদের সম্পর্ক প্রকাশের উপায় হয়ে দেখা দেয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে তারা যে-সমস্ত রচনা লেখে সেগুলির বিষয় হল তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুরা—যৌথখামারী ও শ্রমিকেরা, সোভিয়েত মানুষের শ্রম, আপেল গাছের ফুটন্ত কুঁড়ি, নিস্তেজ ডেইজী ফুল, হেমন্তকালের রুপোলি মাকড়সার জাল আর যৌথখামারের বাগানে আপেল সংগ্রহ। ৪ বছর সময়ের মধ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থী ৪০-৫০টি ছোট ছোট প্রবন্ধ রচনা করে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষাবর্ষে ছেলেমেয়েরা যে-সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করে সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

এমন প্রেরণাশক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন যা সৌন্দর্যসৃষ্টি প্রয়াসের মতো এত বেশি শ্রমে প্রবৃত্ত করতে পারে। দলের সকলে এই প্রয়াসে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। এমন একটি বাচ্চাও ছিল না যে গাছপালার পরিচর্যা না করত। প্রথম গ্রীষ্মে প্রকৃতি আমাদের শ্রমে প্রসন্ন হল না, কিন্তু ছেলেমেয়েরা স্বপ্নে

বিভোর হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বছরের গ্রীষ্মকালে লন্ মসৃণ সবুজ গালিচায় পরিণত হল, মেঠো ফুল ফুটল। আর তৃতীয় গ্রীষ্মে আমাদের জায়গাটা সবুজ গাছপালা আর ফুলের রাজ্য হয়ে গেল। ছেলেমেয়েরা এখানে জমায়েত হয়ে রূপকথা পড়ত, শোনাত।

কাচের ওপর বরফের ফুল কোথা থেকে আসে (তানিয়া, চতুর্থ শ্রেণী)

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম: 'জানলার কাচের গায়ে বরফের ফুল কোথা থেকে আসে?' মা বললেন: 'তুষার দাদুর ছোট্ট নাতিটি আঁকে। রাতে সে দাদুর সঙ্গে হাঁটে, জানলার ওপর চিত্রবিচিত্র করে।' কী করে সে কাজটা করে আমার তা দেখার ইচ্ছে হল। ঘুমোতে গেলাম, কিন্তু চোখ বন্ধ করলাম না। সব্বাই ঘুমিয়ে পড়ল। জানলার বাইরে গাছ ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করে। ছোট একটা ছেলে জানলার দিকে এগিয়ে এলো। সে জানলার ওপর রুপোলি পেন্সিল বুলায় আর নীচু গলায় গান করে। দেখলাম আশ্চর্য এক ফুল এ'কে ফেলেছে। ইয়া চওড়া চওড়া পাতা আর ছোট ছোট পাপড়ি। সকালে সূয্যি খেলা শুরু করল, ফুলটা যেন একেবারে জ্যান্ত। জানি না এটা স্বপ্ন, না সত্যি সত্যিই দেখেছিলাম।

শীতের মাঝখানে ফুলের রাজ্য (গালিয়া, তৃতীয় শ্রেণী)

শরৎকালে হট্ হাউস-এর পাশে ফুটল চন্দ্রমল্লিকা। চন্দ্রমল্লিকা ঠান্ডার কুয়াসাকে ডরায় না। কিন্তু উত্তর থেকে এলো হিম। বাল্‌তির জল জমে গেল। চন্দ্রমল্লিকাকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে হয়। আমরা ফুলগাছগুলোকে টবে বসিয়ে হট্ হাউস-এ এনে রাখলাম। ডাঁটাগুলো ছেঁটে দিলাম। গাছ আবার সবুজ হয়ে উঠল, তারপর গাছে ফুল ফুটল। সকালে আমি জেগে উঠতেই দেখতে পেলাম বাইরে বরফ। বরফ আর সূর্য। আমি ছুটে গেলাম হট্ হাউস-এ। চন্দ্রমল্লিকা ফুটছে—সাদা, ফিকে নীল, ঘন নীল। এদিকে কাচের বাইরে বরফ। চন্দ্রমল্লিকা খটখটে আলোর দিকে চেয়ে হাসছে।

আমরা কী ভাবে মাঠ থেকে গেলাম (পাভ্‌লো, দ্বিতীয় শ্রেণী)

গরমকালে মা'র সঙ্গে মাঠে গিয়েছিলাম খড় আনতে। মা খড়ে গাড়ি বোঝাই করলেন। দড়ি দিয়ে খড়ের গাদা বাঁধলেন। ঘোড়াগুলো ধীরে ধীরে চলতে লাগল। আমরা বসে ছিলাম খড়ের গাদার অনেক অনেক ওপরে। সূর্য ডুবল, আকাশে জ্বলে উঠল তারা। আমি খড়ের গাদার ওপর শুয়ে পড়লাম, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের ঘোড়ার গাড়ি এখন আর ঘোড়ার গাড়ি নয়—যেন একটা বিরাট নৌকো। আমরা ভেসে চলেছি সাগরের ওপর দিয়ে। আমাদের মাথার ওপরে তারা। তারাগুলো একেবারে কাছে। হাত বাড়ালেই যেন ওদের ধরা যায়। দূরে কোথায় যেন সবুজ সাগরতীর। সেখানে গান গাইছে তিতির পাখি, বেহালা বাজাচ্ছে ফড়িংয়ের দল। আমাদের নৌকো থেমে গেল, এদিকে তারাগুলো দুলছে। নৌকো পারে এসে ভিরল। মা উঠে দাঁড়ালেন, আমার কিন্তু আরও শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

শরতের মেঘলা দিন (শুরা, তৃতীয় শ্রেণী)

দিনগুলো হয়ে গেল ছোট, রাতগুলো বড়। ভোরবেলায় নদীর ওপর ভেসে বেড়ায় কুয়াসা। যেখানে সূর্য, সেখানে কেন সূর্যের আলোয় কুয়াসা কেটে যাচ্ছে না? আকাশ থেকে শরতের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। গাছগুলো ডালপালা নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতা খসে পড়ছে। ডালগুলোতে ঝুলছে বড় বড় ফোঁটা। কোথায় যেন কুয়াসার মধ্যে একটানা ডেকে চলেছে গাংচিল। ও হয়ত দক্ষিণে যেতে পারছে না, তাই লোকের কাছে নালিশ জানাচ্ছে। বনের ভেতরে সব চুপচাপ। কাঠঠোক্‌রা কয়েক বার ঠকঠক আওয়াজ করার পর চুপ করে গেল। ওক গাছের সোনালি ফল পাতার ওপর খসে পড়ে। সারা দুনিয়া সাদা কুয়াসায় ঢাকা।

শরৎকাল যখন শুরু হয় (সেরিওজা, চতুর্থ শ্রেণী)

সকালে সোয়ালো পাখিরা চঞ্চল হয়ে গাঁয়ের ওপর ওড়ে। তারপর ওরা বিরাট ঝাঁক বেঁধে জড় হল। সার বেঁধে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের

তারে, আস্তে আস্তে কিচিরমিচির করে কী যেন বলাবলি করতে লাগল। ওরা পরামর্শ করছে কখন গরম জায়গায় যাওয়া যায়। পরের দিন সোয়ালোদের আর দেখা গেল না। ওরা কোথায় উড়ে গেল? কী ভাবেই বা ওরা জানতে পারে যে শরৎ এসে যাচ্ছে? এখনও ত গরমের দিন চলছে। সূর্য দিব্যি তাপ দিচ্ছে। শরতের রোদের কিরণে ঝলমলে সন্ধ্যা আমার ভালো লাগে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে জ্বলতে থাকে সন্ধ্যার টকটকে আলো। পপ্‌লার গাছের পাতাগুলোও মনে হয় লাল টকটকে। এ হল সন্ধ্যার আলোর ঝকমকানি। পুকুরের শান্ত জলও সন্ধ্যায় আলোর মতো ঝকমক করছে। কেবল পুকুরের ওপরে সন্ধ্যার কোলাহল ওঠে: দক্ষিণ থেকে পাখিরা বাস বদল করে আসে, রাত কাটায়। সকালে কুয়াসার চাদরে পুকুর ঢেকে যায়। ঘাসে—শিশির। শিশির কেমন যেন সাদা সাদা, গরমকালের শিশিরের মতো নয়। শুরু হয় শরৎকাল।

জীবনে সবচেয়ে বড় কী (ভারিয়া, চতুর্থ শ্রেণী)

জীবনে সবচেয়ে বড় কী? খনিমজুর বলে, সবচেয়ে বড় হল কয়লা। কয়লা না থাকলে গাড়ি থাকত না, ধাতু হত না, লোকে ঠাণ্ডায় জমে যেত।

ধাতুকর্মী বলে: সবচেয়ে বড় হল ধাতু। ধাতু ছাড়া গাড়ি হত না, কয়লা পাওয়া যেত না, ফসল হত না, জামাকাপড় হত না।

চাষী বলে: সবচেয়ে বড় হল ফসল। পাইলট বল, খনিমজুর বল, ধাতুকর্মী বল, আর সীমান্তরক্ষীই বল—ফসল ছাড়া কেউ খাটতেই পারত না।

আচ্ছা, ওদের মধ্যে কার কথা সত্যি? জীবনে সবচেয়ে বড় কী? সবচেয়ে বড় হল খাটুনি। খাটুনি ছাড়া কয়লা হয় না, ধাতু হয় না, ফসলও হয় না।

‘আগুন’ ঘোড়া (সানিয়া, চতুর্থ শ্রেণী)

মা’র কাছ থেকে শোনা। গাঁয়ে যখন প্রথম যৌথখামার গড়া হচ্ছিল তখন যৌথখামারীরা একটা ঘোড়া কেনে। ঘোড়াটার নাম ছিল ‘আগুন’। ও কারও বশ মানত না। সবচেয়ে সাহসী আর বড় বড় লোকেরাও ‘আগুনের’ সামনে এগোতে ভয় পেত। সে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ত, দাঁত দিয়ে কামড় দিত আর নাক দিয়ে আওয়াজ করত।

ইউর্‌কো নামে এক অল্পবয়সী ছোকরা কিন্তু শেষ অবধি অবাধ্য ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপাল। ঘোড়াটা দাপাদাপি করল, চিঁহিঁহিঁ ডাক ছাড়ল, লাফিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ইউর্‌কোকে পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। কয়েক ভার্স্ট ছুটে গিয়ে গাঁয়ের শেষে থেমে পড়ল। রাস্তার মাঝখানে দুটো ছোট বাচ্চা খেলা করছিল। ওরা ঘোড়ার দিকে ছুটে এসে তার সামনের দু’পা জড়িয়ে ধরল। মা ত ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন। ভাবলেন এবারে ঘোড়াটা হয় বাচ্চাদের মেরে ফেলবে, নয়ত ঘায়েল করবে। কিন্তু ঘোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকটা পা সরায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। আড়চোখে বাচ্চা দুটোর দিকে তাকায়, যেন ভয় হচ্ছে ওদের গায়ে ধাক্কা না লাগে। ওরা কিন্তু খেলেই চলছে। তারপর ‘আগুন’ সাবধানে ওদের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ছুটে পালাল। ওকে ধরে আস্তাবলে পোরা হল।

শজারু (ফেদিয়া, চতুর্থ শ্রেণী)

আমাদের দেউড়ির নীচে শজারুরা থাকে। সন্ধ্যায় ওদের গোটা পরিবার গর্তের ছোট ছোট মুখ থেকে বেরিয়ে এসে পুকুরের দিকে যায়। আগে আগে বুড়ো শজারু, তার পেছনে—পাঁচটি ছোট ছোট বাচ্চা, সবার পেছনে—শজারু-গিন্নি। ওখানে ওরা কী করে? আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ওরা জল খাচ্ছে, আর মুখ হাত ধুচ্ছে। তারপর আবার ছোট ছোট থাবা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কী সব শেকড়বাকড় বার করে খায়। এ কাজটা করে শজারু আর শজারু-গিন্নি। ছানাপোনারা সেই সময়

খেলে, হুটোপাটি করে। ওরা একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছে — সেখানে কেউ যায় না।

একদিন কোথা থেকে যেন এক কুকুর এসে হাজির। কুকুরটা শজারুর দিকে তেড়ে এলো। শজারু তালগোল পাকিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। শজারুরা সকলেই হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়ল। কুকুর ধাড়ি শজারুকে দাঁতে চেপে ধরে পুকুরের দিকে নিয়ে গেল। শজারু সাঁতার কেটে পারের দিকে চলল। কুকুর তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে দেখে। তারপর শজারুর সঙ্গে খেলতে লাগল। আমি কুকুরটাকে খেদিয়ে দিলাম।

পরের বার বসন্তকালে দেউড়ির নীচে রয়ে গেল একা ধাড়ি শজারু। বাদবাকিরা গেল কোথায়? হয়ত অন্য কোন জায়গায় বাসাবদল করেছে। ধাড়ি শজারুর বোধহয় সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমি দেউড়ির কাছে একটা বাটিতে দুধ রেখে দিলাম। শজারু এসে দুধ খেল। ও আর আমাকে ভয় পায় না। আমি ওকে লোভ দেখিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলাম। লাইট জ্বালালাম। শজারু এক দৃষ্টিতে বাতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। আমি মেঝেতে পুরনো খবরের কাগজ রাখলাম। শজারু কাগজ দিয়ে খেলতে শুরু করল। আর রাতে চলে গেল দেউড়ির নীচে তার নিজের জায়গায়।

বুদিওনি বাহিনীর ফৌজী আর্তেম মিখাইলভিচ (দাঙ্কো, চতুর্থ শ্রেণী)

পাইওনিয়র বাহিনীর জমায়েতের সময় আমাদের এখানে আসতেন আর্তেম মিখাইলভিচ। তিনি সব্জি চাষীদের দলে কাজ করেন। আমরা ভাবতাম অমনি কোন দাদু-টাদু হবেন। আসলে কিন্তু তিনি ছিলেন বুদিওনি বাহিনীর ফৌজী, গৃহযুদ্ধের বীর। তিনি আমাদের বলেন কী ভাবে গুপ্ত সন্ধানের কাজে যেতেন, কী ভাবে শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণ করতে যেতেন। একবার তিনি আহত অবস্থায় দেনিকিন বাহিনীর লোকগুলোর হাতে বন্দী হন। ওঁকে গুলি মেরে ফেলার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু গুলি খেয়ে উনি মারা গেলেন না, আরও মারাত্মক আহত হলেন।

রাতে তিনি সেখান থেকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে বেরিয়ে এসে এক কৃষকের কুটিরে ঠাঁই নিলেন। লোকে তাঁকে চিলেকোঠায় লুকিয়ে রেখে সারিয়ে তুলল। তিনি আবার শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে লড়াই করতে চললেন। এই হলেন আমাদের দাদু আর্তেম মিখাইলভিচ। আমিও অমনি হতে চাই।

বিজয়-উৎসব (ভলোদিয়া, তৃতীয় শ্রেণী)

বিজয়-উৎসব এলো। এই দিন যুদ্ধ শেষ হয়। আমাদের সোভিয়েত সেনাবাহিনী ফাশিস্তদের হারিয়ে দেয়। গোলাগুলি ও বোমা ফাটা বন্ধ হয়ে গেল। এখন প্রতি বছর এই দিনটিতে লোকে তাদের বিজয়-উৎসব করে, শহিদদের সম্মান করে। ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি গড়েন, তিনি সকলকে বলেন: 'ইউক্রেনীয়, রুশী, বেলোরুশী, জর্জিয়ান, মোলদাভিয়ান — সবাই মিলেমিশে থাক, তোমাদের কেউ হারাতে পারবে না।'

আমরা সমষ্টিগত ভাবেও রচনা করি। একবার শরৎকালের এক মেঘলা দিনে ছেলেমেয়েরা 'স্বপ্নপুরীতে' জ্বলন্ত আগুনের পাশে বসেছিল। আমি দূর গ্রীষ্মপ্রধান দ্বীপের কথা বলছিলাম। বাচ্চাদের কেন যেন মনে পড়ে গেল তরমুজখেতে বিশ্রামের কথা, প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আর নদীর কথা। এই সব স্মৃতিচারণ থেকে গড়ে উঠল এক রচনা, পরে ওরা রচনাটাকে 'আমাদের মাতৃভাষা' খাতায় টুকে রাখে।

তরমুজখেতে আমাদের কেমন কাটে

গরম জমির ওপর বিরাট বিরাট তরমুজ। নীল, সবুজ, বেগনী। সকালে ওগুলো থাকে শিশিরবিন্দুতে ঢাকা। কনকনে ঠাণ্ডা। ঘাসের ওপর শিশির, আমাদের কুঁড়েঘরও শিশিরবিন্দুতে ঢাকা। একদিন দাঙ্কো খুব ভোরে উঠল, সে একটা বড় তরমুজ নিয়ে এলো। তরমুজটা টুকরো

টুকরো করে কাটল। যে কেউ ওঠে, তাকেই সঙ্গে সঙ্গে তরমুজ খেতে দেয়। দাঙ্কো বলল: 'যে সবার শেষে উঠবে সে পাবে তরমুজের মাঝখানের সুস্বাদু নরম ভাগটা'। সকলেই উঠে গেছে, ঘুমোচ্ছে কেবল সাশা। আমরা বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম—কখন ওর ঘুম ভাঙ্গে। অপেক্ষা করে করে বিরক্তি ধরে গেল, আমরা নরম ভাগটা খেয়ে ফেললাম। আরও একটা তরমুজ আনা হল। এই তরমুজটার নরম ভাগ সাশা পেল।

কুয়াসায় ঢাকা শান্ত সকাল। কুয়াসা ভেসে এলো খাত থেকে, ঢেকে দিল গোটা তরমুজখেত। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারল সুয্যি, তরমুজগুলোর ওপর আলো ফেলল। মনে হয় তরমুজ ত নয়, যেন নীল, সবুজ আর ছাইরঙা কাচের গোলা সাদা নদীর ওপর ভাসছে।

দিনের বেলায় তরমুজখেতের ওপর দিয়ে হু হু করে বয়ে যায় গরম বাতাস। নীল আকাশে গান গায় ভারুই পাখিরা। ওরা তরমুজখেতে এসে বসে না কেন? কেন ওরা কেবল গম আর যবের খেতের ভেতরে বাসা বাঁধে, বাচ্চাদের জন্ম দেয়, আর ভারুই পাখিদের বাসা সবচেয়ে বেশি—বাক্ হুইটের খেতে?

তরমুজখেতের পাশে, খাতের কাছাকাছি আমরা পিঁপড়ের বাসা দেখতে পেলাম। দাদু দেখতে পেলেন, পিঁপড়েরা তাড়াহুড়ো করে কোথায় যেন চলেছে। উনি বললেন: ধারেকাছে কোথায় যেন পিঁপড়েদের বড় একটা বাসা আছে। পিঁপড়েদের নিজেদের কাছ থেকেই জানা যাবে বাসাটা কোথায়। দাদু পিঁপড়েদের যাওয়ার পথে ছোট ছোট কয়েক টুকরো তরমুজ রাখলেন। মিষ্টি তরমুজ সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়েরা ছেয়ে ফেলল। আমরা দেখলাম ওরা ছোট ছোট মিষ্টি দানা কোথায় যেন বয়ে নিয়ে চলল। ওদের পেছন পেছন গিয়ে আমরা পৌঁছুলাম পিঁপড়ের বাসায়। ঝোপের নীচে একটা ছাইরঙা ঢিবি, যেন জ্যান্ত। পিঁপড়েরা দানাগুলো গর্তের ভেতর কোথায় যেন বয়ে নিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে তরমুজখেতে। পিঁপড়ে যে বন আর লোকজনের পক্ষে কত উপকারী, দাদু আমাদের সে কথা বললেন। পিঁপড়েদের এককটা বাসা ক্ষতিকর পোকামাকড় থেকে কয়েক হেক্টর বন বাঁচায়। আমরা

পিঁপড়েদের যত্ন নিতে লাগলাম, তারপর দাদু আমাদের শেখালেন কী করে নতুন পিঁপড়ের বাসা তৈরি করতে হয়।

আমরা যখন বাড়ি চলে যাচ্ছি, সেই সময় দাদু আমাদের একটা করে বড় তরমুজ দেন। তরমুজগুলো অনেক দিন আমাদের বাড়ির জানলার কাছে থাকে। ওগুলো দেখে আমাদের মনে পড়ে গরম হাওয়া আর বিশাল স্তেপের কথা, ভাড়ুই পাখির কথা, দাদুর কথা, আর কুঁড়েঘরের কাছেই যে ঝিঁঝি পোকা থাকত তার গানের কথা। ঝিঁঝি পোকাটা এখন কোথায়?

শব্দের সুষমা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় কাব্যে। কবিতা অথবা গান উপভোগের সময় শিশুরা যেন শব্দের সঙ্গীত শুনতে পায়। শ্রেষ্ঠ কাব্যে কাব্যমণ্ডিত শব্দ মাতৃভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবব্যঞ্জনা উদ্‌ঘাটন করে। এই কারণেই শিশুরা কবিতা মুখস্থ করতে চায়। শিশু তার হৃদয়গ্রাহী শব্দ বারবার আবৃত্তি করে সত্যিকারের তৃপ্তি পায়।

ছোটরা যাতে কাব্যমণ্ডিত শব্দের সঙ্গীত অনুভব করতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে আমি সেদিকে দৃষ্টি দিই। প্রকৃতির কোলে যে সব মুহূর্তে শিশুরা পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ থাকত, তখন আমি ওদের কবিতা পড়ে শোনাতাম।

বিশ্বের কাব্যভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের প্রভাবে শিশুমন শব্দের গীতধ্বনি সৃষ্টিতে মেতে ওঠে। বসন্তকালের দিনের সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় শিশুরা ধ্বনিমাধুর্যমণ্ডিত শব্দে মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করে। শিশুমনে কাব্যপ্রেরণা সঞ্চারিত হয়: ছেলেমেয়েরা কবিতা রচনা করে।

সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, সকলেরই ইচ্ছে করে উপযুক্ত শব্দ খুঁজে বার করার। শিশুর মন যখন কাব্যপ্রেরণায়

উদ্দীপিত হয় সেই মুহূর্তে শব্দ হয়ে ওঠে জীবন্ত, প্রাণচঞ্চল, তাতে খেলা করে রামধনুর সাতরঙ, তা থেকে ছড়িয়ে পড়ে মাঠ আর তৃণভূমির সৌরভ; শব্দ তখন স্থান পায় শিশুর মনোজীবনে। ছেলেমেয়েরা শব্দের মধ্যে খুঁজতে থাকে তাদের আবেগ-অনুভূতি ও উপলব্ধি প্রকাশের উপায়। শিশুমনে কাব্যপ্রেরণা জাগিয়ে তোলা—এর অর্থ হল ভাবনার আরও এক সঞ্জীবনী উৎসের সন্ধান লাভ। সে উৎসের শক্তি এখানেই যে শব্দ কেবল মানুষের ভাষায় অর্থবহ বস্তু ও ঘটনাই প্রকাশ করে না, তা গভীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি, আবেগ-অনুভূতিও প্রকাশ করে।

কাব্য রচনা শেখানোর উদ্দেশ্য—খুদে কবিদের লালন-পালন করা নয়, এর উদ্দেশ্য হল প্রতিটি শিশুহৃদয়কে মহৎ করে তোলা। শিশুহৃদয়ে কাব্যপ্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে, প্রতিটি শিশুর মনে শব্দ যাতে ব্যক্তিগত কাব্যিক ধ্বনিমাধুর্য অর্জন করে সেই উদ্দেশ্যে আমি সম্ভবমতো সমস্ত রকম উপায় অবলম্বন করি।

শীতকালের শান্ত সকাল। গাছপালা সাদা হিমকণায় ঢাকা। পাতলা বরফে ঢাকা, ছুঁচের মতো ডালপালাগুলো দেখে মনে হয় যেন রুপোয় জড়ানো। আমরা স্কুলের বাগানে যাই, ডালপালায় যে অনুপম সৌন্দর্যের মায়া সৃষ্টি হয়েছে তা যাতে না নষ্ট হয় সেই জন্য আমরা যত দূর সম্ভব ডালপালার স্পর্শ এড়ানোর চেষ্টা করি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। আমি পাঠ করি শীতকালের সৌন্দর্য সম্পর্কে পুশকিন ও হাইনের লেখা কবিতা। কাব্য ও সৌন্দর্যের প্রভাবে শিশুরা এমন এমন শব্দ খুঁজে পায় যাদের সাহায্যে হিমকণায় ঢাকা গাছের রূপ আঁকা যায়, ওরা কবিতা রচনা করে। ওরা কবিতা রচনা

করে সমষ্টিগত ভাবে, ভাগে ভাগে—আমরা কয়েক বার বাগানে আসি। ছেলেমেয়েরা এর আগে যে-সমস্ত রূপকথা রচনা করেছিল সেগুলির উজ্জ্বল কল্পমূর্তি তাদের কবিতায় রূপায়িত হয়।

শৈশবে শিশুমাত্রেই—কবি। অবশ্য কাব্যপ্রেরণা শিশুমনে কোন বিস্ময়কর সহজাত প্রবৃত্তি বলে সঞ্চারিত হবে এমন আশা করাও অন্যায়। আমি মোটেই সহজাত প্রতিভার চিন্তা মনে প্রশ্রয় দিচ্ছি না, এমন চিন্তাও করি না যে প্রতিটি শিশুই সহজাত কবি। মানবিক সৌন্দর্যানুভূতি মনের ভেতরের কবিকে জাগিয়ে তোলে। এই অনুভূতির শিক্ষা ব্যতিরেকে শিক্ষার্থী প্রকৃতি ও শব্দের সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন থেকে যাবে, তার কাছে জলে ঢিল ছোঁড়া আর সঙ্গীতসুধাবর্ষণরত বুলবুলির গায়ে ঢিল ছোঁড়া সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। শিশুকে কাব্যপ্রেরণার আনন্দ দান করা, তার হৃদয়ে কাব্যসৃষ্টির জীবন্ত উৎসের উৎসার ঘটানো—পড়তে এবং অংক কষতে শেখানোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কোন কোন শিশুর এই উৎস সবেগে উৎসারিত হয়, কারও কারও মধ্যে তার বেগ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। আমি লক্ষ্য করলাম, কোন কোন ছেলেমেয়ের কাছে কাব্যপ্রেরণা স্বল্পকালীন উদ্দাম আলোড়ন মাত্র নয়, হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়, তা হল তাদের হৃদয়ের চিরন্তন তাগিদ।

কাব্যসৃষ্টি—ভাষাচর্চার সর্বোচ্চ পর্যায়, আর ভাষাচর্চা হল মানবসংস্কৃতির মর্মমূলের অভিব্যক্তি। কাব্য সকলেরই নাগালের মধ্যে। তা বিশেষ প্রতিভাবানদের বিশেষ কোন সুযোগ বলা চলে না। কাব্য মানুষকে সমুন্নত করে। সৃষ্টির এই অতি সূক্ষ্ম ক্ষেত্রটি যাতে প্রতিটি শিশুর গভীর ব্যক্তিগত, অন্তরের সামগ্রী হয়ে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয় শ্রেণীতেই লারিসা, সানিয়া, সেরিওজা, কাতিয়া, ভারিয়া, কোলিয়া, তানিয়া ও লিদা গোপনে যে-সমস্ত কবিতা লিখত সেগুলি আমাকে আড়ালে পড়ে শোনাত। আমি জানতাম যে অন্যান্য ছেলেমেয়েও কবিতা লেখে, তবে নিজেদের শখের কথা বলতে তারা লজ্জা পায়। সেটাও বেশ ভালোই বলতে হবে।

শিশুরা যে কবিতা লেখে এর মধ্যে আমি কোন রকম বিশেষত্বই দেখতে পেতাম না; এ হল অন্তরের শক্তির স্বাভাবিক খেলা, সৃজনের সাধারণ অগ্নিকণা—এছাড়া পূর্ণমাত্রার শৈশব ধারণায়ই আনা যায় না। তবে শিশুদের মনোজীবন যে এত সমৃদ্ধ, তা যে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে এই ভেবে আমার আনন্দ হত বৈকি!

আমি বিশেষ করে আনন্দ পাই এই দেখে যে কাব্যপ্রেরণা কোলিয়াকে সমুন্নত করে তুলেছে। ওর সঙ্গে আমার সৌহার্দ আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠল। স্কুলের বাগানে একটা জায়গা ছিল যেখানে আমি একান্তে থাকতে পছন্দ করতাম। আবহাওয়া ভালো থাকলে আমি এখানে বিশ্রাম করতাম, বেহালা বাজাতাম। ঘটনাক্রমে এমন হল যে কোলিয়া আমার জায়গাটা 'আবিষ্কার করে' ফেলল। হয়ত সে নিজেই নির্জনতা খুঁজছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে ছেলেটা বিমূঢ় হয়ে গেল, ওখান থেকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু আমি তাকে থেকে যেতে বললাম। আমি বেহালা বাজাচ্ছিলাম, আমার ইচ্ছে ছিল বেহালার বাজনায় গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যার সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করি। কোলিয়া মন দিয়ে সুর শুনল। তারপর আমি এমনই মগ্ন হয়ে পড়লাম যে ছেলেটা কখন আমার পাশে এসে বসেছে তা লক্ষ্যই করি নি। ওকে বেহালাটা দিই, আমি যা বাজালাম

কোলিয়া সেটা পুনরাবৃত্তির চেষ্টা করল, কিন্তু সে কিছু করে উঠতে পারল না। ও বাজানো ছেড়ে দিল। আমরা চুপচাপ বসে বসে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখি, সন্ধ্যার নীরবতা কান পেতে শুনি। হয়ত পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য-উপলব্ধি আমাদের দুজনকে একাত্ম করে ফেলেছিল বলেই কোলিয়া বিশ্বাস করে আমার কাছে আওড়াল প্রকৃতি সম্পর্কে তার নিজের রচনা — কবিতা:

সবুজ পাতার নীচে নীলরঙা ফুল;
মৌমাছি দলে দলে এসে বসে ফুলের ওপরে।
বাগানে রাতের বেলা এলো বুলবুল,
গান গায় লাইলাক-ঝোপের ভিতরে।
সকালে বাগানে বাজ বাজে কড়কড়,
বর্ষায় ফুলরাশি ধুয়ে একাকার।
ছাইরঙা মেঘ ওড়ে আকাশের 'পরে,
লাইলাক আকাশের নীল রং ধরে।

সেই সন্ধ্যায় আমি আর কোলিয়া অনেকক্ষণ বাগানে বসে রইলাম। ছেলেটা ওখানে আসতে লাগল, আর প্রতিবারই ছোট ছোট কবিতা পড়ত।

আমি জানতে পারলাম যে কোলিয়া তার কবিতা লিখে রাখে না: সে মনে রাখে। কবিতা তার স্মৃতিতে আর হৃদয়ে থাকে। আমার শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন প্রায় কেউই ছিল না যে সাদা কাগজ সামনে নিয়ে কবিতা ভাবতে বসত। কবিতার জন্ম হত লেখার জন্য নয়। বাচ্চারা কবিতা পরিহার করতে পারত না, যেমন পরিহার করতে পারত না আঁকা।

শুরাও আত্মিক সান্নিধ্যের মুহূর্তে বিশ্বাস করে তার গোপন রহস্য আমাকে জানায়। শীতের দিনে আমরা বনে যাই ,স্কি

করি। রক্তিম সূর্য অস্তগামী। সন্ধ্যার কিরণমালায় দেবদার গাছের গঁুড়িগুলি দেখে মনে হচ্ছিল যেন লোহা পিটিয়ে তৈরি। আমরা বনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলাম। ঠিক এই সময় শুরা পড়ল কাঠঠোক্‌রা পাখি নিয়ে স্বরচিত কবিতা।

ভারিয়া তার শৈশব পর্বে বেশ কিছু কবিতা রচনা করে। এই মেয়েটির মন অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল। আমি ভারিয়াকে গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যার সৌন্দির্যে মুগ্ধ হয়ে পুকুর পারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি; পুকুরের কাচের মতো মসৃণ বুকের ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে নীল আকাশ, জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে পুসি-উইলো—ভারিয়া তাকিয়ে রয়েছে সেই দিকে। এর কয়েক দিন বাদে মেয়েটি এই গ্রীষ্মসন্ধ্যার উপর কবিতা আমাকে শোনায়।

প্রতি বছর শরৎকাল শুরু হওয়ার আগে আগে ছেলেমেয়েরা গ্রীষ্মের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আয়োজন করত। আমরা আমাদের ওক গাছের সামনে যাই, গ্রীষ্মবিদায় সম্পর্কে, সারস আর শরৎকালের ঈষদুষ্ণ দিন সম্পর্কে কবিতা রচনা করি। চতুর্থবার গ্রীষ্মবিদায় জানানোর সময় ছেলেমেয়েরা আমাদের পরম প্রিয় ও পরম আদরের মাতৃভূমি সম্পর্কে কবিতা রচনা করে।

প্রধান লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় বিষয় ছিল শিশুদের কল্পনায় সৃষ্ট উজ্জ্বল রূপমূর্তি। ছেলেমেয়েদের মনোজীবনে কাব্যপ্রেরণা এক তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি চেষ্টা করি যাতে তারা শ্রেষ্ঠ কাব্যনিদর্শনগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। আমাদের এখানে একটা ছোটখাটো কাব্যগ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। কাব্যসৃষ্টি তখনও যাদের অন্তরের তাগিদে পরিণত হয়

নি, যাদের মনে কাব্যিক শব্দের প্রতি সংবেদনশীলতা তখনও বিকশিত করার আবশ্যক ছিল বিশেষ করে তাদের জন্য গ্রন্থাগারটির প্রয়োজন অনুভূত হয়। আবারও বলতে হয়, শিশুদের কাব্যসৃষ্টি — প্রতিভার লক্ষণ রূপে গণ্য করা ঠিক নয়। আঁকার মতো এটাও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার: আঁকে সকলেই, প্রতিটি শিশুই এই পর্বের মধ্য দিয়ে যায়। তবে কাব্যসৃষ্টি শিশুদের মনোজীবনে স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র তখনই যখন তাদের সামনে শিক্ষক উন্মুক্ত করেন পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য ও শব্দের সুষমা। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ যেমন সঙ্গীত ছাড়া শেখানো যায় না, তেমনি কাব্যের প্রতি অনুরাগও শেখানো যায় না কাব্যসৃষ্টি ছাড়া।

যে মানুষ পুশকিন, হাইনে, শেভ্‌চেঙ্কো ও লেসিয়া উক্রাইন্‌কার রচনার অনুরাগী, যে মানুষ তার আশেপাশের **সৌন্দর্য-সম্পর্কে সুন্দর ভাবে** কিছু **ব্যক্ত করতে** চায়, যে মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় শব্দের অন্বেষা সৌন্দর্য অনুধ্যানের তাগিদের মতোই জরুরী হয়ে দেখা দেয়, যে মানুষের কাছে মানবিক সৌন্দর্যবোধ বলতে সর্বোপরি বোঝায় মানবিক সদ্‌গুণের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষে মানুষে পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত সম্পর্কের — কমিউনিস্ট সম্পর্কের — প্রতিষ্ঠা, সে মানুষ অমার্জিত হতে পারে না, মানববিদ্বেষী হতে পারে না।

আমাদের নিভৃত ‘সৌন্দর্যলোক’

বসন্তকালে, প্রথম শ্রেণী শেষ হওয়ার আগে আমরা ‘সৌন্দর্যলোক’ সৃষ্টির কাজে হাত দিলাম। ছেলেমেয়েরা

বহুদিন হল এর স্বপ্ন দেখছিল। আমাদের কল্পনায়, জায়গাটা হওয়া চাই শান্ত, নির্জন, যেখানে প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের হাতে গড়া সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটবে। আমাদের স্বপ্নের লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ, আমরা ভাবি, কী ভাবে বছর বছর আমাদের নিভৃত কোণটায় গাছগাছড়ার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। এখানে আমরা বিশ্রাম করব, খাটব, বসন্তকে অভ্যর্থনা জানাব, গ্রীষ্মকে বিদায় জানাব।

স্কুলের এলাকা আর ঝাঁকড়া ঝোপঝাড়ের মাঝখানে ছেলেমেয়েরা খুঁজে বার করল একটা ফাঁকা জায়গা, সেটা গিয়ে মিলেছে খাতের ঘাসে ভর্তি ঢালের সঙ্গে। বর্ষার সময় এখানে অনেক জল এসে জমে। আমরা ফাঁকা জায়গাটা থেকে আগাছা সাফ করলাম। তাকে সবুজ লন্-এ পরিণত করার কাজে লেগে গেলাম।

‘আমাদের জায়গাটা হবে গাছপালার রাজ্য,’ আমি ছেলেমেয়েদের বললাম। ‘খাতের ঢালটা লতার দেয়ালে ঢেকে যাবে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে পাখিরা এসে থাকবে।’

বাচ্চারা স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। ফাঁকা জায়গাটা সবুজ ঘাসের মাঠে পরিণত করার জন্য আমাদের অনেক খাটতে হয়। মাঠ থেকে চাপ চাপ ঘাস বয়ে এনে বসাতে হল, জল ঢালতে হল। বৃষ্টিও যাতে সবুজ ঘাসের ওপর জল ঢালে তার জন্য ওরা অধীর আগ্রহে বর্ষার প্রতীক্ষায় থাকে। বনের মধ্যে লতার কয়েকটা চারা পাওয়া গেল, সেগুলিকে খাতের ঢালে বসানো হল। আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে সেবারে গরমটা তেমন শুকনো ছিল না, সবগুলি গাছগাছড়াই দিব্যি বেড়ে উঠল। বন থেকে বেশ কিছু লিলি তুলে এনে লন্-এর এক কোনায় লাগিয়ে দেওয়া হল। আমরা বনগোলাপের তিনটি ঝোপ

লাগালাম—এর সঙ্গে গোলাপও লাগানো হবে—জায়গাটাকে ফুলের রাজ্য করে ফেলতে হবে। সারা লন্-এর চারপাশে বসিয়ে দিলাম বুনো বাদামের গাছ। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে, আমাদের এখানে মেঠো ফুলও হোক। ডেইজী এবং আরও কিছু ফুলের গাছ আমরা পেয়ে গেলাম। হট্ হাউস থেকে এনে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকাও বসালাম—শরতে অনেক দিন পর্যন্ত ফুটবে।

ভারিয়া বসালো সূর্যমুখী ফুল। লন্-এর বেশ খানিকটা দূরের এক কোনায় ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে দিল এক মুঠো বাক্ হুইটের দানা। নিনা ও সাশার বাবা আমাদের দুটো খুদে আপেলচারা দিলেন। ভিতিয়া আমাকে বলল যে ওর দিদিমা টিউলিপ বাগান করেন। আমরা টিউলিপের কয়েকটা গোড়া এনে বসালাম। একদিন গরমকালে ছেলেমেয়েরা বনের ভেতরে ফুলে ভর্তি একটা বিরাট ফুটন্ত লিণ্ডেন গাছ দেখতে পেল। গাছের ডালে ডালে গুনগুন করছে হাজার হাজার মৌমাছি, মনে হচ্ছিল যেন গোটা বন হার্পযন্ত্রে বাদ্য বাজছে। ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওদের ইচ্ছে হল নিজেদের জায়গাটার পাশে কয়েকটা লিণ্ডেন গাছ লাগায়। শরৎকালে আমরা বনে গিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে চারাগাছ ওঠালাম। বীথীর মতো সারি করে লাগিয়ে দিলাম। ওরা মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগল, যখন লিণ্ডেন গাছগুলো বড় হবে তখন গাছের ঝাঁকড়া মাথার সঙ্গে মাথা মিলে গিয়ে নীচের ছায়ায় ঢাকা পথ তৈরি হবে।

প্রত্যেক ক্লাসেই নিজস্ব ‘সৌন্দর্যলোক’ গড়ে তোলার ধুম পড়ে গেল। সকলেই চেষ্টা করল অন্যদের মতো যেন না হয়। আর ১৯৫৫ সনের শরৎকালে স্কুলের সকলের উদ্যোগে শুরু

হল ঐ রকম একটা সর্বজনীন জায়গা গড়ার কাজ। স্কুলের দালানের পাশে আমরা বানালাম গোলাপ বাগান। বনগোলাপ থেকে তৈরি অনেকগুলি চারা বসালাম আর সেগুলির সঙ্গে কলম বাঁধলাম বিভিন্ন জাতের গোলাপের। প্রতি বছর বাগান সুন্দর থেকে সুন্দরতম হতে থাকে। বসন্তে আর গ্রীষ্মে এখানে ফুলের সমুদ্র। সকলে এখানে এসে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, খাটে — সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

গোলাপ বাগান — এখন গোটা স্কুলের সকলের লালিত সন্তান। সমাজকল্যাণমূলক শ্রমে যে ক্লাসের সাফল্য সবার ওপরে সে ক্লাস বাগানের কর্তৃত্বগ্রহণের অধিকার পায়। প্রায়ই অধিকার পেয়ে থাকে নিম্ন ও মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি। ঐ সব ক্লাসের ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন কয়েক ডজন ফুল তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। ফুলগুলি ওরা ক্লাসে নিয়ে আসে, শিক্ষকদের ও মা'দের উপহার দেয়, আর দেয় গাঁয়ের সেরা মেহনতীদের। প্রথম ফসল তোলার উৎসবের দিনে ছেলেমেয়েরা বিশাল গোলাপের তোড়া বানিয়ে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের উপহার দেয়।

সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য যে শ্রম তা শিশুহৃদয়কে মহনীয় করে তোলে, শিশুকে উদাসীন থাকতে দেয় না। দুনিয়ার সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গিয়ে শিশুরা উত্তরোত্তর ভালো, নির্মল ও সুন্দর হতে থাকে।

জীবনাদর্শের উৎসমুখে

আমি আমার প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ রূপে ভাবতে চেষ্টা করি। যে সব চিন্তা আমাকে ভাবিত করে তুলত

তা হল: শিশু বড় হলে কেমন মানুষ হবে? সমাজকে সে কী দেবে, কিসে সে আনন্দ পাবে, কিসে সে মুগ্ধ হবে, কিসের প্রতি বিরূপ হবে, কিসে খুঁজে পাবে নিজের সুখ, দুনিয়ার বুকে সে কোন্ চিহ্ন রাখবে?

একজন শিক্ষক ও শিক্ষাদাতা হিশেবে আমার কাজ হল যুগ যুগ ধরে মানবজাতি যে-সমস্ত নৈতিক সম্পদ গড়ে তুলেছে ও অর্জন করেছে সেগুলিকে, অর্থাৎ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাবোধ, মানুষের উপর মানুষের নির্যাতন ও দাসত্ববন্ধনের প্রতি আপসহীন মনোভাব, উচ্চ আদর্শের জন্য — জনসাধারণের সুখ ও মুক্তির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের মানসিকতা — শিশুচিত্তে সঞ্চার করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যে জন্মভূমি-সংক্রান্ত মহিমান্বিত শব্দ ও সমুন্নত আদর্শাবলী যেন আমাদের শিক্ষার্থীদের চেতনায় গালভরা, শূন্যগর্ভ বুলিতে পরিণত না হয়, যেন সেগুলি বিবর্ণ না হয়ে পড়ে, বারবার উচ্চারণের ফলে লেপাপোঁছা, রং চটা না হয়ে যায়। উচ্চ আদর্শের কথা ছেলেমেয়েরা মুখে ঘনঘন উচ্চারণ না হয় নাই করুক, এই সব আদর্শ বরং বেঁচে থাকুক শিশুহৃদয়ের উষ্ণ শিহরণের মধ্যে, হৃদয়াবেগ ও আচরণের মধ্যে, ভালোবাসা ও ঘৃণার মধ্যে, নিষ্ঠা ও আপসহীনতার মধ্যে।

বিশেষ করে ছোটদের এমন শব্দ আওড়ানোয় প্রবৃত্ত করা উচিত নয় যার তাৎপর্য তারা এখনও জানে না। জাতির কাছে যা পরম পবিত্র, এর ফলে তা শূন্যগর্ভ ধ্বনিতে পরিণত হতে পারে।

একটা ছোট গাছ যখন কোন রকমে মাটির ওপর মাথা তুলে উঠে দাঁড়ায় তখন মালী সে গাছটির শিকড় জোরদার করে,

কেননা শিকড়ের শক্তির উপরই নির্ভর করছে উদ্ভিদের পরমায়ু। ঠিক তেমনি, শিক্ষকের কাজও হল তাঁর ছেলেমেয়েদের অপরিসীম দেশাত্মবোধে, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি অনুরাগ এবং কমিউনিজমের মহান আদর্শের প্রতি আনুগত্যের বোধে দীক্ষিত করে তোলা। শিশু যখন পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখতে, উপলব্ধি করতে, মূল্যায়ন করতে শুরু করে সেই মুহূর্ত থেকে শুরু হয় এই গুণাবলির শিক্ষা।

যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে পূর্বপুরুষেরা যা যা গড়ে তুলেছেন, পিতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য, মেহনতীদের সুখের জন্য কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যা যা অর্জিত হয়েছে সে সবই যেন শিশুদের কাছে মূল্যবান হয়। শিশুর কাছে জন্মভূমির শুরু রুটির টুকরো আর গমের খেত থেকে, ছোট পুকুরটির মাথার ওপরকার নীল আকাশ আর বনপ্রান্ত থেকে, শিশুর শিয়রে মা'র গান আর রূপকথা থেকে। শৈশবের সোনার দিনগুলিতে, শিশুরা যখন শব্দের প্রতি, রূপের প্রতি, অন্যের মনোজগতের প্রতি বিশেষ সংবেদনশীল, তখন পূর্বপুরুষের গর্বের যাবতীয় বিষয় তাদের হৃদয়ের গোচরীভূত করতে হবে, তাদের কাছে বলতে হবে কী মূল্যে মুক্তশ্রমের সুখ অর্জিত হয়েছে। আমি নজর রাখি, জীবনের কল্যাণের উপভোগ যেন নিশ্চিন্তে না হয়। শিশুর পারিপার্শ্বিক জগৎ উপলব্ধি ও নিজেকে উপলব্ধি এক তরফা হওয়া উচিত নয়। জগৎকে এবং নিজেকে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে অবশ্যই অল্প অল্প করে উপলব্ধি করতে হবে পূর্বপুরুষদের সৃষ্ট বৈষয়িক সম্পদ ও মানসসম্পদের প্রতি নিজের কর্তব্য।

মাঠে, বনে, নদীর ধারে, আশেপাশের গাঁয়ে আমাদের

প্রমোদভ্রমণ ও পদযাত্রার নাম দেওয়া হয়েছিল জন্মভূমির অতীতে 'পর্যটন'। এই 'পর্যটনের' সময় আমি ছেলেমেয়েদের দেখানোর চেষ্টা করতাম আমাদের জাতির মনোজীবনে অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র। আমি ওদের বলি:

'তোমাদের সামনে বিশাল শস্যখেত, গমের শীষ পেকে উঠেছে। বনের শেষে এই শস্যখেতে গৃহযুদ্ধের সময় শ্বেতরক্ষীরা লাল ফৌজের একজন গেরিলাকে গুলি করে মারে। আর পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের প্রথম বছরের কঠিন গ্রীষ্মকালে এখানে আমাদের সামান্য কয়েক জন যোদ্ধার সঙ্গে ফাশিস্ত সৈন্যদের একটা কোম্পানির তুমুল লড়াই বাধে। এখানে আমাদের বীরেরা মৃত্যুবরণ করেন। এই বিশাল মাঠটার দিকে একবার চেয়ে দেখ। যে টিলাগুলো দেখছ, ওগুলো হল নামহীন সমাধি। মাটি ওঁদের কীর্তির স্মৃতি রক্ষা করছে। হাজার হাজার টিলা — এ হল হাজার হাজার নামহীন সমাধি — মাটি রক্ষা করে চলছে বীরদের পরম মূল্যবান রক্ত, জাতির মনে চিরকালের জন্য স্থান অধিকার করে আছে তাঁদের কীর্তির স্মৃতি। তাঁরা যদি মাতৃভূমির জন্য প্রাণবিসর্জন না করতেন তাহলে তোমরা তোমাদের দেশের মাটির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারতে না, ফাশিস্তরা সকলকে দাস বানিয়ে ফেলত।'

ছোট শিশু নিজের দেশের ভাগ্য নিয়ে বরং একটু ভাবুক, অনুভব করুক, উপলব্ধি করুক তার ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ, অস্থিরতা। অতীতের ঘটনাবলী তার সামনে দেখা দিক বর্তমানের উৎস হয়ে।

শিশুকাল এমন এক বয়স যাকে আমরা নিশ্চিন্ত আনন্দ, খেলাধুলা আর রূপকথায় মেতে থাকার বয়স বলে মনে করি, কিন্তু আসলে তা হল জীবনাদর্শের উৎসস্বরূপ। ঠিক এই

সময়ই গড়ে ওঠে মানুষের রুচিবোধ। শৈশবে পারিপার্শ্বিক জগতে শিশু কিসের সন্ধান পেয়েছে, কোন্ জিনিস তাকে বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে, কোন্ জিনিস তার মনে বিরূপ ভাব সৃষ্টি করেছে, তাকে কাঁদিয়েছে — ব্যক্তিগত অপমানবশত নয়, অন্যান্য মানুষের ভাগ্যের কথা ভেবে কষ্ট পাওয়ার ফলে — এরই ওপর নির্ভর করেছে কী রকম নাগরিক হবে আমাদের শিক্ষার্থী। শিশুর দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে বহুমুখী জগৎ, সে জগতের পরস্পর বিরোধিতা ও জটিলতা; তার মধ্যে শিশুরা দেখতে পায় সৌন্দর্য ও কুশ্রীতা, সুখ ও দুঃখ। পারিপার্শ্বিক জগতে যা যা ঘটছে, অতীতে মানুষ যা নিয়ে বেঁচে ছিল এবং বর্তমানে যা নিয়ে বেঁচে আছে, সে সবকেই শিশু ভালো ও মন্দ — এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখে। শিশুকালে মনুষ্যত্ববোধ ও রুচিবোধের ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে শিশুকে **ভালো ও মন্দ সঠিক ভাবে দেখার শিক্ষা** দিতে হবে।

এই কথাগুলিতে আমি যে তাৎপর্য আরোপ করি তা নিম্নরূপ: শিশুরা পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে যা কিছু জানতে পারবে, সমস্ত সামাজিক ঘটনা, অতীতে ও বর্তমানে মানুষের আচরণ — এ সবই ছোটদের মনে যেন গভীর নৈতিক অনুভূতি জাগ্রত করে। ভালো-মন্দের সঠিক বোধের অর্থ হল এই যে শিশু যা উপলব্ধি করে তা সে অন্তরে গ্রহণ করে। ভালো জিনিস তার মন আনন্দে উদ্বেলিত করে, তাকে মুগ্ধ করে, নৈতিক সৌন্দর্য অনুসরণে অনুপ্রাণিত করে; যা মন্দ তা তার মনে জাগ্রত করে ঘৃণা, আপসহীন মনোভাব, সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রামের প্রবল শক্তি। শিশুর মন সত্যের নিষ্প্রাণ ভাণ্ডার হলে চলবে না। যে বিরাট ত্রুটি আমি নিবারণে প্রবৃত্ত

হই তা হল ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ত মনোভাব। যে শিশুর হৃদয় হিমশীতল সে ভবিষ্যতে হবে কূপমণ্ডূক। শৈশবেই প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে যা মন্দ বা মন্দের প্রশ্রয়সূচক তার প্রতি আপসহীন মনোভাব ও রুচিসম্মত হৃদয়াবেগের স্ফুলিঙ্গ।

মানুষের উপর মানুষের নির্যাতন যে একটা বিরাট দুষ্কর্ম — এই সত্য শিশুচেতনায় প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন কাজ নয়। কোন ব্যাপারের মন্দটা যে কোথায়, শিশুরা সুযোগ পেলে শিক্ষককে সে সম্পর্কে সঠিক জবাবই দেয়। কিন্তু মানুষে মানুষে দাসত্ববন্ধনের সুস্পষ্ট চিত্র যদি শিশুকে স্তম্ভিত না করে, সে যদি এ ধরনের দুষ্কৃতিকারীর প্রতি ঘৃণা অনুভব না করতে পারে তাহলে সে সমুন্নত আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ হতে পারবে না, হতে পারবে না খাঁটি নাগরিক।

মানুষের ঔদাসীন্য — বিপজ্জনক ও কদর্য, আর শিশুর ঔদাসীন্য — ভয়াবহ। শিশুকালে আমার প্রতিটি শিক্ষার্থীর যাতে অন্যান্য মানুষের — এমন কি পৃথিবীর বিপরীত কোন প্রান্তে বসবাসকারীর লোকজনের, আবার এমনও হতে পারে যে শতবর্ষ আগেকার লোকজনের — ভাগ্য সম্পর্কে গভীর ব্যক্তিগত অশান্তির উদার অনুভূতি উপলব্ধি করে, আমি সেদিকে দৃষ্টি দিই। এই অনুভূতি — ঔদাসীন্য নিরাময়ের, হৃদয়ের শীতলতা — তথা কূপমণ্ডূকতার বিপজ্জনক বীজ উচ্ছেদের নির্ভরযোগ্য মহৌষধ।

আমি আমার শিক্ষার্থীদের এমন সমস্ত বই পড়ে শোনাতাম, ইতিহাসের এমন সমস্ত বিবরণ দিতাম যেখানে ধ্বনিত হয়েছে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের আহ্বান, যেখানে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে মানুষের উপর মানুষের নির্যাতনের

প্রতি আপসহীন মনোভাব। বহুবার ছেলেমেয়েরা শোনে পোল্যান্ডের লেখক হেন্‌রিখ সেন্‌কেভিচের রোমাঞ্চকর কাহিনী 'বাজিয়ে ইয়াঙ্কো'। প্রথম পাঠে ওরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। অসহায় বালকের প্রাণনাশকারী জমিদারকে ওরা অত্যাচারী ও রক্তচোষা আখ্যা দেয়। ক্রোধে ওরা ছোট ছোট হাতের মুঠো পাকায়, ওদের চোখ নিদারুণ ক্রোধে জ্বলতে থাকে। বাজিয়ে ইয়াঙ্কো আমার শিক্ষার্থীদের মনোজীবনে স্থায়ী আসন লাভ করল। তারপর আমরা গল্পটা বারবার পড়লাম, ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ওটা অক্ষরে অক্ষরে মনে করে রাখে। ওরা কেন বারবার ইয়াঙ্কোর কাহিনী শুনতে চায়? আমার মনে হয় তার কারণ এই যে ক্রোধের অনুভূতি অন্তরের শক্তির প্রবল বন্যা বইয়ে দেয়। মন্দের আপসহীন শত্রুরূপে নিজেকে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু উত্তরোত্তর শক্তিমান হয়ে ওঠে, সে চায় নিজের নৈতিক শক্তির পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করতে, আরও একবার এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে যে সে সত্যের জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত। যে হৃদয়ে এই অনুভূতি বিকশিত সে হৃদয় পারিপার্শ্বিক জগতের ভালো-মন্দ সম্পর্কে সজাগ।

বিশিষ্ট ইউক্রেনীয় লেখক আর্খিপ তেস্‌লেঙ্কো দরিদ্র কৃষক পরিবারের শিশুদের নিরানন্দ শৈশব ও কৈশোর সম্পর্কে যে-সমস্ত কাহিনী লেখেন সেগুলিও ছেলেমেয়েদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তাঁর লেখা একটি গল্পের বিষয়বস্তু হল কৃষক পরিবারের এক প্রতিভাময়ী কিশোরীর দুর্ভাগ্য। জারের আমলা আর ধনীদের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে, দারিদ্র্যের মধ্যে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। এই কাহিনী আমরা যখন পড়া শেষ করি তখন শিশুদের চোখেমুখে নিদারুণ ক্রোধ ফুটে ওঠে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে আমরা হ্যারিয়েট বীচার স্টো'র 'টম কাকার কুটির' দু'বার পড়ে শেষ করি। ছেলেমেয়েরা ক্রীতদাসদের ভাগ্যে দারুণ কষ্ট পায়। তাদের পক্ষে ধারণা করাই কঠিন যে পশুদের মতো মানুষও কেনা-বেচা হয়। ধীরে ধীরে শিশুচেতনার সামনে উন্মুক্ত হতে থাকে আধুনিক কালের ভালো-মন্দের সংগ্রামের সুস্পষ্ট চিত্র: পুঁজিবাদী দেশগুলিতে কোটি কোটি মানুষ খেটে চলছে নিজের জন্য নয়, জমিদার আর পুঁজিপতিদের জন্য, শিশুরা জানে না শৈশব কাকে বলে, দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের — নিজেদের জন্মভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন, তাঁদের গুলি করে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

গ্রীক জাতির বীর নিকোস্ বেলোইয়ান্নিস্-এর ট্র্যাজিক ভাগ্যের কথা ছেলেমেয়েদের চিরকাল মনে থাকবে। গ্রীসে ফাশিস্ত অধিকারের সময় বেলোইয়ান্নিস্ দখলদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন; দেশ যখন হিটলারতন্ত্রীদের কবলমুক্ত হল তখন বুর্জোয়া বিচারালয় দেশপ্রেমিকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। হাতে লাল রঙের পিঙকফুল নিয়ে নিকোস্ বেলোইয়ান্নিস্ মৃত্যুর মুখোমুখি হন। তাঁর স্ত্রীও বিচারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পান, স্বামী যে দিন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন সেই দিনই তিনি এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। কারাগারে আবদ্ধ বালকের ভাগ্যে উদ্বিগ্ন ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে কী ভাবে বেলোইয়ান্নিসের শিশুসন্তানকে সাহায্য করা যায়। মহৎ অনুভূতি তাদের সক্রিয় কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। ওরা ছোট বেলোইয়ান্নিসের মাকে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মারফত চিঠি পাঠায়, আয়োজন করে

উপহারের — সাদা রেশমের ওপর এম্ব্রয়ডারি করা লাল পিঙকফুল। তারপর প্রতি বছর ছাত্রছাত্রীরা বীরের স্ত্রীকে চিঠি পাঠাত, আর ছেলেটির জন্মদিনে পাঠাত উপহার: সাদা রেশমের ওপর এম্ব্রয়ডারি করা ফুল — গোলাপ, পপি, লাইলাক। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ এই কাজটি শিশুমনে রেখে যায় গভীর ছাপ, কারণ এটা হল মন্দের প্রতি ধিক্কার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

সমাজজীবনের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের এমন কথাও বললাম যে মানব-ইতিহাসের গভীর তমসাচ্ছন্ন পর্বে, যখন অশুভ শক্তি কোটি কোটি মানুষের উপর নির্যাতন চালায় তখনও সবসময় এমন সব লোকজনের দেখা পাওয়া গেছে যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। ঐ সব মানুষের নাম, তাঁদের জীবন, কীর্তি — নবীন প্রজন্মের কাছে উজ্জ্বল ধ্রুবতারাস্বরূপ। নিজেদের জন্মভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য, শোষণ-মুক্তির জন্য, মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন — মানবজাতির সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ সন্তানের দৃঢ়তায় ও শৌর্যবীর্যে, তাঁদের মতানুগত্যে আমার শিক্ষার্থীরা যাতে মুগ্ধ হয় আমি সে ব্যাপারে যত্নপর হই।

অতীতে মানবজাতি যে-সমস্ত নৈতিক মূল্য গড়ে তুলেছে ও অর্জন করেছে এবং যেগুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেগুলি যাতে একালেও প্রতিটি শিশুর অন্তরের ঐশ্বর্য হয়ে দাঁড়ায়, হৃদয়কে আলোড়িত করে, সারা দুনিয়ায় সত্যের বিজয়ের খাতিরে সক্রিয় কর্মে অনুপ্রাণিত করে, তার জন্য আমি সচেষ্ট হই। সত্য চিরকালই বিপ্লবাত্মক, বলেন আন্তোনিও গ্রাম্‌শি। আমি চেষ্টা করি বড় বড় বাক্য ব্যবহার

না করে নৈতিক সত্যের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করতে। মানবজাতির নৈতিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য শিশুর অন্তরের ঐশ্বর্য হয় একমাত্র তখনই যখন তার বিপ্লবাত্মক অর্থ হৃদয় আলোড়নকারী উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রকাশ পায়। শব্দ শিক্ষা দেয়, আর দৃষ্টান্ত মুগ্ধ করে — এই মর্মে একটি লাতিন প্রবচন আছে। উজ্জ্বল জীবনের দৃষ্টান্ত, মানবজাতির সুখের জন্য কীর্তির দৃষ্টান্ত — এ হল এমন এক আলো যা শিশুর জীবনকে উদ্ভাসিত করে তোলে। কিন্তু দৃষ্টান্ত মানুষকে বাঁচতে শেখায় একমাত্র তখনই যখন তা হয় মানবিক, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী ভাবধারার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। যে মানুষ ভাবাদর্শবিবর্জিত সে শেষ পর্যন্ত একমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি নিয়ে থাকে — লিখেছেন জার্মান মহাকবি গ্যেটে।

আমি শৈশবে শিশুদের সামনে উন্মুক্ত করলাম এমন সমস্ত মানুষের উজ্জ্বল রূপ, যাঁদের নাম বহু প্রজন্মের কাছে ধ্রুবতারা হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে ছোট শিশুর পক্ষে সব জিনিস ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। শিশুর ওপর যথেচ্ছ পরিমাণে রূপ ও চিত্র চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়, তার মনকে অবিরাম আলোড়িত, বিচলিত করা উচিত নয়। শিশু আপাতত না হয় অল্পই জানুক, তবে এই অল্পের মধ্যে তার কাছে যেন নৈতিক মূল্যবোধের সৌন্দর্য উন্মুক্ত হয়। শিশু তার মনকে যা আলোড়িত করেছে, বিচলিত করেছে তাই নিয়ে ভাবুক, অলঙ্কারের ভাষায় বলতে গেলে, ভাবনাচিন্তা ও অনুভূতির সংমিশ্রণ তার ভেতরে থিতিয়ে আসুক। মানবজাতির সুমহান আদর্শের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁদের কীর্তিকাহিনী আমি চার বছর ধরে আমার শিক্ষার্থীদের বলি। আমি যাঁদের কথা বলি তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্পার্টাকাস,

কাম্পানেল্লা, ইভান সুসানিন, স্তেপান খাল্‌তুরিন, তারাস শেভ্‌চেঙ্কো, টমাস মিউণ্ট্‌সের, সোফিয়া পেরোভ্‌স্কায়া, নিকোলাই কিবাল্‌চিচ, খ্রিস্তো বতেভ, ইয়ানুশ কর্চাক। আমি তাদের বলি মহান লেনিনের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী, কমিউনিস্ট বীর ইভান বাবুশ্‌কিন, সের্গেই লাজো, কামো, ইয়াকোভ স্‌ভের্দ্‌লভ, ফেলিক্স দ্‌জেরজিন্‌স্কি, জুলিয়াস ফুচিক আর এর্নস্ট থেলমানের কাহিনী, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের বীর নিকোলাই গাস্তেল্লো ও আলেক্সান্দর মাত্রোসভের কাহিনী, বৈজ্ঞানিক সত্যসন্ধানী পৌরুষদীপ্ত জোর্দানো ব্রুনো আর মহান মানবদরদী বিজ্ঞানী মিক্‌লুখো-মাকলাইয়ের কথা।

ভাব যেখানে জীবন্ত মানবিক আবেগে, আচরণে ও কীর্তিতে রূপায়িত হয়েছে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিশুর মনোজগতের উপর বিশাল প্রভাব সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। কোন আচরণের মর্ম কী শিশুকে তা ব্যাখ্যা করে দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, ভাব ও রূপ যখন মিশে একাকার হয়ে যায় তখন শিশু ভাববস্তু চমৎকার বুঝতে পারে। যে সব বীরের কাহিনী আমি আমার শিক্ষার্থীদের শোনাই তাদের নৈতিক সৌন্দর্যের মর্মদ্যোতক অতি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে যা ছিল তা হল মানুষের সুখের জন্য জীবন ও সর্বশক্তি উৎসর্গের মানসিকতা। এই বৈশিষ্ট্যই শিশুকে মুগ্ধ করে, অন্য মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে ভাবতে প্রবৃত্ত করে। যে সব মানুষ মানবজাতির সেবার মধ্যে নিজেদের সুখের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা শিশুর কাছে নৈতিক আদর্শ হয়ে দেখা দেন।

শিশু নৈতিক মহিমাসংক্রান্ত গ্রন্থপাঠে গভীর রাত অবধি ডুবে থাকবে না, তার হৃদয় পরম পুলকে দ্রুত স্পন্দিত হবে না — এমন ঘটনা ছাড়া পরিপূর্ণ শিক্ষার কথা কল্পনা করা

কঠিন। নৈতিক আদর্শ অন্তরে তখনই জাগ্রত হয় যখন মানুষ অনেকটা নিজেই নিজেকে নিরীক্ষণ করে দেখে, মানুষের ধারণায় যা নৈতিক সৌন্দর্যের আদর্শ — মতানুগত্য, শৌর্য ও দৃঢ়তার এবং বাধাবিপত্তির সামনে অটল মনোভাবের আদর্শ — তার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে।

শিক্ষককে ভেবেচিন্তে এমন সমস্ত বিবরণ নির্বাচন করতে হবে যেগুলি নৈতিক আদর্শের উৎসমুখের সন্ধান শিশুদের দিতে পারে। এখানে প্রধান ব্যাপার হল ভাবাদর্শগত অর্থ, যা নিয়ে গড়ে ওঠে এমন সমস্ত ঘটনা ও তথ্য। নবীন প্রজন্মের কাছে যাঁরা আদর্শ, তাঁদের জীবনকে ব্যক্তিগত ভাগ্য ও মানবজাতির ভাগ্যের একক রূপে দেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

লেনিনের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী বলার সময় আমি সেই সমস্ত তথ্য সবিস্তারে বর্ণনা করি যা থেকে শ্রমজীবী জনসাধারণের ভাগ্যের প্রতি ভ্লাদিমির ইলিচের গভীর দরদের পরিচয় মেলে। মহান নেতা যা কিছু করতেন তার লক্ষ্য হত জনগণের সুখ। গৃহযুদ্ধ ও ধ্বংসলীলার কঠিন পর্বে অনাথ শিশুদের প্রতি লেনিনের যত্নের কথা শুনে ছেলেমেয়েদের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। আমি চেষ্টা করি যাতে লেনিনীয় মানবিকতা শিশুহৃদয়ে পরম নৈতিক মূল্যবোধরূপে স্থান পায়, যাতে শিশুরা নৈতিক সৌন্দর্য ও সত্যের এই শিখরদেশ থেকে নিজেদের এবং পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখতে শেখে।

ছেলেমেয়েদের মনে গভীর ছাপ রেখে যায় পোল জনগণের জাতীয় বীর ইয়ানুশ কর্চাক সম্পর্কিত কাহিনী। একজন মানুষ যাদের ভালোবাসেন সেই শিশুদের সঙ্গে নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চললেন — একথা ভেবে ওরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। ইয়ানুশ কর্চাক ইচ্ছে করলে নিজের জীবন রক্ষা করতে

পারতেন, কিন্তু ফাশিস্ত জল্লাদদের হাতে যখন হাজার হাজার নিরপরাধ শিশু প্রাণ হারাচ্ছে তখন নিজেকে বাঁচানো তিনি অমর্যাদাকর বিবেচনা করেন। ...ইয়ানুশ কর্চাক শিশুদের কাছে খাঁটি মনুষ্যত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন।

'নারোদ্‌নায়া ভোলিয়া' (জনমুক্তি) পার্টির বীরবৃন্দ — স্তেপান খাল্‌তুরিন, সোফিয়া পেরোভ্‌স্কায়া ও নিকোলাই কিবালচিচ-এর জীবনবৃত্তান্ত শিশুমনে ঐকান্তিক মুগ্ধতার অনুভূতি জাগ্রত করে। আমি যখন বীর কমিউনিস্ট জুলিয়াস ফুচিক ও কামো'র (তের্‌-পেত্রোসিয়ান) দৃঢ়তা, শৌর্য ও মতানুগত্য সম্পর্কে কাহিনী পড়ে শোনাই তখন ছেলেমেয়েদের মন মানুষের জন্য গর্বের অনুভূতিতে ভরে ওঠে। তারা বলল: 'এই রকমই ত হওয়া চাই। এঁরাই ত খাঁটি বীর।'

সোভিয়েত মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যে-সমস্ত বীর পাইওনিয়র প্রাণ বিসর্জন করেছে সেই ভালিয়া কোতিক, ভিতিয়া করোব্‌কোভ, লিওনিয়া গলিকভ, ভলোদিয়া দুবিনিন ও ভাসিয়া শিশ্‌কোভ্‌স্কির বহু কীর্তিকাহিনী আমি ছেলেমেয়েদের শোনাই। এক্ষেত্রে, কমিউনিস্ট নৈতিকতার পরম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য — ভাবাদর্শের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা ও পৌরুষ, সমাজতন্ত্র, শান্তি, মুক্তি ও গণতন্ত্রের শত্রুদের প্রতি আপসহীন মনোভাব যাতে শিশুদের সামনে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয় সে ব্যাপারে আমি সচেষ্ট হই। নিজের মতকে আত্মমর্যাদার মতো সমর্থনের ক্ষমতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করা — শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, আর সে কর্তব্য সম্পাদন সম্ভব হয় একমাত্র তখনই যখন অল্পবয়স থেকে মানুষের মনে ভালো ও মন্দ সম্পর্কে উজ্জ্বল রূপে প্রতিমূর্ত ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কোন ধারণাই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতিজনিত

মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। শিশুর কাছে কোন জিনিসটি মূল্যবান, কিসের সঙ্গে সে কখনই আপস করতে পারে না — এই সব নৈতিক ব্যাপারের সুস্পষ্ট বিভাগ থাকা আবশ্যক। ছোট বয়সে নীতিশিক্ষা — নৈতিক সৌন্দর্যের এই উদ্দীপনা মানুষের জন্য আনন্দ সৃষ্টির আবেগ, নিজের মানবিক মর্যাদাবোধ রক্ষার এবং কমিউনিজমের নৈতিক আদর্শের মূল্যদানের উৎসাহ জাগ্রত করে।

স্কুলের বয়ঃকনিষ্ঠ ছেলেমেয়েরা নৈতিক আদর্শের উৎসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের শিক্ষাদাতাদের কাজ হবে প্রতিটি শিশুর সামনে নৈতিক সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা, কমিউনিস্ট মতানুগত্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষাগ্রহণের সময়ই তারা শ্রমজীবী জনগণের জীবন্ত, সৃজনশীল অংশরূপে নিজেদের ভাবতে পারে।

কমিউনিস্ট পার্টির ভাবানুসরণে

স্কুলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালোবাসতে শেখানো, তার আদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের জন্য সংগ্রামের মনোভাব গড়ে তোলা। 'কমিউনিস্ট' শব্দটি ছেলেমেয়েরা অহরহ শুনে থাকে। শোষকদের কবল থেকে আমাদের জনগণের মুক্তির জন্য, সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য, সমাজের কমিউনিস্ট রূপান্তরের জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন তাঁদের অত্যুজ্জ্বল, সুমহান রূপের সঙ্গে একাকার হয়ে এই শব্দ ও ধারণা যাতে শিশুচেতনায় স্থান পায় আমি সে বিষয়ে সচেষ্ট হই। আমার মতে শিক্ষকতার আদর্শ হল

এই যে পিতৃপিতামহের কমিউনিস্ট আদর্শের উত্তরাধিকারী আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন তাঁদের জন্য গর্ব অনুভব করে, তারা যেন নিজেদের দেশের সত্যিকারের কর্তৃত্বভার নিতে পারে, কমিউনিজম গঠন ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে পারে।

এই কাজে সাফল্য আমি সর্বোপরি লক্ষ্য করি কমিউনিস্টদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। আমাদের এখানে এই আলোচনামালার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অগ্নিগর্ভ মানুষ'। আমি আমাদের দেশের বিশিষ্ট কমিউনিস্টদের সম্পর্কে বলতাম। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামী কমিউনিস্টদের ভাস্বর জীবন ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম শিশুদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করে যে একজন কমিউনিস্টের পরম সুখ হল জনগণের প্রতি আনুগত্য, জনগণের সুখের জন্য সংগ্রাম।

আমাদের 'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের প্রথম দিন থেকে শুরু করে যে দিন কিশোর-কিশোরীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাসের সার্টিফিকেট পেয়ে স্বাধীন কর্মজীবনে প্রবেশ করে অথবা পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও কোথাও যায়, সেই দিনটি পর্যন্ত আমি ওদের লেনিনীয় পাঠ শোনাই। গোড়ার দিকে এতে ছিল ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের শৈশব ও কৈশোর সংক্রান্ত উজ্জ্বল কাহিনী। বছরের পর বছর এই লেনিনীয় পাঠের সঙ্গে বেশি করে এসে যুক্ত হতে লাগল ইতিহাস, কমিউনিস্ট আদর্শ, জনগণের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পার্টির সংগ্রামসংক্রান্ত প্রশ্ন। শিশুদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে কমিউনিস্ট পার্টি হল জাতির শ্রেষ্ঠ অংশ, জাতির সেরা সন্তানবর্গ।

কমিউনিস্টদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎকার শুরু হল। নিজেদের জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে কমিউনিস্টদের কাহিনী শিশুদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের অংশ হয়ে দেখা দেয়। প্রবীণ বলশেভিক ভ. ম. বেস্কোরোভাইনি, আ. ম. রাদ্জিভিল ও ন. ক. গাইচুক-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা ছেলেমেয়েদের চিরকাল মনে থাকবে। আমাদের দেশবাসীরা যে সোভিয়েত শাসনের জন্মলগ্নে তাকে লালন করেছেন, শ্রমিক ও কৃষকদের বিজয়ের জন্য নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলেছেন, এই ঘটনা শিশুদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। তাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাল যে কমিউনিস্টরা হলেন দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন মানুষ। সেই সঙ্গে তাঁরা বিনয়ী শ্রমিকও এবং বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁরা কমিউনিজম গঠনের জন্য তাঁদের শক্তি ও জ্ঞান প্রয়োগ করেন। আ. ম. রাদ্জিভিলকে ছেলেমেয়েরা সেরা সব্জি উৎপাদনকারী হিশেবে জানে। ভ. স. বেস্কোরোভাইনিকে জানে হাতের কাজে দক্ষ কারিগর হিশেবে — তিনি হলেন একজন অভিজ্ঞ মেশিন-অপারেটর। কী ভাবে গাঁয়ে যৌথখামার গড়ে ওঠে, কী ভাবে ট্র্যাক্টর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের পর কমিউনিস্টরা ট্র্যাক্টর চালান এবং যৌথখামারের মাঠে প্রথম হলকর্ষণ করেন — এই সব কাহিনী তিনি ছেলেমেয়েদের বলেন।

সোভিয়েত জনগণের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য পার্টির সংগ্রাম সম্পর্কে ভ. ম. বেস্কোরোভাইনি কয়েকটি সাক্ষাৎকারে আলোচনা করেন। যৌথখামারের পার্টি সংস্থার কাজ কী তাও তিনি বলেন। ছেলেমেয়েরা জানতে পারল যে যৌথখামারের কমিউনিস্টরা ফলনের উন্নতির জন্য যত্ন নেন, পশুপালন ফার্ম থেকে যাতে মেহনতীদের জন্য আরও বেশি মাংস, দুধ ও মাখন পাওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।

লেনিনীয় পাঠমালার মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যকর ছিল পিতৃভূমির মহাযুদ্ধসংক্রান্ত কাহিনী। স. আ. কভ্‌পাক-এর নেতৃত্বে গেরিলা ইউনিটে অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আ. ক. ৎসিম্বাল-এর সঙ্গে, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরিকে ফাশিস্ত কবল থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ন. স. ওনোপা এবং নিজেদের গ্রামবাসী আরও অনেকের সঙ্গে — ফ্যাসিবাদের কবল থেকে জন্মভূমির মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীরদের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎকার ঘটে। শিশুদের চেতনায় এই বিশ্বাস ক্রমেই গভীরতর হয় যে লেনিনের কাজ, লেনিনীয় সত্য বেঁচে আছে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মে ও সংগ্রামের মধ্যে, জনগণের শ্রমের মধ্যে।

অহরহ মানুষের চিন্তা ছাড়া জীবন নিরর্থক

জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শিশু যদি বিনা শ্রমে, অন্তরের শক্তি না খাটিয়েই কেবল আনন্দ ভোগ করে যায় তাহলে তার হৃদয় অনুভূতিশূন্য, নির্দয় ও উদাসীন হয়ে পড়তে পারে।

যে প্রবল নৈতিক শক্তি শিশুচিত্তকে মহনীয় করে তোলে তা হল মানুষের জন্য কল্যাণসৃষ্টি। সোভিয়েত বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত অন্যতম কর্তব্য হল এই যে শিশুর হৃদয় যাতে অনুভব করতে পারে যে তার আশেপাশে এমন সমস্ত লোকজন আছে যারা তার সাহায্য, যত্ন, স্নেহ, দয়ামায়ার প্রয়োজন বোধ করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা। সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের লোকজনের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া যেন শিশুর বিবেকে

বাধে, যেন আমাদের সামনে বিশিষ্টতা অর্জনের ইচ্ছা শিশুর কাছে জনকল্যাণের প্রেরণা না হয়, যেন তা হয় নিঃস্বার্থ প্রেরণা।

শিশুর বিবেকের উৎস, পরহিত প্রবৃত্তির উৎস — শোকতাপগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা। মানুষের অন্তর্লোকের প্রতি সংবেদনশীলতা, অন্যের দুর্ভাগ্যে মর্মপীড়া অনুভবের ক্ষমতা — এ থেকেই শুরু হয় উন্নত মানবিক আনন্দ, যে আনন্দ ছাড়া নৈতিক সৌন্দর্য সম্ভব নয়। 'আনন্দ নিকেতনে' থাকতেই আমার শিক্ষার্থীরা নৈতিক মানবীয় সৌন্দর্যের শীর্ষাভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ করে: তারা মনুষ্যত্ববোধের মহাবিদ্যার প্রথম পাঠ গ্রহণ করে, প্রাত্যহিক জীবনের পরিবেশে যাদের সংস্পর্শে তারা আসে তাদের দুঃখবেদনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অনুভব করতে শেখে। এই ক্ষমতা বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে মনোজীবনের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র তখনই, যখন শৈশবের গোটা পর্বে মানুষ এক দিনের জন্যও লোকের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ না করে পারে না।

আমি আমার শিক্ষার্থীদের সবসময় অন্যের অনুভূতির সহমর্মী হতে শেখাই, যে মানুষ সমবেদনা, সাহায্য ও দরদী যত্নের প্রয়োজন অনুভব করছে, শিশু যাতে তার জায়গায় মনে মনে নিজেকে কল্পনা করতে পারে, তার অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে আমি সেদিকে দৃষ্টি রাখি। অপরের দুঃখ যেন শিশুর ব্যক্তিগত দুঃখে পরিণত হয়, যেন দুঃখী মানুষকে কী ভাবে সাহায্য করা যায় এই নিয়ে তাকে ভাবিয়ে তোলে। মনুষ্যত্বের শিক্ষায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে দুটি মানুষের ব্যক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের আত্মিক মেলামেশা।

প্রতিবেশীকে সাহায্য করার চেয়ে মানবজাতিকে ভালোবাসা সহজ। নির্দিষ্ট ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া মানবপ্রেম সম্ভব নয়। বন্ধু যখন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে কাতর প্রার্থনা করছে তখন তার চোখে গভীর দুঃখের ছায়া যে শিশু দেখতে না পায় মানবিক দুঃখবেদনা সে কখনও হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না। যে শিশু মানবজীবনের সমস্ত দিক না জানে — সুখ ও দুঃখ দুইই সমান ভাবে না জানে সে কখনও সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ হবে না।

আমাদের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের জীবনে বেশ কিছু দুঃখের ঘটনা ঘটে, এর জন্য তাই দূরে যাওয়ার আবশ্যক ছিল না। ছেলেমেয়েদের দলের মধ্যে আনন্দের হাসি শোনা যেত, বিরাজ করছিল প্রফুল্লতা, কিন্তু কোন কোন শিশুর চোখে দেখা যেত বিষাদের ছায়া। ভালিয়া স্কুলে ভর্তি হওয়ার তিন বছর বাদে তার বাবার শরীর হঠাৎ বড় খারাপ হয়ে পড়ে। মেয়েটির কথাবার্তা কমে যায়, তাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখায়। নিনা ও শুরার মা গুরুতর অসুস্থ, মেয়ে দুটোকে প্রায়ই ঘরে থাকতে হত গেরস্থালির কাজে বাপকে সাহায্য করার জন্য। শুরার দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় — কখনও এক সপ্তাহের জন্য, কখনও বা এক মাসের জন্য; ছেলেটার পক্ষে এই ঘটনা ছিল বড় দুঃখের। দিদিমার অসুখের সময় সে থাকত তার মাসীর অভিভাবকত্বে; মহিলা বড় ভালো মানুষ, তিনি শুরাকে যত্ন করতেন, কিন্তু দিদিমাকে ছেড়ে থাকতে ওর কষ্ট হত। একদিন শরৎকালের এক ঠাণ্ডা দিনে শুরা ঠিক করল যে সে দিদিমাকে দেখতে হাসপাতালে যাবে। মাসীকে কোন কিছু না জানিয়েই সে হাসপাতালে চলল। পথে বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে তার ঠাণ্ডা লাগল, সে অসুস্থ

হয়ে পড়ল। কয়েক দিন বাদে তাকেও ভর্তি করা হল সেই একই হাসপাতালে যেখানে তার দিদিমা ছিলেন।

ভলোদিয়াদের পরিবারে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল। ভলোদিয়ার মা ছিলেন পলেস্তারার মিস্ত্রি। রোজ বাস্-এ চেপে তিনি কাজে যেতেন। বসন্তকালে গলা বরফ ফের জমে গিয়ে রাস্তা পেছল হয়ে পড়ায় বাস একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ভলোদিয়ার মা গুরুতর আহত হন। ডাক্তাররা বলেন: তিনি চিরজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে থাকবেন। ঠিক এই সময় সংকটজনক পীড়াগ্রস্ত হয়ে মারা গেলেন ভলোদিয়ার দাদু। ভলোদিয়া যাতে জীবনে সঠিক পথ অবলম্বন করে তার জন্য দাদুর অবদান ছিল বিরাট।

কোলিয়াদের পরিবারেও নেমে এলো দুর্ভাগ্য, তবে সে আরেক রকমের। চোরাই মাল লুকিয়ে রাখার অপরাধে কোলিয়ার বাবাকে গ্রেপ্তার করা হল, বিচারে তার দু'বছরের কারাদণ্ড হল। পরিবারে নৈতিক পরিবেশ অনেকটা পরিচ্ছন্ন হল বটে, কিন্তু যা ঘটে গেল তা বালককে বিমূঢ় করে দিল।

রোজই যখন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয় তখন আমি তাদের মুখ ভালো ভাবে নিরীক্ষণ করি। শিশুর বিষাদগ্রস্ত দৃষ্টি — শিক্ষাদানের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে এর চেয়ে কঠিন ব্যাপার আর কী হতে পারে? শিশুহৃদয়ে যদি দুঃখ থাকে সে অবস্থায় শিশুর ক্লাসে হাজিরা হয় নামেমাত্র। সে টানটান করা এক তারের মতো: সামান্য অসতর্ক ছোঁয়া যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। একেক শিশুর দুঃখভোগ একেক রকম: কাউকে বা আদর করলে তার মন হাল্কা হয়, কেউ বা দরদমাখা কথায় মনে আরও ব্যথা পায়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের দক্ষতা নির্ভর করছে সর্বোপরি মানবিক প্রাজ্ঞতার উপর: পীড়িত হৃদয়কে

সারিয়ে তোলার মতো বুদ্ধি রাখতে হবে, শিক্ষার্থীকে নতুন করে দুঃখ দিলে চলবে না, তার মনের আহত স্থানকে স্পর্শ করা চলবে না। দুঃখে ভেঙ্গে পড়া, হতাশায় জর্জরিত ছাত্র অবশ্যই আগের মতো পাঠে মন দিতে পারে না, তার মননক্রিয়ার ওপর শোকের প্রভাব না পড়ে পারে না। শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে বড় কথা হল সর্বোপরি শিশুর শোক, দুঃখ, কষ্ট দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, শিশুমন দেখা ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা। শিশুর দুঃখের প্রতি শিক্ষকের মনোভাব কী, শিশুমন কতটা বোঝা ও উপলব্ধির ক্ষমতা তাঁর আছে, শিক্ষকতার মূল সেখানেই নিহিত।

যে ছাত্র শোকগ্রস্ত তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য তলব করা উচিত নয়, তার কাছ থেকে অধ্যবসায় ও কঠোর শ্রম দাবি করা উচিত নয়। কী ঘটেছে তা জিজ্ঞেস করাও উচিত নয় — শিশুর পক্ষে তা প্রকাশ করা সহজ নয়। শিশু যদি শিক্ষককে বিশ্বাস করে, শিক্ষক যদি তার বন্ধু হন তাহলে সে যা বলা সম্ভব বলবে। যদি চুপ করে থাকে তাহলে শিশুর পীড়িত হৃদয়কে স্পর্শ না করাই ভালো। ...শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন কাজ হল অনুভব করতে শেখানো। শিশু যত বড় হবে শিক্ষকের পক্ষে ততই কঠিন হয়ে পড়বে — অলঙ্কারের ভাষায় বলতে গেলে — মানবহৃদয়ের সূক্ষ্ম তন্ত্রী স্পর্শ করা। এই সূক্ষ্ম তন্ত্রীর অনুরণনই ধারণ করে মহৎ অনুভূতির আকার।

নিকট জনের চোখ দেখে তার অন্তর্লোক উপলব্ধির ক্ষমতা শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে গেলে শিক্ষাদাতাকে জানতে হবে কী ভাবে শিশুদের অনুভূতির প্রতি, সর্বোপরি শোকানুভূতির প্রতি দরদ দেখাতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর মধ্যে আবেগধর্মী ও নৈতিক সম্পর্ক সবচেয়ে কুৎসিত আকার

ধারণ করে তখনই যখন বয়োজ্যেষ্ঠ অবিবেচকের মতো তর্ক তুলে শোকানুভূতিকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, দেখানোর চেষ্টা করেন যে শিশু তার শোক নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে।

সর্বোপরি বুঝতে হবে শিশুহৃদয়ের আন্দোলন। বিশেষ কোন প্রণালীর সাহায্যে এটা শেখা সম্ভব নয়। আবেগধর্ম ও নীতি সম্পর্কে শিক্ষাব্রতীর সূক্ষ্ম বোধের কল্যাণেই কেবল তা সম্ভব হয়ে ওঠে। শিশুর দুঃখের উৎস যা-ই হোক না কেন সাধারণ একটা রূপ তার মধ্যে সবসময়ই লক্ষ্য করা যায়: বিষণ্ণ, ব্যথাতুর দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে অশিশুসুলভ চিন্তাচ্ছন্ন ও নির্বিকার ভাব, ব্যাকুলতা, নিঃসঙ্গতা। যে শিশু দুঃখের মধ্যে আছে সে তার বন্ধুবান্ধবের খেলাধুলা ও আমোদফূর্তি লক্ষ্য করে না, দুঃখচিন্তা থেকে কোন কিছুই তার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। শিশুকে এক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম ও মঙ্গলজনক যে সাহায্য দেওয়া যেতে পারে তা হল তার একান্তই ব্যক্তিগত, অন্তরতম স্থানকে স্পর্শ না করে তার দুঃখের ভাগ নেওয়া। রূঢ় হস্তক্ষেপে ক্রোধ উদ্রিক্ত হতে পারে, আর ভেঙ্গে না পড়ার, হতাশ না হয়ে শোক সামলে নেওয়ার উপদেশ শিশুর কাছে অসঙ্গত বাচালতা বলেই মনে হবে যদি তার মধ্যে সত্যিকারের মানবিক অনুভূতির চিহ্ন না থাকে।

শিশুদের অনুভব করতে শেখানোর অর্থ হল সর্বোপরি নিজের মার্জিত আবেগধর্ম ও নীতিবোধ তার মধ্যে সঞ্চার করা। মার্জিত অনুভূতি ব্যক্তির মানসিক অবস্থার গভীর বোধ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। আর এ ধরনের বোধ শিশুর কাছে তখনই আসে যখন সে ভুক্তভোগী মানুষের জায়গায় মনে মনে নিজেকে স্থাপন করে।

সাশার দিদিমা যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন সাশাকে

দেখাতে বিষণ্ণ, চিন্তাগ্রস্ত, সেই সঙ্গে সন্ত্রস্ত: তাকে কোন কিছু বললেই সে চমকে ওঠে, যেন তার ক্ষতস্থান কেউ স্পর্শ করেছে। একদিন আমি দেখতে পেলাম ওর বড় বড় কালো চোখ জলে ভরে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা আমাকে বলল: 'সাশা কাঁদছে।' শিশু যেহেতু শিশু সেই কারণে সে তার বন্ধুর প্রতি অথবা বয়স্ক কোন ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে এমন আশা করা অন্যায়। সহমর্মিতা শেখাতে হয় — তেমনই যত্ন, মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে, যেমন ভাবে শিশুদের শেখানো হয় প্রথম হাঁটতে। সহমর্মিতা — জানার, ভাবনা ও হৃদয় দিয়ে জানার অন্যতম সূক্ষ্ম ক্ষেত্র। অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতীর থাকতে হবে সহমর্মিতা শিক্ষাদানের শক্তিশালী হাতিয়ার — কথা।

সাশা যখন ক্লাসে ছিল না সেই সময়ের সুযোগ নিয়ে আমি ছেলেমেয়েদের বললাম: 'মানুষ যখন দুঃখ পায় তখন তা দেখে অবাক হওয়ার ভাব প্রকাশ করতে নেই। সাশার বড় দুঃখ। ওর একমাত্র আপন মানুষ — দিদিমা। মাকে ওর মনে পড়ে না। এদিকে দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে হয়ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। তাহলে ছেলেটা থাকবে কার সঙ্গে? ওর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে দেখ, তাহলে বুঝতে পারবে দুঃখ কাকে বলে। মনে পড়ে কি সেই বুড়ো মানুষটিকে, যাকে আমরা পথের ধারে দেখেছিলাম? মনে পড়ে তার চোখে কী রকম বেদনার ভাব ছিল? তোমরা তখন অনুভব করেছিলে যে বুড়ো মানুষটি বিপদে পড়েছে। তা হলে তোমরা বন্ধুর চোখে দুঃখের ছায়া দেখতে পাও না কেন? তোমরা ত দেখতে পাচ্ছ যে সাশা আজ কয়েক দিন হল চুপচাপ, গম্ভীর হয়ে আছে। ও ক্লাসে, কিন্তু ওর সমস্ত ভাবনাচিন্তা পড়ে আছে দিদিমার শয্যার পাশে। ও যদি কয়েক

দিন স্কুলে না আসে তাহলে তোমরা কেউ ওর স্কুলে না আসার কারণ নিয়ে ওকে জিজ্ঞেসবাদ করার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা মুখে বলা মানুষের পক্ষে সহজ নয়। মোটকথা, কাউকে যদি বিপদে, দুঃখদুর্দশার মধ্যে পড়তে দেখ তাহলে কৌতূহল প্রকাশ না করে বরং সাহায্য কর। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। যদি জানতে পার যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কারও বিপদ ঘটেছে তাহলে এমন কাজ করবে যাতে তোমার মুখের কোন কথা, তোমার কোন আচার-আচরণ তার দাঃখকে বাড়িয়ে না দেয়। অতএব আরও ভালো করে ভেবে দেখ সাশা ও তার দিদিমাকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়। কিন্তু লোকে তোমাদের বলবে, আহা কী ভালো রে — বন্ধুকে সাহায্য করছে — এই বাহাদুরী পাওয়া যেন তোমাদের সাহায্যের উদ্দেশ্য না হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মন সায় না দিচ্ছে যে বন্ধুকে সাহায্য করা উচিত, ততক্ষণ উদারতার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণেই তোমরা ভালো বনে যাবে না।'

সাশা ক্লাসে এলো, তার সম্পর্কে আর কোন কথাই আমি বললাম না, ছেলেমেয়েরাও বুঝে ফেলল কেন আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা শুরু করে দিলাম। আর টিফিনের সময় ওরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল কী ভাবে সাশাকে ও তার দিদিমাকে সাহায্য করা যায়। ছেলেমেয়েরা বন্ধুর জন্য নিয়ে এলেনা আপেল আর মাছ — এ সবই তারা করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। দিদিমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সাশাকে যখন মাসীর কাছে থাকতে হয় তখন ছেলেমেয়েরা প্রায়ই তার কাছে যেত। ছেলেটা বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়ে পড়ে দিদিমার সঙ্গেই হাসপতালে শুয়ে আছে জানতে পেরে ওরা গভীর দুঃখ অনুভব করে। ছুটির দিনে আমরা সকলে হাসপাতালে গেলাম।

ছেলেমেয়েরা বন্ধুর জন্য নিয়ে যায় আপেল ও বিস্কুট। আর শুরা নিয়ে যায় একটা চকোলেট বার — এটা ওর বাবা দিয়েছেন। দিনের অর্ধেক সময় আমরা হাসপাতালে অপেক্ষা করলাম — হাসপাতালে সাশার ঘরে একে একে সব ছেলেমেয়ে এলো।

ব্যাপারটা আমাকে যেমন আনন্দ দিল তেমনি উদ্বিগ্নও করে তুলল, কেননা এ ত সমষ্টিগত হৃদয়াবেগের ফল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিল যারা বন্ধুর ভালো করতে এগিয়ে এসেছিল সর্বোপরি এই উদ্দেশ্যে যাতে তাদের উদার আচরণ অন্যদের চোখে পড়ে। ভলোদিয়া আমাকে বলল যে সে হাসপাতালে সাশার জন্য উপহার নিয়ে আসবে একজোড়া নতুন স্কেট, যা তার বাবা কিছুকাল আগে কিনে দিয়েছেন।

'বাবার মত আছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, আছে।'

'তা হলে হাসপাতালে এনে কাজ নেই। সাশার ত আর এখন স্কেট করার উপায় নেই। বরং ও সুস্থ হয়ে উঠলে বাড়িতে নিয়ে আসিস।'

ভলোদিয়া কিন্তু বন্ধুকে স্কেট উপহার দিল না। দেখা গেল মনের আবেগ বেশ দুর্বল। ...এই ঘটনা মনের উদারতা, আন্তরিকতা ও সহানুভূতি শেখানোর ব্যাপারে বেশ ভাবিয়ে তুলল। বড়ই সূক্ষ্ম, জটিল জিনিস। শিশু যাতে প্রশংসা ও পুরস্কারের কথা না ভেবে ভালো করার তাগিদে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হয় তার জন্য কী করা যায়? ভালো করার তাগিদ ব্যাপারটা কী? কোথা থেকে তার সূত্রপাত? বলাই বাহুল্য যে সহানুভূতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত হৃদয়াবেগের তাৎপর্য

বিরাট। তথাপি সহমর্মিতাকে প্রতিটি শিশুর মনোজীবনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্র গভীর ভাবে অধিকার করে থাকা চাই।

আমি যে দিকে দৃষ্টি দিই তা হল এই যে আমার শিক্ষার্থীরা সকলেই যেন মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হয় — যেন বন্ধুবান্ধবকে অথবা সাধারণ ভাবে অন্যদের সাহায্য করে অন্তরের প্রেরণাবশত এবং তাতে গভীর তৃপ্তি অনুভব করে। নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত অন্যতম কঠিন কাজ: মানুষকে ভালো কাজ করতে শেখাতে হবে, সেই সঙ্গে এড়াতে হবে কী করা উচিত সেই ব্যাপারে সরাসরি উপদেশ। কার্যক্ষেত্রে কী করা উচিত? সম্ভবত, সবচেয়ে বড় কথা হল শিশুর অন্তরে বিকশিত করে তোলা অভ্যন্তরীণ শক্তি, যার কল্যাণে মানুষ ভালো কাজ না করে পারে না, অর্থাৎ সহমর্মিতার শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু কী ভাবে তা করা যায়? শিশু যাতে অন্যের দুঃখ দেখে মনে মনে তার জায়গায় নিজেকে স্থাপন করতে পারে, যাতে উজ্জ্বল ভাবনা উজ্জ্বল আবেগের জন্ম দেয়, যাতে ছোট শিশুর ব্যক্তিত্ব দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, যাতে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে শিশু নিজেকে দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছুনোর জন্য কী উপায় অবলম্বন করা যায়?

শিশুদের মনোজীবন ও পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের যে-সমস্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত সেগুলি ধীরে ধীরে মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত সেমিনারে পরিণত হল। তাতে প্রাথমিক শিক্ষকমণ্ডলী ছাড়া মাধ্যমিক শ্রেণীর এবং ওপরের ক্লাসের শিক্ষকেরাও যোগ দিতেন। আমাদের তত্ত্বাবধানের বিষয় হয়ে দাঁড়াল মানুষ — শিশু, উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী। মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত সেমিনারের বৈঠকগুলিতে

আমাদের বিবরণী ও সমাচারের বিষয় হত নির্দিষ্ট কোন শিশুর মনোজগৎ, তার মানসিক, নৈতিক, আবেগধর্মী, শারীরিক ও নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশের উৎস, প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর্বে তার বুদ্ধিবৃত্তি, মননক্রিয়া, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি, চরিত্র ও ব্যক্তিগত মতামত সংগঠিত হয়ে ওঠার ও হতে থাকার পরিস্থিতি। প্রাথমিক শিক্ষকেরা তাঁদের বিবরণীর সাহায্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতাদের অনেকটা যেন উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে ও কিশোর-কিশোরীদের উপর শিক্ষণীয় প্রভাব সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত করে তুলতেন। উত্তরোত্তর অধিক মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল শিক্ষাবিষয়ক সমষ্টিগত মত: যাকে আমরা শিক্ষা দিচ্ছি সে যাতে সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলীর প্রভাবাধীনে থাকে তার জন্য প্রতিটি শিক্ষাব্রতীকে গভীর ভাবে জানতে হবে প্রতিটি ছাত্রকে, প্রতিটি ছাত্রের সূক্ষ্মতম ব্যক্তিমানসকে।

কোন কোন ছেলেমেয়ের অন্তর্লোকের জটিলতম ক্ষেত্র গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা ২ ঘণ্টায় কখনও বা ৩ ঘণ্টায়ও হয়ে উঠত না। যেমন, কোলিয়ার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার বিবরণী শোনার পর শিক্ষকেরা আমার বর্ণনার সঙ্গে যোগ করলেন অতি গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকটি বিশদ ব্যাপার: শিশু তার মণ্ডলীর মধ্যে যা দেখে তা তার ভাবজগতে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, অর্থাৎ মানুষে মানুষে সম্পর্ক তার কাছে কী রকম হয়ে দেখা দেয়, অন্যদের সঙ্গে নিজের কী রকম সম্পর্ক সে অনুভব করে। সৎকর্মের প্রতি অভ্যন্তরীণ অন্তঃপ্রেরণা সম্পর্কে, শিশু কী ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষের ভালো করতে এগিয়ে আসে সে-সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত কৌতূহলজনক এবং শিক্ষকমণ্ডলীর মতে, নতুন এক সিদ্ধান্তে এলাম।

দুর্ভাগ্যপীড়িত বন্ধুকে শিশুরা যত বেশি অন্তরের শক্তি প্রদান করে ততই বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল হতে থাকে তাদের হৃদয়। ফেব্রুয়ারির এক ঠাণ্ডা দিনে (ছেলেমেয়েরা তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে) আমার বাড়িতে ছুটে এলো মিশা, কোলিয়া ও লারিসা। কোন একটা কারণে ওদের উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

'ভানিয়ার ভাই লিওনিয়া মারা গেছে,' কাতিয়া বলল। 'ওর বাবার কাছে টেলিগ্রাম এসেছে। কাল উনি কাজাখস্তান* যাচ্ছেন। এখন কী করা যায়?'

ছেলেমেয়েদের চোখে ঝরে পড়ছে অনুনয়: আমাদের শেখান, বন্ধুকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়।

ট্র্যাজিডিটা কী ভাবে ঘটল ঐ দিনই তা জানা গেল। ১৮ বছর বয়স্ক ট্র্যাক্টরচালক লিওনিয়া পশুপালন খামারে খড় নিয়ে যাচ্ছিল। পথে উঠল তুষার ঝঞ্ঝা। সে ইচ্ছে করলে ট্র্যাক্টর রেখে দিয়ে পথের কাছাকাছি যে গাঁ ছিল সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারত, কিন্তু সে তা করল না, তার ভরসা ছিল যে তুষারঝড় থেমে যাবে এবং সে সময়মতো খামারে খড় পেঁছে দিতে পারবে। কিন্তু তুষারঝড়ের বেগ আরও বাড়ল, হিমের আঘাত এসে পড়ল, লিওনিয়া ট্র্যাক্টরের মধ্যে হিমে জমে গেল। ...ভানিয়া কয়েক দিন স্কুলে এলো না। ছেলেমেয়েরা বিষণ্ণ, তাদের কলরব থেমে গেল। সকলেই জিজ্ঞেস করে: বন্ধুকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়? কেউ কেউ বলল, ভানিয়াদের বাড়িতে যাওয়া উচিত। আমি পরামর্শ দিলাম ওরা যেন তা

---

* কাজাখস্তান — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইউনিয়নের অন্তর্বর্তী একটি প্রজাতন্ত্র।

না করে: 'ছেলেটার, তার মা-বাবা ও ভাই-বোনদের অমনিতেই বড় শোক। আমরা ওদের বাড়িতে এলে আমাদের দেখেই মা'র মনে পড়বে লিওনিয়ার স্কুলে যাওয়ার কথা, তাঁর পক্ষে আরও খারাপ হবে। মা'র মন যখন একটু শান্ত হয়ে আসবে তখন, আর কয়েক দিন বাদে যাওয়া যাবে। আর ভানিয়া যখন স্কুলে আসবে তখন ওকে জিজ্ঞেস করো না কী ভাবে ওর ভাই মারা গেল, একথা ভাবতে গেলে ওর মন খারাপ হয়ে যাবে, ওর পক্ষে বলা কঠিন হবে। ভানিয়ার দিকে নজর দিও, হুঁশিয়ার থেকো, কোন ভাবেই ওর মনে আঘাত দিও না।'

ভানিয়ার বাবা কাজাখস্তান থেকে আসার পর আমাকে বললেন যে ওখানকার রাষ্ট্রীয় খামারের বসতির একটি রাস্তা তাঁর বড় ছেলের নামে হয়েছে। আমি সংবাদটা ছেলেমেয়েদের জানালাম। সেই সময় আমাদের ক্লাস পাইওনিয়রে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ওদের বাহিনীর এবং তিনটি গ্রুপের কোন্‌টার কী নাম হবে এই নিয়ে ওরা ভাবছিল। শেষ পর্যন্ত, আমি যা আশা করছিলাম তা-ই হল, ওরা নিজে থেকেই বলল, ভানিয়া যে গ্রুপে থাকবে সেটার নাম হোক কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী তার ভাই লেওনিদের নামে। আমি ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিলাম: ড্রইং খাতা নিয়ে আমাদের প্রত্যেকে স্কুল সম্পর্কে যা হোক একটা ছবি আঁকুক। বলাই বাহুল্য ওদের ইচ্ছে হল লেওনিদ আর তার বিদ্যালয়পর্ব সম্পর্কে ছবি আঁকে। লেওনিদ তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় যে আপেল গাছটা লাগিয়েছিল, ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমাদের তা দেখায়। পদার্থবিদ্যার ঘরে আমরা লেওনিদ ও তার বন্ধুদের তৈরি ক্রেনের মডেল দেখতে পেলাম। লেওনিদ পাখি ভালোবাসত, সে তার গ্রুপের সঙ্গে মিলে পায়রাদের জন্য যে

ছোট্ট বাসা বানিয়েছিল সে স্মৃতি স্কুলে ছিল। ড্রইং খাতায় ছেলেমেয়েরা এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ দেয়। আমি লেওনিদের প্রতিকৃতি আঁকলাম। ড্রইং খাতাটা মাকে উপহার দেওয়া হল। তাঁর কাছে এই উপহারটি ছিল অমূল্য: তাঁর আনন্দ হল এই দেখে যে স্কুলের সকলে ছেলেকে মনে রেখেছে। পাইওনিয়রের যে গ্রুপটি লেওনিদের নামে হবে তার জন্যও আমরা ঐ একই রকম একটি ড্রইং খাতা বানালাম।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যে কল্যাণবোধ ও সৎকর্ম যেন 'আনুষ্ঠানিক' ব্যাপারে পরিণত না হয়ে যায়। যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে যত দূর সম্ভব কম কথাবার্তা বলতে হবে, সহৃদয়তার জন্য কোন প্রশংসার কথা মুখে আনা চলবে না — শিক্ষাকর্ম ক্ষেত্রে এই দাবি মেনে চলতে হবে। মানবিক আচরণকে শিশু যখন নিজের কৃতিত্ব বলে ভাবে, অনেকটা মহিমা রূপে গণ্য করে, তখন বড় বিপদের কথা। এ ব্যাপারে প্রায়ই দোষী হয় আমাদের স্কুল। কোন এক ছাত্র হয়ত রাস্তায় কারও হারানো দশটি কোপেক পড়ে পেয়ে ক্লাসে নিয়ে এলো, অমনি ছাত্রছাত্রীদের সকলের মধ্যে ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে একটা কৌতূহলজনক ঘটনা মনে পড়ছে। ঘটনাটা ঘটেছিল পাশের একটা স্কুলে। একটা মেয়ে ক্লাসে নিয়ে এলো পড়ে-পাওয়া পাঁচ কোপেক, শিক্ষিকা তার খুব সুখ্যাতি করলেন। ...এর পরেই টিফিনের সময় তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে দিদিমণির কাছে ছুটে এলো — দেখা গেল ওরা সকলেই বন্ধুবান্ধবের হারানো পয়সা খুঁজে পেয়েছে — কেউ এক কোপেক, কেউ বা দুই কোপেক। ছেলেমেয়েরা প্রশংসার প্রত্যাশা করছিল; দিদিমণি অস্বস্তি বোধ করলেন, রুষ্ট হলেন। ...এই ভাবে শিশুরা 'প্রশংসার ভাগ পাওয়ার জন্য' লালায়িত

হয়ে ওঠে, আর তাদের যদি প্রশংসা না করা হয় তাহলে তারা অসন্তুষ্ট হয়।

সহৃদয়তাকে হতে হবে মননক্রিয়ার মতোই অভ্যস্ত ব্যাপার। তাকে পরিণত হতে হবে অভ্যাসে। আমাদের শিক্ষকমণ্ডলী চেষ্টা করেন যাতে উদার, আন্তরিক, সহৃদয় আচরণ শিশুর গভীর পরিতৃপ্তির কারণ হয়। অপরের অন্তর্লোকের প্রতি হৃদয়ের সংবেদনশীলতা যেমন শিক্ষকের মুখের কথার প্রভাবে তেমনি সমষ্টির মনোভাবের প্রভাবেও শৈশবে জাগ্রত হয়। যা অতি গুরুত্বপূর্ণ তা হল কল্যাণধর্মী কাজে সকল শিশুর প্রবৃত্তি, হৃদয়ের প্রবল অনুভূতিপ্রবণতা জাগিয়ে তোলা। কিন্তু এই আবেগ হৃদয়কে একমাত্র তখনই মহিমান্বিত করে তোলে যখন তা ব্যক্তিগত কার্যকলাপের আকার ধারণ করে।

আমার শিক্ষার্থীরা তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু — আন্দ্রেই দাদুর কথা ভোলে নি। শীতকালে বৃদ্ধ বাস করতেন মৌচাষের জায়গা থেকে অনতিদূরে একটি শীতকালীন ছোট কুটিরে। ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে আসত, আপেল, আঁকা ছবি নিয়ে আসত। দাদু ওদের প্রতিটি আন্তরিক কথায় আনন্দ পেতেন। ছেলেমেয়েরা অনুভব করত যে নিঃসঙ্গতা — দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ওরা মানুষটির ভালো করার চেষ্টায় থাকত।

একদিন মার্চ মাসের এক ঈষদুষ্ণ দিনে ছেলেমেয়েরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আন্দ্রেই দাদুর কাছে চলল: আজ ওরা শীতকালের আশ্রয় থেকে মৌমাছিদের বার করে আনতে দাদুকে সাহায্য করবে। এই দিনটা ওদের সকলের কাছে এক উৎসব ছিল: বসন্তের সোনালি পাখাওয়ালা অগ্রদূতেরা কী ভাবে চারদিকে উড়ে বেড়ায় তা লক্ষ্য করে ওরা আনন্দ পায়। কুটিরে যাওয়ার পথে আমরা জল পান করার উদ্দেশ্যে এক প্রৌঢ়া

মহিলার বাড়িতে উঠলাম। উনি আমাদের ঘরে তৈরি বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলেন, বললেন আমরা যেন ঘন ঘন তাঁর বাড়িতে অতিথি হই।

যুদ্ধের সময় ওল্‌গা ফিওদরভ্‌না গভীর শোক পান: তাঁর দুই বড় ছেলে, স্বামী ও ভাই ফ্রণ্টে মারা যান, আর মেয়ে ফাশিস্ত জার্মানিতে পাথুরে কয়লার খনিতে সাধ্যাতীত খাটুনির দরুন মারা যান। আমি মহিলার দুর্ভাগ্যের কাহিনী ছেলেমেয়েদের বললাম, শিশুহৃদয়ে তখনই জাগ্রত হল ওল্‌গা দিদিমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর বাসনা। ওরা প্রায়ই দিদিমার কাছে আসত। ওল্‌গা ফিওদরভ্‌না ছেলেদের ও স্বামীর পাওয়া অর্ডার ও পদক আমাদের দেখান। শিশুহৃদয়ে ওল্‌গা দিদিমাকে খুশি করার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। ফলের গাছ লাগানোর সময় হতেই আমরা ওঁর উঠোনে পাঁচটা আপেল গাছ লাগালাম, আর লাগালাম সেই একই সংখ্যক নাসপাতি ও চেরি গাছ ও আঙুরলতা — ছেলে, মেয়ে, স্বামী ও ভাইয়ের স্মৃতিতে। দিদিমার নিজের জন্যও কটি গাছ লাগানো হল। ওল্‌গা ফিওদরভ্‌না যে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। প্রচণ্ড গরমের সময় আমরা গাছে জল দিতে আসতাম, অবশ্য আমাদের ছাড়া ওল্‌গা ফিওদরভ্‌না নিজেও কাজটা করতেন। গ্রীষ্মকালে ছেলেমেয়েরা সারা দিন ওঁর কাছে কাটাত।

ওল্‌গা দিদিমা ছেলেমেয়েদের বন্ধু হলেন। তাঁকে বাদ দিয়ে ওরা একটা উৎসবও করত না। চেরি, আপেল, নাসপাতি ও আঙুর পাকার সময়টা যাতে ফসকে না যায় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকত। দিদিমার বাগানে এসে আমরা প্রথম পাকা ফলগুলো পেয়ে তাঁকে এনে দিতাম। ছেলেমেয়েরা সপ্তম

শ্রেণীতে পড়ার সময় দিদিমা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার এক সপ্তাহ বাদে তিনি মারা গেলেন। ছেলেমেয়েরা বড় দুঃখ পেল। কিছুকাল পরে আমরা জানতে পারলাম যে ওল্‌গা ফিওদরভ্‌না তাঁর মৃত্যুর পর কুটির ও বাগান শিশুদের দেওয়ার জন্য উইল করে গেছেন। এই উইল যৌথখামারের পরিচালকদের সমস্যায় ফেলল: ছাত্রছাত্রীরা কুটির ও বাগানের মালিক — এটা কী রকম ব্যাপার? আইনশাস্ত্রের কোন নিয়মের আওতায় যা পড়ে না, যৌথখামারীরা সে ব্যাপারের সমাধানে সাহায্য করল। তারা বলল এই ছোট খামারবাড়িটাতে ছোটরা নিজেদের মনের মতো ভালো ভালো কাজ করুক। আমরা আন্দ্রেই দাদুকে কুটিরে আসার আমন্ত্রণ জানালাম, উনি সানন্দে ওখানে উঠে এলেন — জায়গাটা মৌচাষের জায়গা থেকে কাছেও। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় অক্টোবর বাহিনীর বাচ্চাদের সঙ্গে ভারিয়া ও জিনার বন্ধুত্ব হয়, তারা ওদের পাইওনিয়র বাহিনীর জন্য তালিম দেয়। ছেলেমেয়েরা সারা দিন ওদের নিজেদের বাগানে কাটায়।

যে জননীর সন্তান মাতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর শোকের অন্ত নেই। আমাদের ছেলেমেয়েদের উচিত এই শোক অনুভব করা, উপলব্ধি করা, তার ভাগীদার হওয়া। ভলগা থেকে এল্‌বা, উত্তর মেরুসাগর থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উষ্ণ জলরাশির অজানা সমাধিগর্ভে শায়িত সন্তানদের হাজার হাজার জননী স্কুলের ছেলেমেয়েদের বন্ধু হোক। আমাদের জন্মভূমির পরম দুঃখবেদনা — ২ কোটি ২০ লক্ষ প্রাণ হারানোর বেদনা, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাভোগের, অগ্নিকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার বেদনা —

যা আমাদের জনগণ ভুলতে পারে না, যার জন্য ফাশিস্তদের ক্ষমা করা যায় না — তা যদি শিশুমন অনুভব করতে না পারে, উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে তাকে মহনীয় করে তোলা যায় না।

শিশু যত গভীর ভাবে জননীর বেদনা হৃদয়ঙ্গম করবে, অনুভব করবে, ততই বৃদ্ধি পাবে তার হৃদয়ের সংবেদনশীলতা, ততই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হবে তার নাগরিক দৃষ্টিভঙ্গি, ততই তীব্র হয়ে দেখা দেবে শিশুহৃদয়ে জন্মভূমির ভবিষ্যতের জন্য দায়িত্ববোধ। এই কারণে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের জননীদের পাইওনিয়র সভায় (সাধারণ ভাবে, বিদ্যালয়ে) আমন্ত্রণ জানানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ব্যাপারে রীতিমতো বিচক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতে হবে। শিশুদের কাছে এই ঘটনাটা যেন নিয়মিত পর্যায়ের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান হয়ে দেখা না দেয়। যে মানুষের ব্যক্তিগত বেদনা সমগ্র জাতির বেদনার অভিব্যক্তিস্বরূপ, তার সঙ্গে সাক্ষাৎকার যাতে দীর্ঘকাল শিশুমনে ছাপ রেখে যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা চাই।

নাগরিকের শিক্ষাদান কেবল তত্ত্বগত ভাবে নয়, শিক্ষাপ্রক্রিয়ার ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও অন্যতম জটিল সমস্যা। এক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্ব যার ওপর আরোপ করতে হয় তা হল এই যে জ্ঞান যেন হৃদয়ের পথ ধরে অগ্রসর হয়, মানুষের ব্যক্তিগত অন্তর্লোকে প্রতিফলন ঘটায়। জন্মভূমি সম্পর্কে জ্ঞান, সোভিয়েত জনগণের কাছে যা পবিত্র ও প্রিয় সে-সম্পর্কে জ্ঞান — এটা নিছক এমন তথ্য নয় যা মনে করে রাখার পর প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ করা যায়। এ হল এমনই সত্য যা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবনকে স্পর্শ করবে। মানুষের মহিমার

মধ্য দিয়েই যে জন্মভূমির মহিমা জানা যায়, এই শর্তে তা শিশুর কাছে পবিত্র হয়ে দাঁড়ায়।

বিশিষ্ট সোভিয়েত লেখক, লেওনিদ লেওনভের ভাষায় 'জনগণের স্মৃতি — এক বিশাল গ্রন্থ, যেখানে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে।' এই গ্রন্থপাঠ ব্যতিরেকে, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর সম্পর্কে গভীর চেতনা ও বোধ ব্যতিরেকে নাগরিকতার শিক্ষা অচিন্তনীয়। আমরা যাকে জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক আখ্যা দিতে অভ্যস্ত, আমার মতে, সর্বোপরি তা হল জনচিত্ত থেকে শিশুদের চেতনায় ও হৃদয়ে আমাদের পরম পবিত্র সামগ্রীর সঞ্চরণ — দেশের শত্রুদের প্রতি, জনগণের অশেষ দুঃখদুর্দশা সূচনাকারী, দাসত্ববন্ধনকারীদের প্রতি ঘৃণা ও দেশপ্রীতির সঞ্চরণ। জনগণের স্মৃতির এই বিশাল গ্রন্থ যতবার স্পর্শ করা যায় ততবারই তা হয় মানবিক ব্যক্তিত্ব গঠনের জটিলতম, পরম দায়িত্বপূর্ণ কর্ম।

মহৎ অনুভূতিদীপ্ত শ্রম

শ্রম তখনই মহান শিক্ষাদাতা হয় যখন তা শিক্ষার্থীদের মনোজীবনে স্থান পায়, মৈত্রী ও সৌহার্দের আনন্দ দান করে, অনুসন্ধিৎসা ও ঔৎসুক্য বিকাশ করে, বাধাবিপত্তি অতিক্রমণের চাঞ্চল্যকর আনন্দ সঞ্চার করে পারিপার্শ্বিক জগতে নিত্যনব সৌন্দর্যের উদ্ঘাটন ঘটায়, জাগিয়ে তোলে প্রথম নাগরিক অনুভূতি — বৈষয়িক সম্পদ স্রষ্টার অনুভূতি, যে অনুভূতি ছাড়া মানুষের জীবন সম্ভব নয়।

শ্রমের আনন্দ — প্রভূত শিক্ষামূলক শক্তির অধিকারী।

শৈশবে প্রতিটি শিশুকে এই মহৎ অনুভূতি গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম শরৎ। স্কুলের জমিতে ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আমাদের জন্য কয়েক বর্গমিটার জমি বরাদ্দ করে দিয়েছে। আমরা মাটি কোপাই — এই কাজটা পাড়াগাঁয়ের শিশুর অভ্যস্ত কাজ। বাচ্চাদের বলি: 'এখানে আমরা শীতকালের গম বুনব, ফসল তুলব, পেষাই করব। হবে আমাদের প্রথম রুটি।' রুটি কাকে বলে ছেলেমেয়েরা ভালোমতোই জানে, ওরা ওদের বাবা ও মায়েদের মতোই শ্রম নিয়োগ করে, সেই সঙ্গে যে কাজটা আমরা করতে চলেছি তার মধ্যে একটা রোমাণ্টিক-রোমাণ্টিক, খেলা-খেলা ভাবও আছে।

প্রথম ফসলের স্বপ্ন ওদের অনুপ্রাণিত করে, বাধাবিপত্তি অতিক্রমণে সাহায্য করে। আর বাধাবিপত্তিও কম নয়: ছেলেমেয়েরা ঝুড়ি করে পচানি সার বয়ে আনে, মাটির সঙ্গে মেশায়, গমের সারির জন্য জলসেচের আল খোঁড়ে, বোনার জন্য বীজ বাছে। ফসল বোনা সত্যিকারের উৎসবে পরিণত হয়। সকলেই শ্রমের অনুপ্রেরণায় মেতে উঠেছে। ফসল বোনা হয়ে গেল, কিন্তু কেউই বাড়িতে যায় না। মন চায় স্বপ্ন দেখতে। আমরা গাছের নীচে বসি, আমি সোনালি গমের দানার রূপকথা বলি। রূপকথা ভাবতে ভাবতে ভাবি আমার শিক্ষার্থীদের কাছে শৈশবের এই শ্রম শুধু ছেলেখেলা না হয়ে যেন প্রথম নাগরিক কর্তব্য পালনের আনন্দ হয়ে দেখা দেয়। আমি ভাবি, শ্রম যেন হয় এক প্রশস্ত সড়ক, যার উপর দিয়ে যাত্রা করে শিশু সমাজজীবনে প্রবেশ করতে পারে, লোকজনকে এবং নিজেকে জানতে পারে, প্রথমবার নাগরিকতার গর্ব অনুভব করতে পারে। আমি কখনই বিস্মৃত হতাম না যে শ্রম যেন

সহজসাধ্য না হয়। শিশুদের শারীরিক শক্তি ও অন্তরের শক্তি প্রয়োগের মাপকাঠিতেই নির্ধারিত হয় সেই পরম গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার নাম পূর্ণতাপ্রাপ্তি। শ্রমের কল্যাণেই শিশুর সাবালকত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বাধাবিপত্তির এই মাপকাঠি খুঁজে বার করে তাকে এমন ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে শ্রম যেমন শিশুসুলভ হয় তেমনি শিশুও যেন ধীরে ধীরে শিশুত্ব বর্জন করে। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে শিক্ষার এই উদ্দেশ্যটি সফল হয় একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই যখন শিশুর শ্রমে নিহিত থাকে বয়স্কদের সৃজনী কার্যকলাপের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান: বৈষয়িক ফলপ্রাপ্তি আর সমষ্টিভুক্তির বোধ।

গমের অংকুর বের হওয়া পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা উত্তেজনা বোধ করে: আমাদের খেত শ্যামল হয়ে উঠতে আর কত দিন লাগবে? অংকুর গজানোর পর ছেলেমেয়েরা রোজ সকালে ছুটে আসত দেখতে: সবুজ ডাঁটাগুলি দ্রুত বাড়ছে কিনা। শীতকালে আমরা খেতটাকে বরফ দিয়ে ঢেকে দিলাম যাতে গম গরমের মধ্যে থাকতে পারে। বসন্তকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায় যখন তারা দেখতে পায় অংকুরগুলো জমিতে যেন এক নিরেট গালিচা পেতে দিয়েছে, গম শীষ উঠিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি গমের শীষের ভাগ্য ছেলেমেয়েদের ভাবনার বিষয় হল।

ফসল বোনার চেয়ে ফসল তোলা আরও বড় আনন্দোৎসব হল। ছেলেমেয়েরা স্কুলে এলো উৎসবের সাজে। ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে যত্ন করে গম কাটল, ছোট ছোট আঁটি বাঁধল। আবার শ্রমের উৎসব — মাড়াই। দানা খুঁটে খুঁটে থলিতে ভরা হল। আন্দ্রেই দাদু গম পেষাই করে সাদা ময়দা নিয়ে এলেন।

তিনার মা'কে আমরা অনুরোধ করলাম আমাদের জন্য রুটি সেঁকে দিতে। ছেলেমেয়েরা তাঁকে সাহায্য করল: ছেলেরা জল বয়ে আনল, মেয়েরা জ্বালানি কাঠ আনল। অবশেষে হল চারটি বড় বড় সাদা রুটি — আমাদের শ্রম, আমাদের যত্ন ও উদ্বেগের ফসল। আনন্দের অনুভূতিতে শিশুহৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এলো বহুপ্রতীক্ষিত দিন — প্রথম রুটির উৎসব। উৎসবে ছেলেমেয়েরা আন্দ্রেই দাদুকে আর সকলের মা-বাবাকে নিমন্ত্রণ করল। এম্ব্রয়ডারি করা সাদা টেবিল ক্লথ বিছিয়ে দেওয়া হল, মেয়েরা রুটির সুগন্ধী টুকরো টেবিলে সাজিয়ে রাখল, আন্দ্রেই দাদু রাখলেন কয়েক থালা মধু। মা-বাবারা রুটি খান, ছেলেমেয়েদের প্রশংসা করেন, শ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

এই দিনটি শিশুদের স্মৃতিতে চির জাগরূক থাকে। উৎসবে শ্রম ও মানবিক সদ্‌গুণ সম্পর্কে বড় বড় কথা উচ্চারিত হয় না। উৎসবে প্রধানত যা ছেলেমেয়েদের মনে উত্তেজনা সঞ্চার করে তা হল গর্ববোধ: আমরা ফসল ফলিয়েছি, আমরা মা-বাবাদের আনন্দ দিয়েছি। আর নিজের শ্রমের জন্য মানুষের গর্ব — নৈতিক শুদ্ধতা ও মহত্ত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

আমাদের প্রথম ফসলের উৎসব স্কুলের অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। প্রতিটি ক্লাসের শিক্ষার্থীরাই নিজেদের ফসল ফলাতে চায়। ছেলেমেয়েরা ক্লাসের পরিচালকদের অস্থির করে তুলল: অন্যদের ফসল-উৎসব আছে, কিন্তু আমাদের নেই কেন?

এই ঘটনা শিক্ষকমণ্ডলীকে গভীর ভাবনায় ফেলে। সকলেই দেখেছেন যে অতি সাধারণ কাজ — জমি চাষ করা, সার ফেলা — ছেলেমেয়েদের কাছে বনে ভ্রমণ ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ

পাঠের মতোই আগ্রহজনক হতে পারে। শিক্ষকেরা বললেন যে-কোন কাজেই যাদের কোন আকর্ষণ নেই বলে মনে হত সেই নিষ্কর্মারাও এই শ্রমের মধ্য দিয়ে এমন ভাবে পালটে গেছে যে তাদের আর চেনাই যায় না। তাদের কাজ করার ইচ্ছা জাগে। 'ব্যাপারটা কী?' — আমরা ভাবলাম। সকলেই এ বিষয়ে একমত হলেন যে প্রধান ব্যাপারটি নিহিত আছে মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায়, অনুভূতিতে। শ্রমশীলতা — সর্বোপরি শিশুদের ভাবজীবনের ক্ষেত্র। শিশু তখনই কাজের জন্য উদ্যোগী হয় যখন শ্রম তাকে আনন্দ দান করে। শ্রমের আনন্দ যত গভীর, শিশুরা ততই বেশি আত্মসম্মানের মূল্য দেয়, ততই স্পষ্ট করে কার্যকলাপের মধ্যে দেখতে পায় নিজেদের — নিজেদের প্রয়াস, নিজেদের নাম। শ্রমের আনন্দ— বিপুল শিক্ষামূলক শক্তি, যার কল্যাণে শিশু নিজেকে সমষ্টির একজন বলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তার মানে এই নয় যে শ্রম আমোদ-প্রমোদে পরিণত হয়। এর জন্য প্রয়াস ও দৃঢ়তা দরকার। কিন্তু আমাদের একথাও ভুললে চলবে না যে আমরা কাজ করছি শিশুদের নিয়ে, যাদের সামনে জগৎ সবে উন্মুক্ত হচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা ঠিক করল প্রতি বছর ফসল-উৎসব উদ্‌যাপন করবে। ওরা তাদের বিদ্যালয়-পর্বের পরবর্তী শরতে নতুন জমি নিল, শীতকালীন গম ফলিয়ে আবার নিমন্ত্রণ করল মা-বাবাদের আর তাদের ছোট বন্ধুদের — প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের ছেলেমেয়েদের। আমার শিক্ষার্থীরা যখন কৈশোরে পেঁছায় তখনও তারা বিপুল উৎসাহের সঙ্গে স্কুলের ছোট জমি থেকে ফসল ওঠাত, গমের দানা পিষে রুটি বানাত — এ সবের মধ্যেই ছিল রোমাণ্টিক ভাব, খেলা। শ্রমের আনন্দ অন্য কোন

আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। সৌন্দর্যবোধ ছাড়া এ আনন্দ অচিন্তনীয়, কিন্তু এখানে সৌন্দর্য — শিশু যা পায় কেবল তা-ই নয়, সর্বোপরি, সে যা সৃষ্টি করে সেই বস্তু। শ্রমের আনন্দ — অস্তিত্বের সৌন্দর্য; এই সৌন্দর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে শিশু অনুভব করে আত্মমর্যাদা, বাধাবিপত্তি অতিক্রমণের জন্য গর্ব।

আনন্দের অনুভূতি একমাত্র তারই অধিগম্য যে শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, জানে কাকে বলে ঘর্ম ও ক্লান্তি। শৈশব নিরন্তর উৎসবে পরিপূর্ণ হওয়া উচিত নয় — শিশুর সাধ্যমতো শ্রম নিয়োগ যেখানে নেই সেখানে শ্রমের সুখও শিশুর অধিগম্য নয়। শ্রম শিক্ষাদানের সর্বোচ্চ বিচক্ষণতা নিহিত আছে শিশুহৃদয়ে শ্রমের প্রতি লৌকিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যে। জনসাধারণের কাছে শ্রম — জীবনের এমন এক অপরিহার্যতা যাকে ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব অচিন্তনীয়; শুধু তা-ই নয়, শ্রম তাদের কাছে ব্যক্তির মনোজীবন ও আন্তর সম্পদের বহুমুখী প্রকাশক্ষেত্রও বটে। শ্রমের মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় মানবিক সম্পর্কের ঐশ্বর্য। শিশু যদি এই সম্পর্কের সৌন্দর্য অনুভব করতে না পারে তাহলে শ্রমের প্রতি ভালোবাসা শেখানো অসম্ভব। শ্রমসংক্রান্ত কার্যকলাপের মধ্যে জনগণ দেখতে পায় ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের, আত্মপ্রতিষ্ঠার অতি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শ্রম ছাড়া মানুষের স্থান শূন্য — এই মর্মে একটি লোক-প্রবচন আছে। শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য কর্তব্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ, ব্যক্তিগত গর্ববোধ যাতে শ্রম সাফল্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

ছেলেমেয়েরা তাদের বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম বসন্তে 'মায়ের বাগান' বসায় — এতে ছিল ৩১টি আপেল গাছ আর ঐ একই

সংখ্যক আঙুর লতা। আমি আমার শিক্ষার্থীদের বললাম: 'এটা হবে তোমাদের মা'দের বাগান। মা হলেন তোমাদের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন মানুষ। তিন বছর বাদে আপেল গাছে ও আঙুর লতায় প্রথম ফল ফলবে। প্রথম আপেল, প্রথম আঙুর গুচ্ছ আমরা মা'দের উপহার দেব। তাঁদের আনন্দ দেব। মনে রেখো তোমাদের মা'দের অনেক কষ্ট করতে হয়। সেই কষ্টের দাম আমরা দেব তাঁদের আনন্দ দিয়ে।'

'মায়ের বাগানে' শ্রমের প্রেরণা হয় স্বপ্ন — বয়োজ্যেষ্ঠদের, মা-বাবাদের আনন্দ দেওয়ার স্বপ্ন। কোন কোন ছেলেমেয়েরা তখনও জানা ছিল না এই মহৎ মানবিক অনুভূতির — জননীর প্রতি ভালোবাসার সমস্ত গভীরতা। আমি প্রতিটি শিশুর মনে এই অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। গালিয়া তার সৎমা'র জন্য গাছ লাগাল, সাশা লাগাল তার দিদিমার জন্য, ভিতিয়া লাগাল মাসীমা'র জন্য। কেউই শ্রমের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাল না। বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে ছেলেমেয়েরা গাছপালায় জল দিত, অনিষ্টকর পোকামাকড় ধ্বংস করত। আপেল গাছ ও আঙুর লতা সবুজ হয়ে উঠল। তৃতীয় বছরে প্রথম ফুল দেখা দিল, প্রথম ফল ফলল। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হচ্ছিল তার গাছের ফল যেন তাড়াতাড়ি পাকে।

তোলিয়া, তিনা ও কোলিয়া যে আনন্দ পেল এটা আমার কাছে ছিল বড় সুখের ব্যাপার: ওদের গাছে রসালো আপেল পেকে উঠেছে, আঙুর লতায় টসটস হয়ে উঠেছে সোনালি আঙুর গুচ্ছ। ছেলেমেয়েরা পাকা ফল পেড়ে মা'দের কাছে নিয়ে গেল। এটা ছিল ছেলেমেয়েদের জীবনের এক অবিস্মরণীয় দিন। আমার মনে আছে কোলিয়া যখন মা'কে

দেওয়ার জন্য গাছ থেকে আপেল পাড়ে তখন তার চোখে কী দরদের ভাবই না উপছে পড়ে!

বিদ্যালয়-জীবনের দ্বিতীয় বছরে শিশুদের শ্রম মহৎ অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। মা-বাবাদের জন্য খামারবাড়ি সংলগ্ন যে জমি ছিল সেখানে ছেলেমেয়েরা সকলে মা-বাবা, ঠাকুমা-দিদিমা ও দাদুদের জন্য ফলের গাছ লাগাল। 'এই হল মা-বাবা, ঠাকুমা-দিদিমা আর দাদুদের আপেল গাছ,' ছেলেমেয়েরা গর্ব করে বলল। সাশা তার মা ও বাবার স্মৃতিতে আপেল গাছ লাগাল; গালিয়া ও কোস্তিয়া তাদের মা'দের স্মৃতিতে ফলের গাছ বড় করে তুলতে লাগল, তারা তাদের সৎমা'দের কথাও ভুলল না — তাদের জন্যও একটি করে আপেল গাছ লাগাল।

এই গাছগুলির প্রতি শিশুরা যে যত্ন নেয় সে রকম গভীর যত্ন আর কোন কাজে তাদের দেখা যায় নি। সকলেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে কখন আপেল গাছে ফুল ফুটবে। আপেল গাছ থেকে প্রথম ফলের জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা, সে ফল পাড়া, মা'কে দেওয়া — নিছক শ্রমপ্রক্রিয়া নয়, যে প্রক্রিয়া ছেলেমেয়েরা একের পর এক সাধন করে এসেছে। এ হল নৈতিক বিকাশের এমন কতকগুলি ধাপ যা বয়ে ওপরে ওঠার সময় শিশুরা তাদের কাজের সৌন্দর্য অনুভব করে।

মানুষের জীবনে পরম পবিত্র ও সুন্দর — জননী। যে শ্রম মা'কে আনন্দ দেয় তার নৈতিক সৌন্দর্য যাতে শিশুরা অনুভব করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধীরে ধীরে আমাদের দলের মধ্যে উদ্ভূত হল ও সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল এক চমৎকার ঐতিহ্য — শরৎকালে, মাটি ও শ্রম যখন মানুষকে মুক্ত হস্তে সম্পদ উপহার দিয়ে থাকে তখন আমরা শারদীয়

মাতৃ-উৎসব উদ্‌যাপন করতে লাগলাম। ঐ দিন প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজের শ্রমে যা ফলিয়েছে, সারাটা গ্রীষ্মকাল এমন কি কয়েক বছর ধরে যার স্বপ্ন দেখেছে এমনি নানা ধরনের জিনিস — ছোট্ট জমিটাতে ফলানো আপেল, ফুল, গমের শীষ (মা-বাবাদের জন্য খামার সংলগ্ন যে জমি ছিল তাতে প্রতিটি শিশুর মনমতো শ্রমনিয়োগের জায়গা থাকত) মা'কে এনে দিত। 'মা'কে যত্ন কর,' শারদীয় মাতৃ-উৎসবের প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে আমরা ছেলেমেয়েদের চেতনায় এই ভাবনার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটাই। মা'র আনন্দের জন্য শিশু তার শ্রমে যা বেশি অন্তরের শক্তি প্রয়োগ করে ততই বেশি তার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের অধিষ্ঠান।

আমাদের এখানে বসন্তকালীন মাতৃ-উৎসবেরও জন্ম হয়। বনের মধ্যে আমরা একটা নির্জন ফাঁকা জায়গা খুঁজে পেলাম — গ্রীষ্মকালে এখানে অনেক ফল জন্মায়। এই আশ্চর্য জায়গাটার সান্নিধ্যে ছেলেমেয়েরা পরম আনন্দ অনুভব করত। তাদের ইচ্ছে হল নিজেদের এই আনন্দের ভাগ মা'দের দেয়। একটা চিন্তা ওদের মাথায় খেলে গেল: প্রথম যে ফুল এখানকার মাটির শোভা বর্ধন করবে, সেটা মা'কে দিতে হবে। এই ভাবে দেখা দিল বসন্তের মাতৃ-উৎসব। এই দিন ছেলেমেয়েরা স্নিগ্ধ স্নোড্রপ ঘণ্টাফুল ছাড়াও হট্ হাউস-এ চাষ-করা ফুল মা'দের এনে দেয়। মা'কে উপলক্ষ করে উদ্‌যাপিত এই উৎসবগুলিতে কোলাহল ও 'সংগঠিত অনুষ্ঠানের' পদ্ধতি পরিহার করাই শ্রেয়। মা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শন যাতে গভীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক ব্যাপার হয় আমরা সেদিকে দৃষ্টি রাখি। এখানে প্রধান ব্যাপার বড় বড় কথা নয়, গভীর অনুভূতি।

মানবজাতিকে ভালোবাসা আপন জননীর মঙ্গল করার চেয়ে সহজ — শোনা যায় এই রকম একটি উক্তি করেছিলেন

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউক্রেনীয় লোকদার্শনিক গ্রিগোরি স্কভরোদা। এই বচনটির মধ্যে লৌকিক শিক্ষাতত্ত্বের গভীর প্রজ্ঞা নিহিত আছে। নিকট মানুষের প্রতি, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগ যদি হৃদয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা মানেই ভালোবাসা নয়। আন্তরিকতা, সৌহার্দ ও সহানুভূতি শিক্ষার প্রকৃত বিদ্যালয় হল পরিবার; মা-বাবা, ঠাকুমা-দিদিমা, দাদু আর ভাইবোনদের প্রতি সম্পর্কই হল মনুষ্যত্বের পরীক্ষা।

শিশুদের শ্রমকে হতে হবে সৌন্দর্য সৃজনধর্মী — শিক্ষাক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব ও নীতিজ্ঞানের ঐক্য এই দাবিই করে। বিদ্যালয়-জীবনের প্রথম শরৎকালে আমরা বনগোলাপের বীজ যোগাড় করে স্কুলের এলাকায় আমাদের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে বুনে দিলাম। বনগোলাপের সঙ্গে সাদা, লাল, ঘন লাল আর হলুদ রঙের গোলাপের অংকুরের জোড় বাঁধলাম। আমরা আমাদের 'গোলাপবাগ' তৈরি করলাম। প্রথম ফুল যখন দেখা দিল তখন ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ হল তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ওরা ঝাড় ছুঁতে ভয় পেল, পাছে ফুলের কোন ক্ষতি হয়। আমি যখন বললাম যে ফুল যদি ঠিকমতো তোলা যায় তাহলে সারা গরমকাল ধরে গাছে ফুল ফুটবে তখন ওদের আনন্দ আর ধরে না। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হচ্ছিল মাকে ফুল দেয়। শারদীয় মাতৃ-উৎসবের সময় আপেলের সঙ্গে সঙ্গে গোলাপফুলের ছোট স্তবক মা'দের উপহার দেওয়া যাবে ভেবে শিশুদের বড় আনন্দ হল।

স্কুলে শিক্ষার প্রথম বসন্তকালে আমরা অনেক ফুলগাছ লাগাই। গাছগুলিকে সবসময় পরিচর্যা করা দরকার। বিশেষ করে গাছে জল দেওয়া কাজটা সহজ নয়। এই সময় ওপরের

ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা একটা ছোটখাটো পাম্পিং ব্যবস্থা তৈরি করে ফেলল। পাম্প করে জল নিয়ে আসা যেত ফুলবাগিচায়, এর ফলে ছোটদের পক্ষে শ্রম লাঘব হল, আর কাজটায় সকলেরই উৎসাহ দেখা গেল — এমন কি সবার ছোট যে দাঙ্কো সে-ও আধ-ঘণ্টার মধ্যে সবগুলো ফুলগাছে জল দেওয়ার কাজ সারতে পারে।

আমার ইচ্ছে ছিল ফুলচাষ যেন প্রতিটি শিশুর ব্যক্তিগত শখ হয়ে দেখা দেয়। সম্ভবত গোলাপপরিচর্যার মতো এমন আর কোন শ্রম নেই যা প্রভূত পরিমাণে হৃদয়কে সমুন্নত করে, সৌন্দর্য ও সৃষ্টির, সৃজনকর্ম ও মনুষ্যত্বের সমন্বয় ঘটায়। প্রতিটি শিশুর মনে যাতে নিজের বাড়িতে বাগান করার বাসনা জাগে আমি সেদিকে দৃষ্টি রাখি। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতেই আমার শিক্ষার্থীরা বাড়ি-সংলগ্ন জমিতে চাষ-করা গোলাপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে শেখে।

জীবনের অভিজ্ঞতায় আমার এই প্রত্যয় জন্মায় যে শিশু যদি সৌন্দর্যসম্ভোগের উদ্দেশ্যে ফুল চাষ করে, যদি তার শ্রমের একমাত্র পারিতোষিক হয় সৌন্দর্য উপভোগ এবং অন্য মানুষের সুখ ও আনন্দের জন্য সেই সৌন্দর্যসৃষ্টি তাহলে সে মন্দ ও ইতর কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারে না, মানববিদ্বেষী ও নির্দয় হতে পারে না। এ হল নীতিশিক্ষায় অন্যতম জটিল প্রশ্ন। সৌন্দর্য নিজে এমন কোন যাদুকরী শক্তি ধারণ করে না যা মানুষকে মনের উদারতা শেখাতে পারে। সৌন্দর্য নৈতিক পরিচ্ছন্নতার, মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে পারে একমাত্র তখনই যখন সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী শ্রম উচ্চ নৈতিক প্রেরণাবশত, মানবায়িত হয়ে ওঠে, সর্বোপরি পরিপূরিত হয় মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে। মানুষের জন্য সৌন্দর্যসৃষ্টিকারী শ্রমের এই মানবায়ন যত গভীর হয়

ততই বেশি করে মানুষের নিজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগে, ততই বেশি তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে নীতিবোধের অভাব।

নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের ভূমিকা আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অন্তর্লোকের উপর, বিশেষত ভাবাবেগের উপর প্রভাববিস্তারকারী অন্যতম উপায় হিশেবে সৌন্দর্যকে বড় রকমের গুরুত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবের ভূমিকার যাতে অতিমূল্যায়ন না ঘটে সে বিষয়েও আমরা সতর্ক হই। কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সৌন্দর্য **শিক্ষামূলক** প্রভাব হয়ে দেখা দেয়? মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত সেমিনারে আমরা নিজেদের সামনে এই প্রশ্ন উত্থাপন করি। এর উত্তর বেরিয়ে এলো শিক্ষাপ্রক্রিয়ার নিয়মের সাধারণ বিশ্লেষণ থেকে। অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সাহায্যে, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের অন্তর্লোকের উপর শিক্ষকের প্রভাববিস্তারের পদ্ধতি ও প্রণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে আমাদের আরও বেশি করে এই বিশ্বাস জন্মাল যে এমন কোন একক, সর্বশক্তিসম্পন্ন পদ্ধতি নেই এবং থাকতেও পারে না যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সাফল্য সুনিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষামূলক প্রভাবের অন্যান্য ক্ষেত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতাজনিত ক্ষতি পূরণ করতে পারে।

নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষাকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে, কিন্তু কমিউনিস্ট শিক্ষার অন্যান্য উপাদান ও অঙ্গীভূত অংশে যদি গুরুতর ত্রুটি থেকে যায় তাহলে সৌন্দর্যের শিক্ষামূলক প্রভাবও দুর্বল হয়ে পড়ে, এমন কি নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হতে পারে। শিশুর অন্তর্লোকের উপর প্রতিটি প্রভাব শিক্ষামূলক শক্তি অর্জন করে একমাত্র তখনই যখন পাশাপাশি চলে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য প্রভাব। কোন

কোন ক্ষেত্রে মানুষ ফুলচাষের প্রতি যত্ন নিতে পারে, ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে, আবার সেই সঙ্গে মানববিদ্বেষী, উদাসীন, নির্দয়ও হতে পারে — সবই নির্ভর করে আমরা, শিক্ষাদাতারা, যে প্রভাবের উপর বিশেষ আশা-ভরসা ন্যস্ত করে থাকি তা ব্যক্তির অন্তর্লোকের উপর প্রভাববিস্তারের আর কোন্ কোন্ উপায়ের পাশাপাশি অবস্থান করছে তারই উপর।

এই সত্য আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যয়ে পরিণত হতে লাগল। নির্দিষ্ট একেক জনের জীবনের অবস্থা পর্যালোচনা করে আমরা **শিক্ষাসংক্রান্ত প্রভাবের সামঞ্জস্যবিষয়ক** সমস্যার সন্ধান পেলাম। আমার মতে এটা হল শিক্ষার অন্যতম মৌলিক, বনিয়াদী নিয়ম। আমি মোটেই এমন মত পোষণ করি না যে এই সমস্যা আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবহারিক শিক্ষাকর্মে সমাধিত হয়েছে, তবে তার সমাধান ও অনুসন্ধানের জন্য কম কাজ করা হয় নি। শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের অভিব্যক্তিস্বরূপে এই সমস্যার মূল কথা নিহিত আছে নিম্নোক্ত বিষয়টির মধ্যে: ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তারকারী প্রতিটি উপায়ের শিক্ষাতাত্ত্বিক ফলপ্রসূতা নির্ভর করছে প্রভাবের অন্যান্য উপায় কতটা সুপরিকল্পিত, উদ্দেশ্যনিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ, তার উপর। শিক্ষার উপায় হিশেবে শ্রমের শক্তি কতটা দক্ষতার সঙ্গে উন্মুক্ত হচ্ছে, বুদ্ধিবিবেচনা ও অনুভূতির শিক্ষা কতটা গভীর ভাবে ও সুপরিকল্পিতরূপে সম্পন্ন হচ্ছে তারই উপর নির্ভর করছে শিক্ষার উপায়রূপে সৌন্দর্যের শক্তি। শিক্ষকের মুখের কথা একমাত্র তখনই শিক্ষামূলক শক্তি অর্জন করে যখন বয়োজ্যেষ্ঠদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত সক্রিয় থাকে, যখন শিক্ষার আর সমস্ত উপায় নৈতিক পরিচ্ছন্নতা ও মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়।

শিক্ষামূলক প্রভাবসমূহের মাঝখানে শত শত, হাজার হাজার আপেক্ষিকতা ও শর্তাবদ্ধতা আছে। এই আপেক্ষিকতা ও শর্তাবদ্ধতা কী ভাবে বিবেচিত হয়, সঠিকতর ভাবে বলতে গেলে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়, তারই দ্বারা শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় শিক্ষার ফলপ্রসূতা। শিক্ষাবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সকলকে উত্ত্যক্ত করে তা হল এই যে শিক্ষাবিজ্ঞান জীবন থেকে পশ্চাৎপদ। আমার মতে এই অভিযোগের সময় বিশেষ করে মনে রাখা দরকার যে ব্যক্তির উপর যে-কোন প্রভাব তার শক্তি হারায়, যখন অন্যান্য আরও অনেক প্রভাব সেক্ষেত্রে সক্রিয় না থাকে, যে-কোন নিয়ম শূন্যগর্ভ শব্দে পরিণত হয়, যখন আরও বহু নিয়ম তার সঙ্গে কার্যকরী না হয়। শিক্ষাতত্ত্ব সেই পরিমাণেই পিছিয়ে থাকে যে পরিমাণে ব্যক্তির উপর আরও বহু প্রভাবের আপেক্ষিকতা ও পারস্পরিক শর্তাবদ্ধতা অনুসন্ধান করে না দেখে। শিক্ষাবিজ্ঞান একমাত্র তখনই খাঁটি বিজ্ঞানে পরিণত হবে যখন তা শিক্ষাতত্ত্বসংক্রান্ত ঘটনাসমূহের সূক্ষ্মতম, জটিলতম আপেক্ষিকতা ও পারস্পরিক শর্তাবদ্ধতা অনুসন্ধান করবে, ব্যাখ্যা করবে।

...জন্ম নিল কুসুমের উৎসব। এ রকম উৎসব কয়েকটি ছিল। বসন্তের কুসুমোৎসব — এ হল লিলি, টিউলিপ ও লাইলাকের উৎসব। এই দিন আমরা যেতাম বনে, লাইলাক ফুলের বাগানে। বাগানটা আমরা বানিয়েছিলাম স্কুল-জীবনের প্রথম শরৎকালে। ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে ফুল সংগ্রহ করে ছোট তোড়া বাঁধত, চেষ্টা করত বর্ণসুষমার অনুপম সমন্বয় খুঁজে বার করার। ওরা লন্‌-এ আসত, মুগ্ধ হয়ে তোড়াগুলির সৌন্দর্য দেখত। সেগুলি এনে দিত তাদের মায়েদের আর

আমাদের বন্ধুদের — আন্দ্রেই দাদুকে ও ওল্‌গা দিদিমাকে। ওরা প্রাক্‌বিদ্যালয় পর্বের ছেলেমেয়েদেরও উৎসবে আমন্ত্রণ জানাত, তাদের জন্যও তোড়া বানাত।

দ্বিতীয় উৎসব — গোলাপের উৎসব। স্কুলের 'গোলাপবাগ' আর বাড়ি-সংলগ্ন জমি থেকে ফুল তুলে ছেলেমেয়েরা তোড়া বানাত। শিক্ষার দ্বিতীয় বছরেই ওদের প্রায় সকলের বাড়িতে গোলাপ ঝাড়ের চাষ চলত। সবচেয়ে সুন্দর তোড়া আমরা আন্দ্রেই দাদু আর ওল্‌গা দিদিমাকে দিই।

তৃতীয় উৎসব — মেঠো ফুলের উৎসব। এই উৎসব শিশুদের সবচেয়ে বড় আনন্দ দিত। আমরা ভোরবেলায় মাঠে যেতাম— এই সময়টায় ফুল বিশেষ সুন্দর। মেঠো ফুলের সুন্দর তোড়া বানানো — সত্যিকারের শিল্পসৃষ্টি। ওরা তোড়া নিয়ে স্কুলে আসত, বিশ্রাম করত, স্বপ্ন দেখত আমাদের এখানেও কবে মেঠো ফুল ফুটবে। ওরা মনে করে রেখেছিল কোথায় সবচেয়ে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে, শরৎকালে বীজ সংগ্রহ করত, শেকড় খুঁড়ে আনত। স্কুলের সংলগ্ন বাগানে নানা রকমের মেঠো ফুল ফুটল।

শারদীয় কুসুমোৎসব, অর্থাৎ চন্দ্রমল্লিকার উৎসবে থাকত গ্রীষ্মবিদায়ের বিষণ্ণতা। এ উৎসব যত দেরিতে উদ্‌যাপন করা যায় তার জন্য কত পরিশ্রমই না ব্যয়িত হত! আমরা ঠান্ডা বাতাস আর হিম থেকে চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়গুলিকে রক্ষা করতাম, কাগজের টোপর দিয়ে রাতে তাদের ঢেকে রাখতাম। শারদীয় কুসুমোৎসবের পর আমরা ফুলগাছগুলিকে হট্‌ হাউস-এ স্থানান্তরিত করতাম। বিদ্যালয়-জীবনের তৃতীয় বছরে ছেলেমেয়েরা প্রথম স্নোড্রপ ফুলের উৎসব উদযাপন করল। বনে তখন বরফ পড়ে আছে কিন্তু মাটি ইতিমধ্যে শীতঘুম থেকে

জেগে উঠেছে। বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় দেখা দিয়েছে প্রথম বেগনী-নীল ও সাদা ফুলের ঝুমকো। এই দিন ছেলেমেয়েরা তাদের মায়েদের দিত ছোট ছোট ফুলের তোড়া।

শিশুরা যাতে শ্রমের মধ্যে অন্তরের আনন্দের উৎস দেখতে পায় আমি সে ব্যাপারে সচেষ্ট হই। মানুষ যেন শুধু অন্নবস্ত্রের জন্য, বাসস্থান নির্মাণের জন্য শ্রম না করে, তার বাড়ির পাশে যাতে ফুল ফোটে, সেই ফুল যাতে তাকে এবং অন্যদের আনন্দ দেয় — যাতে শৈশবেই মানুষ আনন্দের জন্য শ্রম নিয়োগ করে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা চাই।

স্কুলে পড়াশুনা শুরু করার এক বছর বাদেই মা-বাবাদের বাড়ি-সংলগ্ন জমিতে ছেলেমেয়েদের জন্য ছোট ছোট সৌন্দর্যলোকের আবির্ভাব ঘটল। প্রায় সকলেরই অংশে গোলাপ ফুল ফুটল। তাছাড়া প্রত্যেকেরই ছিল নিজের নিজের প্রিয় ফুল। ভারিয়া, লিদা, পাভ্‌লো, সেরিওজা, কাতিয়া, লারিসা ও কোস্তিয়া চন্দ্রমল্লিকা ভালোবাসত। সানিয়া, জিনা, লিউবা, লিদা ও সাশা পিংকফুল ও টিউলিপ পরিচর্যা করে। ভানিয়া, ভিতিয়া ও পেত্রিক লাইলাকের কয়েকটি ঝাড় লাগায়। আমি ছেলেমেয়েদের দেখাতাম কী ভাবে ফুলের পরিচর্যা করতে হয়, কী ভাবে চারা তৈরি করতে হয় এবং গাছের জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গা বাছতে হয়।

পুষ্পপ্রীতি কোলিয়া ও তার মায়ের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। ছেলেটা হট্ হাউস-এ কাজ করতে ভালোবাসত। আমি ওকে চন্দ্রমল্লিকার তিনটি ঝাড় দিলাম, দেখিয়ে দিলাম কী করে ওগুলিকে লাগাতে হয়। এই সময় আমরা ভালো জাতের টমেটোর চারা ছেলেমেয়েদের বিতরণ করি। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে কোলিয়া ডজনখানেক টমেটোর চারাও বাড়িতে নিয়ে

এলো। মা টমেটো লাগালেন, আর কোলিয়া লাগাল চন্দ্রমল্লিকা। সপ্তাহদুয়েক বাদে মা চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়গুলি দেখতে পেলেন—সেগুলি ইতিমধ্যে শক্ত শেকড় গেড়ে বসেছে—তিনি চন্দ্রমল্লিকা উপড়ে ফেলে দিলেন। ছেলেটা ফেলে-দেওয়া ফুলগাছ বেড়ার কাছে দেখতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মা'র কাছে ছুটে এলো। মহিলা হাসলেন: 'ওঃ কী আমার ফুল রে—তার জন্যে আবার দুঃখু! ফুল দিয়ে আমাদের কী হবে শুনি? ফুল ছাড়া এতদিন চলেছে, এখনও চলবে।' কোলিয়া চুপচাপ ফুলগাছ তুলে নিয়ে চালাঘরের পেছনে এক কোণে লাগাল।

কিছুকাল বাদে কোলিয়া কয়েকটি নীল ফুল এনে মাকে দিয়ে বলল: 'মা, দেখ কী সুন্দর!' বালকের এই কথাগুলির মধ্যে জটিল অনুভূতি নিহিত ছিল। সে হয়ত বলতে চেয়েছিল: 'মা, আমি চাই, আমাদের পরিবারের জীবন যেন এই ফুলগুলোর মতোই সুন্দর হয়।'

ছেলেমেয়েরা প্রবল আন্তরিকতার সঙ্গে 'পাখিদের ডাক্তারখানায়' কাজ করে চলে।

ঝড়বৃষ্টির পর আমরা বনে যেতাম, সেখানে সবসময়ই বাসা থেকে পাখির ছানা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতাম। 'পাখিদের ডাক্তারখানায়' বহুক্ষণ শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি চলে। ...আর শীতকালে কনকনে হিমের সময় 'পাখিদের ডাক্তারখানার' জানলার সামনে কুমড়োর বীচি সাজিয়ে রাখা হত পাখিদের খাবার হিশেবে। বহু নীলকণ্ঠ পাখি খাবারের ওপর এসে উড়ে বসত। খাবারে যখন আর কুলোত না তখন ওরা কিচিরমিচির করে আরও খাবার চাইত। ছেলেমেয়েরা টেবিলের ওপর দানা ছড়িয়ে দিত, নীলকণ্ঠ পাখিরা উড়ে ঘরের ভেতরে চলে আসত, ঠুকরে ঠুকরে খাবার খেত। ধীরে ধীরে পাখিরা

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মানিয়ে নিল, আরও বেশি সময় ধরে ঘরের মধ্যে থাকত, এমন কি হিমের রাতে ঘর ছেড়ে বাইরে যেত না। ওরা আনন্দে কিচিরমিচির করত, ঘাড়ে, হাতে ও মাথায় উঠে এসে বসত। যে দিন রোদ থাকত সে দিন ওরা খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলে যেত। বাচ্চারা বন্ধুদের বিদায় দিতে চায় না। পাখিরাও যেন এটা অনুভব করত: তাদের কলকাকলির মধ্যে বাচ্চারা যেন শুনতে পেত এই প্রার্থনা: মাফ্ করবে, আমরা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না।

কোলিয়া, ইউরা, সাশা, কোস্তিয়া ও পাভ্‌লো 'পাখিদের ডাক্তারখানায়' অনেক ঘণ্টা ধরে কাটাত। আমি ছেলেমেয়েদের পরামর্শ দিলাম নিজেদের বাড়িতেও পাখিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে। সকলের বাড়ির জানলার কাছে খোপ তৈরি হল, সেগুলিতে থাকত কুমড়োর বীচি। আর পাভ্‌লো ত পাখিদের জন্য ছোটখাটো বাসাই বানিয়ে ফেলল।

আপাতদৃষ্টিতে এ সবই অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, মনে হতে পারে যে শিক্ষার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু বস্তুতপক্ষে প্রাণীর প্রতি যত্ন—এটাই হল অন্তরের সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা ও অনুভূতিপ্রবণতার শিক্ষা।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে শুরু করে 'ভারুই পাখির উৎসব' শ্রম ও শিল্পসৃষ্টির এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উৎসবে পরিণত হয়। এই উৎসবের প্রসঙ্গ অবশ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়েরা ময়দা দিয়ে ছোট ছোট ভারুই পাখির আকারে রুটি বানায়। প্রত্যেকেই তাদের সাধারণ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে উড়ন্ত পাখির প্রবল বেগ সঞ্চারের চেষ্টা করে। এ ছিল এক মৌলিক সৃষ্টিকর্ম। মেয়েরা একে অন্যকে নিজের নিজের ভারুই

পাখি দেখাত, সেগুলির মধ্যে গতি ছাড়াও গীতের সন্ধান পেত। ঐ সময় তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত: 'তোর পাখিটা চুপ করে আছে, আর আমারটা গান গাইছে।'

ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে মাঠে কাজ করতে যাবে, পশুপালন-ফার্মে কাজ করবে, তারা চাষী হবে, দুগ্ধদোহনকারিণী হবে, কৃষিবিদ ও উদ্যানপালনবিদ হবে। অতি শৈশবেই ছেলেমেয়েরা যাতে মাঠে ও ফার্মে সাধারণ কাজ করার সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে সেদিকে নজর রাখা দরকার। সাধারণ কৃষিশ্রম যাতে শিশুদের আনন্দ দান করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর খেলাধুলা ছাড়া, শ্রমসংক্রান্ত কার্যকলাপের সমষ্টিগত প্রেরণা ছাড়া, সমষ্টিতে পারস্পরিক সম্পর্কের সৌন্দর্য—সৌহার্দমূলক পারস্পরিক সহায়তা ও মৈত্রীর প্রেরণা ছাড়া এটা অসম্ভব। আমার শিক্ষার্থীরা সবসময়ই সর্বসাধারণের কাজকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করত, তার ফলাফল নিয়ে ভাবত। ক্লাস সর্বদাই ছিল সমষ্টিশ্রমের দল।

বসন্তকালের প্রথম দিকে আমরা পশুপালন-ফার্মে তানিয়ার বাবার কাছে গেলাম। আমাদের জন্য চালাঘরে গরম দেখে একটা কোণ আলাদা করে দেওয়া হল, এখানে রাখা হল চারটি ভেড়ার বাচ্চা—তানিয়ার বাবা সবচেয়ে দুর্বল দেখে ভেড়ার বাচ্চা বেছে দিলেন। এই ছোট বাচ্চাগুলির পরিচর্যা করব, রোজ ওদের গরম গরম বিচালির ক্বাথ আর দুধ খাওয়াব, যত দিন না বাচ্চাগুলো বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে—আমি ছেলেমেয়েদের বললাম।

অনেক সময় শোনা যায়, এমন সমস্ত নিষ্কর্মা আছে যারা কোন ব্যাপারেই আগ্রহ বোধ করে না, অনেকের হৃদয় এত কঠিন যে কিছুতেই তাদের সংশোধন করা যায় না। কথাটা

সত্যি নয়। ছোটদের অনুপ্রাণিত করুন (উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের নয়; ১১-১২ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সে রকম অনুপ্রাণিত করতে গেলে বিলম্ব হবে) পশুপালন-ফার্মে ভেড়ার বাচ্চা পরিচর্যার মতো শ্রম দিয়ে, ছোটদের নিয়ে মাসদুয়েক এ রকম কাজ করে দেখুন—দেখতে পাবেন পরম উদাসীনের মনও কী রকম আর্দ্র হয়। শ্রমের সৌন্দর্য দিয়ে সমষ্টিগত ভাবে শিশুদের অনুপ্রাণিত করা—এ হল শ্রমশীলতার প্রবল উৎস। আমাদের ক্লাসে একজনও উদাসীন ছিল না, একটিও নিষ্কর্মা ছিল না, আর এ হল সাধারণ শ্রমে শিশুদের অনুপ্রাণিত করে তোলারই ফল।

আমরা ভালো বিচালি খুঁজে এনে তা সেদ্ধ করে ক্বাথ বানিয়ে ভেড়ার বাচ্চাদের খেতে দিতাম, ওদের দুধ খাওয়াতাম। ভেড়ার বাচ্চারা যখন সবুজ ঘাস খেতে শুরু করল তখন ছেলেমেয়েরা হট্ হাউস থেকে ওদের জন্য যব আর জই এনে দিত। আর ঘাসে যখন সবুজ রং ধরল তখন ভেড়ার ছানাদের রসালো খাদ্যের আর অভাব রইল না। তানিয়ার বাবা চালাঘরের কাছে ওদের চরে বেড়ানোর জন্য জায়গা ঘিরে দিলেন, আমরা সারা দিনের জন্য ভেড়ার ছানাদের ওখানে ছেড়ে দিতাম। এটা ছিল আমাদের 'ভেড়ার ফার্ম'।

বিদ্যালয়-জীবনের তৃতীয় বছরে আরও গুরুত্বপূর্ণ, নতুন নতুন কাজ দেখা দিল—ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে হল বাছুরদের পরিচর্যা করে। আমাদের জন্য আরও একটা জায়গা দেওয়া হল—এ জায়গাটা ছিল ডেয়ারী ফার্মে। ছেলেমেয়েরা গোটা শীতকাল ধরে হট্ হাউস-এ যব আর জই ফলাল। গ্রীষ্মকালে বাছুরদের জন্য বিচালি শুকাল। বহু ছেলেমেয়ে প্রায় প্রত্যেক দিন ফার্মে আসত।

বসন্তকাল আসতে ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চাদের যখন ফিল্ড ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হল তখন বাচ্চারা মনে কষ্ট পেল। তাদের ইচ্ছে হল অন্তত একদিন যেন প্রকৃতির মাঝখানে, মাঠে ওদের থাকতে দেওয়া হয়। রবিবার দিন আমরা মাঠে যেতাম। ভেড়া ও ভেড়ার বাচ্চাদের চরাতাম, রাখালদের কেটে রাখা বিচালি সংগ্রহ করতাম; বসন্তের প্রথম ঘাস—ভেড়ার বাচ্চাদের পুষ্টিকর খাদ্য। গ্রীষ্মকালে, ক্লাসের পড়াশুনার শেষে ছেলেমেয়েরা প্রায় রোজই ফিল্ড ক্যাম্পে আসতে থাকে। জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে মানুষ যদি শৈশবেই মামুলি কাজের সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত না হয় তা হলে সে কখনও সাধারণ কৃষিশ্রম ভালোবাসতে পারে না।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষামূলক জমিতে শিশুদের শ্রমও রোমাণ্টিকতার অগ্নিকণায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রথম শ্রেণীতেই আমাদের জন্য ০·১ হেক্টর জমি আলাদা করে দেওয়া হয়। স্কুলের ওপরের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ছেলেমেয়েরা এখানে বানাল ছোট একটি বাড়ি—ইটের দেয়াল, টালির ছাদ, কাঠের মেঝে, ছোটখাটো উনুন, জলের পাইপ, বৈদ্যুতিক বাতি—সবই সত্যিকারের বাড়ির মতো, তবে সবই ছোটখাটো। ছেলেমেয়েরা এই বাড়ির নাম দিল 'সবুজ বাড়ি'। এটি হয়ে দাঁড়াল আরও একটি আরামের জায়গা, যেখানে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির কাহিনী পাঠ করত, শুনত। পরে, ছেলেমেয়েরা যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠল তখন আমরা এখানে বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতাম।

ছোট বাড়িটির নির্মাণকর্ম ছিল যেমন খেলা, তেমনি শ্রমও। কাজটা শেষ হওয়ার পর ছেলেমেয়েরা ওদের নিজের হাতের সৃজনকর্মের প্রতি যত্ন নিত। ওরা ভালো ভাবেই জানত যে

এই বাড়িটা হল তাদের শ্রমের ফল। কোন রকম ব্যাখ্যাই জীবনের এই অভিজ্ঞতার স্থান গ্রহণ করতে পারে না।

শিশু যাতে সামাজিক শ্রমের প্রতি যত্ন নেয় তার জন্য তাকে সামাজিক সৃজনকর্মের প্রথম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে—সে অভিজ্ঞতায় গোড়ায় যত তুচ্ছই হোক না কেন। বৈষয়িক সম্পদের মর্ম একমাত্র তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন সামাজিক ব্যাপার মানুষের প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। এই গুণ শৈশবেই অর্জন করা উচিত। শিক্ষকেরা প্রায়ই বলে থাকেন যে উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ সামাজিক সম্পদের অপচয় ঘটায়—এ ব্যাপারে ওদের কোন চেতনা নেই কেন? কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথম পর্বে মানুষ যাতে মিতব্যয়ী ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাবোধসম্পন্ন হয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি তার যত্ন যাতে লোক-দেখানো ধরনের না হয়ে দশজনের জিনিস সম্পর্কে আন্তরিক ভাবনা হয়ে প্রকাশ পায়—এ-ই যদি আপনার কাম্য হয় তাহলে শৈশবে সামাজিক একটা কিছুকে তার কাছে করে তুলতে হবে প্রিয়, ব্যক্তিগত আনন্দ থেকে, ব্যক্তিগত সুখ থেকে অবিচ্ছেদ্য।

'সবুজ বাড়ির' লাগোয়া জমিতে আমরা গম, যব, বাক্‌হুইট, ভুট্টা, সূর্যমুখী চাষ করি। বাড়িতে আমরা বীজ বাছাই করতাম, ফসল রাখতাম, সার বানাতাম। ছেলেমেয়েদের শ্রম ছিল জানার রোমাণ্টিক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত। ওরা ভেবেচিন্তে কাজ করত, কাজ করার সময় ভাবনাচিন্তা করত। তাদের সামনে উন্মুক্ত হতে থাকে প্রকৃতির রহস্য ও নিয়মবদ্ধতা। জ্ঞান যে কেবল শ্রমের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির শক্তি কাজে লাগাতে এবং তা অর্জনে মানুষকে সাহায্য করে, শৈশবেই যাতে আমার শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে এই প্রত্যয় লাভ করে, আমি সেদিকে দৃষ্টি দিই। আমি তাদের গমের দানা সম্পর্কে বলি, শ্রম যে কী ভাবে তাকে জীবনীশক্তি দান করে সেকথা বলি। শিশুদের সামনে উন্মুক্ত হয় জমির জীবনের আশ্চর্য জগৎ। আমরা জমিতে জৈব পদার্থ এনে ফেলি, জমি উর্বর হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে ১০০টি করে গমের দানা বোনে, তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গাছের বৃদ্ধি লক্ষ্য করে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে জমিকে এমন 'পেট পুরে খাওয়ানোর' ইচ্ছে জাগল যাতে গমের শীষগুলোর বিশাল বিশাল, মোটা মোটা দানা জন্মায়। প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হত নিজের গাছগুলোকে আরও কত ভালো করে পুষ্টিকর তরল পদার্থ খাওয়ানো যায়। এ ছিল সত্যিকারের সৃজনকর্ম, এই সৃজনকর্ম ওদের অনুপ্রাণিত করত, অতি সাধারণ শ্রম প্রয়োগে আগ্রহী করে তুলত। সযত্নে শীষ কেটে ওরা একটা একটা করে হাজার দানা গুনত, ওজন করত: যে সবচেয়ে বেশি ফসল তুলতে পারত সে দারুণ গর্ব বোধ করত; বাদবাকিরা আরও ভালো করে কাজ করার চেষ্টা করত।

আমার দেখে আনন্দ হল যে ছেলেমেয়েরা গাছপালাকে গভীর ভাবে ভালোবাসে, মাটির জীবন অনুভব করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ওরা সাধারণ জমিতে যে রকম গমের দানা ফলে তার দ্বিগুণ বড় দানা ফলায়।

'সবুজ বাড়িতে' ও হট্ হাউস-এ আমরা পুষ্টিকর দ্রবণে শসা ও টমেটো ফলাতাম। শীতকালে ছেলেমেয়েরা পচা সার আর কালো মাটির পুষ্টিকর মিশ্রণ তৈরি করত, বসন্তকালে তা জমিতে ফেলত, আর শরৎকালে প্রচুর আলু ও টমেটো সংগ্রহ করত।

বাড়িটাতে মধ্যম বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য 'সবুজ ল্যাবরেটরি' বানানো হয়েছিল। কোন কোন ছেলেমেয়ে সেখানে কাজ করত। এখানে ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের পরিচালনায় আমার শিক্ষার্থীরা উদ্যানপালন ও উদ্ভিদপালনের উপর কৌতূহলজনক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। এখানে আমি ওদের দেখাতাম কী ভাবে বুনো জাতের ফলগাছের সঙ্গে চাষ-করা ফলগাছের সংকর বানাতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওরা সকলে এই সূক্ষ্ম বিদ্যা আয়ত্তে আনে, ওরা প্রকৃতির ওপর জ্ঞানের আধিপত্য অনুভব করে, অনুভব করে তত্ত্ব ও ব্যবহারের ঐক্য।

জোড় লাগানোর ফলাফল লক্ষ্য করার জন্য ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে বসন্তের অপেক্ষায় থাকে। ঐ ধরনের মুকুল থেকে যখন ছোট ছোট পাতা গজাল তখন ওদের আনন্দ আর ধরে না। আমরা একটা যৌথ পালনাগার গড়লাম। ঠিক করলাম প্রতি বছর সেখানে চারা লাগাব। পালনাগারটি আমাদের প্রিয় শ্রমচর্চার আরও একটি জায়গা হল। গ্রীষ্মকালে, তৃতীয় শ্রেণী শেষ হওয়ার পর, আমরা নির্জন ঝোপঝাড়ের মধ্যে বুনো প্লামগাছের সন্ধান পেলাম। আমাদের প্রত্যেকেই তার সঙ্গে চাষ-করা জাতের ফলের জোড় বাঁধল—কেউ প্লাম, কেউ অ্যাপ্রিকট, কেউ বা পীচফলের। সবগুলি জোড়ই বেঁচে গেল। একই মূলে কী ভাবে বিভিন্ন জাতের ফলগাছের অংকুর বেড়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা আশ্চর্য হয়ে তা লক্ষ্য করে। দু'বছর বাদে ফল হল।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে প্রকৃতি হল ভাবনার, সৃজনী ও অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধিবৃত্তির সুসমৃদ্ধ উৎস। প্রকৃতির নিয়ম হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু মানুষে পরিণত হয়, কেননা সে ধীরে ধীরে প্রকৃতির বিকাশের দীর্ঘ সোপানে সর্বোচ্চ

স্তররূপে নিজেকে উপলব্ধি করে। কিন্তু প্রকৃতি নিজে কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নয়—শিশুর প্রাকৃতিক শক্তি বিকাশের, তার বুদ্ধিবৃত্তি শিক্ষাদানের, মননক্রিয়ার সমৃদ্ধিসাধনের ক্ষমতা প্রকৃতির নেই। সক্রিয় প্রয়াস ব্যতিরেকে, পরিশ্রম ব্যতিরেকে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের ও জানার উপায় নেই। প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য মানুষ যখন প্রথম সচেতন প্রয়াস গ্রহণ করে, একমাত্র তখনই প্রকৃতি তাকে পুরস্কৃত করে: গোড়ায় সে দান হয় কৃপণ, পরে মানুষ একই কালে জানা ও সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যত নতুন নতুন প্রয়াস প্রয়োগ করে ততই প্রকৃতির দান উদার থেকে উদারতর হয়। শিশুরা যত বেশি পরিশ্রম করে ততই বেশি পরিমাণে তাদের চেতনার সামনে প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, ততই বেশি করে তারা নিজেদের সামনে দুর্বোধ্য, নতুন জিনিস দেখতে পায়। কিন্তু দুর্বোধ্য যত বেশি, চিন্তাও ততই সক্রিয়; বিস্ময়বোধ—মননক্রিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রাথমিক 'ইন্ধন'। গমের দানা যখন প্রথম ঝুরঝুরে জমির ভেতরে রাখা হল সেই মুহূর্ত থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহের সময় পর্যন্ত শিশুদের মনে দু'শ'র বেশি প্রশ্ন জাগে: কী ভাবে? কেন? জমিতে শ্রম-নিয়োগ—গাছপালা, ফসল ও অন্যান্য চাষাবাদের মতো প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তারের এমন আর একটি ক্ষেত্র খুঁজে বার করা কঠিন যা ভাবনাকে এতটা নাড়া দেয়, এতটা ভাবিয়ে তোলে।

শিশুদের শ্রম যাতে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়, তাদের ঝোঁক ও প্রবণতা উন্মেষের সহায়ক হয়, আমি তার চেষ্টা করি। স্কুলের ওয়ার্কশপের পাশে আমরা বাচ্চাদের জন্য একটা ঘর সাজাই। এখানে টেবিল রাখা হয়, টেবিলের সঙ্গে লাগানো হয় বাইস।

বহুকালের এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব হল—স্কুলের বড় ছেলেমেয়েরা ছোটদের জন্য দুটি ছোট টার্নারিযন্ত্র ও একটি ড্রিলিং মেশিন তৈরি করল। আলমারিতে আর তাকে রাখা হল রেঁদা, করাত, ফিটার মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতির বাক্সে—ধাতু প্রসেসিংয়ের যন্ত্রপাতির সেট, ধাতুর পাত, তার—এসবই ডিজাইন ও মডেল তৈরির পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। শ্রমকক্ষে শ্রম বহু ছেলেমেয়েকে আগ্রহী করে তুলল। ধীরে ধীরে খুদে কারিগরদের এক চক্র গড়ে উঠল। ছেলেমেয়েদের বড় আগ্রহ জাগিয়ে তোলে বিশেষ করে ডিজাইন ও মডেল গঠন আর করাত দিয়ে কাটাকাটির কাজ।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর আমরা শ্রমকক্ষে জমায়েত হতাম, আমরা সঙ্গে সঙ্গে বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র, শস্যছাঁটার যন্ত্র ও ঝাড়াই মেশিনের মতো কয়েকটি যন্ত্রের আকর্ষণীয় মডেল তৈরি করে ফেলি, তা ছাড়া সত্যিকারের বাড়ির মতো বাড়ি, লেখার টেবিল আর ফিটার মিস্ত্রীর খুদে খুদে যন্ত্রপাতির জন্য আলমারিও বানাই। ছেলেমেয়েরা যৌথ ভাবে কাজ করত—কাঠ ও ধাতুর তৈরি নানা যন্ত্রাংশ বানাত। মডেল যত ছোট ও সূক্ষ্ম হত, যত কঠিন হত—ছেলেমেয়েদের ভাষায়, সত্যিকারের 'বড়দের মতো' করে বানাতে—ততই উৎসাহের সঙ্গে তারা কাজ করত।

এই শ্রমে ছোটদের আকর্ষণ করার সময় আমি প্রধান যে লক্ষ্য সামনে রাখি তা হল ঝোঁক ও প্রবণতার উন্মেষ ঘটানো, সৃজনের আনন্দ সঞ্চার করা এবং ভবিষ্যতের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় অভ্যাস ও দক্ষতা গড়ে তোলা। আমি ছেলেমেয়েদের দৃষ্টান্ত দিয়ে আকর্ষণ করার চেষ্টা করি: কী ভাবে কাঠ ও ধাতু প্রসেসিং করতে হয়, কী ভাবে যন্ত্রপাতি

ব্যবহার করতে হয় তা ওদের চাক্ষুষ দেখাই। যে ব্যক্তি শেখান তাঁর নৈপুণ্য হল কর্মপ্রবৃত্তির অগ্নিকণা জ্বালিয়ে তোলার স্ফুলিংস্বরূপ, প্রেরণাস্বরূপ। শ্রমকক্ষে আমাদের কাজ শুরু হয় আমি যখন ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে কাঠ থেকে পুতুলের খাট তৈরি করলাম, তখন থেকে। ছোট খাটটা যত বেশি সত্যিকারের খাটের আকার নিতে থাকে ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে শিশুদের চোখ: ওরা কাজে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ে। ওদের মধ্যে অনেকে তৎক্ষণাৎ আমাকে সাহায্য করতে শুরু করে: ওরা খাটের বিভিন্ন অংশ চাঁচে, পালিশ করে। আমরা যখন বায়ুচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের মডেল তৈরির কাজে নামলাম তখন আমার কেবল নির্ভরযোগ্য সহকারীই ছিল না, কাজের যথার্থ সঙ্গীও ছিল। ইউরা, ভিতিয়া ও মিশা শিগ্‌গিরই যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা শিখে ফেলল। সকলেই কাজ করতে ইচ্ছুক, তাই আমরা একসঙ্গে কয়েকটি মডেল রচনা শুরু করলাম।

এখানে সামান্য প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া দরকার। শিশুদের ক্ষমতা ও মেধার উৎস তাদের আঙুলের অগ্রভাগ। অলংকারের ভাষায় বলতে গেলে, আঙুল থেকে প্রবাহিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা সৃজনী ভাবনায় পুষ্টি সাধন করে। শিশুর হস্তসঞ্চালনে আস্থার ভাব ও উদ্ভাবনক্ষমতা যত বেশি, শ্রমের হাতিয়ার ও হাতের পারস্পরিক ক্রিয়া যত সূক্ষ্ম, এই পারস্পরিক ক্রিয়ার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় গতি যত জটিল, ততই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় শিশুবুদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনী শক্তি, ততই নির্ভুল, সূক্ষ্ম, জটিল হয়ে দেখা দেয় এই পারস্পরিক ক্রিয়ার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় গতি; প্রকৃতি ও সামাজিক শ্রমের সঙ্গে হাতের পারস্পরিক ক্রিয়া শিশুর মনোজীবনের যত

গভীরে স্থান পায়, ততই বেশি করে শিশুর কার্যকলাপের মধ্যে প্রকাশ পায় পর্যবেক্ষণশীলতা, অনুসন্ধিৎসা, সন্ধানী মনোভাব, মনোযোগের ক্ষমতা, গবেষণার ক্ষমতা।

অন্য কথায় বলতে গেলে, শিশুর হাত যত নিপুণ, সে ততই বুদ্ধিমান। কিন্তু নৈপুণ্য আপনা আপনিই আসে না। নৈপুণ্য নির্ভর করে শিশুর মানসিক ও শারীরিক শক্তির উপর। নৈপুণ্য যত উৎকর্ষ লাভ করে বুদ্ধির শক্তিও তত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নৈপুণ্যও তার ক্ষমতা আহরণ করে বুদ্ধি থেকে। পারিপার্শ্বিক জগতের উপলব্ধি যাতে পরিবেশের সঙ্গে শিশু-হস্তের পারস্পরিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়, যাতে শিশু কেবল চোখ দিয়ে লক্ষ্য না করে হাত দিয়েও লক্ষ্য করে, কেবল প্রশ্ন দিয়ে নয়, শ্রম দিয়েও নিজের ঔৎসুক্য প্রকাশ করে এবং তার বিকাশ ঘটায় আমি সেদিকে দৃষ্টি রাখি।

'আনন্দ নিকেতন' বিদ্যালয়ের জীবনের প্রথম দিন থেকেই আমার শিক্ষার্থীরা লতাপাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে, বীজ সংগ্রহ করে, বিভিন্ন জাতের কাঠের নমুনা সংগ্রহ করে। কেবল পর্যবেক্ষণের সময়ই নয়; হাতুড়ি, ছুরি, কাঁচি ও বাটালির মতো অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে সজ্জিত হাতের ও বিবিধ উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার কল্যাণেও তারা পদার্থের ধর্ম অনুসন্ধান করে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা ছোট ছুরি দিয়ে কাজ করতে শেখে। ওরা বিভিন্ন জাতের কাঠ কেটে চাকতি বানায়, সেগুলিকে পালিশ করে, কাগজের সঙ্গে আঠা দিয়ে কিংবা সেলাই করে আটকে রাখে, তাদের কোন্‌টা কতটা শক্ত, কার কী লক্ষণ তা তুলনা করে। অ্যাশ গাছের গুঁড়ির ওপরে যে বাড়তি পিন্ড গজায় (উপাদানটি খুবই নমনীয়) তা দিয়ে ওরা বানায় অক্ষর আর পশুপাখির

মূর্তি। আমাদের গ্রামের অনতিদূরে আছে একটা গ্রানিট পাথরের গুহা। এখানে আমরা প্রায়ই পাহাড়ী শিলার নমুনা সংগ্রহ করতে আসতাম। ছেলেমেয়েরা আগ্রহভরে ছোট ছোট হাতুড়ি দিয়ে অভ্রের টুকরো ভেঙ্গে নিত, রঙিন পাথর সংগ্রহ করত, মাটি দিয়ে খেলনার ইট বানাত, রোদে শুকিয়ে সেগুলি দিয়ে ছোট ছোট বাড়ি বানাত। গ্রীষ্মকালে, ফসল তোলার সময় আমরা গম ও যবের সমান মাপের খড় কেটে নিয়ে তা দিয়ে খড়ের দড়ি পাকাতাম, স্ট্র হ্যাট তৈরি করতাম।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের চার বছরের মধ্যে ছেলেমেয়েরা ৩০টিরও বেশি জটিল ধরনের, সত্যিকারের চালু যন্ত্রের মডেল বানায়। বছরের পর বছর ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত ঝোঁকের উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর প্রকাশ ঘটতে থাকে। শুরা, ভিতিয়া, মিশা, সেরিওজা ও ইউরার ধাতু ও যন্ত্রের প্রতি টান দেখা যায়। ওরা কয়েক ঘণ্টা ধরে কাজ করতে পারত, সময় কী ভাবে কেটে যেত তা ওরা লক্ষ্যও করত না। কখনও কখনও তাদের বাড়ি পাঠাতে বেগ পেতে হত। ছেলেদের এই শখের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ পেশা অথবা জীবিকার পূর্বাভাস দেখলে ভুল করা হবে। জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে কোন কাজের দক্ষতা—জটিল রূপান্তরের স্তর ভেদ করে যায়। মানুষ ছেলেবেলায় যা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে পরে তাই-ই হয়েছে, এমন ক্বচিৎ ঘটে।

শারীরিক শ্রম মানসিক বৃত্তি শিক্ষাদানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। হাতের কাজের দক্ষতা—অনুসন্ধানপ্রবণ মন, স্বাভাবিক বুদ্ধি ও সৃজনী কল্পনার বৈষয়িক রূপমূর্তি। প্রতিটি শিশু যাতে শৈশবেই নিজ হাতে তাদের ভাবনার রূপায়ণ ঘটায় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থ শ্রেণীতে ছেলেমেয়েরা নিজেরা নিজেদের যন্ত্রপাতি তৈরি করে। ছেলেরা তাদের সাধারণ যন্ত্রও ভোলে না: কাঁচি দিয়ে কেটে তারা পুতুল নাচ ও ছায়ানৃত্যের থিয়েটারের জন্য পশুপাখির মূর্তি বানায়, রূপকথার নানা চরিত্রের মূর্তি বানায়। সেরিওজা ও মিশা ক্লাসঘরের জন্য ও 'রূপকথার ঘরের' জন্য দুটি অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করে।

আরও একটি আকর্ষণীয় কাজ শিশুদের মনে পরম আনন্দ সঞ্চার করল: আমরা অভ্যন্তরীণ দহনব্যবস্থা সম্পন্ন ছোটখাটো ইঞ্জিনচালিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করি। বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নীচু ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ করত, ছোটদের পক্ষে তাই বিপদের কোন কারণ ছিল না।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে দু'ঘণ্টা করে নির্দিষ্ট ছিল প্রিয় শ্রমের জন্য। কেউ কেউ যেত 'সবুজ বাড়িতে', কেউ কেউ শ্রমকক্ষে আবার কেউ বা হট্ হাউস-এ কিংবা শিক্ষা ও পরীক্ষা-মূলক জমিতে অথবা বাগানে। যারা ফার্মে কাজ করতে ভালোবাসত তারা যেত ভেড়ার বাচ্চা ও বাছুর পরিচর্যা করতে। ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই এই সময় মনের মতন শ্রম করত। আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একেকদিন তাদের প্রিয় শ্রম নিয়োগের একেক জায়গায় যেতাম। প্রতিটি গ্রুপে এমন ছেলেমেয়ের দেখা পাওয়া যেত যাদের বিশেষ বিশেষ ধরনের কার্যকলাপে ঝোঁক প্রকাশ পায়। তারা ছোট ছোট কর্মিদলের সংগঠক হয়ে দাঁড়ায়, নিজ নিজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে সঙ্গীদের অনুপ্রাণিত করে। শ্রমকক্ষে গ্রুপের পরিচালক ছিল ইউরা। খুদে উদ্ভিদপালকদের পরিচালক ছিল ভানিয়া, উদ্যানপালকদের — ভারিয়া, পশুপালকদের — সাশা। এই ছেলেমেয়েরা যে অনেক কিছু পারে এবং তাদের সমবয়সীদের

চেয়ে অনেক বেশি জানে তাতে আমি আনন্দ পাই। তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্য ছেলেমেয়েরা, শ্রমসংক্রান্ত কার্যকলাপ সৃজনী ক্ষমতা প্রতিযোগিতার চরিত্র অর্জন করল।

শ্রম শারীরিক ও বুদ্ধিমার্গীয় শক্তির আনন্দোচ্ছল ক্রীড়ারূপে, আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠারূপে আমার শিক্ষার্থীদের অন্তর্জীবনে প্রবেশ করছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই যে প্রতিটি মানুষ যেন শৈশব পর্বে তার প্রিয় শ্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে, যেন নিজের সৃজনী ক্ষমতার রূপায়ণ চাক্ষুষ দেখতে পায়, প্রিয় কাজে অর্জন করতে পারে নৈপুণ্য — অবশ্য শিশুর পক্ষে যে মাত্রায় সম্ভব। যখন তার স্কুলে পড়ার বয়স তখনই তাকে কিছু না কিছু একটা খুব ভালোমতো ও সুন্দর ভাবে করার শিক্ষা পেতে হবে। প্রিয় কাজে সাফল্যজনিত গর্ববোধ — আত্মসচেতনতার প্রথম উৎস, শিশুমনে সৃজনী প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে তোলার প্রথম স্ফুলিঙ, আর প্রেরণা ছাড়া, আনন্দের প্রস্ফুরণ ও পরিপূর্ণ শক্তি উপলব্ধি ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব নেই, মানুষ যে জীবনে উপযুক্ত স্থান করে নেবে সে ব্যাপারে গভীর নিশ্চয়তা নেই। আমার চেষ্টা ছিল, স্কুলে যেন এমন একটি শিশুও না থাকে যে শ্রমের মধ্যে নিজের ব্যক্তিসত্তার, স্বকীয়তার উন্মেষ না ঘটায়।

আমি শ্রমের প্রতি ছেলেমেয়েদের প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য করি। কিন্তু আমি মোটেই এমন মনে করি না যে এই অনুরাগ কোন না কোন পরিমাণে প্রতিটি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পথ পূর্বনির্দিষ্ট করে। কোন ছাত্র যখন জীবন্ত প্রকৃতিজগতের প্রতি প্রবল অনুরাগের পরিচয় দেয়, যদি ফলের বাগানে অথবা শস্যক্ষেত্রে কাজ করে সে আনন্দ পায় তার মানে মোটেই

এমন নয় যে সে উদ্যানপালক কিংবা কৃষিবিদ হবে। প্রবণতা, ক্ষমতা, ঝোঁক—অনেকটা ফুটন্ত গোলাপঝাড়ের মতো—কোন কোন ফুল ঝরে পড়ে, অন্যগুলি তাদের পাপড়ি খোলে। প্রতিটি শিশুর সর্বদাই অনেকগুলি শখ থাকে, এ ছাড়া শিশুদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অন্তর্লোক কল্পনাই করা যায় না। কিন্তু সেগুলির কোন একটার প্রতি তার বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিশু যতক্ষণ না কোন একটা শ্রমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করছে ততক্ষণ ব্যক্তি হিশেবে তাকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু যেই মুহূর্তে শ্রম গভীর ব্যক্তিগত আনন্দ দান করতে থাকে তখনই মানবিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে।

মানুষ যে শ্রমে উৎকর্ষ অর্জন করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করে, তা শিক্ষাদানের শক্তিশালী উৎস হয়ে দেখা দেয়। মানুষ নিজেকে স্রষ্টারূপে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে সে যা আছে তার চেয়েও ভালো হওয়ার চেষ্টা করে। শিশুকালে, কৈশোরের দ্বারপ্রান্তেই মানুষ যখন নিজের সৃজনী শক্তি ও ক্ষমতা উপলব্ধি করে তার তাৎপর্য যে কী বিরাট তা বলে শেষ করা যায় না। এই উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত আছে ব্যক্তিত্ব গঠনের মর্মবস্তু।

তোমরা, খুদে পাইওনিয়ররাই জন্মভূমির ভবিষ্যৎ অধিপতি

প্রথম শ্রেণীতেই আমার প্রথম একজন সহকারিণী জুটে গেল—১২ বছর বয়সী পাইওনিয়র, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী ওলিয়া। সে পাইওনিয়র স্বেচ্ছাসেবী পরিষদের কাছে অনুরোধ জানাল যেন অক্টোবর বাহিনীর ছোট ছেলেমেয়েদের পাইওনিয়র

বাহিনীতে ভর্তির জন্য প্রস্তুতির ভার তার ওপর দেওয়া হয়। ছোটদের সে ভালোবাসত—আর এটাই ছিল বড় কথা। (আমাদের স্কুলে অক্টোবর গ্রুপ ও পাইওনিয়র বাহিনীর দলপতি নিয়োগ করা হয় না; ছোটদের সঙ্গে কাজ করতে সে-ই এগিয়ে আসে যার সে রকম ইচ্ছে আছে আর যে ছোটদের ভালোবাসে)। ওলিয়া আমাকে বহু ব্যাপারে সাহায্য করত; সে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করত, তাদের নিয়ে বনে, মাঠে যেত, পিতৃভূমির মহাযুদ্ধকালে সোভিয়েত মানুষের কীর্তিকাহিনী আর পাইওনিয়র-বীরদের কাহিনী ওদের শোনাত।

ওলিয়া যে কাজ শুরু করল আজ ১৫ বছর হল তা অব্যাহত আছে, আর তা খুদে পাইওনিয়রদের ভাবাদর্শগত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। আমার পরামর্শে সে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের বীরদের সঙ্গে শিশুদের প্রথম সাক্ষাৎকারের আয়োজন করে। বীরদের মুখের বিবরণ এতই আকর্ষণীয় ছিল যে মেয়েটি তা নোট করে। নোট থেকে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হতে লাগল হাতে-লেখা পত্রিকা 'পিতৃভূমির মহাযুদ্ধকালে আমাদের দেশবাসীরা'। বাচ্চাদের নিয়ে ওলিয়া যে কয়েক বছর কাজ করে সেই সময়ের মধ্যে সে নিজে এবং পরে পাইওনিয়ররা ১০০টিরও বেশি বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। পত্রিকায় বীরদের আলোকচিত্র স্থান পায়। বর্তমানে হাতে-লেখা পত্রিকায় আছে ৬০০টি বিবরণ। এই বিবরণগুলি দেশপ্রেমের অনুভূতি শিক্ষার উজ্জ্বল, অমূল্য উৎস।

ছোটদের সঙ্গে সবসময় মেলামেশা ওলিয়ার কাছে কেবল কর্তব্যস্বরূপ ছিল না, ছিল তার অন্তরের তাগিদ। আমার মতে এই তাগিদ হল অপূর্ব, ভাস্বর প্রতিভা—মনুষ্যত্বের

প্রতিভা। যে এই প্রতিভার অধিকারী সে হয় চমৎকার শিক্ষাবিদ, সে তার শ্রমের মধ্যে খুঁজে পায় পরম সুখ। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিমণ্ডলীর মধ্যে ছেলেমেয়েদের মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে এমন অনেক ছেলে ও মেয়েকে দেখা যাবে যারা তাদের খুদে বন্ধুদের জন্য কিছু না কিছু না করে থাকতে পারে না। ছেলেদের ক্ষেত্রে এই তাগিদ প্রায়শই দুরন্তপনা, দুষ্টুমি ও ছলচাতুরী হয়ে প্রকাশ পায় — বালক চায় পরিচালক হতে, তার বন্ধুদের পরিচালনা করতে, কিন্তু সে জানে না কোন্ দিকে তার শক্তি খাটানো উচিত। এখানে শিক্ষকদের পরামর্শ দিতে চাই: শক্তির এই উচ্ছ্বাসকে দাবিয়ে দেবেন না। ছেলেরা — এই দুষ্টু ও চপলমতি বালকেরাই আপনার ভবিষ্যৎ সহকারী। ওদের নিজেদের কাছে টেনে আনতে জানতে হয়, জানতে হয় ওদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে।

আমাদের পবিত্র দেশের মাটির মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু বীর সন্তান তার বুকের ওপর প্রচুর রক্ত ঢেলেছেন। এই পবিত্র মাটির প্রতি গভীর ভালোবাসার গভীর অনুভূতি যাতে পাইওনিয়র বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতিপর্বে এবং পাইওনিয়র বাহিনীর সমগ্র পর্বে শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে আমি সেদিকে লক্ষ্য রাখি। শিশু যাতে মুগ্ধ হয়, যেখানে সে তার মনের একটি অংশ নিয়োগ করে, চোখের সামনে শিশু যে সৌন্দর্য দেখে, তার প্রতি মুগ্ধতা — এ থেকেই শুরু হয় জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা। জন্মভূমির প্রকৃতির সৌন্দর্য, সোভিয়েত মানুষের হাতের সৃষ্টি, আমি আর ওলিয়া শিশুদের চোখ মেলে দেখতে শেখাই।

আমরা স্তেপে যেতাম, টিলার ওপরে বসতাম, গমের প্রশস্ত

খেত দেখতাম, ফুটন্ত ফুলের বাগান, ছিমছাম পপলার গাছ ও নীল আকাশের সৌন্দর্য আর ভারুই পাখিদের গান উপভোগ করতাম। যে মাটিতে আমাদের পিতৃপিতামহের বাস, যেখানে আমাদেরও জীবন কাটাতে হবে, সন্তানসন্ততির মধ্য দিয়ে নিজেদের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, আমাদের বয়োবৃদ্ধি ঘটবে এবং জন্মদাত্রী এই মাটির কোলেই আশ্রয় নিতে হবে, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধতা—জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার অতি গুরুত্বপূর্ণ এক আবেগধর্মী উৎস। দুনিয়ায় এমন দেশ আছে যেখানে প্রকৃতি আমাদের মাঠ আর তৃণভূমির চেয়ে উজ্জ্বল, কিন্তু মাতৃভূমির সৌন্দর্যকে আমাদের শিশুদের কাছে হতে হবে সবচেয়ে প্রিয়। বসন্তে গাছপালা কী ভাবে সাদা সাদা ফুলে ঢাকা পড়ে যায়, কী ভাবে ঘণ্টাফুলের ওপর মৌমাছির দল উড়ে বেড়ায়, কী ভাবে আপেল পাকে, টমেটোয় লাল রং ধরে—শিশু এ সব যেন নিছক দেখে না, এ সবই তাকে যেন আনন্দ দেয়, তার মনোজীবনকে পরিপূর্ণতা দান করে। শৈশব তার স্মৃতিতে জাগরূক, থাকুক উজ্জ্বল, রৌদ্রালোকিত রূপমূর্তিতে: কুসুমিত উদ্যানের শুভ্র সজ্জা, বাক্ হুইটের খেতের উপর মৌমাছিদের অনুপম বীণাধ্বনি, শরতের গভীর, শীতল আকাশ আর তার দিগন্তে উড়ন্ত বকপাঁতি, মরীচিকার মতো ধিকি ধিকি কুহেলির ভেতরে নীল নীল টিলা, সূর্যাস্তের রক্তিমাভা, পুকুরের আরশির উপর ঝুঁকে-পড়া পুসি-উইলো, পথিপার্শ্বের ছিমছাম পপলার গাছ—এ সবই শিশুকালে জীবনের সৌন্দর্যরূপে, পরম প্রিয় স্মৃতি হয়ে হৃদয়ে অনপনেয় ছাপ ফেলে রাখুক।

কিন্তু এই সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবনাও যেন শিশুমনে স্থান পায় যে ফুলে ফুলে ঢাকা বাগান, মৌমাছির গুঞ্জন, মা'র

স্নেহমাখা গান, ভোরের আলো ফোটার মুখে মা যখন সযত্নে তোমার গায়ে কম্বলটা টেনে দেন তখনকার মিষ্টি ঘুম — এর কোনটাই থাকত না যদি শীতকালের এক কনকনে ভোরবেলায় উনিশ বছরের কিশোর আলেক্সান্দর মাত্রোসভ বুক দিয়ে গুলির আঘাত থেকে সহযোদ্ধাদের পথ অবরোধ করতে গিয়ে শত্রুর গুলিতে প্রাণ না দিত, যদি নিকোলাই গাস্তেল্লো তাঁর জ্বলন্ত প্লেনকে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কের ওপর না ফেলতেন, যদি ভলগা থেকে এল্‌বা পর্যন্ত এলাকা জুড়ে হাজার হাজার বীর তাঁদের রক্ত না ঢালতেন। শিশু যখন অস্তিত্বের আনন্দ অনুভব করে সেই মুহূর্তে তার চেতনায় ঠিক এই ভাবনাটাই সঞ্চার করে দিতে হয়। এখানে, আমাদের নিজেদের গাঁয়ে, এই মাটিতে, এই গাছপালার নীচে আমাদের জন্মভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সোভিয়েত যোদ্ধারা কী ভাবে সংগ্রাম করেছিল আমি আমার শিক্ষার্থীদের সে বিবরণ দিই।

অস্তিত্বের আনন্দ — ব্যক্তির আত্মচেতনার পরাকাষ্ঠামাত্র নয়, এ হল পারিপার্শ্বিক জগতের মূল্যায়ন, শিশু নিজের আশেপাশে যা দেখে তার প্রতি সক্রিয় সম্পর্ক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে জীবনের যুক্তি এমনই যে পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্যকে আমাদের শিক্ষার্থীদের শৈশবের আনন্দের — অস্তিত্বের আনন্দের অন্যতম উৎস হতেই হবে। এই কারণে প্রতিটি ফুল, প্রতিটি ঘাস যাতে শিশুকে আনন্দ দেয় সেদিকে শিক্ষাদাতার দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক জগৎ শিশুর কাছে প্রিয় হবে কি একমাত্র এই কারণে যে তা সুন্দর? অস্তিত্বের আনন্দ ত আসলে এমন কতকগুলি তৃপ্তির সমষ্টিমাত্র, যে তৃপ্তি শিশু লাভ করে জ্যেষ্ঠ পুরুষদের কাছ

থেকে। পারিপার্শ্বিক জগৎ খুদে মানুষটির কাছে প্রিয় হতে থাকে তখনই যখন সে দেখতে পায় ও অনুভব করে জন্মভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তার পিতৃপিতামহ কী পরিমাণ ঘর্ম, রক্ত ও অশ্রু ঢেলেছেন।

জন্মভূমি অসীম প্রিয় হয়ে দাঁড়ায় তখনই যখন অস্তিত্বের আনন্দ সৌন্দর্যের রক্ষাকর্তাদের প্রতি কর্তব্যবোধের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। এই সম্মিলনের মধ্যে নবীন প্রজন্মের নৈতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক শিক্ষাদানের ঐক্য প্রকাশ পায়। অস্তিত্বের আনন্দ নিশ্চিন্ত আনন্দ হলে চলবে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বাধীন নাগরিকের সুখের স্বার্থে আত্মবলিদান ও দুঃখকষ্ট বরণের কাহিনী দিয়ে শৈশবের আনন্দে বিষণ্ণতা সঞ্চার করা উচিত হবে না বলে যে-সমস্ত শিক্ষাবিদ মনে করেন তাঁরা মারাত্মক ভুল করে থাকেন।

শরৎকালের প্রথম দিকের রৌদ্রোজ্জ্বল দিন, আপেলের ভারে গাছ নুইয়ে পড়ছে, থোকা থোকা আঙুর পেকে উঠেছে, যৌথখামারের মাড়াইয়ের জায়গায় রাশি রাশি হলুদ রঙের গম স্তূপাকার হয়ে আছে, স্বচ্ছ বাতাসে মাকড়সার রুপোলি জাল ভাসছে। আমি আর ওলিয়া বাচ্চাদের গ্রামের উপকণ্ঠে নিয়ে যাই। এখানে আছে একটা উঁচু টিলা, সেখান থেকে চোখে পড়ে নীলাভ তরমুজে ঢাকা উপত্যকা, আরও দূরে বাগান, বাগানের পর — ছিমছাম পপলার গাছ, তাদের পেছনে — স্তেপ, শীতকালীন গমের সবুজ খেত, দিগন্তে — নীলাভ আঁধারে ঢাকা দূরের টিলা। ছেলেমেয়েরা অবিস্মরণীয় কিছু মুহূর্ত অনুভব করে। তাদের সামনে যে সৌন্দর্য উন্মুক্ত হয়েছে তার মধ্যে ওরা অনুভব করে নিজেদের সুখী শৈশবের অংশ: দূরের ঐ মাঠ থেকেই সন্ধ্যাবেলায় মা ও বাবা আসেন,

তাঁদের দরদভরা চোখে থাকে স্যের্যর ফুলকি। আমরা টিলার ওপর বসি, আমি শুভ ও অশুভ সম্পর্কে রূপকথা বলি, শিশুরা শুভবুদ্ধির জয়ে আনন্দিত হয়।

এক সপ্তাহ বাদে আমরা আবার টিলার ওপর, প্রকৃতির অপরূপ চিত্রের মধ্যে শিশুদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় এক নতুন রূপ: শরৎ তার প্রথম রং ছড়িয়ে দিয়েছে, সোনালি রঙে ঢেকে দিয়েছে আপেল আর পপলার গাছ, আর শীতকালীন শস্যের পান্নারঙা মাঠ হয়ে উঠেছে আরও উজ্জ্বল, আকাশ—আরও গভীর। এই ভাবে আমরা প্রতি সপ্তাহে একই সময় আমাদের জায়গায় আসি, সৌন্দর্য উপভোগ করি, চমৎকার চমৎকার লৌকিক রূপকথায় শুভ ও অশুভের সংগ্রাম উপলব্ধি করি, শরতের স্তেপের সঙ্গীত কান পেতে শুনি, নির্মল বাতাসে নিশ্বাস নিই, বসন্তকালে কী ভাবে এখানে এসে ভারুই পাখিকে অভ্যর্থনা জানাব তার স্বপ্ন দেখি। স্তেপের এই জায়গাটা ছেলেমেয়েদের মনোজীবনে স্থান পায়, তাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। এ হল জন্মভূমির প্রথম উজ্জ্বল রূপ, এই রূপ শিশুহৃদয়ে চিরকালের জন্য ছাপ রেখে যায়।

পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও তার রসগ্রহণ ব্যতিরেকে জন্মভূমির প্রতি বিশেষ অনুভূতি জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। জ্যেষ্ঠ পুরুষের মানুষেরা যে কী বিপুল মূল্যে শিশুদের জন্য আনন্দ এনে দিয়েছেন সে বিবরণ দেওয়ার আগে জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্পর্কে শিশুদের চোখ খুলে দেওয়া দরকার। শিশুর হৃদয়ে চিরকালের জন্য থেকে যাক দূর শৈশবের ক্ষুদ্র এক নিভৃত কোণের স্মৃতি, এই কোণটির সঙ্গে জড়িত হয়ে থাক মহীয়সী মাতৃভূমির রূপ।

শরৎকালের শান্ত এক দিনে আমি টিলার চূড়ার ওপরকার

একটা গর্ত ছেলেমেয়েদের দেখাই। গর্তটা চোখে না পড়ার মতোই বলতে হয়। আমি ওদের বলি:

'এই গর্তটার দিকে তাকিয়ে দেখ। সময়ে গর্তটা সমান হয়ে এসেছে, তার ওপর ঘন হয়ে ঘাস জন্মেছে। ...আজকের মতোই এক রোদ ঝলমলে শরৎকালের দিন। এই রাস্তার ওপর দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী নীপারের ওপারে পশ্চাদপসরণ করছিল। এখানে, টিলার চূড়ার ওপর এলো এক কিশোর মেশিনগানচালক। শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা, নীপারের দিকে যেতে না দেওয়া — এই উদ্দেশ্যে সে এখানে মেশিনগান বসায়। রাস্তায় শত্রুদের মোটরসাইকেল বাহিনীর আবির্ভাব ঘটল। মেশিনগানচালক তাদের খতম করল। ফাশিস্তরা মর্টার আর বন্দুক থেকে টিলা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ডানদিকটা কেমন যেন কোপানো। এখানে মাটির ওপর মারাত্মক ধাতুর টুকরো ছড়ানো। বিস্ফোরণের আওয়াজ থেমে যেতে রাস্তায় আবার মোটরসাইকেল বাহিনী দেখা দিল, টিলা আবার চঞ্চল হয়ে উঠল — সোভিয়েত যোদ্ধার গুলির আঘাতে শত্রুরা ধরাশায়ী হতে লাগল। ফাশিস্তরা টিলার গায়ে ট্যাঙ্ক ভিড়াল। ট্যাঙ্ক ঠিক এই গাছগুলোর কাছে এগিয়ে এসে গুলি ছুঁড়ল। গুলিবর্ষণ থেমে যেতে আবার রাস্তায় মোটরসাইকেল বাহিনী দেখা দিল; আবার চঞ্চল হয়ে উঠল টিলা। যোদ্ধার হাতে, মাথায় আর বুকে ভয়ঙ্কর চোট লাগল, কিন্তু সে লড়াই চালিয়ে গেল। চোখের ওপর রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ল, সে জানত যে শেষবারের মতো জন্মভূমির নীল আকাশ দেখছে। একটা গোলা এসে যখন মেশিনগানের পাশে ফেটে পড়ল, একমাত্র তখনই কিশোরের বুকের স্পন্দন থেমে গেল। সন্ধ্যাবেলা এখানে যৌথখামারীরা এলো, গর্ত খুঁড়ে

রক্তাক্ত দেহ সমাধিস্থ করল। সোভিয়েত সেনাবাহিনী গ্রাম মুক্ত করার আগে পর্যন্ত যোদ্ধার দেহাবশেষ এখানেই পড়ে ছিল। সৈনিকের সহযোদ্ধা বন্ধুরা টিলার চূড়ায় এসে দেহাবশেষ খুঁড়ে বার করে গ্রামে নিয়ে এলো, সম্মানের সঙ্গে সমাধিস্থ করল ভ্রাতৃসমাধিতে। আমরা বীরের নাম জানি না, তার মাও জানেন না কোথায় তাঁর ছেলেকে সমাধিস্থ করা হয়েছে।'

শিশুদের হৃদয় যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে। শিশুদের কাছে আরও প্রিয় হয়ে ওঠে জীবনের সৌন্দর্য, জন্মস্থানের সৌন্দর্য। ওরা বীরের দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখে। কিশোর তার জীবন দান করল, যাতে ওরা সুখে শান্তিতে বাস করতে পারে, যাতে আকাশে তারা ঝলমল করে, ঘাস আর আপেলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, যাতে স্তেপের ওপর শোনা যায় ফড়িংয়ের মৃদু গুঞ্জন, যাতে নববর্ষের রাতে মা বালিশের নীচে তুষার দাদুর উপহার রাখতে পারেন। ...ছেলেমেয়েরা নীরব, ওরা তাকিয়ে থাকে প্রচুর রুধিরে প্লাবিত মাটির দিকে। ওদের ইচ্ছে হয় প্রতিটি পাথরের টুকরোকে আদর করে।

আমার শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে হয়ত সে রাতে অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারে নি। তাদের চোখের সামনে — জন্মভূমি স্তেপ — কখনও উজ্জ্বল সূর্যালোকে উদ্ভাসিত, কখনও বা যুদ্ধের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। হৃদয় যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়: আজ তারা যে সৌন্দর্য দেখতে পেল, যে সৌন্দর্য দেখতে পাবে আগামীকাল, এক বছর বাদেও, বীর তা আর কখনও দেখতে পাবে না। এই চিন্তায় — আবার চোখে জল, আর স্বপ্নে — মা'র ঈষদুষ্ণ, স্নেহমাখা হাতের পরশ।

পর দিন সকালে ক্লাস শুরু হওয়ার আগেই স্কুলে এসে

হাজির হল ভারিয়া। গতকাল সে একটা কবিতা লিখেছে। সেটি সে পড়ে শোনাল।

এক সপ্তাহ বাদে আমরা আবার টিলায় যাই। ছেলেমেয়েরা জানতে চায় কে সেই বীর, কোথায় তার জন্ম, কোথায় সে পড়াশুনা করে, তার মা বেঁচে আছেন কিনা। শিশুরা যা কিছু শোনে ও দেখে তা তারা এখন মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীরের দৃষ্টিতে গ্রহণ করে। ওরা নিজেদের অনুভূতি প্রকাশের জন্য কিছু একটা করতে চায়। গাছপালা যখন নিষ্পত্র হল তখন আমরা টিলার চূড়ায় একটা ওক গাছের চারা এনে বসালাম। শিশুহৃদয়ে যখন সহৃদয় অনুভূতির মৃদু শিহরণ খেলে যায় তখন কোন কথার প্রয়োজন হয় না। শিশুরা যা করে তা গভীর উপলব্ধিবশত: আমরা নিছক টিলাকে সবুজ করার জন্য গাছ লাগাই না — আমরা বীরের জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করি।

টিলার ওপর ওক গাছ বড় করে তোলা কঠিন — ছেলেমেয়েরা তা জানে, কিন্তু কোন রকম বাধাবিপত্তিতে তারা ভয় পায় না। শীতকালে আমরা ঠাণ্ডা বাতাস থেকে চারাগাছটাকে বাঁচাই, তাকে তুষারে ঢেকে দিই। বসন্তকালে যখন নরম ঘাসে টিলা ঢেকে যায় তখন ছেলেমেয়েরা রোজ ছুটে এসে দেখে চারাগাছে কচি পাতা গজাচ্ছে কিনা। এ কেবল গাছের প্রতি যত্ন নয় — এ হল বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ওক গাছটা সবুজ হয়ে উঠল, প্রতিটি পাতায় শিশুরা অনুভব করল সেই কঠিন দিনের নিশ্বাস। বীরকে যাঁরা সমাধিস্থ করেছিলেন সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কীর্তির সঠিক দিন নির্ধারণে সাহায্য করেন। এই দিনটিকে আমরা প্রতি বছর গৌরবোজ্জ্বল দিনরূপে, স্মৃতি ও শোকের দিনরূপে উদ্‌যাপন করি।

ছেলেমেয়েরা খুব ভোরে স্কুলে আসে, প্রত্যেকে নিয়ে আসে ফুল, জীবন্ত ফুলের মালা গাঁথে, কাহিনী অনুযায়ী যেখানে বীর শেষশয্যা গ্রহণ করেন সেখানে মালা অর্পণ করে।

টিলার ওপরকার ছোট এই জমিটা শিশুদের কাছে হয়ে দাঁড়াল জন্মভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গকারী জ্যেষ্ঠ পুরুষের মানুষদের বীরত্বের প্রতীক। 'তোমরা হলে জ্যেষ্ঠ পুরুষের মানুষদের প্রচুর রক্তধারায় আপ্লুত এই মাটির অধিপতি। আমাদের জন্মভূমি যাতে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয় তার জন্য তোমাদের যত্ন নিতে হবে,' — এই চিন্তা আমি শিশুদের মনে সঞ্চার করি।

এক ঈষদুষ্ণ দিনে আমি ও ওলিয়া ছেলেমেয়েদের 'বীরবাগে' নিয়ে গেলাম। ১৯৪১ সনের শরৎকালের শেষ দিকে যেখানে ফাশিস্ত অধিকারের সময় শোকাবহ ঘটনা ঘটে, পরিপূর্ণ বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের প্রকাশ ঘটে, সেখানে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যৌথ প্রয়াসে এই স্মরণিক গড়ে তোলে। যৌথখামারের বাগান কেটে ফেলে ফাশিস্তরা এখানে যুদ্ধবন্দীদের শিবির বানায়। তারকাঁটার বেড়ার ভেতরে, খোলা আকাশের নীচে সোভিয়েত বাহিনীর ছয় হাজার আহত, ক্ষুধাপীড়িত, বস্ত্রহীন সৈনিক ও অফিসারকে রেখে তিলে তিলে মেরে ফেলা হয়। লোকে জল পেত না, শরৎকালের ঠাণ্ডা রাতে তারা বরফে ঢাকা জমির নীচ থেকে তুষার কণা বার করে খেত। প্রতিদিন ডজন ডজন যুদ্ধবন্দী মারা যেত। পাশবিক হিংস্রতা নিয়ে ফাশিস্তরা অপেক্ষা করত কখন সকলে মারা যাবে, তাহলে এরপর ওরা শিবির সংলগ্ন বিমান বোমার গুদামটি উড়িয়ে দিয়ে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর ঘাড়ে এই বলে দোষ চাপাবে যে তারাই বিমান থেকে নিজেদের লোকজনের ওপর বোমা ফেলেছে।

সোভিয়েত দেশপ্রেমিকরা ক্যাম্পে ব্যাপক পলায়নের প্রস্তুতিমূলক গোপন সংগঠন গড়ে তুললেন। এক ঠাণ্ডা রাতে হাজার হাজার লোক যখন বৃষ্টি আর বাতাসের ঝাপটায় কাঁপছে তখন ২০টি জায়গায় গুড়ি মেরে কাঁটাতারের দিকে এগিয়ে গেলেন সৈন্য আর অফিসাররা। তাঁরা এগিয়ে গেলেন মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার জন্য: কাঁটাতারের ওপর শুয়ে পড়লেন। তাঁদের দেহের ওপর দিয়ে স্তেপে বেরিয়ে এলো বহু যুদ্ধবন্দী। চার হাজারেরও বেশি মানুষ সে রাতে যৌথখামারীদের কাছে আশ্রয় পায়। গেস্টাপোকর্মীরা, বিশ্বাসঘাতক পুলিশের লোকজন — কেউই তাঁদের সন্ধান পেল না। মৃত্যুর মুখে নিক্ষিপ্ত চার হাজার মানুষ যাতে আবার অস্ত্রধারণ করে মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয় তার জন্য চারশ' বীর প্রাণ দিলেন।

ফাশিস্ত কবল থেকে গ্রাম মুক্ত হওয়ার পর স্কুলের ছেলেমেয়েরা ঠিক করল এই পবিত্র জায়গাটাকে ফুলে ফুলে ছাওয়া এক নিভৃত কোণে, বীরদের জীবন্ত স্মরণিকে পরিণত করবে। পতিত জমিটাকে সাফ করা হল, যেখানে যেখানে গর্ত ছিল বুজিয়ে দেওয়া হল, লাগানো হল চারশ'টি ওক গাছ — যাঁরা নিজেদের সঙ্গীদের বাঁচানোর জন্য জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের চারশ'টি স্মরণিক। ওক গাছগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, পুরুষানুক্রমে জনসমাজে প্রচারিত হতে থাকে বীরত্বপূর্ণ কীর্তির সত্যঘটনামূলক উপকথা। ওককানন বসানোর কয়েক বছর বাদে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা পাইওনিয়র বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সময় ওককাননের পাশে নিজেদের ওক গাছও লাগাল। কাঁটাতারের বেড়ার ওপরে, যেখানে বীরদের রক্ত জমাট বেঁধে ছিল, যেখানে হৃৎপিণ্ডের ভস্মাবশেষ ধূলির সঙ্গে

মিশেছে, সেখানে সুদীর্ঘজীবী এই গাছগুলি বেড়ে উঠুক। প্রতিটি পাইওনিয়র নিজ নিজ গাছ লাগাল। এটা এক প্রথা হয়ে দাঁড়াল: পাইওনিয়র বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীরা 'বীরবাগে' ওক গাছ লাগায়।

আমরা ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখানে এলাম। ওলিয়া বীরদের কীর্তিকাহিনী বলল, নিজের লাগানো ওক গাছটি দেখাল। ছেলেমেয়েরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে কবে তারাও পাইওনিয়র বাহিনীতে ভর্তি হবে।

বসন্তকাল এলো, লেনিনের জন্মবার্ষিকীর* আর কয়েক সপ্তাহ বাকি। এই দিনটিতে খুদে লেনিনবাহিনীতে গ্রহণ উপলক্ষে পাইওনিয়র স্বেচ্ছাসেবীদের আনুষ্ঠানিক জমায়েত হয়ে থাকে। আমরা আবার 'বীরবাগে' আসি — প্রতিটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আসে ওক গাছের চারা, কোদাল আর এক ঝুড়ি পচানি সার। ওরা চারাগাছ লাগাল, গাছে জল দিল, এখানে, বীরত্বপূর্ণ কীর্তির এই পবিত্র স্থানে, ২২ এপ্রিল জ্যেষ্ঠ সঙ্গীরা ছেলেমেয়েদের গলায় পাইওনিয়র টাই এ'টে দেয়। এখানে খুদে পাইওনিয়ররা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমির বিশ্বস্ত দেশপ্রেমিক হওয়ার আনুষ্ঠানিক শপথ গ্রহণ করে।

বছরে কয়েকবার আমরা 'বীরবাগে' যেতাম। বসন্তের গোড়ার দিকে শুকনো ডালপালা আর পাতা সাফ করতাম, হিমে নষ্ট হয়ে যাওয়া চারার জায়গায় অন্য চারা লাগাতাম। শরৎকালের শেষ দিকে যে দিনটিতে বীরেরা কীর্তি সম্পাদন করেন সে

---

* ১৮৭০ সনের ২২ এপ্রিল লেনিনের জন্ম। প্রতি বছর এই দিনটি লেনিন স্মৃতিদিবস রূপে উদ্‌যাপিত হয়।

দিন আমরা এখানে পাইওনিয়র বাহিনীর সভার আয়োজন করতাম। কাঁটাতারের বেড়ার জায়গায় ছিমছাম ওক গাছগুলি বেড়ে উঠছে। ছেলেমেয়েরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কঠোর নীরবতা পালন করে, প্রত্যেকে গাছের নীচে ফুল রাখে — সেই স্মরণীয় রাতে মাটি যেখানে রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল, সেখানে জ্বলজ্বল করে অ্যাস্টার ও চন্দ্রমল্লিকা ফুল।

আমাদের পরম সুখের দিনগুলিতেও — গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে, দূরে কোথাও প্রমোদভ্রমণের যাওয়ার আগে — আমরা 'বীরবাগে' যেতাম। এই পবিত্র স্থানটিতে সর্বদা বিরাজ করত নীরবতা। এটা ছুটোছুটি করার জায়গা নয়, খেলার জায়গা নয়, চিৎকার-চেঁচামেচির জায়গা নয় — এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে হয়, বিশ্রাম করতে হয়, পড়াশুনা করতে হয়। এখানে আসত সেই সমস্ত ছেলেমেয়ে যাদের বাবারা দেশপ্রেমের মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে পুত্র তার পিতার সমাধির সামনে মস্তক আনত করে — সে সমাধি আছে হয়ত দূরে কোথাও — মেরুসাগরের তীরে কিংবা কার্পাথীয় পর্বতমালায়। পুরুষ থেকে পুরুষানুক্রমে চলে সেই সমস্ত বীরের কাহিনী যাঁরা প্রাণ দিয়ে সোভিয়েত জনগণের জন্য রক্ষা করেছেন সূর্য, ফুল, স্বাধীন শ্রম।

টিলার ওপর ওক গাছ ক্রমেই মাথা উঁচু করে উঠতে থাকে। নীল আকাশে গর্বভরে মাথা উঁচিয়ে থাকা এই ওক গাছ কোন বয়স্ক লোকের চোখে পড়লে তার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হবে, তার কাছে জন্মভূমি হবে আরও প্রিয়, আরও আপন।

দশকের পর দশক কেটে যাবে, ইতিহাসের এই অভূতপূর্ব যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীদের জীবনের অবসান ঘটবে, আরও

নতুন নতুন প্রজন্মের লোকজন আশ্চর্য হয়ে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে সেই সব মানুষকে যাঁরা ফাশিস্ত দাসত্ববন্ধনের বিপদ থেকে মানবজাতিকে ত্রাণ করেছেন।

যুদ্ধের বিপদ ও সন্ত্রাস, অগ্নিদাহের রক্তিমাভা, বোমা বিস্ফোরণের আঘাতে মুমূর্ষু মানুষের কাতরানি, ফাশিস্ত জার্মানিতে সশ্রম কারাদণ্ডভোগের জন্য তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া লোকজনের কান্না, ফ্রন্টে গমনোদ্যত পিতাদের গাঢ় আলিঙ্গন, স্বামীর কিংবা পিতার যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যা অবলম্বনের সংবাদ পেয়ে নারীদের কান্না — এর কোনটাই আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। নবীন প্রজন্মকে শহিদদের চিরন্তন স্মরণিকের সামনে শ্রদ্ধাবনত হতে হবে। এখানে, আমাদের স্কুলে, যেখানে আমরা আজ পড়াশুনা করছি সেখানে ফাশিস্ত অধিকারের সময় সশ্রম কারাদণ্ডভোগী সোভিয়েত যুবক-যুবতীদের ফাশিস্ত জার্মানিতে স্থানান্তরের অন্তর্বর্তীকালীন কারাগার বানানো হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের একথা ভুলে গেলে চলবে না। ছেলেমেয়েরা বড় হবে, তাদেরও ছেলেমেয়ে হবে — তখন যেন তারা তাদের মধ্যেও সঞ্চার করে দেয় শত্রুর প্রতি ঘৃণার প্রবল অনুভূতি।

যুদ্ধের আগে আমাদের গ্রামে অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৫১০০। আমাদের স্বগ্রামবাসী ৮৩৭ জন মানুষ — ৭৮৫ জন পুরুষ আর ৫২ জন নারী পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের ফ্রন্টে বীর শয্যা গ্রহণ করেন। রণাঙ্গন থেকে যাঁরা আর ঘরে ফেরেন নি সেই ৮৩৭ জন স্বগ্রামবাসী বাদেও আমাদের গ্রামের ৬৯ জন অধিবাসী ফাশিস্ত মৃত্যুশিবিরগুলিতে মারা যান — তাঁদের অনাহারে আর অমানুষিক পীড়নে অর্ধমৃত করা হয়, তাঁদের যন্ত্রণা দেওয়া হয়, প্রাণনাশ করা হয়, তারপর

জ্বালানো হয় ক্রিমেটোরিয়ামে। ওঁদের দেহের ভস্মাবশেষ নিয়েই বেসাতি করে ফাশিস্ত খুনেরা, তোমাদের ভাইবোন আর মা-বাবাদের দেহভস্ম দিয়েই বুখেনভাল্ড ফাশিস্ত শিবিরের অনতিদূরবর্তী ভাইমার-উপকণ্ঠের কৃষকরা জমিতে সার দেয়। আমাদের ভাইবোন, পিতৃপিতামহের দেহভস্ম তোমাদের বুকে আঘাত করুক, আঘাত করুক তোমাদের সন্তানসন্ততির বুকে। কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে আমাদের গ্রাম থেকে উঠতি বয়সের ২৭৬টি ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী চালান করা হয় জার্মানিতে ফাশিস্ত বন্দী শ্রমশিবিরে। তাদের মধ্যে ১৯৪ জন নিহত, তাদের বধ করা হয় মৃত্যুশিবিরে, তারা মারা যায় অনাহারে, সাধ্যাতীত পরিশ্রমের ফলে, তাদের কাউকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় ক্রিমেটোরিয়ামে। পাভেলের ভাইকে বোহুম শহরে নিয়ে গিয়ে ফাশিস্ত দুষ্কৃতকারীরা নাশকতামূলক কার্যকলাপের জন্য গনগনে লোহা দিয়ে চোখ পুড়িয়ে খুবলে ফেলে, তারপর তাকে জ্যান্ত অবস্থায় গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পেরেকবিদ্ধ করে। তানিয়ার বোনকে কমিউনিস্ট প্রচারকার্যের জন্য নাৎসীরা জ্যান্ত কবর দেয়। কোস্তিয়ার কাকাকে লোহার খাঁচার ভেতরে ফেলে দেওয়া হয়, সেখানে তিনি নগ্ন অবস্থায় কয়েক দিন ধরে কষ্ট ভোগ করেন, তারপর নির্যাতিত হয়ে মারা যান। ইউরার খুড়তুত ভাই পালানোর চেষ্টা করায় তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলার জন্য শিকারী কুকুরদের মুখে ফেলে দেওয়া হয়। ভালিয়ার খুড়তুত বোনের দুধের বাছাকে ছিনিয়ে নিয়ে ফাশিস্ত অফিসার মা'র চোখের সামনে পাথরে মাথা আছড়ে মেরে ফেলে। দুটি সন্তান — ৪ বছরের মেয়ে আর ৩ বছরের ছেলে সমেত ২৬ বছর বয়স্কা মহিলা লুসিয়া মাসীকে অস্ওয়েন্‌ৎসিমের ফাশিস্ত ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। ক্যাম্পে বাচ্চাদের কাছ থেকে মাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মহিলা ফাশিস্ত অফিসারকে বললেন: 'ওরা অসুস্থ, দয়া করে ওদের আমার কাছে থাকতে দিন।' ফাশিস্ত অফিসারটি হুঙ্কার দিয়ে বলল: 'যদি অসুস্থই হয়ে থাকে ত, আমরা ওদের চিকিৎসা করব...', এই বলে হতবিহ্বল মা'র চোখের সামনে নগ্ন শিশুদের পাথরের ওপর ছুঁড়ে দিল, লোহার নাল লাগানো জুতো পায়ে মাড়িয়ে শিশুদেহ পিষ্ট করল।

আমি ছেলেমেয়েদের বলি: 'একথা আমাদের নিজেদের ত ভুলে গেলে চলবেই না, পরন্তু আমাদের কাজ হবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির স্মৃতি পুরুষানুক্রমে ভবিষ্যৎ সকল প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চার করা।' সোভিয়েত মাতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের প্রতিকৃতির একটি গ্যালারি — পল্লীর একটি নিজস্ব প্যানথিয়ন গড়ার কথা আমরা একসঙ্গে মিলে ভাবি। শিক্ষার তৃতীয় বর্ষের শেষে ও চতুর্থ বর্ষের গোড়ায় ছেলেমেয়েরা পল্লীবাসীদের সকলের বাড়ি ঘোরে।

মায়েরা যুদ্ধে নিহত বীরদের আর ফাশিস্ত মৃত্যুশিবিরের শহিদদের আলোকচিত্র দেন। ছোট ছোট আলোকচিত্র থেকে আঁকা প্রতিকৃতিগুলি আমরা 'গৌরব ও শোকের আলয়ে' রাখলাম। এ হবে আমাদের প্যানথিয়নের সূত্রপাত। নতুন নতুন প্রজন্মের বিদ্যালয়-শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে এর সজ্জা সম্পন্ন করবে — এই ছিল আমাদের লক্ষ্য। এটা আমাদের কর্তব্য, এবং আমাদের তা পালন করা উচিত এই কারণে, যাতে পৃথিবীতে কখনও যুদ্ধ না হয়, যাতে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যাতে যুদ্ধ ও বিনাশের জন্য শিশুদের জন্ম না হয়ে তাদের জন্ম হয় শান্তি ও সুখের জন্য। এটা বিশ্বের সকল

জাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য — ফ্যাসীবাদের সন্ত্রাস যাতে আর কখনও দেখা না দেয় তার জন্য আমাদের কোন কিছুই ভুলে গেলে চলবে না, ক্ষমা করা চলবে না।

একবার কোন এক ভ্রমণের সময় নীপারের উঁচু তীরে আমাদের রাত্রিযাপন করতে হয়। ছেলেমেয়েদের কয়েকবার জল আনার জন্য গিরিখাতের ঝরণায় যেতে হয় আর প্রতিবারই তাদের যেতে হত ঘুরে — পায়ে-চলা পথের ওপর পড়ে ছিল একটা বিরাট পাথরের চাঁই, সেটার পাশ কাটিয়ে যেতে হত।

'এই পাথরটা এখানে পড়ে আছে কেন?' ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে ভাবে। 'লোকে এটাকে ঘুরে যায়, অথচ ঝোপের ভেতর ঠেলে ফেলে দেয় না কেন?' সংবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওরা পাথরটাকে গড়িয়ে একপাশে ঠেলে দিল। সকালে বুড়ো জেলে আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল পাথরটা কোথায়। ছেলেমেয়েরা ভাবল ওরা বোধহয় প্রশংসা পাবে, কিন্তু দাদু মাথা নেড়ে বললেন: 'এই পাথরটা বহু বছর যাবত এখানে পড়ে আছে, আর এটাই তার জায়গা।' ...অতঃপর তিনি তিনজন সোভিয়েত গুপ্তকর্মীর কীর্তিকাহিনী আমাদের বললেন। নীপার নদীর প্রবল লড়াইয়ের সময় তাঁরা নদী পেরিয়ে এসে টমিগান নিয়ে পাথরের আড়ালে পড়ে থাকেন এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা অসমান লড়াই চালিয়ে যান। ফাশিস্তরা কামান আর মর্টার যুদ্ধে নামাল, কয়েক ঘণ্টা ধরে মাইন আর গোলার বিস্ফোরণ চলল, কিন্তু পাথরটা যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। রাতে গুপ্তকর্মীদের সাহায্যের জন্য নদী পার হয়ে এগিয়ে এলো আমাদের সেনাবাহিনী। সৈন্য তিনজন তখন গোলাগুলি আর গুলির টুকরোর আঘাতে আহত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পাথরের আড়ালে পড়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁদের মনোবল

তখনও অটুট। ওঁদের নীপারের ওপারে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হল, কেউ তাঁদের নাম জানে না, কেবল এই গ্রানিট পাথরের চাঁইটা বীরদের কীর্তির স্মৃতিচিহ্ন হয়ে আছে। ছেলেমেয়েরা পাথরটার সামনে এগিয়ে গেল, অনেকক্ষণ ওটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ঝোপ থেকে পাথরটাকে গড়িয়ে নিয়ে এসে যথাস্থানে রাখল। কেবল এখনই ওরা লক্ষ্য করল যে গ্রানিট পাথরটা গুলিতে আর গোলার টুকরোর আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। মাটিতে আমরা পাথরের অনেকগুলি টুকরো পেলাম, ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে ছোট ছোট টুকরোগুলি নিল।

সেই সময় থেকে খুদে পর্যটকদের যাত্রাপথ সর্বদা যেত বাঞ্ছিত পাথরটার পাশ দিয়ে। টিলার ওক গাছ আর 'বীরবাগের' মতো ছাইরঙা পাথরের চাঁইটাও শিশুদের কাছে হয়ে দাঁড়াল শিশুদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের উন্নত অনুভূতির উদ্রেককারী কীর্তিজনিত সৌন্দর্যের প্রতীক।

শৈশবে মানুষ পিতৃপিতামহের বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকে কী ভাবে গ্রহণ করে তার উপরই নির্ভর করছে মানুষের নৈতিক রূপ, সামাজিক স্বার্থের প্রতি, জন্মভূমির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত শ্রমের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি। ঠিক এই টিলার উপর, যেখানে আমরা আজ শ্রম নিয়োগ করছি সেখানে যে বীরের রক্তপাত ঘটেছিল এই চিন্তায় শিশুহৃদয় যাতে দ্রুত স্পন্দিত হয়ে ওঠে আমি সেদিকে দৃষ্টি দিই। অনুভূতি থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় দৃঢ় বিশ্বাস: জন্মভূমির কল্যাণের জন্য দেশের মাটিতে শ্রম নিয়োগ — এ হল এমন এক সুখ যার জন্য লোকে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে পারে। শিশুহৃদয়ের সংগুপ্ত কোণে জেগে ওঠে বিবেকের কণ্ঠস্বর: তোমার মাথার ওপর নির্মল আকাশ

আছে, তুমি নীল আকাশের দিকে তাকাতে পারছ একমাত্র এই কারণে যে পপলার ও বার্চ, ওক গাছ ও আপেল গাছের নীচে শায়িত রয়েছেন এমন সমস্ত মানুষ যাঁরা তোমার জন্য আলো ও জীবন রক্ষা করেছেন।

এই কণ্ঠস্বর খুদে পাইওনিয়রদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে তারা হল জন্মভূমির ভবিষ্যৎ অধিপতি। জ্যেষ্ঠ পুরুষের মানুষেরা যে বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ গড়ে তুলেছেন তার উপর এই কর্তৃত্ববোধ — নাগরিক পরিণতিলাভের মূল। শিশুদের জন্য যাঁরা উজ্জ্বল সূর্য আর নীল আকাশ রক্ষা করেছেন তাঁদের সামনে কর্তব্যের জন্য শিশুদের কী ভাবে শ্রমে অনুপ্রাণিত করা যায় আমি আর ওলিয়া সে বিষয়ে ভাবি। একদিন ছেলেমেয়েরা তাদের শস্যক্ষেত্রে আসে: যেখানে কোনকালে কিছুই জন্মাত না এমন এক টুকরো অনুর্বর জমিতে গম ফলানোর উদ্দেশ্যে কয়েক সেণ্টনার পচানি সার সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। খাটুনিটা ছিল কঠিন আর একঘেয়ে। ১৯৪৩ সনে ভলগা তীরের প্রবল লড়াইয়ের সময় ইউক্রেনের কম্‌সমোল-সদস্য মিখাইল পানিকাকো যে কৃতিত্বের পরিচয় দেয়, কাজের শুরুতে ওলিয়া ছেলেমেয়েদের সে সম্পর্কে বলে।

উনিশ বছর বয়সী কিশোর ফাশিস্ত ট্যাঙ্কের পথ রোধ করে পরিখায় দাঁড়ায়। শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক পরিখার ওপর দিয়ে চলল। যোদ্ধা দাহ্যমিশ্রণের বোতল ট্যাঙ্কের গায়ে ছোঁড়ার উদ্দেশ্যে হাত তুলল। ঠিক এই মুহূর্তে গুলির আঘাতে হাতে-তোলা বোতল ফেটে গেল। দাহ্য তরল পদার্থ জ্বলে উঠল, পোশাক বয়ে মুখের ওপর গড়িয়ে পড়ল। জীবন্ত মশাল আগুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী তুলে পরিখার ওপর উঠল, এগিয়ে গেল ট্যাঙ্কের

দিকে। মিখাইলের হাতে ধরা ছিল শেষ বোতলটা। সে ততক্ষণে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কের আচ্ছাদনের গায়ে উঠে গেছে। বোতল দিয়ে একটি আঘাত হানল ট্যাঙ্কের মাথায় — ট্যাংক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, পাক খেল। ট্যাংক ফেটে যাওয়ার আগে, শেষ মুহূর্তে মিখাইল বুক চিতিয়ে দাঁড়াল, জ্বলন্ত হাতটা তুলল, চিৎকার করে উঠল। সৈনিকরা যুদ্ধের আহবান শুনে পরিখা থেকে উঠে এসে শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করে দিল, রাস্তাটা দখল করল।

বিবরণটা শিশুদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। সেই মুহূর্তে বীর যেন তাদের সামনে জীবন্ত ও চিরন্তন হয়ে উঠল, সে যেন বলছে: 'আমি আমাদের পবিত্র দেশের এই রকমই একটুকরো মাটির জন্য প্রাণ দিয়েছি। সে মাটিতে কী জন্মাবে — কাঁটাগাছ না গম, এই ভেবে কি উদাসীন থাকা যায়?' প্রত্যেকের হৃদয়ে এই মুহূর্তে কথা বলে ওঠে তার বিবেক: উদাসীন থাকা যায় না।

আমি এমন ধারণা মোটেই পোষণ করি না যে কাজ করার আগে সবসময় বীরত্বপূর্ণ কীর্তিকাহিনী ছেলেমেয়েদের শোনানো দরকার। তুমি যদি আলস্য দেখাও, যেমন করা উচিত তেমন কাজ যদি না কর তার মানে হল জন্মভূমির প্রতি নিজের কর্তব্য তুমি পালন করছ না — এই ভাবে শিশুকে বোঝানো ঠিক হবে না। কর্তব্যবোধ — এক পবিত্র অনুভূতি, শিশুর উচিত হবে সযত্নে তাকে নিজের হৃদয়ের মধ্যে রক্ষা করা। সেই সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ কীর্তি যাতে বাঁচতে শেখায়, শিশুর চৈতন্যে প্রথম নাগরিক প্রত্যয় জাগিয়ে তোলে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্তব্য। আমি ওলিয়াকে পরামর্শ দিলাম সে যেন আসন্ন শ্রমনিয়োগের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কের উল্লেখ না করে, কোন রকম উপদেশ ছাড়াই মিখাইল পানিকাকোর কাহিনী বলে,

যাতে শিশু নাগরিকের দৃষ্টিতে তার জন্মভূমির জমির টুকরোটিকে দেখতে পায়।

খুদে লেনিনীয় সংগঠনে শিশুদের যোগদান

১৯৫৫ সনের বসন্তকালে তৃতীয় শ্রেণী শেষ করার কিছু আগে ছেলেমেয়েরা লেনিন পাইওনিয়র সংগঠনে ভর্তি হল। কম্‌সমোল-কমিটি ওলিয়াকে দলনেতা নিয়োগ করল। সে তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ল।

জোইয়া কস্‌মোদেমিয়ান্‌স্কায়া পাইওনিয়র স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর আনুষ্ঠানিক সভা প্রথা অনুযায়ী আয়োজিত হল ২২ এপ্রিল — লেনিনের জন্মদিনে। এর অনেক আগে থেকেই ওলিয়া ও তার বন্ধুবান্ধবেরা ছেলেমেয়েদের পাইওনিয়রে ভর্তি হওয়ার তালিম দিতে থাকে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা লেনিনীয় পার্টি, কম্‌সমোল ও পাইওনিয়র সংগঠনের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস ছেলেমেয়েদের বলে।

‘যার কীর্তি তোমাদের সবচেয়ে বেশি প্রেরণা দেয় তারই নামে তোমাদের পাইওনিয়র বাহিনীর নাম হোক,’ ওলিয়া ছেলেমেয়েদের বলল, ওরাও একবাক্যে ঠিক করে ফেলল. আমাদের বাহিনীর নাম হবে স্তালিনগ্রাদের লড়াইয়ের বীর মিখাইল পানিকাকোর নামে। আমাদের বাহিনীর মূলমন্ত্র: ‘লেনিনের মতো সংগ্রামী ও বিজয়ী হতে হবে’। আমাদের প্রতীক ওক গাছের পাতা ও ওকফল, যার অর্থ হল জন্মভূমির প্রকৃতি ঐশ্বর্যমন্দিত করে তোলার সংগ্রাম।

পাইওনিয়র সভায় ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও উপস্থিত হলেন মা-বাবারা, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অংশগ্রহণকারীরা,

গৃহযুদ্ধ ও গেরিলা আন্দোলনের প্রবীণ যোদ্ধারা এবং ১৯১৯ সনে যে তরুণ কমিউনিস্টরা গ্রামে তাদের সংগঠন গড়ে তোলে সেই প্রথম আমলের কম্‌সমোল সদস্যরা।

ছোটখাটো সবুজ লন্‌-এর উপর সভা অনুষ্ঠিত হল। অষ্টম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের আর তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অর্থাৎ ভাবী খুদে লেনিনীয় বাহিনী সারি বেঁধে মুখোমুখি দাঁড়াল। অষ্টম শ্রেণীর বাহিনীর পরিষদ-সভাপতি ঘোষণা করল যে আজ তাদের বাহিনীর কাজকর্ম শেষ হচ্ছে, তারা কর্মভার অর্পণ করছে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী — খুদে লেনিনীয়দের হাতে।

লাল টাই অর্পণের আনুষ্ঠানিক মুহূর্ত শুরু হল। স্কুলে যে প্রথা গড়ে উঠেছে সেই অনুযায়ী বিদায়ী পাইওনিয়র বাহিনী নবাগত পাইওনিয়র দলকে লাল টাই অর্পণ করে। ছেলেমেয়েরা তাদের পাইওনিয়র টাই খুলে খুদে বন্ধুদের গলায় বেঁধে দেয়। ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যেকে যে যার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল তাকে নিজের টাই বেঁধে দেয়। অষ্টম ও তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাইবোনেরা ছিল — বড়রা ছোটদের টাই অর্পণ করে পরম মূল্যবান পারিবারিক সামগ্রীরূপে। লাল টাই গ্রহণ করার পর ছেলেমেয়েরা আনুষ্ঠানিক শপথবাক্য উচ্চারণ করে। তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে তারাও মিখাইল পানিকাকোর মতো দৃঢ় ও বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেমিক হবে, 'লেনিনের মতো সংগ্রামী ও বিজয়ী হতে হবে' — এই মূলমন্ত্র পালন করবে। পাইওনিয়র বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার স্মৃতিতে প্রত্যেকেই পেল উপহার — বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন ও সংগ্রাম সম্পর্কে কোন গ্রন্থ।

এই সভা আমার শিক্ষার্থীদের স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল

থাকে। পাইওনিয়র বাহিনীতে গ্রহণের অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হল এই যে পাইওনিয়র টাই পুরুষানুক্রমে খুদে লেনিনীয়দের অর্পণ করা হয়ে থাকে। লাল টাই — বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতীক।

লেনিনের মতো সংগ্রামী ও বিজয়ী হতে হবে

লেনিন শিখিয়েছেন: প্রতিটি প্রাত্যহিক কর্মে, সাধারণ দৈনন্দিন শ্রমের মধ্যে আছে কমিউনিজমের জন্য সংগ্রাম। শিশুরা যাতে তাদের আশেপাশে যা কিছু ঘটছে সে সমস্তকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে, যাতে জনগণের বৈষয়িক সম্পদের ভাগ্য শিশুকে ভাবিত করে তোলে, আমি আর ওলিয়া তা নিয়ে ভাবি। ওলিয়া বাহিনীতে প্রকৃতির খুদে সংরক্ষকদের একটি দল সংগঠন করল। স্কুলের অনতিদূরে ক্ষেত্র-সংরক্ষণকারী যে বনভূমিটি ছিল ছেলেমেয়েরা তা দেখাশোনার ভার নিল। বনভূমির বরাবর যেতে তারা দেখতে পেল কে যেন কয়েকটি গাছের বাকল কেটে ফেলেছে: স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তার ইচ্ছে হল গাছগুলি যেন শুকিয়ে যায়, তাহলে গাছ কাটার পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে, অর্থাৎ গাছগুলি ত শুকিয়েই গেছে, ওদের আর রেখে কী হবে? ছেলেমেয়েরা ক্ষুব্ধ হল: ব্যাপারটা কী? — আমরা গাছ লাগাই, আর কে না কে এসে কিনা সেগুলি মেরে ফেলে? জানা দরকার এটা কার কাজ।

এই দিন থেকে প্রকৃতির খুদে সংরক্ষকদের পাইওনিয়র অভিযান শুরু হল। সন্ধ্যাবেলায় পাইওনিয়ররা ক্ষেত্র-সংরক্ষণকারী বনভূমিতে যেত, তারা অনাহূত অতিথিদের প্রতীক্ষায় থাকে। কয়েক দিন বাদে অপরাধীরা হাতে-নাতে

ধরা পড়ল — দুজন যৌথখামারী গাছ কাটার উদ্দেশ্যে করাত হাতে দেখা দিল। কারা গাছপালা নষ্ট করছে সে সংবাদ ছেলেমেয়েরা যৌথখামারের পরিচালনদপ্তরে জানাল। অপরাধীদের প্রতিটি নষ্ট করা গাছের জায়গায় দশটা করে গাছ লাগাতে বাধ্য করা হল। ছেলেমেয়েরা আনন্দ পেল: সত্যের জয় হল। পরিপূর্ণ নৈতিক শিক্ষার এ হল এক অপরিহার্য শর্ত। কমিউনিস্ট আদর্শের জন্য সংগ্রাম তখনই মহত্ত্বের উৎস হয়ে দাঁড়ায় যখন খুদে পাইওনিয়র ন্যায়ের জয় দেখতে পায়। বিজয় অনুপ্রাণিত করে, নতুন নতুন বাধাবিপত্তি অতিক্রমণের অবশ্যপ্রয়োজনীয় নতুন শক্তি যোগায়।

প্রকৃতির খুদে সংরক্ষকরা এক নতুন খেলায় মেতে উঠল। খেলাটার ভিত্তি ছিল সৌন্দর্য ও শ্রমশীলতার জন্য সংগ্রাম। একবার পাইওনিয়র অভিযানের সময় তারা দেখতে পেল যে কোন কোন যৌথখামারীর উঠোন আগাছায় ভরে উঠেছে। ছেলেমেয়েরা ঐ যৌথখামারীদের আপেল গাছের চারা এনে দিল, আগাছা সাফ করে সে জায়গায় ফলের গাছ বসাতে বলল। দেখা গেল তিনজন লোক উৎসাহহীন — এ কাজে তাদের আলস্য। পাইওনিয়ররা তখন 'প্রকৃতির খুদে সংরক্ষকদের বার্তা' লিখল — তাতে থাকল উৎসাহহীন লোকদের উদ্দেশে প্রতিবেদন: 'আপনাদের উঠোন যে আগাছার পালনক্ষেত্র হয়েছে এই দেখে আমরা, প্রকৃতির খুদে সংরক্ষকরা ব্যথিত। কাঁটাগাছের ঝোপেঝাড়ে শিগ্‌গিরই হয়ত নেকড়েরা আস্তানা গাড়বে। এই 'বনে' বাস করেন কী করে? আপনাদের কাছে অনুরোধ, আগাছা সাফ করে ফেলুন, আপেল গাছ ও আঙুরলতা লাগান, ফুলের চাষ করুন। আপনাদের বাড়ির পাশে পাঁচটা চারাগাছ আর তিনগোছা আঙুরলতা রেখে গেলাম। কালই গাছগুলো

লাগাবেন। লাগাবেন এবং ভালো করে জল দেবেন। এ কাজে যদি আপনাদের আলস্য হয় তাহলে আমরা আসব, গর্ত খ্ঁড়ব, আগাছা সাফ করব, গাছ লাগাব। বাগান হবে, তবে সে বাগান আপনাদের হবে না, হবে আমাদের পাইওনিয়রের।'

'বার্তাগ্লি' দেওয়া হল অভিনব পন্থায়: খোলা জানলা গলিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হল। আর সন্ধ্যাবেলায় কেউ যাতে দেখতে না পায় এমনি ভাবে চারাগাছ রেখে দেওয়া হল। এ সবই ছিল শিশ্দের উদ্ভাবিত খেলা। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল পরদিন কী হয়: উৎসাহহীন লোকেরা কী করে। ক্লাসের পর রাস্তা দিয়ে যেতে দেখল পতিত জমিগ্লিকে চেনাই যায় না: যেখানে আগাছা জন্মেছিল সেখানে গাছ লাগানো হয়ে গেছে।... প্রকৃতির খ্দে সংরক্ষক পাইওনিয়র গ্রুপের সংবাদ দেখতে দেখতে স্কুলময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। আমাদের বাহিনী হল প্রকৃতির খ্দে সংরক্ষক পাইওনিয়র স্বেচ্ছাসেবীদের সংগঠক। যৌথখামারের পরিচালনদপ্তর জ্যেষ্ঠ পাইওনিয়রদের অন্রোধ জানাল তারা যেন তুত গাছের আবাদ রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করে: কোন কোন যৌথখামারী কোন রকম দয়ামায়া না করে ডালপালা ভাঙ্গত। পাইওনিয়ররা কয়েকবার অভিযান চালানোর পর ডাল ভাঙ্গা বন্ধ হল।

গ্রীষ্মকালে বাহিনী ভালো জাতের গম ফলানোর পরীক্ষাম্লক জমির জন্য ২০ কিলোগ্রাম বাছাই গমের বীজ মজ্ত করার দায়িত্ব নিল। ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে ভালো দেখে গমের শীষ বাছাই করল, স্কুলের একটা ঘরে শীতকালে সেগ্লি সংরক্ষণের জন্য শ্কনো জায়গা বার করল, বসন্তকালে ঝাড়াই করে দানা বার করল এবং কৃষিবিদের হাতে অর্পণ করল। এই শ্রমের মধ্যে এত বেশি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল

যে গম বোনা শুরু হতে ছেলেমেয়েরা (ওরা তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত) তাদের বীজ কী ভাবে বোনা হয় তা দেখার জন্য মাঠে চলল। অংকুর গজাতে মাঠ আবার ওদের টানল। ফসল তোলার সময় পাইওনিয়ররা ঠিক করল যে এ কাজে ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করবে। আমি দেখে আনন্দ পেলাম যে নিজেদের শক্তির একটি কণা লোকের জন্য নিয়োগ করতে পেরে শিশুরা আশেপাশের জগতে যা কিছু ঘটছে সে সবের প্রতি আরও বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে পড়ছে। আমরা মাঠ ছেড়ে যাই, ছেলেমেয়েদের আনন্দ আর ধরে না: আমাদের বীজ থেকে চমৎকার ফসল ফলেছে। যৌথখামারের বাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমরা দেখতে পেলাম আপেলের ছোট চারাগাছে শুঁয়োপোকা। ছেলেমেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। পাইওনিয়ররা এই মুহূর্তে সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্যের কথা ভাবে না, কোন প্রাণ মৃত্যুর আশংকাগ্রস্ত হয়েছে দেখে তারা আসলে উদাসীন থাকতে পারে না। তারা বাগানে গিয়ে শুঁয়োপোকা ধ্বংস করে, আপেল গাছ বাঁচায়, আশেপাশের গাছগুলি খুঁটিয়ে দেখে: সেখানে কোন ক্ষতিকর কীট আছে কিনা।

নিজের দেশের মাটির ওপর অধিকারবোধ — পরম গুরুত্বপূর্ণ দেশাত্মবোধ। আমাদের উচিত শিশুহৃদয়ে তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠাদান। খাঁটি দেশপ্রেমিক সে-ই হতে পারে যার কাছে শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের প্রথম পর্বে সর্বসাধারণের শস্যক্ষেত্রের প্রতিটি শীষের ভাগ্য, সর্বসাধারণের বাগানের প্রতিটি গাছ আর যৌথখামারের মাড়াইয়ে প্রতি মুঠো দানার ভাগ্য মা কিংবা বাবার উপহার দেওয়া খেলনার মতো, প্রিয় সচিত্র গ্রন্থ, স্কেট আর স্কী-র মতোই গভীর ব্যক্তিগত

আনন্দদায়ক। ...সামাজিক ব্যাপার শিশুর কাছে গভীর ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়াবে একমাত্র তখনই যখন সে মানুষের জন্য কিছু সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শ্রমে নিজের হৃদয়ের অংশ নিয়োগ করবে, যখন নিজের হাতে তৈরি বৈষয়িক সম্পদ গভীর আনন্দ নিয়ে আসবে, যখন এই আনন্দের পথ যাবে উদ্বেগ, যত্ন আর অসাফল্যের মধ্য দিয়ে। শিশুর মর্মপীড়া ও মনস্তাপের উৎস আমাকে সর্বদাই উদ্বিগ্ন করে তুলত। শিশু কোন্ জিনিসটাকে হৃদয়ের কাছাকাছি গ্রহণ করে? — কেবল তার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যসংক্রান্ত বিষয় না কি যা অন্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তা-ও? এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে সর্বদা শিশুদের নৈতিক সদ্গুণের নিরিখস্বরূপ ছিল। প্রবল বর্ষণে স্কুলের শিক্ষা ও পরীক্ষা-মূলক খেতে গমের কাণ্ডগুলি হেলে পড়তে দেখে কোলিয়া কিংবা ভালিয়া দুঃখ পেলে আমি পরম পুলকিত হই। শিশু যতক্ষণ না এমন বিপর্যয়ের জন্য কষ্ট পাচ্ছে, নিদারুণ উদ্বেগ ও দুঃখ ভোগ করছে, ততক্ষণ শিক্ষক নিশ্চিত হতে পারেন না, কেননা তাঁর শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ জীবনে উদাসীন পর্যবেক্ষকে পর্যবসিত হলেও হতে পারে।

স্বার্থপর ও আত্মপরায়ণ হয়ে ওঠে ঠিক তারাই যারা লোক সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ছাড়াই শৈশব কাটায়, যারা উপভোগ করত নিরঙ্কুশ আনন্দ। আমার দুই শিক্ষার্থী ভলোদিয়া ও স্লাভা যে এই বিপদের মুখে পড়েছে তা দেখে আমি উদ্বিগ্ন হই। ওদের দুজনের পরিবারেই বাচ্চাদের যত রকম আনন্দ দেওয়ার চূড়ান্ত ব্যবস্থা ছিল। বাচ্চাদের একমাত্র দুঃখ হত এতেই যে বাবা-মা'রা নতুন, ভালো কোন জিনিস কিনে দিচ্ছেন না। এই স্বার্থপর উদ্বেগকে রোধ করতে হলে তার বিরুদ্ধে

দাঁড় করাতে হয় আরেক ধরনের চিন্তা ও দুঃখ—মানুষের বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় আমি দেখতে পেলাম যে 'আনন্দ নিকেতনে' থাকার সময় যে লিণ্ডেন গাছটি আমরা লাগিয়েছিলাম সেটি শুকিয়ে যাচ্ছে। 'আমাদের বন্ধুর জলে কমতি পড়ছে,' আমি ভলোদিয়া ও স্লাভাকে বললাম। ওদের কৌতূহলজনক একটা ব্যাপার দেখাব বলে কথা দিয়ে বাগানে নিয়ে এলাম, তারপর গরমে শুকিয়ে-যাওয়া গাছ দেখালাম। 'লিণ্ডেন আমাদের কাছ থেকে সাহায্য চায়, আমরা ইচ্ছে হলে ওকে সাহায্য করতে পারি,' আমি ছেলেদের বললাম। 'এই জাতের গাছ, বিশেষ করে কচি অবস্থায় ভিজে হাওয়া, সেঁতসেঁতে ভাব আর ঠাণ্ডা ছায়া পছন্দ করে। তাই বলি কি, এসো, আমাদের বন্ধুকে সাহায্য করা যাক। জলের মোটা পাইপ থেকে একটা সরু পাইপ এখানে টেনে নিয়ে আসব (জায়গাটা দূরে নয়), পাইপ থেকে লিণ্ডেন গাছের ওপর বৃষ্টি ছাড়ব—গাছ সত্যিকারের প্রাণ জুড়ানো ঠাণ্ডা পাবে।' গোড়ায় ছেলে দুটো আমার কথায় তেমন কোন উৎসাহ দেখাল না, কিন্তু আমি যখন কৃত্রিম বৃষ্টির কথা বললাম তখন তাদের চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল। শ্রম ওদের কাছে আকর্ষণীয় খেলা হয়ে দেখা দিল। আর এমন কোন্ শিশু আছে যে খেলতে চায় না? ওরাও খেলতে লাগল। আমরা পাইপটাকে গাছের দিকে বাড়িয়ে দিলাম, ঝাঁঝরি লাগলাম, দেখতে দেখতে লিণ্ডেনের ওপর সূক্ষ্ম ঝিরিঝিরি জলকণার বাষ্প দেখা দিল। প্রচণ্ড গরমের দুপুরে ওরা দুজনে বৃষ্টি 'ছাড়ত', আর সন্ধ্যার আগে আগে 'বন্ধ করত'। ধীরে ধীরে গাছের ভাগ্য—গাছ বৃষ্টিতে কেমন অনুভব করছে এই চিন্তা ওদের ভাবিয়ে তোলে। লিণ্ডেনের

ডালগুলো সোজা হয়ে উঠেছে, সেখানে নরম কচি কচি পাতা গজিয়েছে দেখে ওরা আনন্দ পেল। এই ভাবে শিশুদের জীবনে এমন এক বিষয়ে আকর্ষণ দেখা দিল যা তাদের ব্যক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে জড়িত নয়।

কিন্তু এ হল সূচনামাত্র। হীরা কেটে বহুমূল্য ধাতু বানানোর সময় মণিকারকে যেমন মূল্যবান পাথরের কোন জায়গায় কী ভাবে কাটতে হবে তা বোঝার জন্য হীরার প্রতিটি পাশকে ভালো করে লক্ষ্য করতে হয়, শিক্ষাদাতাকেও তেমনি ভাবতে হয় শিশুহৃদয়ের নিভৃততম কোণে প্রবেশের পথ। বনগোলাপের সবচেয়ে বড় বীজ খুঁজে বার করার উদ্দেশ্যে ভলোদিয়াকে নিয়ে আমি কয়েকবার বনে যাই, তারপর বীজ লাগালাম, আমরা সবুজ অংকুরে জল ঢালতাম। গাছ জোড় লাগানোর উপযুক্ত হয়ে উঠছে আমরা তার সঙ্গে শ্বেত গোলাপের জোড় বাঁধলাম। এটা কেবল শ্রম ছিল না, এ হল সন্তর্পণে শিশুহৃদয় স্পর্শ করা। ধীরে ধীরে আমি চেষ্টা করলাম যাতে কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, পারিপার্শ্বিক জগৎও বালকের সুখদুঃখের কারণ হয়ে দেখা দেয়।

স্লাভার প্রতিও অনেক মনোযোগ দিতে হয়। ওলিয়ার সঙ্গে ও পশুপালন ফার্মে অসুস্থ ভেড়ার বাচ্চা দেখতে যেত। প্রথম প্রথম প্রাণী পরিচর্যা তার কাছে ছেলেখেলা বলে মনে হত, তারপর তা শ্রমের প্রতি আকর্ষণে পরিণত হল, ধীরে ধীরে সে হয়ে দাঁড়াল এক কর্মঠ খুদে পশুপালক। আমার চিরকাল মনে থাকবে একটি দিনের ঘটনা। শীতকালের এক ঠাণ্ডা দিনে স্লাভা আমার কাছে এলো—ওর চোখে জল। সে অনুযোগ করে বলল যে তার আদরের বাছুরটা জইয়ের কচি ডাঁটা পছন্দ করে অথচ হট্ হাউস-এ ফলানো হয় কেবল যব।

এখন সে ফার্মে যাবে কী করে? আমরা তাই জইয়ের চাষও শুরু করলাম।

ব্যক্তিগত তাগিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন জিনিসের প্রতি যত্ন—শিশুর স্বার্থপরতার অব্যর্থ মহৌষধ। সামাজিক কল্যাণের চিন্তা শিশুকে যদি ব্যক্তিগত ভাবে পেয়ে বসে তাহলে আত্মাদর বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুমাত্র কখনও শিশুমনে স্থান পাবে না। যে-সমস্ত শিশুর জীবনে আনন্দ-বেদনা কেবল নিজের অহংকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তাদের হৃদয় এই স্বার্থপর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন।

'অসমসাহসীদের দল'

আমার শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও আত্মিক বিকাশের সেই সময় এলো যখন শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল এবং তাদের আচার-আচরণ এমনই অদ্ভুত আকার ধারণ করল যে আপাতদৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যা মেলে না। আমার চোখের সামনে ঘটে গেল কেমন যেন এক ত্বরিত পরিবর্তন: লাজুক ছেলেমেয়েরা হয়ে উঠল বেপরোয়া, যারা ছিল ভীরু তারা হয়ে উঠল সাহসী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

একবার আমরা মাঠে গেলাম দেখতে কী ভাবে যৌথখামারীরা আর ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা খড়ের গাদায় খড় স্তূপাকার করে। ছেলেমেয়েরা কৌতূহলভরে দেখতে লাগল ট্র্যাক্টরচালক ট্র্যাক্টরের সঙ্গে মোটা তার জুড়ে উঁচু গাদার উপর রাশি রাশি খড় টেনে তুলছে। তারটা টানটান হয়ে ১৫ মিটার মতো ওপরে উঠে গেছে। ওখান থেকে আমরা কম্বাইনের দিকে রওনা দিলাম। এমন সময় দূর থেকে আমি দেখতে পেলাম ছেলেদের

মধ্যে কে যেন দু'হাতে তার আঁকড়ে ধরে ক্রমাগত ওপরে উঠে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি শুরা নেই। হ্যাঁ, শুরা-ই ১৫ মিটার উঁচুতে ঝুলছে। ছেলেমেয়েরা শুরাকে দেখতে পেয়ে খড়ের গাদার কাছে ছুটে এলো, ওরা আনন্দে চেঁচামেচি করতে লাগল, বোধহয় প্রত্যেকেরই ইচ্ছে মাথা ঘুরানো ওপরে ওঠার আনন্দ উপভোগ করে। আমি কোন রকমে অপেক্ষা করে রইলাম—শেষ পর্যন্ত শুরা তার বয়ে গড়গড় করে নীচে নেমে এলো। আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করা যায়—অস্বাভাবিক ভ্রমণপর্ব ভালোয় ভালোয় শেষ হওয়ার জন্য আনন্দ করব নাকি ছেলেমেয়েদের যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব।

এ ধরনের ভ্রমণ থেকে ছেলেমেয়েদের ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হল। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে আমার সতর্কতার জন্য ওরা বেশ অসন্তুষ্ট। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই ভ্রমণপর্বকে নিষিদ্ধ না করে নিরাপদ করা দরকার। তারের নীচে আমরা খড় বিছিয়ে দিলাম, একের পর এক ছেলেরা, পরে মেয়েরাও তার বয়ে যাতায়াত করল।

সেই সময় আমাদের অল্‌টারনেটিভ কারেণ্ট বলতে কিছু ছিল না, ব্যাটারি চার্জ করার জন্য ওপরের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একটা বায়ুবিদ্যুৎকেন্দ্র বানিয়েছিল। বায়ুচালিত ইঞ্জিনটি রাখা হয়েছিল ১২ মিটার উঁচু বুরুজের ওপর। বুরুজের ওপরে ছিল কাঠের তৈরি এক সমতল পাটাতন। পাটাতনে ছিল একটা ছোট হ্যাচ্‌ওয়ে, যার ভেতর দিয়ে ইলেক্‌ট্রিশিয়ান ইঞ্জিনে পেঁছুতে পারত। একদিন প্রবল বেগে হাওয়া দিতে শুরু করল, ছেলেমেয়েরা ঘুড়ি ওড়াতে লাগল। প্রত্যেকেরই চেষ্টা, যত উঁচুতে পারা যায় ঘুড়ি ওড়ানো। ভানিয়া বলল: 'আমার

ঘুড়ি সবচেয়ে ওপরে উড়বে।' সে বুরুজের ওপরে গিয়ে উঠল, পাটাতনটার চারদিকে যে কাঠের রেলিং ছিল তার ওপর ঝুঁকে পড়ে সুতো ছাড়তে লাগল। আমি দেখে আঁতকে উঠলাম যে ভানিয়ার অসতর্কতায় হ্যাচ্‌ওয়ের ঢাকনা একপাশে সরে গিয়ে পাটাতনের শেষ প্রান্তে গড়িয়ে এসে মাটিতে পড়ে গেল। ছেলেটা তখন খোলা হ্যাচ্‌ওয়ের চারপাশে ছুটোছুটি করছে—পায়ের তলার কিছুই সে লক্ষ্য করছে না। তার দৃষ্টি তখন ঘুড়ির ওপর আটকে আছে। নেহাৎই বরাতজোর বলতে হবে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটল না।

উচ্চতার প্রতি ছোটদের একটা অদম্য আকর্ষণ আছে; উচ্চতার মধুর অনুভূতি ছোটদের পরম আনন্দ দান করে, এদিকে আমরা, শিক্ষাদাতারা এতে দারুণ উদ্বেগ বোধ করি। ছেলেমেয়েদের যে-সমস্ত আচরণে আমি উদ্বিগ্ন হই তার প্রায় সবগুলিই উচ্চতার প্রতি আকর্ষণের সঙ্গে জড়িত।

স্কুলের অনতিদূরে ছিল একটা পুরনো গীর্জা। ঘণ্টাঘরের ২৫ মিটার উঁচু দালানটার চূড়ায় ছিল গোলাকার গড়ানে গম্বুজ। একবার বসন্তকালের এক রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে গম্বুজের দিকে তাকাতে দেখি ক্রুসের পাশে তিনটি শিশুমূর্তি। সেরিওজা, কোলিয়া ও শুরাকে চিনতে পারলাম। আমার বুক হিম হয়ে গেল। আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা গম্বুজের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে গিয়ে লুকানোর চেষ্টা করতে লাগল। ওদের ডাকার কোন অর্থ হয় না। তাতে বরং ক্ষতি হওয়ারই আশঙ্কা। আমি স্কুলে গিয়ে শিক্ষকদের বললাম তাঁরা যেন ধীরেসুস্থে ছেলেমেয়েদের সকলকে বাইরে নিয়ে যান—কাউকে প্রমোদ ভ্রমণের জন্য বনে, কাউকে মাঠে বেড়ানোর জন্য, আর বড়দের—বাড়িতে; এককথায়, এমন কাজ করতে হবে যাতে

কেউ ওদের তিনজনের দিকে মনোযোগ না দেয়, সোরগোল না তোলে। আমি নিজে গেলাম ওয়ার্কশপে, যেখান থেকে ঘণ্টাঘরটা ভালোমতো দেখা যায়। আমি ওখানে জানলার ধারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। হয়ত এমনও হতে পারে যে খড়ের গাদার পাশে খেলার সুযোগ করে দিয়ে আমি ওদের উঁচু জায়গায় উঠে আনন্দ উপভোগের প্রবল বাসনার ইন্ধন যুগিয়েছি? তারপর আমি দেখতে পেলাম ছেলেরা পুরনো মরচে ধরা পাইপ বয়ে গীর্জার গম্বুজ থেকে নামল। পাইপটা ছিল এতই পুরনো যে জায়গায় জায়গায় কোন রকমে লেগে ছিল মাত্র।

গ্রীষ্মকালে মুষলধারে বর্ষণের পর পুকুরের ওপরকার সেতুর নীচে জলপ্রপাত সৃষ্টি হল। যৌথখামারের এক প্রৌঢ়া কর্মী স্কুলে এসে বলল: 'দেখুন গিয়ে আপনার বাচ্চারা কী করছে।' আমি পুকুরের দিকে গেলাম। বাঁধের ওপর কাউকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু সেতুর নীচ থেকে ছেলেদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেলাম। তোলিয়া ও ভিতিয়া সেতুর রেলিং-এর সঙ্গে দড়ি বেঁধে দোলনা বানিয়েছে: উত্তাল জলপ্রপাতের ওপর দোল খেতে খেতে ওরা আনন্দে চিৎকার করছে।

পেত্রিক, ভিতিয়া ও কোলিয়া কোথা থেকে যেন পুকুরের খাড়া পাড়ের ওপর একটা কাঠের পিপে নিয়ে এসেছে, তার তলাটা অর্ধেক ভাঙ্গা। ছেলেদের একেকজন কড়া নিয়মমাফিক পালা করে পিপের ভেতরে ঢোকে—কেউই নিজের পালা বন্ধুকে ছেড়ে দিতে রাজি নয়—বাকি দুজন আস্তে করে পিপেটা গড়িয়ে ঢালু পাড় দিয়ে নামিয়ে দেয়। পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুরের দিকে নেমে গিয়ে জলের কয়েক মিটার আগে থেমে যায়। এই আমোদপ্রমোদ যে কী করে বিপদ-আপদ

ছাড়াই কেটে গেল তা আজও আমার পক্ষে বুঝে ওঠা ভার। এ রকম ক্ষেত্রে বোধহয় একমাত্র শিশুরাই দুর্ঘটনা এড়িয়ে যেতে পারে।

বনে বেড়ানোর সময় আমরা কাঠুরেদের কাজ লক্ষ্য করতাম। তারা যৌথখামারের জন্য নির্মাণসামগ্রী মজুত করত। বড় বড় গাছগুলি যখন মাটিতে পড়ে তখন ছেলেমেয়েরা সেদিক থেকে কিছুতেই দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। বাড়ি ফেরার সময় ওরা দেখতে পেল না যে শুরা ও দাঙ্কো ওখানে রয়ে গেল। আমরা তখন বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় বুড়ো কাঠুরে ছেলে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির। সে বলল যে শুরা ও দাঙ্কো গাছে ওঠার মতলবে ছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল গাছ যখন পড়তে থাকবে তখন তার ডাল থেকে নীচে লাফ দেবে।

সবগুলি ঘটনাই ঘটেছিল তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার মাসছয়েকের মধ্যে। আমি অনুভব করলাম যে এ ধরনের আচরণ থেকে ছোটদের ঠেকিয়ে রাখা, দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে যত্ন নেওয়া—এটা কোন সমাধান নয়। শিশুদের প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার দাবি কেবল সক্রিয় কার্যকলাপ নয়। শিশু বিপদের মুখে তার নির্ভীকতার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ঘটাতে চায়। আমার শিক্ষার্থীদের জীবনের যে রোমাণ্টিক শৌর্যের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, নির্ভীক আচরণের বাসনা তারই প্রমাণ। শিশুদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা দরকার।

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে আপাতদৃষ্টিতে অপরিণামদর্শী এই কাজগুলি করেছে প্রধানত বালকেরা। এমন একটি ছেলেও ছিল না যে আমাকে ভাবনায় ফেলে নি। এমন কি যাকে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ও ভীরু প্রকৃতির মনে করতাম সেই দাঙ্কোও ১৯৫৫

সনের শরৎকালের শেষ দিকে আমাকে অবাক করে দিল। খুব পাতলা বরফের আস্তরণের ওপর দিয়ে সে পুকুর পার হয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করে তৃতীয় শ্রেণীর আরও দুটি ছেলে চেষ্টা করল—তাদের পায়ের নীচে বরফ ভেঙ্গে পড়ল, তবে সৌভাগ্যবশত তীরের একেবারে কাছে।

দুর্ঘটনা থেকে আগলে রাখা? এটা অবশ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এটাই সব নয়। বিপদের মুখোমুখি হয়ে তাকে জয় করতেও জানতে হয়।

আমাদের এখানে তাই গড়ে উঠল ‘অসমসাহসীদের দল’। ছেলেরা সকলেই সে দলের অন্তর্ভুক্ত হল, কিছুকাল বাদে কোন কোন মেয়েও যোগ দিল। আমি এমন সব খেলা ও আমোদপ্রমোদ ভেবে বার করলাম যাতে মনের জোর আর অসমসাহসের দরকার। পুকুরের ধারে আমরা পেয়ে গেলাম একটা খাড়া উঁচু জায়গা। তলাটা ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম, মনে হল বিপজ্জনক নয়। জুলাইয়ের প্রচণ্ড গরমের দিনে ছেলেমেয়েরা এখানে স্নান করতে এলো। খাড়া পাড় থেকে লাফানোর সময় কী ভাবে শূন্যে ডিগবাজী খেতে হয় তা আমি দেখালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুসরণে শুরা, সেরিওজা, কোলিয়া, ভিতিয়া ও ফেদিয়া জলে ঝাঁপ দিল। পরদিন প্রথম ঝাঁপে কৃতিত্ব দেখাল ইউরা, কোস্তিয়া ও পেত্রিক। তৃতীয় দিন—তোলিয়া, মিশা, সাশা ও ভানিয়া। চারটি ছেলে—পাভ্‌লো, ভলোদিয়া, দাঙ্কো ও স্লাভা তখন পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত। বন্ধুরা ওদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। নীচে মেয়েরা স্নান করছিল, তারাও ছেলেদের উৎসাহ দিতে লাগল। উঁচু তীরভূমিতে আমাদের কাছে এসে হাজির হল তিনা। সে-ও ঝাঁপ দিতে চায়। সে ঝাঁপ দিল, ভঙ্গিটা সুন্দর হল। লারিসা

ও ভারিয়া তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। ওদের চারজনের তখন লজ্জা হল। শেষ পর্যন্ত পাভ্‌লো, দাঙ্কো ও স্লাভা ভয়কে জয় করল।

একমাত্র ভলোদিয়া কিছুতেই মন স্থির করে উঠতে পারছিল না। আমি দেখতে পেলাম ছেলেটি ভয়কে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছে না সেই সীমারেখা যার ওপারে মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয় বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য গর্ববোধ। ভলোদিয়ার জন্য নীচু দেখে একটা জায়গা খুঁজে বার করতে হল। সে মেয়েদের সঙ্গে সেখান থেকে লাফ দিল, কিন্তু উঁচু তীর থেকে লাফ দেওয়ার মতো সাহস তার কিছুতেই হল না। ওর মনে সাহস সঞ্চারের জন্য পরে অনেকক্ষণ ঝঞ্ঝাট পোহাতে হল। বসন্তকালে ছেলেরা যখন গাছে গাছে স্টার্লিং পাখির থাকার জন্য কাঠের বাক্স ঝোলাতে লাগল তখন আমি ভলোদিয়াকে বলে কয়ে গাছে উঠতে রাজি করালাম। বালক এই প্রথম ভয়কে জয় করল। ছেলেমেয়েরা আমাকে গোপনে বলল যে ভলোদিয়া একা একা খাড়া পাড়ের কাছে গিয়ে গায়ের পোশাক খুলে অনেকক্ষণ বসে থেকেছে, ঝাঁপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বার কয়েক ছুটে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়েছে।

অপেক্ষাকৃত সাহসী প্রথম তিনটি মেয়েকে অনুসরণ করে খাড়া পাড় থেকে ঝাঁপ দিল ভালিয়া। ভালিয়ার কাছ থেকে এটা কেউ-ই আশা করে নি। ভালিয়ার আচরণে ভলোদিয়া বিমূঢ় হয়ে গেল। সে চোখ কোঁচকাল, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভালিয়ার পর নিনা, গালিয়া, লিউসিয়া, জিনা, কাতিয়া ও সাশা সাহস করে ঝাঁপ দিল। তারপর সব মেয়েই যোগ দিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল এই যে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের

ইচ্ছাশক্তি অনেক বেশি, তারা বিপুল সাহসিকতার সঙ্গে ভয় ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব জয় করতে পারে এবং সাহসিকতাপূর্ণ কাজে সাফল্য অর্জনের পর তাদের আনন্দের অভিব্যক্তি ছেলেদের মতো অতটা উদ্দাম হয় না।

আগস্ট মাসে প্রবল বর্ষণের সময় যৌথখামারের গোরুর পাল থেকে ১৪টি বাছুর দলছুট হয়ে চলে যায়। বাছুরগুলো জলামাঠে কোথায় যেন পালিয়ে যায়। বড়রা অনেকক্ষণ ওদের খোঁজাখুঁজি করেও কোন হদিশ পায় না। 'আচ্ছা, আমরা একবার খুঁজে দেখি,' শুরা ও ভিতিয়া আমাকে বলল। 'অসমসাহসীদের দলের' ৯ জন—ছয়টি ছেলে ও তিনটি মেয়ে—আমার সঙ্গে বাছুর খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। আমরা সঙ্গে নিলাম বাড়তি খাবার, তাঁবু, কম্পাস, সরোবর পার হওয়ার জন্য দুটি মোটরগাড়ির টায়ার। ছেলেমেয়েরা বেশ খোশমেজাজে ছিল। আমরা জলা মাঠটাকে তন্ন তন্ন করে দেখলাম, কোন কোন জায়গায় ২-৩ জন করে দলে দলে ভাগ হয়ে কাজে নামতে হল। চার দিন বাদে ১১টা বাছুরের সন্ধান মিলল, সেগুলি বনের ভেতরে ফাঁকা জায়গায় চরে বেড়াচ্ছিল। প্রবল বর্ষণের সময় যে প্রচণ্ড জলধারার সৃষ্টি হয় তার কবলে পড়ে বাদবাকিগুলি সম্ভবত মারা গেছে। বাছুর খোঁজার দিনগুলি ছেলেমেয়েদের চিরকাল মনে থাকে। বিশেষত মনে থাকে গালিয়া, লিউসিয়া ও সানিয়ার—মেয়েরা অন্ধকার, ব্যাঙ আর ঢোঁড়া সাপকে ভয় করত। অথচ এ সময় শেয়াল আর পেঁচার সঙ্গেও তাদের মোলাকাত হয়।

গ্রীষ্মকালে, চতুর্থ শ্রেণী শেষ করার পর আমরা পর্বতারোহণের খেলায় মেতে উঠলাম। খাড়া পাড় থেকে দড়ির সিঁড়ি শক্ত করে এঁটে দিয়ে খাদের ভেতরে ঝুলিয়ে দিলাম।

নীচে—আমাদের পাহাড়ী ক্যাম্প, আমরা হলাম পর্বতারোহী। কাজটা ছিল এই যে সিঁড়ি দিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে প্রায় খাড়া দেয়ালের ওপর উঠে আসতে হবে, খাড়া পাড়ে উঠতে হবে, তারপর আবার খাদে নামতে হবে। বহু ছেলেই এখন আর উঁচু জায়গা দেখে ভয় পায় না, তবে গোড়ায় তারাও কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। প্রথমে চূড়ায় উঠে ফের নীচে নামল ভিতিয়া, তাকে অনুসরণ করল শুরা ও সোরিওজা। ইউরা মাঝপথে ফিরে এলো। অপেক্ষাকৃত কম খাড়া অন্য একটি জায়গা খুঁজে বার করতে হল। সেখানে আমরা কয়েক দিন খেললাম। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামল। দেখা গেল তিনা, লারিসা ও কোস্তিয়ার বেশ সাহস আছে। তারা ভলোদিয়া ও স্লাভাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করতে লাগল—তিন মিটার উঁচুতে এই দুটি ছেলের মাথা ঘুরতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সকলেই খাড়া জায়গায় উঠল।

ছেলেমেয়েরা সাহস ও নির্ভীকতার প্রমাণ দেখানোর পর গভীর আনন্দ অনুভব করে। সাহস ও শৌর্য—এই নৈতিক ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ চরিত্রবৈশিষ্ট্য প্রতিটি মানুষের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় কেবল অসাধারণ পরিস্থিতিতে নয়, প্রাত্যহিক জীবনে এবং শ্রমের ক্ষেত্রেও বটে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়পর্বের সমাপ্তি যত আসন্ন হয়ে উঠতে লাগল ততই যে ভাবনা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে তা এই যে শিশুরা শিগ্‌গিরই কিশোর-কিশোরীতে পরিণত হবে। তারা এখনই নিজেদের সম্পর্কে গভীর ভাবনাচিন্তা করে, তারা ভাবে: 'আমি কেমন? আমার মধ্যে ভালো কী আছে, মন্দই বা কী আছে? আমার সম্পর্কে বন্ধুরা কী ভাবে?'

ঘনিয়ে আসে কৈশোর—স্বশিক্ষার কাল। ছেলেমেয়েদের

ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা যখন পরম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক শক্তি হয়ে দাঁড়াবে সেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমি এখনই, শৈশবেই স্বশিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করি। প্রতিটি শিশুর শ্রম ও বিশ্রামের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। ছেলেমেয়েরা সকাল ছয়টায় উঠত, সকালের ব্যায়াম করত, ঠাণ্ডা জলে গা ধুত, সকালের খাবার খেয়ে পড়তে বসত। স্কুলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অন্তত এক ঘণ্টা প্রত্যেকেই পড়া করত। স্থায়ী নিয়মানুবর্তিতা যাতে স্বশিক্ষার বিষয় হতে পারে আমি সেদিকে দৃষ্টি দিই। ভলোদিয়া ও স্লাভার পক্ষে সকালে ওঠা কষ্টকর ছিল। ওদের সকালে ঘুম ভাঙ্গাতে মা-বাবাদের খারাপ লাগাত, ওদের সকাল সকাল ঘুমানোর অভ্যাসও তাঁরা করতে পারেন নি। আমি ছেলেদের সঙ্গে ছাড়া তাদের মা-বাবাদের সঙ্গেও কথা বলি। স্লাভাকে স্বশিক্ষার সম্ভাবনাপূর্ণ পথে টেনে আনা সম্ভব হল। সে নিজের উপর হুকুম জারি করতে শিখল। কিন্তু ভলোদিয়াকে আপাতত সে পথে আনা গেল না। পরিবার তাকে কোমলতার শিক্ষা দিচ্ছিল।

গ্রীষ্মবিদায়

চতুর্থ শ্রেণী শেষ করার পর আমার ছেলেমেয়েরা সকলে— ১৬টি ছেলে ও ১৫টি মেয়ে—পঞ্চম শ্রেণীতে উঠল। ১২ জন ছাত্রছাত্রী সব বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ নম্বর পেল, শিক্ষাপরিষদ ওদের প্রশংসাপত্র প্রদান করল।

আমার মতে আমার শিক্ষকতার প্রধানতম সাফল্য এখানেই যে ছেলেমেয়েরা মনুষ্যত্বের বিদ্যালয় অতিক্রম করেছে, তারা মানুষকে অনুভব করতে শিখেছে, মানুষের দুঃখবেদনাকে

হৃদয়ের কাছাকাছি গ্রহণ করতে শিখেছে, মানুষের মাঝখানে বাঁচতে, নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসতে আর জন্মভূমির শত্রুকে ঘৃণা করতে শিখেছে। তারা শ্রমের পরিবর্তন ক্ষমতা বুঝতে পারে, মাতৃভাষায় চমৎকার আয়ত্তে আনে, পর্যবেক্ষণ, ভাবনা, লেখা ও পড়া এবং ভাষার মাধ্যমে ভাবের প্রকাশ — এই পাঁচটি জিনিস শেখে। আমার এই বিশ্বাস জন্মায় যে সাত বছর বয়সের আগেই, অর্থাৎ বলতে গেলে প্রথম শ্রেণীতে বিদ্যাশিক্ষার আগেই পড়তে ও লিখতে শেখানো যেতে পারে। এই লক্ষ্য অর্জিত হলে শিশুর অন্তরের শক্তি ভাব ও সৃষ্টির কাছে মুক্ত হতে পারে।

সমস্যামূলক বয়ঃসীমায় — কৈশোরে প্রবেশে শিশুদের যাতে নৈতিক ও আত্মিক প্রস্তুতি থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখাও রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার সময় আমি এই উত্তরণ পর্বটির কথা মনে রাখি। কৈশোরের সমস্যা আসলে চতুর্থ শ্রেণীতে থাকতেই শুরু হয়।

...আগস্ট মাসের এক শান্ত সন্ধ্যায় আমরা 'সৌন্দর্যলোকে' আসি গ্রীষ্মকালকে বিদায় জানাতে।

গাছপালার মাথায় মাথায় সূর্যের শেষ কিরণমালা খেলা করছে; চার বছর আগে আমরা যে আপেল গাছ লাগাই তাতে আপেল পেকেছে। আঙুরগুচ্ছের ওপর ভ্রমর উড়ছে, মাঠ থেকে ভেসে আসছে ট্র্যাক্টরের আওয়াজ। আমরা গ্রীষ্মকালের শান্ত সন্ধ্যা সম্পর্কে গান ধরলাম। গান থেমে যেতে ছেলেমেয়েরা সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গীত, যে গ্রীষ্মকে আজ আমরা বিদায় জানাচ্ছি তার স্মৃতি — এ সবই শিশুমনে প্রতিধ্বনি তোলে। পারিপার্শ্বিক জগৎ — সন্ধ্যার আকাশ, রক্তিম গোধূলি, সোনালি আপেল, আঙুরগুচ্ছ, সাদা

চন্দ্রমল্লিকা, ভ্রমরের গুঞ্জন—সমগ্র জগৎ আমাদের সামনে এক বীণাযন্ত্র হয়ে দেখা দেয়, শিশুরা তার তন্ত্রী স্পর্শ করা মাত্রই সে যন্ত্রে বেজে ওঠে মায়াবী সঙ্গীত—ভাষার সঙ্গীত। এ হল আনন্দ ও বিষাদের সঙ্গীত। আমিও আনন্দিত হলাম, বিষণ্ণ বোধ করলাম। এই ত তোমরা কৈশোরে পোঁছে গেছ, তোমাদের সামনে কী অপেক্ষা করছে? আমি প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকব, তোমাদের যৌবনের প্রথম পর্বে ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে নিয়ে যাব। পাঁচ বছর আমি তোমাদের হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে গেছি, নিজের হৃদয় তোমাদের দিয়েছি। এমন মুহূর্তও এসেছিল যখন আমার হৃদয় ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যখন হৃদয়ের শক্তি নিঃশেষিত হত তখন তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছেই যেতাম। তোমাদের খুশির কলতান আমার হৃদয়ে নতুন শক্তি সঞ্চার করত, তোমাদের হাসি নতুন উৎসাহ জাগিয়ে তুলত, তোমাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার ভাবনাকে উদ্বুদ্ধ করত। ...আমি কল্পনায় তোমাদের প্রাপ্তবয়স্ক দেখি। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখি শৌর্যবান সোভিয়েত দেশপ্রেমিককে, সততাপূর্ণ ও আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষকে, স্বচ্ছ বুদ্ধিদীপ্ত ও সুদক্ষ মানুষকে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

'প্রগতি' প্রকাশন

বের হয়েছে:

করোলকভ ইউ.॥ ফেলিক্স — এর মানেই সুখী। কাহিনী।

পোলীয় ও রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ফেলিক্স দের্জিনস্কির বিষয়ে কাহিনী এটি। তাঁর উচ্চ নৈতিক গুণ এবং সমাজতন্ত্রের কাজে নিঃস্বার্থ নিষ্ঠার জন্য তাঁকে 'বিপ্লবের নাইট' নামে অভিহিত করা হয়।

বিপ্লবীর কৈশোর, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রস্ফুরণ, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির ন্যায়সঙ্গত কাজে তাঁর মহান বিশ্বাস, এবং তাঁর লৌহকঠিন ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে লেখক বর্ণনা করেন। অগ্নিগর্ভ বিপ্লবীর জীবন এবং কার্যকলাপ দেখানো হয়েছে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি ও পরিচালনা এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রথম কয়েক বছরের ইতিহাসের পটভূমিতে।

'প্রগতি' প্রকাশন

বের হয়েছে:

ক. আন্তোনভা, গ. বনগার্দ-লেভিন, গ. কতোভ্স্কি॥ ভারতবর্ষের ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

এই বইটির রচয়িতারা বিখ্যাত সোভিয়েত ইতিহাসবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ।

বইটিতে প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দিন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের মুখ্য ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রতি, স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত অন্তঃরাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির ব্যাখ্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার কার্যকলাপ, নিজেদের অধিকারের জন্য শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিশ্লেষণ, মুক্তি সংগ্রামের ক্রমবিকাশের কথা বর্ণনা করা হয়েছে বইটিতে।

‘প্রগতি’ প্রকাশন

বের হয়েছে:

ভ. আফানাসিয়েভ॥ বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম।

বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদমির করেসপণ্ডিং সদস্য ভ. আফানাসিয়েভের এই বইটিতে সংক্ষেপে ও সুবোধ্যভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের অঙ্গীভূত অংশ — বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের মুখ্য উপাদানগুলি বর্ণিত হয়েছে। এতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ, আধুনিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের সমস্যাবলি আলোচিত হয়েছে।

লেখক এতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিকাশের ইতিহাসের কথা উল্লেখ করেন, শোষণ ও উৎপীড়নবিহীন সমাজ গঠনের সমস্যা, বাস্তব সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মানবতাবাদী মর্মের প্রতি যথেষ্ট স্থান দেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত